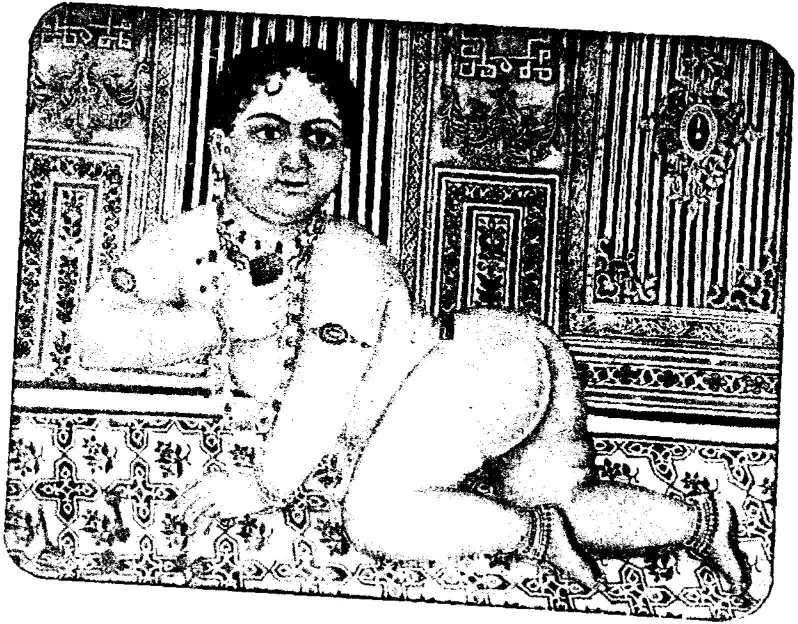


গোপাল ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনোযেনগতঃস

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। বৈশাখ ১৩১৭। ১ম সংখ্যা।

পন্থার চতুর্দ্দশ বৎসর।

সুখ-দুঃখ, বিপদ্ ও সম্পদের মধ্য দিয়া জগৎ-পিতা আমাদিগকে চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত করিলেন। গত ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে, তাঁহারই প্রসাদে কত কত মনস্বী ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিধানে কেহ বা এই পত্রিকাকে ত্যাগ করিয়াছেন কেহবা জন্মান্তরীণ জগৎ হইতে ইহার উন্নতি ও অবনতির আবর্ত্তসমূহকে স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিতেছেন। লীলাময়ের অনন্ত লীলাস্রোতে দোদুল্যমান কলেবর পন্থা এইরূপে তাহার বর্ত্তমান স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতীতের কার্য্যাকার্য্য, পাপ-পুণ্য "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু"। বর্ত্তমানের বিষয় এস একবার ভাবিয়া দেখি. ভবিষ্যৎ তো নিয়তির গর্ভে প্রচ্ছন্ন এবং বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পাঠক ও পাঠিকাবর্গ—! "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এবং "সত্যাৎ নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" এই দুইটী মূলমন্ত্র শিরে বহন করিয়া, পন্থা আপনাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতদূর মূলমন্ত্রের সাধনা হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন। যে পথের অন্বেষণে আমরা নিয়োজিত হইয়াছি, ঐ পথকে উপনিষৎ, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুর হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শত বাধা অতিক্রম করিয়াও পথের সন্ধান পায় বটে—কিন্তু যত দিন ঐ প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক না হয়, ততদিন কি উপায়। বিশ্বের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে ক্ষুদ্র-মহৎ, পাপী ও মহাত্মা সকলেরই স্থান আছে এবং এইরূপ সমদ্রষ্টার চক্ষে সকলের মূল্যই সমান।

গন্তব্য-নির্ণয় পথান্বেষণের পূর্ব্বাভাস ও পরিমাপক। পন্থার মূলমন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া, মহাজনবাক্য অনুসরণপূর্ব্বক এককথায় ঈশ্বরই জীবের গন্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ঈশ্বরকে আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন—ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ হইতেছে বৃহৎ। তাহাতে কোনওরূপ সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা নাই। যাহা সর্ব্বজনীন, যাহা নিরতিশয় তাহাই ব্রহ্মসত্তার পরিচায়ক। কাজেই ব্যক্তিগত উন্নতি বা ব্যক্তিগত মহত্ত্ব আমাদিগের গন্তব্য হইতে পারে না। কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, আমরা ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত মহত্ত্ব পরিবর্জ্জন করিতে বলিতেছি। যতকাল জীব ও সংসার থাকিবে, যতকাল পর্য্যন্ত ভেদভাবশীল প্রত্যেক মানবই স্বরূপ বোধ করিতে না পারিবে, ততকালই ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত মহত্ত্বের মোহিনীশক্তি ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তবে ঐ উন্নতি ও মহত্ত্বের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তদনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত করা প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে জীবসাধারণ ও জগতের হিত সমভাবে ও সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত মহত্ত্ব ও ধর্ম্ম। মায়ার ঘোরে অনেক সময় ঐ প্রকৃত মূল্যের কথা আমরা ভুলিয়া যাই—ফল হয়, দেবতার নামে অসুরত্বের প্রতিষ্ঠা—বিদ্যার মন্দিরে অবিদ্যার সংস্থাপন। জীবের অহংকার-শক্তি এতই প্রবল যে, দেশ, কাল ও পাত্রাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের মহত্ত্ব সংস্থাপনই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঐ অহংকারের শক্তি এতই সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন যে, তাহা কখন কোন ভাবে খেলা করে, তাহা স্থির করা কঠিন। সময়ে ঐ শক্তি পুরাণপ্রসিদ্ধ মায়ামৃগের ন্যায় রামের শব্দেরও অনুকরণ করে—বুদ্ধির ও বিদ্যার নামে অহংকার

ও অবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করে। তজ্জন্যই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্ম পদার্থ—পরিচ্ছিন্নতাশূন্য ও ভেদাতীত। যাহাতে ছোট-বড়, পাপী-মহাত্মা—সাধারণ ও অসাধারণের বিপর্য্যয় আছে, তাহা ব্রহ্মবস্তু হইতে পৃথক্ সুতরাং অবিদ্যা। প্রকৃত ধর্ম্মের পন্থা, ঐরূপ বিশেষতাশূন্য। বিশেষতা মাত্রই পরিমাপক। পরিমাপমাত্রই মায়ার কার্য্য। মায়া শব্দের ব্যাখ্যা করা স্বল্পস্থানের মধ্যে সুকঠিন এবং তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। তবে এক কথায় বলিতে গেলে যাহাতে বিশেষতা আছে, অর্থাৎ যাহা সকল বস্তু ও সকল ভাবকে সমভাবে সমন্বিত করিতে না পারে, তাহাকেই মায়া বলা যায়—যাহার পরিচ্ছিন্ন সত্তা আছে, প্রাদেশিকতা আছে, যাহাতে "আমি" "তুমি" বিভাগ আছে, তাহাই মায়া।

আপত্তি হইতে পারে যে, এরূপ ব্যাপক সত্তার উপর ভিত্তি-স্থাপন করিয়া কোনও প্রকার ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যায় না এবং ঐ সত্তা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পন্থা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। এ আপত্তি যে, আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত, তাহা নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক প্রকার মতাবলম্বী মনস্বী ব্যক্তিরা ঐ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অদ্বৈত মতের অসম্পূর্ণতা ও অপ্রামাণিকতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐ সমস্ত আপত্তি এই অর্থে নিয়োজিত হয় যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থান নাই, অথবা পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের যুক্তিযুক্ত কোনও ব্যাখ্যা নাই। স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা অযৌক্তিক। প্রথমতঃ যদি ব্রহ্মই জীবের গন্তব্য ও পরা গতি হয়, তাহা হইলে তৎ স্বভাবানুযায়ী পন্থা অবলম্বন ভিন্ন তথায় গমন করা অসম্ভব। যদি পূর্ব্বদিকে কোনও স্থানে আমার যাওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পশ্চিম দিকে আমি যতদূরই অগ্রসর হই না কেন, গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, আমি ক্রমশঃই তাহা হইতে দূরে যাইয়া পড়িব। পূর্ব্বদিকের পন্থায় গমন করিতে করিতে, আমার অনেক সময় অতিবাহিত হইতে পারে, পথের কোনও একটী স্থানে উপনীত হইলেই, আমার গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি হইবে না সত্য, কিন্তু দিঙ্‌নির্ণয় ঠিক থাকাতে, আমি যতই দূরে থাকি না, কোনও না কোন সময়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়ার আশা থাকিতে পারে। তদ্রূপ সান্তের দ্বারা অনন্তের লাভ, বিশেষের দ্বারা অবিশেষ-

প্রাপ্তি, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সান্ত বস্তুর বিপুল সমাবেশ করিলেও অনন্ত হইতে পারে না। তুমি একটী সান্তবস্তুর অপরটীর সহিত যোগ করিলে, ক্রমশঃ তাহাদিগের বিস্তৃতি ও আয়তন বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপভাবে যতদূরই বা যত ক্ষণই যোগ কর না কেন, অনন্তত্বে পঁহুছিতে পারিবে না। বিশেষত্ব যতই উন্নত কর না, অবিশেষী পদার্থের জ্ঞাপক হইবে না। যদি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিতে তুমি জনসাধারণের পাপ ও অজ্ঞান হইতে পৃথক্ থাকিয়া নিজ অহঙ্কার-প্রণোদিত চেষ্টা দ্বারা যে ব্যক্তি বিপুল ক্ষমতাশালী হইয়াছেন—যিনি জানেন যে, তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মই তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হইতে বিশিষ্ট করিয়া, এক পবিত্র উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছে—এইরূপ ব্যক্তিবিশেষকে বুঝ, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, তুমি ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হইয়াছ! এবম্প্রকার বিশেষত্বের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম অবিশেষী। এই অবিশেষী শব্দের বোধ হয় কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, বিশেষত্বের অভাবই অবিশেষ। "বিশেষ—অবিশেষ" দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব নহে। একদিকে দেখিতে গেলে, ব্রহ্ম-পদার্থ, অনন্য-সাধারণ—শ্রুতি যেমন ব্রহ্মকে "এক" বলিয়াছেন তেমনই 'অদ্বিতীয়" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি অবিশেষও বটেন। পূর্ণ অদ্বিতীয়ত্ব ও অবিশিষ্টতা বুঝিতে হইলে, দ্বিতীয়ত্বের ও বিশিষ্টতার নিরসন দ্বারা বুঝিলে হইবে না। অদ্বিতীয় বলিতে যাহা দুই হইতে পৃথক্ তাহা নহে—যাহা ভিন্ন অপর একটী পদার্থ আছে বটে, কিন্তু যাহা নিজ গুণ-গরিমায় তাহা হইতে পৃথক্ এরূপ নহে। অদ্বিতীয়তা গুণগত নহে, সত্তাগত। গুণের ভাষায় বলিতে গেলে, অশেষ গুণ প্রকাশিত হইয়াও যাহার সত্তা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের এই অদ্বিতীয়তা আছে বলিয়াই, সৃষ্টিস্রোতে মায়ার জগতে ঐ পূর্ব্বকথিত বিশিষ্টতা দেখিতে পাই—কিন্তু ঐ বিশিষ্টতার স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া, আমরা কেবল তাহার বাহ্যিক ভাবদ্বারাই সমধিক আকৃষ্ট হই। বস্তুতঃ জীবের বিশিষ্টতা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তারই প্রকাশভাব এবং আমরা আমাদিগের বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তির প্রভাবেই ঐ বিশিষ্টতার সত্তাগত ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার ব্যবহারিক ভাব গ্রহণ করিয়া ভেদজ্ঞানের সহায়তা করিতেছি। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্"।* অবিশেষী

বলিতে, যাহা বিশেষ হইতে পৃথক্ তাহা নহে, যাহা বিশেষের অতীত। এই দুইটী ভাব মূলতঃ বিভিন্ন। অতীত ভাব গ্রহণ করিলে, যাবতীয় বিশিষ্ট তাহার বিশাল বক্ষে স্থান পায় বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের বাধা দান করে না—পক্ষান্তরে পৃথকত্ব ভাব গ্রহণে সান্তত্ব ও সোপাধিকত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই ভাব বুঝাইতে গিয়া, উপনিষৎ যে উদাহরণ গুলি গ্রহণ করিবাছেন তন্মধ্যে একটী উদাহরণ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলেই ভাবগ্রহণ করিতে পারা যাইবে। "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্র বিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" যেমন এক বায়ু পৃথিবীতে নানা পদার্থের মধ্যগত হইয়া বহুরূপ ধারণ করিয়াছে এবং পদার্থ বিশেষের বাহিরেও যেমন সেই বায়ুই বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ এক আত্মা বা ব্রহ্ম প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেও রহিয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও রহিয়াছেন। বায়ুর উদাহরণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই, বায়ুর প্রকাশভাব যে, বস্তুগত ভাবের উপর স্থাপিত, ঐ বস্তুর দিক হইতে দেখিতে গেলে, পাত্রাবচ্ছিন্ন বায়ুর বিশিষ্টতা আছে—ঘটের বায়ু হইতে পটের বায়ু পৃথক্ ও বিশিষ্ট, তেমনই বায়ুর পক্ষ হইতে দেখিলে, তাহা বিশিষ্টতার সংকার্ণ অন্তরালে পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহা ভূমা, যাহা বৃহৎ, তাহা বিশিষ্টতার অতীত।

এই ব্রহ্ম সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই পন্থার মূলমন্ত্র "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ" গ্রথিত হইয়াছে। যাহার সত্তার সাময়িক, প্রাদেশিক বা পাত্রগত বাধা আছে, তাহাকে সৎ বলা যায় না, কাজেই তাহার সত্যতা নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে সত্যের অল্প-বিস্তরতা বা উচ্চ-নীচতা থাকিতে পারে না। কাজেই তুমি যদি বল যে, নীতি ও ধর্ম্মের প্রাদেশিকতা আছে, কোনও সার্ব্বজনীন নীতি বা ধর্ম্ম নাই, তাহা হইলেই আমাদিগকে বলিতে হয় এরূপ নীতি বা ধর্ম্ম সনাতন নয় এবং ঐরূপ নীতি বা ধর্ম্মের কল্পনা ব্রহ্মবিদ্যা-বিরোধী। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিভিন্নতার প্রতি সমধিক মনঃসংযোগ, পূর্ব্বকথিত বহির্ম্মুখী বৃত্তির কার্য্য এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তন্মূলে যে সমতা ও সর্ব্বজনীনতা আছে, তাহাই সত্য ধর্ম্মের ভিত্তি এবং তাহার শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রয়োজন ও সাধনা।

এই ত গেল গন্তব্য নির্ণয়। এখন দেখা যাউক পথ কোথায়? সে সম্বন্ধে প্রথম সমস্যা—এই দাঁড়ায় যে, জাগতিক পদার্থ-নিচয়ে ও ক্রিয়া-কলাপে ঐ

উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যায় কোথায়? সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত বস্তু-নিচয় ও ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগের বিশিষ্টতা, সান্তভা ও প্রাদেশিকতা সুস্পষ্ট—অনন্তত্ব ও অবিশিষ্টতার স্থান বা অবসর কোথায়? যদি সৃষ্টির কোন নিয়ন্তা থাকেন এবং তিনিই যদি জীবের চরমগতি হয়েন, তাহা হইলে উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন সৃষ্টিরই বা প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কোথায়? উভয়ের বিরুদ্ধ ভাব, শাস্ত্র ও তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতামৃতবর্ষী শারীরক-ভাষ্য লিখিতে গিয়া প্রথমেই বলিলেন, "যুষ্মৎ অস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োবিষয়বিষয়িণো-স্তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ" আমা হইতে পৃথক "তুমি" বা "ঐ" বলিয়া জ্ঞান হইতেছে,—যে বিষয় বা সংসার এবং "আমি" বলিয়া জ্ঞান হইতেছে—যে বিষয়ী বা আত্মা—এ দুইটী আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবযুক্ত। ইহাই যদি হইল, সৃষ্টির বা সংসারের স্বরূপ বা স্বভাব, তবে সাধারণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপন্থার অনুসরণ কি প্রকারে করা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, এই বিরোধের বিষয় আলোচনা করিয়া তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কি বিষয় ও বিষয়ী-- এতই বিরুদ্ধস্বভাবযুক্ত যে, তাহাদিগের কোনও প্রকার সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সংসারে দুয়ের সংযোগ কিরূপে সম্ভবে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রীকরণ অসম্ভব। আচার্য্য তজ্জন্যই শব্দ ও ভাব-সাগর উন্মন্থন করিয়া "তমঃ প্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ" বলিয়াছেন। এই তমঃ-প্রকাশের বিরোধ কিরূপ? আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, দুয়ের কোন সংযোগ বা সমন্বয় নাই। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? যাহার কোনও আলোকের জ্ঞান নাই তাহার তমসেরও কোন জ্ঞান থাকার সম্ভাবনা নাই—নিরবচ্ছিন্ন তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তি অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া জানে না। আরও দেখ, যখন প্রকাশ-স্বভাব বলা হইয়াছে, তখনই তাহার প্রকাশ্য বস্তু চাই এবং সেই প্রকাশ্য বস্তুরও এরূপ স্বভাব আছে, যাহাতে সে প্রকাশিত হইতে পারে। তাহা হইলেই দেখা গেল, যে তত্ত্বতঃ দুয়ের কোনও বিরোধ নাই—পারমার্থিক বিষয়ে উভয়ের বিরোধ দূরীভূত হইয়া—অপূর্ব্ব সংযোগ করিয়া দেয়। তবে বিরোধ কোথায়? চিচ্ছক্তি তত্ত্বতঃ অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সংসারের

মধ্য দিয়া সান্তত্ব ও পরিচ্ছিন্নতার আবরণের অন্তরাল হইতে তাহার স্বরূপ ধীরে ধীরে প্রকাশিত করিতেছে। তজ্জন্যই সাধারণ জ্ঞানের ভিতর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিন অবস্থা পরিদৃশ্যমান হয়। এই অবস্থা-ত্রয়ের সমন্বয় করিতে যাইয়া—তত্ত্বদর্শী বলিলেন, 'বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং।' চিত্তিশক্তি অব্যাহত-প্রভাবে কার্য্য করিতে না পারিয়া, যেখানে গিয়া বাধা পায়, তাহারই নাম বিষয় বা সংসার এবং এ বাধা যে পরিমাণে অতিক্রম-পূর্ব্বক যতদূর তাহাকে নিজান্তর্গত করিয়া লইতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার বিষয় বা সংসার লোপ পায়।

সাধারণভাবে সংসার-স্রোতকে আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় অশেষ বৈচিত্র-চিত্রীকরণের মধ্যে একতা ও অদ্বিতীয়তা ফুটিয়া পড়িতেছে। বিশ্বকে একটী বিশাল পিণ্ডদেহ (Organisen) বলিয়া দেখিলে, আমাদিগের কর্ত্তব্য ও সাধনার পথ সনাতন, সত্য ধর্ম্মের পন্থার অনুসরণ করিতে পারে। সেই জন্যই কি ঋষিগণ ব্রহ্মাণ্ড শব্দ ব্যবহার করেন নাই? মানবের সাধনের পন্থা সুগম করিবার জন্যই সৃষ্টির সর্ব্বস্থানেই প্রণালীগত একতা রক্ষিত হইয়াছে। যে কোনও পিণ্ডদেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই, দেখা যাইবে যে, তাহার এক অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক হইলেও বিভিন্ন নয়, একের স্বাস্থ্য ও পোষণে অপরের স্বাস্থ্য ও পোষণের সহায়তা করে—একের ক্রিয়া ও প্রয়োজনের সহিত অপরের ক্রিয়া ও প্রয়োজন সম্পূর্ণ সুসম্বদ্ধ ও অন্যোন্যাশ্রয়ীভূত। এই বাহ্যিক অন্যোন্যাশ্রয়তার আভ্যন্তরিক কারণ ও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া অন্তর্মুখী দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে পাই যে, প্রতি পিণ্ডদেহের অভ্যন্তরে এবং তদতীত হইয়া, এক অনির্ব্বচনীয় ও অদ্বিতীয় ভাবস্রোত ওতঃপ্রোতভাবে এ দেহের প্রতি-ক্রিয়া ও অংশকে সার্থক ও সমন্বিত করিতেছে। ঐ ভাবস্রোতের উপরই দেহের অবয়ব গুলির সত্তা প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐ সমস্ত অবয়বের মধ্য দিয়া ঐ ভাবস্রোত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। আবার দেখ, কোনও অবয়ব-বিশেষ বা তাহাদিগের সমষ্টি, যাহাকে তুমি দেহ বলিতেছ, ঐ ভাবস্রোতকে পূর্ণ-প্রকাশিত করিতে পারিতেছে না। কেন না, ঐ ভাবস্রোতই দেহ হইতে দেহান্তর প্রস্তুত করিয়া, জীব ও জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত করিতেছে, এবং অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিতেছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের ধর্ম্মের পন্থা অতি সুস্পষ্ট, যাহাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতেই ব্যক্তিগত কল্যাণও সাধিত হইবে। এই ধর্ম্মের সাধনা-মার্গের প্রথম স্তর হইতেছে, "দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ" এবং চরম স্তর হইতেছে, "অহং তেষু, তে ময়ি।"

এই মৌলিক সত্যের উপরই আমাদিগের সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত। উহা একটী কবি-কল্পনা নহে, জীবনের মূলমন্ত্র ও স্বভাবের জীবনী শক্তি। মহাত্মাগণ ব্যক্তিগত উন্নতি বা অনন্য-সাধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্তি জীবের উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, জীব ও জগতের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া দিয়া, যাহাতে সর্ব্বজনীন মঙ্গল সাধিত হয়, সেই পথেই আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে বলিতে হইবে,—"পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু" ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রার্থনা করিতে হইবে—"সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি এবমেব ত্বয়া কার্য্যং" কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদ্বৈ ভূমা তদ্বৈ সুখং।" ওঁ শান্তিঃ।

ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের

পরলোক গমন ।

আমরা পন্থা মুদ্রাঙ্কিত করিতে যাইবার সময় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অকস্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তি সংবাদ পাইলাম। আমাদিগের কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই—আমাদিগের বুদ্ধি ও সাধ্য অনুসারে মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করাই পন্থার প্রয়াস এবং কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রয়াস সফল হইলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে রাজা ধর্ম্মগোপ্তা। মৃত সম্রাট যে, নামে ধর্ম্মগোপ্তা ছিলেন তাহা নহে। ধর্ম্ম শব্দের কোনও সংকীর্ণ ব্যবহারিক অর্থ না দিয়া যদি সর্ব্বজনীন প্রীতি ও সেবা মাত্রকেই ধর্ম্ম-পদবাচ্য করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই বলিতে হইবে যে, আমাদের সম্রাট এক জন প্রকৃত-ধর্ম্মগোপ্তা ছিলেন। ভারতে তাঁহার রাজ্যকালে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী জন-সাধারণ নিঃসঙ্কোচে নিজ নিজ ধর্ম্মে উন্নতি ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এত বড় সুবিশাল রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এক জন কৃতী পুরুষ। আমরা সময়োচিত শোক-প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রেতাত্মার উন্নতিকল্পে বিশ্বনিয়ন্তার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এবং আশা করিতেছি—যে কোনও ভবিষ্যৎ কালে এই মহান্ আত্মা জীবের হিত-সাধন ও মানবের ভ্রাতৃভাব-সংস্থাপনের সহায়তা করিবেন। শোক-সন্তপ্ত রাজ পরিজন-বর্গকে আমরা আর কি আশ্বাস দিব—কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, মৃত সম্রাট তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যথাসময়ে জগৎপিতার স্নেহময় ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অসীম প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয়ের প্রীতি, তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা"। আমরা প্রার্থনা করি যে, নবীন সম্রাটও তাঁহার পিতা ও পিতামহীর উচ্চ আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রজাবর্গের বহু-বর্ষব্যাপী হিত সাধন করিতে থাকুন।

গীতা-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিষয়টি বড়ই গুরুতর। লিখিবার বিষয় এত অধিক যে, সমস্ত সম্পূর্ণ করা একরূপ অসম্ভব। কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া চিন্তার অবসর দিয়াই ক্ষান্ত হইব। শেষ প্রবন্ধে আমি ১১শ অধ্যায় অবধি আসিয়াছি। যে সমস্ত শ্লোকে ঈশ্বরবিষয়ে বিন্দুমাত্র কথা আছে সে সমস্তই দেখাইয়াছি। এক্ষণে পরবর্ত্তী শ্লোক গুলি লইয়া কিছু বলিব।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যদিগের অব্যক্তের উপর মনস্থির করিয়া ধ্যান করা ও ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া নির্ভর করার পার্থক্য দেখাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মত, বেদান্ত দর্শনের মত ও সাংখ্য মতের বিভিন্নতা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে, সাংখ্যের অব্যক্ত ও তাঁহার পরব্রহ্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের মতে পরব্রহ্ম অব্যক্তের বিকাশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরে মতি স্থির করিতে চেষ্টা করা, সাংখ্যমতে অব্যক্তে মনস্থির করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অনেক সহজ। ইহার কারণ এই যে, অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি। মূলপ্রকৃতিতে পৌছান ও ঈশ্বরে পৌছান সমান নহে। আমি সৌরজগৎকে যে তিনটি তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছি, সেই তিনটি এক সঙ্গে লইয়া সাংখ্যেরা বিকাশিত প্রকৃতি বলে। সাংখ্যদিগের অব্যক্ত—তাহাদের মতে এই বিকাশিত প্রকৃতি ও তাহার গুণ সকলের ভিত্তি। সাংখ্য-মত আশ্রয় করিলে উপাধি হইতে অন্য উপাধিতে যাইতে হইবে। কিন্তু শেষ উপাধি হইতে অব্যক্তে যাইবার সময় চৈতন্য কোন নির্দ্ধারিত সেতু পাইবে না। সাংখ্য-দর্শন যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চৈতন্যের উৎপত্তি স্থির না করিয়া, উপাধির উৎপত্তি স্থির করাই কার্য্য। প্রত্যেক উপাধিস্থ চৈতন্য ঈশ্বরে গিয়াই শেষ হয়। সাংখ্য-দিগের অব্যক্তে যায় না। উপাধি হইতে অব্যক্তরূপা মূলপ্রকৃতিতে যাওয়া

অপেক্ষা উপাধিস্থ চৈতন্য হইতে ঈশ্বরের চৈতন্যে পৌছান সহজ। অব্যক্তে পৌঁছিলেও কোন ফল হইতেছে না, কারণ আত্মভাব মূলপ্রকৃতিতে স্থির করা অসম্ভব। কারণ মূলপ্রকৃতি চিরস্থায়ীরূপে কোন ভাবই ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই পৌঁছান অর্থে ইহার বাহ্যিক জ্ঞান যদি বুঝায়, তাহা হইলে কারণ শরীর হইতে ইহাও অসম্ভব। মূলপ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে মূলপ্রকৃতির বাহ্য জ্ঞান সম্ভবে না। অর্থাৎ ঈশ্বরে পৌছান পর্য্যন্ত মূল প্রকৃতির বাহ্য জ্ঞান হইতে পারে না। মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তে আমিত্বের ন্যায় কিছুরই উৎপত্তি করে না। ইহার নিজেরও স্বাধীন আমিত্ব নাই। অব্যক্ত অপেক্ষা উচ্চ কিছু হইতে আমিত্বের উৎপত্তি। অতএব অব্যক্তে আমিত্ব অর্পণ করা একরূপ হয়ই না এবং করিলেও স্থায়ী হইতে পারে না।

তবে যাহারা সাংখ্য সূত্র অনুসারে চলে, তাহাদের পরিণাম কি হয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, তাহারা কারণ-শরীর অবধি আসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে বাধ্য হয়। কারণ তাহারা অব্যক্তে পৌঁছিতে পারে না। সেই জন্য যখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোন্‌টি শেষ স্থান অব্যক্ত না ঈশ্বর। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, ঈশ্বরেই চরম লক্ষ্য রাখা উচিত,কারণ সাংখ্য-মার্গে বিস্তর বাধা-বিপত্তি আছে।

গীতা ১২শ অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫ শ্লোকে—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টিই বলিতেছেন।

১৩শ অধ্যায়ে প্রথম চারিটি শ্লোকে

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুইটি কথা দেখিতে পাই, ক্ষেত্র অর্থে উপাধি, ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকাশ; অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি। প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরের প্রকাশ, কাজে কাজেই সকল আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—তিনি যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ সর্ব্বক্ষেত্রে তিনি যথার্থ জ্ঞাতা। কিন্তু তিনি যদিও যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ, তথাপি কর্ম্ম-বন্ধে বদ্ধ নহেন, কারণ তিনি কর্ম্মের উৎপত্তি করেন না। তিনি নিজে জীবাত্মা নহেন। ইহা তাঁহার প্রকাশ মাত্র। দর্পণে যেরূপ মুখের ছায়া পড়ে, কারণ-শরীরে ঈশ্বরের ছায়াই সেইরূপ জীবাত্মা। এই প্রকাশিত জীবাত্মার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে। ইহা কিছুকাল পরে আবার ঈশ্বরে মিলিয়া যায়।

৪র্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মানবের উপাধি-তত্ত্ব নিগূঢ়রূপে জানিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

২২ শ্লোকে—উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

পরমাত্মা অর্থে পরব্রহ্ম নহে। ইনি শ্রীকৃষ্ণ নিজে। যদিও তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তথাপি তিনি কর্ম্মে বদ্ধ নহেন।

৩০ ও ৩২ শ্লোকে তিনি তাহাই বুঝাইতেছেন—

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

১৪ অধ্যায়ে তিনি ঐ কথাটিই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন। কর্ম্ম ও মূল-প্রকৃতির ত্রিগুণে তিনি বদ্ধ নহেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯ শ্লোকে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

আবার ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

তিনি কি বলিতেছেন দেখ।

এখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—চিরস্থায়ী ও তাঁহার কোন বিশ্রাম নাই। তিনিই বিশ্বে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়।

ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। ইনি সৎ, কারণ ইনি পরব্রহ্ম। ইনি চিৎ, কারণ সনাতন ধর্ম্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এবং ইঁহা হইতেই বিশ্বে উন্নতি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইনি আনন্দ-কারণ, ইনি যথার্থ আনন্দের আধার। ইঁহাতে পৌঁছিলে মানবাত্মা অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায় ৭ম শ্লোক

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

এই শ্লোকটি হইতে নানাবিধ মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমার মতে এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ যুক্তিরই ফল। চৈতন্য ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনিই জীব। কারণ-শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধারণ আমিত্বরূপে বিকাশিত হন। এই শ্লোকে যিনি যে যুক্তিতেই যাইবেন, তিনি সেইরূপ মীমাংসাদি পাইবেন; সুতরাং নানাবিধ অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। সমস্ত অর্থ ও যুক্তি উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই।

অষ্টম শ্লোকে—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ কারণ-শরীরস্থ মানব-অহঙ্কারের বিষয় বলিতেছেন। কারণ-শরীরই মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মের সমস্ত বিষয় যোগ করে।

যখন ইহা দেবযানে যায়, তখন ইহা পঞ্চতন্মাত্র—মন, অহঙ্কার ও জীবনের প্রত্যেক স্থায়ী বীজ লইয়া যায়। যথার্থ বলিতে গেলে, জীবনে যতক্ষণ আমরা সজ্ঞানে থাকি, ততক্ষণ আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার বা আমিত্ব এই সাতটিই জ্ঞানের আধার। যতক্ষণ চৈতন্য থাকে ততক্ষণ ইহারাই প্রকাশিত

হইয়া জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সাধিত করে। ইহারা স্থূল শরীরে ত আছেই সূক্ষ্ম শরীরেও থাকে। কারণ-শরীরেও গুপ্ত ভাবে থাকে। কারণ-শরীরে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য হইতে উদ্ভূত একটি শক্তি গুপ্ত ভাবে বাস করে। পূর্ব্বকর্ম্ম ও তদুদ্ভূত ক্ষমতা-নিদ্দিষ্ট পথে সেই শক্তি ব্যয়িত হইয়া জীবের ভবিষ্যৎ জীবন বা জন্ম গঠিত হয়।

১২ হইতে ১৪ শ্লোকে—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

* * * *

* * * *

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব এই যে, তাঁহারই শক্তি-দ্রব্যে গুণের উৎপত্তি করে। দ্রব্যে আমরা যে সমস্ত গুণ নির্দ্দেশ করি এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া-সমূহ কিছুই ঐ সমস্ত দ্রব্যের অঙ্গীভূত নহে। মূলপ্রকৃতিতে ও সমস্ত গুণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলপ্রকৃতি শুধু গুণশূন্য দ্রব্য। ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞান ও শক্তির স্রোত কার্য্য করিয়াই ইহাতে গুণের উৎপত্তি করে। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই প্রথমে তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই জীবন প্রথম গুণের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিশ্বে যে সমস্ত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই আদি গুণ-সমূহের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। কেনোপনিষদে—স্বর্গে পরাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতির প্রথম আবির্ভাবের বিষয়ে বড়ই সুন্দর একটি গাথা আছে।

যখন পরাশক্তির প্রথম আবির্ভাব হয়, ইন্দ্র জানিতে চাহিলেন ইহা কি। তিনি অগ্নিকে জানিতে পাঠাইলেন যে, সেই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিটি কি? পরাশক্তি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার ক্ষমতা কি? অগ্নি বলিলেন—তিনি মনে করিলে বিশ্ব ভস্ম করিতে পারেন। অগ্নির যে প্রকৃত সে ক্ষমতা নাই এবং কেবল যে তাহাকে ব্যবহার করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য

পরাশক্তি তাঁহার নিকট একটি তৃণ ধরিয়া ভস্ম করিতে বলিলেন। অগ্নি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সেই তৃণ ভস্ম করিতে পারিলেন না। ইন্দ্র বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ুরও সেইরূপ নিগ্রহ হইল। এই উদাহরণটি দেখাইতেছে যে, পরাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতিই এমন কি পঞ্চতন্মাত্রকেও গুণ দ্বারা শোভিত করিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষমতা মূলপ্রকৃতির নহে। শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই বলিতে পারেন যে, তিনিই অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই যথার্থ ক্ষমতা।

ঐ অধ্যায়ে (১৫) ১৬ শ্লোকে

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সত্তাকে দুভাগে বিভক্ত করিতেছেন অর্থাৎ ক্ষর—যাহার অর্থে তিনি সমস্ত বিশ্ব বুঝাইতেছেন। তিনি ঐ কথাটি আর এক স্থানে সাংখ্যদিগের অব্যক্তের সহিত বলিতেছেন। এখানেও নিশ্চয় তিনি সেই একই কথা একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পরের শ্লোক সমূহে তিনি বলিতেছেন—এই দুইভাগই তাঁহা অপেক্ষা নিম্ন। যদিও বিশ্বপ্রলয়ের সময় অক্ষরের বা অক্ষর হইতে উৎপন্ন কিছুরই বিনাশ হয় না, তথাপি তাঁহার স্বভাব অক্ষর হইতেও উন্নত বলিয়াই তাঁহাকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। ১৭ শ্লোকে

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

ইহার সহিত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে, তিনিই কেবল একমাত্র মুক্তির উপায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি মূল হইতে যাহা কিছু বলিয়াছি, ঐ সমস্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে যে, প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতপদ্মোৎসব।*

ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (Theosophical Society) প্রচারিত মত অনুসারে অধুনা চতুর্থ মন্বন্তরের (Fourth Round) পঞ্চম বংশ (Fifth Race) চলিতেছে। আর ষষ্ঠ বংশ (Sixth Race)সংঘটনের আয়োজন হইতেছে। এই পঞ্চম বংশের বিশেষত্ব এই যে,এই সময়ে অধিকাংশ জনমণ্ডলীর কামনাযুক্ত মানসিক প্রকৃতির (Concrete Mind) বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং বিশুদ্ধ মানসিক প্রকৃতির (Abstract Mind) কার্য্য ক্ষেত্র, সাধারণতঃ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। যে যে দেশে যে যে জাতিতে বিষয়-প্রবণ ভোগাসক্ত মানসিক বৃত্তি প্রবল, বর্ত্তমান সময়ে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত জাতির নিবৃত্তি-প্রধান মানসিক প্রকৃতি, বর্ত্তমান সময় সাধারণতঃ তাহাদের বাসের পক্ষে ততদূর অনুকূল নহে। প্রাচীন এসিরিয়া, ক্যাল্ডিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের জাতি-সমূহ শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে বিলুপ্তপ্রায়, কেহ কেহ ক্ষীণ-প্রাণ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কতকগুলি জলচর জীবকে, জল হইতে উত্তোলন করিয়া স্থলের উপর ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের যেরূপ অবস্থা হয়, এই শেষোক্ত জাতিসমূহেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, এক সময়ে আধ্যাত্মিক ভাণ্ডাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সমগ্র জগতে ইহার রত্নরাজি বিতরণ করিয়াছিল, তাই বিধাতার বিশেষ কৃপায় অদ্যাপি ক্ষীণশক্তি হইয়াও জীবিত রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী ও শূদ্রেরা ধন্য, যে হেতু তাহারা অতি সহজে কলিকালে উন্নতি লাভ করিবে। এ স্থলে "স্ত্রী ও শূদ্র" শব্দ দ্বারা বিষয়াসক্ত মানসিক বৃত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ-ভাবাপন্ন দুইটী সম্পর্কীয় বিষয়ের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত পুরুষভাবাপন্ন গুরু বিষয়টি, প্রকৃতিভাবাপন্ন লঘু বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিত, বর্ত্তমান সময়ে

---

* বিগত ৮ই মে বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (Bengal Theosophical Society) সাম্বৎসরিক শ্বেতপদ্মোৎসব (White Lotus Day) উপলক্ষে পঠিত।

অনেকস্থলেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেক স্থলেই সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে যে, ধর্ম্মযাজকের (Church) উপর রাজার (Government) কর্ত্তৃত্ব, রাজার (King) উপর মন্ত্রিসমাজের (Parliament) কর্ত্তৃত্ব, মন্ত্রিসমাজের উপর জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব, পিতার উপর পুত্রের কর্ত্তৃত্ব, শাশুড়ীর উপর বধূর কর্ত্তৃত্ব, পতির উপর পত্নীর কর্ত্তৃত্ব, বৃদ্ধের উপর যুবকের কর্ত্তৃত্ব,——ইহাই বর্ত্তমান সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। এতাদৃশ লঘুগুরু-হীনতা-জনিত বৈষম্যভাব দৃষ্টে এতদ্দেশীয় প্রাচীনবর্গের মধ্যে অনেকেই দুরন্ত কলির প্রবল প্রভাব মনে করিয়া, সতত সন্তপ্ত-হৃদয়ে নিরাশভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাবে নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের প্রণিধান করা উচিত যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সমস্ত বিধিই অশেষ মঙ্গলের আলয়। সেই মঙ্গল বিধির বলে, জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে। প্রাবৃট্‌কালে নবজলধর-ধারায় যখন ধরাতল প্লাবিত হয়, তখন নানা স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এমন কি, তখন সামান্য খাল, বিল, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে, বায়ুসঞ্চালিত তরঙ্গমালায়, কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পের বিকাশে, হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সঞ্চরণে, দর্শকের নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু হেমন্ত সমাগমে সেই সমস্ত খাল, বিল-তড়াগাদি জলশূন্য হইয়া কৃষকের কৃষিক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। আর হেমন্তকালোপযোগী কীট, পতঙ্গ, তরু, লতাদির তখন আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু আবার যখন বর্ষার সমাগম হয়, তখন সেই সমস্ত খাল, বিল, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় পূর্ব্ব-শ্রী লাভ করে। আমাদের এই নিষ্কামশীল জাতিও, এক সময়ে জগতের জ্ঞানধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাত্রী রূপে বরণীয় হইয়াছিল। কিন্তু কালসহকারে মঙ্গলময় বিধাতার সমগ্র জাতির শ্রেয়স্কর বিশেষ ভাব, উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, কালচক্রের নিয়মে প্রজ্ঞাকে কেন্দ্র হইতে পরিধির সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, জগতে কামনাময় মনস্তত্ত্বের অনুশীলনের জন্য, প্রকৃতিকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান-পূর্ব্বক এক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি সাময়িক রূপে আমাদের জাতিকে ক্ষীণশক্তিতে রাখিয়া, অন্য জাতিকে প্রবল করিয়াছেন। আবার জগতে যখন বুদ্ধিতত্ত্বের স্রোত প্রবাহিত হইবে, যখন সমগ্র জগৎ

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে একাঙ্গীভূত হইবে, তখন, শীতের প্রকোপে সমাক্রান্ত মৃতপ্রায় সর্পভেকাদির নিদাঘ সমাগমের ন্যায়, আমাদের এই জাতিও সঞ্জীবিত হইবে। ধর্ম্মপুরুষের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ, ক্রমপরম্পরায় বিশেষ বিশেষ জাতির অভ্যুত্থান দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ইহাই স্থিতিতত্ত্বের একটী পরম রহস্য। এতদ্দেশে যাত্রাগান নামে যে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সম্প্রদায় আছে, তাহাতে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন একটী বালক রাগিণী ভাঁজিতে থাকে, তখন অন্যান্য লোকেরা নিবৃত্ত থাকিয়া তাহাতে মান দিতে থাকে, তারপর সেই বালকের সমাপ্তি হইবামাত্র, অন্য আর একটী বালক রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করে, এইরূপে কিছুকাল পালাক্রমে চলিতে থাকে, অবশেষে সর্ব্বশেষ বালকটী বিরত হইবামাত্র, সকলে সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করে। এইরূপে এক এক জন করিয়া রাগিণী ভাঁজাতে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ই তান-সম্পদে লাভবান্ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এক সময়ে, আমাদের এই জাতি জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জগতের গুরুরূপে মান পাইয়া, যে সুরে রাগিণী ভাঁজিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি জগদ্বাসীর মর্ম্মস্থলে অলক্ষিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য জাতির অন্য সুরে রাগিণী ভাঁজিবার পালা, আর এখন আমাদের মান দেওয়ার সময়। তার পর ষষ্ঠবংশ বিস্তারের প্রাক্কালে, আমরা সকলেই সমস্বরে তান ধরিব। এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ, বর্ত্তমান সভ্যতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে সমস্বরে তান ধরিবার জন্য, এদেশের উপযোগী করিয়া, যথাসাধ্য সম-তানতা রক্ষা করাই, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। নতুবা সমসাময়িক প্রভাবান্বিত জাতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার অভাবে, অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায়, আমরাও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত-প্রায় হইব।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জগতের অধিপতি, এদেশের রক্ষক-পুরুষ, আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সুযোগেই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা এই কালধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ বশতঃ, বর্ত্তমান বহির্ম্মুখীন বিষয়-প্রবণতা দ্বারা রঞ্জিত হইয়া, সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। কারণ, বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ জনমণ্ডলী বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহারা স্থূল-দৃষ্টি প্রযুক্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ

দ্বারা লাভালাভ গণনা করিয়া অন্যান্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। কখন কখন দেখা যায় যে, কোন অভিজ্ঞ কর্ণধার, কোন প্রয়োজন বশতঃ তরণীটীকে বামদিকে ঈষৎ সঞ্চালন করিলে, তদীয় অনভিজ্ঞ নাবিকেরা, সেই প্রয়োজনটী উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া, বামতীরের সঙ্গে সেই তরণীর গুরুতর সংঘর্ষণ উৎপাদন করে। আবার তাহাকে দক্ষিণ দিকে ঈষৎ সঞ্চালন করিবামাত্র, পূর্ব্বোক্ত নাবিকেরা তাহা দক্ষিণদিকের তীর সংলগ্ন করিয়া বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করে। সেইরূপ এদেশের রক্ষক পুরুষ, এদেশে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব (Spirituality) প্রেরণে ইঙ্গিত করিলে, তাহা, চালুনীর ভিতর দিয়া জলসঞ্চালনের ন্যায়, মানসিক মালিন্য প্রযুক্ত, জনসাধারণের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইয়া যায়; কেবল অসার সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর পঙ্কিলতাটুকু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে তিনি যদি একটু সাময়িক বৈষয়িক ভাব (Materiality) প্রেরণে ইঙ্গিত করেন, তবে জনসাধারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থূল ও অসার অংশের নিকৃষ্ট অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে এ দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কণ্টক উৎপন্ন হইতে থাকে। এই উভয়-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া এ দেশকে ঠিক মধ্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য, এ দেশের রক্ষক-পুরুষ, অতি নিগূঢ় উপায়ে বর্ত্তমান ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি (Tneosophical Society) স্থাপন করিয়াছেন।

এই কালধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই, এদেশের স্ত্রী ও অন্ত্যজ জাতি সমূহের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আজকাল দেশের সর্ব্বত্র একটা সমবেদনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যে প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃর অবস্থান মুখ্যভাবে কেবল কেন্দ্রগতই ছিল, তাহা পরিধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র চক্রকে জ্যোতিষ্মান্ করিবার জন্য, সমস্ত মানবমণ্ডলীকে এক জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য, যেন আপন হইতেই চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই জন্য এদেশে যাহারা সমাজের সর্ব্ব-নিম্ন-স্তরে মলিন অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রজ্ঞা-সলিলে ধৌত ও স্নাত করাইয়া, আত্মজ্যোতিঃতে এক অখণ্ড সূত্রে সজ্জিত করিবার জন্য, এই সমবেদনার আবির্ভাব হইল। এই অভিনব কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা আচরণ না করিয়া, যাহাতে মূল উদ্দেশ্যটী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, যাহাতে সম্প্রদায়-বিশেষের অহঙ্কার-জনিত স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি না পাইয়া, একমাত্র

আধ্যাত্মিকতাকেই লক্ষ্য করিয়া, এই উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তৎপ্রতি আমাদের অতি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই কেন্দ্রগত প্রভাব ও পরিধিগত প্রভাব, এতদুভয়ের সেতুরূপে কার্য্য করিবার জন্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নানাপ্রকার সাধনশীল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি ধর্ম্মসমাজ, এই সেতুর কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই, সময়োচিত বিশেষ বিশেষ ভাব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। আর এই শুভ উদ্দেশ্যটী নিরতিশয় উদার-ভাবে সিদ্ধ করবার জন্য, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের নরনারী-নির্ব্বিশেষে লোক লইয়া, বর্ত্তমান ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য-রাজ্য-সমূহে প্রভুত্ব-শক্তির প্রবল প্রতাপ দৃষ্টে, আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করিতে পারিলেই বুঝি, আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইবে, কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। এদেশের আদর্শতন্ত্রীতে পাশ্চাত্য আদর্শের সুর কখনও প্রকৃতরূপে বাজিতে পারে না। কাবুলের ন্যায় ঠিক সুমিষ্ট আঙ্গুর এদেশে উৎপাদন করিতে হইলে, এদেশের সমস্ত জল-বায়ু, প্রকৃতি সুতরাং ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, ঠিক কাবুলেরই ন্যায় জল-বায়ু, প্রকৃতি সুতরাং ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিণত করিতে না পারিলে, তাহা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ এদেশে পাশ্চাত্য উন্নত প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তথাকার প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতিও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; তাহাতে এদেশের দীর্ঘকাল-রক্ষিত বিশেষত্বটী একবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এক্ষণে এই পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ কোন্ অংশ গ্রহণ করিলে, আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইতে পারে, জগতের বিলুপ্ত-প্রায় আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুদ্ধার হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিয়া দেওয়া, ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির একটী প্রধান লক্ষ্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশে এই কাল-ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব বিরাজ করিতেছে। আবার ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশের মধ্যে, এই ভাবটীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক দেশের শাসন প্রণালীদৃষ্টে, সেই

দেশের অন্তর্নিহিত মূলপ্রকৃতির লক্ষণ সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। এই ভাবটীর যে অংশের বিকাশ সাধন যে জাতির পক্ষে উপযোগী, তাহা সেই জাতির শাসন-নীতিতে সারতত্ত্বরূপে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র শাসনপ্রণালীর একটী শেষ-সীমা রাজতন্ত্রপ্রণালী (Monarchical Government),অন্য শেষ-সীমা- প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রণালী (Republic Government); আর অন্যান্য শাসনপ্রণালী, এতদুভয়ের বিশেষ বিশেষ সংমিশ্রণে সমুদ্ভূতমাত্র। রাজতন্ত্র প্রণালীতে রাজশক্তির সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা, আর প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে জনসাধারণের প্রবল আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। অবশিষ্টগুলির মধ্যে, কোনটীতে রাজশক্তির কোন অংশ প্রবল, কোনটীতে প্রজাশক্তির অংশ বিশেষ কার্য্যকর, আর কোনটীতে বা রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই উভয়ের সামঞ্জস্য-সমাধান। বর্ত্তমান সময়ে রুশদেশে রাজশক্তি প্রবল, আমেরিকায় প্রজাশক্তি প্রবল, আর ইংলণ্ডে, প্রজাশক্তির কিয়ৎপরিমাণে প্রাধান্য থাকিলেও, সর্ব্বাপেক্ষা রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বর্ত্তমান-সময়-উপযোগী সামঞ্জস্য। আবার প্রত্যেক দেশের পুরুষশক্তির কার্য্যক্ষেত্র সাধারণতঃ বহির্মুখীন (Objective) ও নারীশক্তির কার্য্যক্ষেত্র সাধারণতঃ অন্তর্মুখীন (Subjective) বলিয়া গণ্য। গণিতের অনুপাতের (Proportion) নিয়মে দেখা যায় যে, দুইটী অন্ত্যরাশির (Extremes) গুণফল, মধ্য রাশির (Mean proportional) বর্গের (Square) সমান। যেমন, একটী এইরূপ অনুপাতের ৪ ও ৯ দুইটী অন্ত্য রাশি, আর ৬ মধ্যরাশি, সুতরাং ৪ : ৬ : : ৬ : ৯ বা $\frac{৪}{৬}=\frac{৬}{৯}$। এখন অন্ত্যরাশিদ্বয় ৪ ও ৯ ইহাদের গুণফল ৩৬, মধ্যরাশি ৬এর বর্গ ৩৬ এর সমান। অতএব রুশিয়ার নারীশক্তি ও আমেরিকার পুরুষশক্তিকে দুইটী অন্ত্যরাশি (Extremes) ধরিলে, ইংলণ্ডের নারীশক্তির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সমাবেশকে মাধ্যানুপাতিক রাশি বলা যাইতে পারে। এই জন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাণীরূপে, তৎপরে সাক্ষাৎভাবে আমাদের মহারাণীরূপে এদেশের অধীশ্বরী-পদে বরিত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিশ্ব-জগতের শিক্ষক পরমকারুণিক পরমেশ্বর অপূর্ব্ব কৌশলে, দেশের অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীরূপ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া, বাহিরের উদ্যান বাটিকারূপ রাজ্যশাসন ক্ষেত্রটী, বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সামঞ্জস্য-

পরায়ণ উন্নত জাতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের দেশকে, তুরস্ক ও তিব্বত দেশজাত গুরুতর অন্তর্বিপ্লবরূপ মহাপাপ হইতে প্রকারান্তরে রক্ষা করিয়াছেন। যে তুরস্কের সোলতান, একসময়ে সমগ্র ইস্‌লাম-রাজ্যে, প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি খলিফার বংশধর বলিয়া পূজিত ছিলেন। আর যে তিব্বতের প্রধান লামা সমস্ত বৌদ্ধজগতে মহাত্মা বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া অর্চ্চিত হইতেন, আজ তাঁহারা কালবৈগুণ্যে জন-সাধারণের নিকট ক্রীড়া-পুত্তল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এই সমন্বয়-পরায়ণ জাতির শাসনাধীনে আসিয়া, এ দেশের জন-সাধারণ এক আদর্শে গঠিত হইতেছে। একপ্রকার শাসননীতি, এক প্রকার শিক্ষা, একপ্রকার মানসিক চিন্তা, একপ্রকার কার্য্যক্ষেত্র, একপ্রকার উপায়ে যাতায়াত, একপ্রকার প্রণালীতে সংবাদাদি আদানপ্রদান দ্বারা এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছে ও পরস্পরের সহিত সমদুঃখসুখতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। ইহাতে অলক্ষিতে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিপাদ্য অভিমত প্রচার ও ষষ্ঠবংশ বিস্তারের পত্তনভূমি প্রস্তুত হইতেছে।

এই সামঞ্জস্য-ভাবটী অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বিধাতা-পুরুষ আমেরিকাতে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, কর্ণেল অল্‌কট্‌কে উহার বহিরঙ্গ বিভাগের, আর ম্যাডাম্ মাভাটাস্কীকে অন্তরঙ্গ বিভাগের অধিনেতৃ-পদে বরণ করিয়াছেন। তদনন্তর মিসেস্ বেসেণ্ট্‌কে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই উভয় বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতিকে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্যাবলী কি আকস্মিক ঘটনা (Chance)-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, না ইহাতে বিধাতা পুরুষের নিগূঢ় কার্য্যকৌশল ও দূরদর্শিতার নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে? এইরূপে সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির সমভাবে স্পন্দিত হইবার জন্য, বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বহির্মুখীন ভাবকে গ্রহণ করিয়া, সমিতির বহির্মুখীন দিকটা, আর সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্মুখীন ভাব লইয়া অন্তর্মুখীন দিকটা এবং উভয়ের সমভাব দ্বারা উহার সমস্ত দেহ, নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই দুই কেন্দ্রের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির গঠন হওয়ায়, উহা বর্ত্তমান কালের সর্ব্ব-শ্রেণী-লোকের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। আর ইহাদ্বারা জগতের আধ্যাত্মিক

শক্তিতে অভিনব চেতনা সঞ্চারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন কোন অভিজ্ঞ ভিষক্‌, কোন ক্ষীণ-প্রাণ, সংজ্ঞাহীন রোগীর মস্তক ও পদ, শরীরের এই দুইটী বিপরীত প্রান্তে, শীতল ও উষ্ণ ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বিপরীত পদার্থের প্রয়োগ দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ এই সুকৌশল-সম্পন্ন উপায়ে, জগতের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্জীবিত হইতেছে। এই যে, দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির ধাতু লইয়া ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির জগদ্ব্যাপী বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা সহসা একদিনে হস্তগত হয় নাই। তাহার সংগ্রহ ও সংস্কার কার্য্যে, নিশ্চয়ই যুগযুগান্তর-ব্যাপী একটা বিরাট আয়োজন চলিয়া আসিতেছিল।

যে দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির সমস্ত শক্তিসামর্থ্যের বিনিময়ে, এই ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি আমাদের আশ্রয়স্থল হইয়াছে তাঁহাদের অসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও অসামান্য ত্যাগস্বীকার, আমাদের সর্ব্বসাধারণের নিকটই সুবিদিত। জননী যেমন স্বীয় স্তন্যধারা দ্বারা ভূমিষ্ঠ শিশুকে প্রতিপালন করেন, ইঁহারাও সেইরূপ স্ব স্ব হৃদয় হইতে তিল তিল করিয়া শোণিতবিন্দু দিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতিকে বর্ত্তমান আকারে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের নিকট আমরা যে কতদূর অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ আছি, তাহা বর্ণনাতীত। ইহাঁদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা স্মরণ করিলে, আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইয়া যায়। আর ইহাঁদের মধ্যে, ম্যাডামের কথা কি বলিব? যিনি জগতের কল্যাণার্থ ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির উন্নতি কল্পে, নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিলেন, আপনার বলিতে যাঁহার আর স্বতন্ত্র কিছু রহিল না, সেই প্রদত্ত-সর্ব্বস্বা, জগতের নরনারীর কল্যাণার্থ ত্যক্ত-প্রাণা, জগতের কোন কোন জন-শ্রেণী হইতে কি নির্য্যাতনই না পাইলেন! তাহা স্মরণ করিলে দুর্ব্বিবহ যাতনাভারে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে! কিন্তু তিনি যে অতুল সম্পদে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার প্রাণপাখী, যে স্বর্গীয় উদ্যানের সুরসফল-আস্বাদন-রসে বিভোর থাকিত, তাহাতে এরূপ নির্য্যাতন তাঁহার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু মাত্র। আর কর্ণেল সাহেব, যিনি আমরণকালব্যাপী চেষ্টায়, জগতের নানা স্থানে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিয়া, জীবন পাত করিলেন, যাঁহার অদম্য উৎসাহে সুদূরবর্ত্তী আইস্‌-ল্যাণ্ড, গ্রীক্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি লোকের প্রীতি-সঞ্চার

হইয়াছে, সেই কর্ণেল সাহেবও যে আমাদের হৃদয়ের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন।

আমাদের দেশে শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত পিতৃ-পুরুষের, এমন কি সমগ্র মানব-মণ্ডলীর, তৃপ্তির জন্য তর্পণ করার একটী চিরন্তন প্রথা আছে। আমরাও আজ এই পবিত্র দিনে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কোষাস্থিত সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড তৃপ্তিরসকে, শ্রদ্ধারূপ তিলের সংমিশ্রণে, আমাদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডরূপ কোষীতে গ্রহণ করিয়া এই তর্পণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আজ এই পবিত্র দিনে আমাদের পর-লোকগত নেতৃদ্বয়ের আত্মার কল্যাণার্থ, আমরা ভগবানের নিকট বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহাদের আত্মার সম্পূর্ণ তৃপ্তি-বিধান হয়। আর যাঁহারা এদেশে ও অন্য দেশে এই ব্রহ্ম বিদ্যা-সমিতির উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, এক্ষণে লোকান্তরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মারও তৃপ্তি হউক। যাঁহারা আমাদের পরিচিত কিম্বা অপরিচিত হইয়াও, কোন না কোন দিন জগতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের আত্মারও তৃপ্তি হউক। যে সমস্ত লোক, ভোগাবস্তু সম্ভোগের পূর্ব্বেই গতাসু হইয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জন্য লোকান্তরে সতত মুহ্যমান রহিয়াছে, তাহাদিগের আত্মারও তৃপ্তি হউক। যাহারা দুর্দ্দমনীয় বাসনা-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া দেহত্যাগ করি-য়াছে এবং পরলোকেও সর্ব্বদা সন্তপ্ত-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের আত্মারও তৃপ্তি হউক। সমস্ত প্রাণিবর্গ তৃপ্তিলাভ করুক আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ হউক। ইহাই আমাদিগের অন্তরের বিশেষ প্রার্থনা।

প্রভু পরমেশ্বর, কৃপা করিয়া এই সকল উন্নতমনা নরনারীর উৎসাহ ও উদ্যম, আমাদের প্রাণে অনুপ্রাণিত করুণ, যেন আমরা সমস্ত মনপ্রাণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির পরিচর্য্যা করিয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতে পারি।

এই উপলক্ষে আমরা শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে আর একটী পবিত্র প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত, আমাদের সর্ব্বজন-প্রিয় পরলোক-গত মাননীয় সম্রাট্ মহোদয়ের আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া, পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি কৃপা করিয়া, আমাদের সম্রাট্ মহোদয়ের আত্মাকে তাঁহার অনন্ত শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।

একটী গল্প।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিষ্যগণ তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে অসমর্থ, অনতিবিলম্বেই তাঁহার আদেশ পালন হইল। চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, সর্ব্ব যন্ত্রণার সহ্যগুণ তাঁহার ছিল; ঠিক প্রাণ-বায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই অদূরে একটি বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র চিনিলেন, কাহার বংশীধ্বনি, ইহা তাঁহার একটি পরিচিত মহিষের বংশীধ্বনি। তাহা শ্রবণ করতঃ সেই মহিষের রূপ ধ্যান করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; তজ্জন্য এই জন্মে মহিষের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

শুনিলেন রাজা মহাশয়?

যুবরাজ—হাঁ, গল্প শুনিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যে করিব কি? তাহাই ভাবিতেছি যে, এইবার হইতে আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে সচেষ্ট থাকিব এবং যাহাতে এই রাজ্যময় সকলেই প্রাণপণে এই ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও ধর্ম্ম রহস্য বুঝিতে সচেষ্ট হয়, তাহাই আমি প্রাণপণে তোমার সহায়তা করিব এবং তুমি যাহা বলিবে, আমি শিষ্যরূপে তাহাই পালন করিব।

সন্ন্যাসিনী—তাহাই হউক। কিন্তু গুরু-শিষ্য ভাব?

যুবরাজ—হাঁ দেবী! আর ছলনা করো না।

সন্ন্যাসিনী—ভাল, যাহা আপনার অভিরুচি। কিন্তু মনে রাখিবেন, গুরু সেই একমাত্র জগৎগুরু। কি আমি, কি উনি, কি তিনি, এইরূপ ভাবে গুরু মনে করিলে, বিষম-ভ্রমে পড়িতে হইবে। 'তিনি এক এবং সর্ব্বভূতস্থ।' ইহাই যেন সর্ব্বদাই স্থির রাখিবেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে কথোপকথন করুন। আমরা আর কতদিন বসিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিব? আসুন, আমরা এই গল্পটি হইতে বেশ করিয়া বুঝিতে শিখি যে, মৃত্যুকালীন যে, যেভাব

---

* চৈত্র মাসের পত্রিকার ৪৬৮ পৃষ্ঠায় কাগী অস্পষ্ট থাকায় গল্প স্থলে গন্ধ ছাপা হইয়াছে।

লইয়া প্রস্থান ক'রে, পরজন্মে সে সেইভাবেই অবস্থান করিবে। আমরা একটি আখ্যায়িকাতে দুইটি ঘটনা দেখিলাম, এরূপ কত গল্পচ্ছলে, সত্যরূপে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া থাকা আবশ্যক, যাহাতে জীবনের এক উদ্দেশ্য লইয়া জীবনযাপন করিতে পারি এবং এইরূপ নিয়ত অভ্যাস করিতে করিতে, যেন মৃত্যুকালীন পর্য্যন্ত চৈতন্যময় হইয়া, সেই সাধনার ভাবটিই মনোমধ্যে আনিতে সমর্থ হই। মায়া-জীবন ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত থাকিয়াও মৃত্যুকালীন সেভাব মনে আনয়ন করাও সুকঠিন। সেই জন্য প্রবাদ আছে :—

"ধর্ম্মকর্ম্ম কর কি, মর্‌তে জান্‌লে হয়।"

প্রকৃতই কর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাখাই সার বুঝি, শেষ রক্ষেই রক্ষে।

শুনিয়াছি অনেক সাধক প্রণব উচ্চারণ করিয়া, ওঁ শব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সাধু পুরুষ এবং যথার্থই সাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, সেই সকল মহাপুরুষগণ (যাঁহারা আমাদের অগ্রগামী হইয়াছেন) তাঁহারাই আমাদের পথ দেখাইয়া দিউন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-কথা।

ম্যাকনিশ সাহেবের স্বপ্ন।

ম্যাকনিশ (Macnish) "স্বপ্ন অমূলক কল্পনা মাত্র"—এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন এবং Philosophy of Sleep নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, যুক্তি দ্বারা স্বীয় মত পোষণেরই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি যে, একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তিনি এই রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"আমি যৎকালে কেথ্‌নেসে বাস করিতেছিলাম, এক রাত্রে একটা ভয়ানক স্বপ্নে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার এক খুব নিকট আত্মীয় (যিনি তৎকালে ৩০০ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন) হঠাৎ মারা গিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। পর দিবস বাটীতে পত্র লিখিলাম। পত্রে এই

স্বপ্নবৃত্তান্ত ঈষৎ গম্ভীর-ভাবে, ঈষৎ বিদ্রূপ-চ্ছলে উল্লেখ করিলাম। ঠাট্টা-ছলে লিখিবার কারণ এই যে, পাছে লোকে ভাবে, আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাটীর সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত, আমি যে, কিরূপ ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত ছিলাম তাহা বর্ণনাতীত। আমার সর্ব্বদাই মনে হইত যে, নিশ্চয়ই ঐ ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই বালকোচিত চিত্তদৌর্ব্বল্যের জন্য আমি সর্ব্বদাই আপনাকে ধিক্কার দিতাম বটে, কিন্তু কিছুতেই মন হইতে ঐ বদ্ধমূল ধারণাটিকে তাড়াইয়া দিতে পারিলাম না। এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল— তিন দিন আমার নিকট তিন যুগ বোধ হইল। চতুর্থ দিনে পত্র আসিল। কি আশ্চর্য্য ! স্বপ্নটি যে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল !! সেই দিনে—সেই সময়ে— সেই আত্মীয় মরিয়াছে সংবাদ আসিল!!" ম্যাক্‌নিশ অবশ্য ঘটনাটিকে Chance coincidence বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যুবক যুবতী।

ম্যাক্‌নিশ তাঁর Philosophy of Sleep নামক গ্রন্থে একটি বড় শোকোদ্দীপক স্বপ্ন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। পেনিন্‌সুলার যুদ্ধ পাঠকবর্গের সুপরিচিত। সৎকালে সার জন্ মূর স্পেন্ দেশে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অধীনে এক যুবক উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই যুবকের প্রতি স্কট্‌লাণ্ড দেশীয়া এক যুবতী অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। প্রিয়তমের বিরহে ইনি অহরহঃ চিন্তিতা, ব্যাকুলা, ম্রিয়মাণা হইয়া পীড়াগ্রস্তা হইয়া পড়িলেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্নে তাঁহার প্রিয়তম যুবককে শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। যুবক ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার মশারি সরাইয়া স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবকের মুখ মলিন ও বিবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত এবং বক্ষস্থলে একটি সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন! এই আহত স্থান হইতে অবিরত রক্তস্রাব হইতেছিল!! যুবতী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য সরিল না। যুবক মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে, আজিকার যুদ্ধে হত হইয়াছি। তুমি স্থির হও, এরূপ কাতর হইও না।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার শোকাবেগ সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া

উঠিল—তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তিনি যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁহার পিতামাতা সেই তারিখটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ইংলণ্ডে এই যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছিলে, জানা গেল যে, ঐ দিনটি করুণার বিখ্যাত যুদ্ধের দিন এবং যুবক সেই দিনে সেইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি মুরের সহিত অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

তিরুপতি।

তিরুপতি সাধারণের নিকট সুপরিচিত না হইলেও অতি প্রাচীন তীর্থ স্থান। গত বৎসর রামেশ্বর দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিয়া তিরুপতি দর্শনে গমন করি। মাদ্রাজমেলে গুডুর পর্য্যন্ত যাইয়া সাউথ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে যোগে ২১শে ফাল্গুন এখানে পৌঁছাই। দেবমন্দির একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত এবং উহা সাধারণের নিকট তিরুমলয় নামে অভিহিত। প্রাতে ৫ টার সময় আমরা উক্ত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। ইহা প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চ এবং সাতটী প্রধান শৃঙ্গে বিভক্ত। উহাদের নাম শেষাচল, গরুড়াচল, আঞ্জনেয়াচল, বৃষভাচল, বেধাচল, নারায়ণাচল ও শ্রীবেঙ্কটরমণাচল। ক্রমে ক্রমে এক একটী শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া মূল স্থানে যাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে পথিকদিগের শ্রান্তিহরণার্থ মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। আমরা যে পথে গিয়াছিলাম তদ্ব্যতীত আরও তিনটী প্রধান ও অন্যান্য কতকগুলি অপ্রশস্ত পথ আছে। নিম্ন সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতটীকে দুইটী অংশে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, প্রস্তরমালা যজ্ঞ-পবিত্রের ন্যায় পর্ব্বতটীকে ঘেরিয়া আছে; এই অংশ দেখিলে বোধ হয় যেন একটী সর্প পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলী করিয়া রহিয়াছে। আমরা যতই উচ্চে উঠিতে লাগিলাম, ততই মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে আমাদের শ্রান্তি অপসারিত হইতে লাগিল। আকাশ চুম্বি-শিখর, নিত্যোৎসব-সমন্বিত স্বচ্ছন্দ-বনজাত ঘননিবিষ্ট বিটপিকুল-পরিশোভিত শেষাদ্রির অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম নিম্ন স্থানের উচ্চতা ও নিম্নতা প্রভৃতি বৈষম্য গুলি ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আপেক্ষিক উচ্চ-নীচের বৈষম্য দূরীভূত হইয়া একটী চিত্রপট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লোহিতবর্ণ-দিনকর-জ্যোতি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর পতিত হওয়ায়, বোধ হইল যেন প্রকৃতি দেবী কৌষেয় বসনাঞ্চল পরিধান করিয়া বিরাজিত আছেন। সুবর্ণমুখী নদীটী সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া বেঙ্কটাচলের পাদতলবিধৌত করতঃ ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। পথিপার্শ্বে অসংখ্য অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি-গণ দেবদর্শনার্থিগণের নিকট ভিক্ষার আশায় বসিয়া আছে। বুঝিবা যাহার যাহা আছে জগতকে না দিলে ভগবদ্দর্শন ঘটে না; এই জ্ঞান-শিক্ষা দিবার জন্যই আমাদের হৃদয়ে দয়াশক্তির উদ্রেক করিয়া, তাহাতে আমাতে অভিন্ন, এই ভাব উদ্দীপন করাইবার জন্য ভগবান্ অন্ধ-খঞ্জ-বিকলাঙ্গ-বেশে আমাদের গন্তব্যপথে দণ্ডায়মান। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ বড়ই দুরূহ, প্রস্তরগুলির উপর দিয়া অতিশয় সাবধানে যাইতে হয়, নতুবা এক-বার পদস্খলন হইলে বিপদের সম্ভাবনা; সাহস, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা না হইলে এই পথে যাওয়া যায় না। নানারূপ ফলমূলশোভিত স্বভাবজাত বিটপি-রাজির শোভা এমনি মনোমুগ্ধকর যে তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে, গম্যস্থানও ভুলিতে হয়। দেখিলাম বর্ত্ম দিয়া কতলোক আকুলপ্রাণে জগৎ ভুলিয়া "গোবিন্দ গোবিন্দ" রব উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রায় ১টার সময় আমরা মন্দির সন্নিধানে গমন করিয়া "সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ" নামে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মন্দিরটী অতিশয় উচ্চ নহে। মূলস্থানের উপর যে গম্বুজ আছে তাহার উপরিভাগ কলধৌত-সুবর্ণপত্রদ্বারা মণ্ডিত। মন্দিরে প্রায় ৭ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। একহস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে দেখাইতেছেন। বামদিকের একহস্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে পদ্ম বিরাজিত। এই স্থানে আরও কতকগুলি তীর্থ আছে সেগুলি স্বামীতীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ, পাপনাশিনী, আকাশগঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত।

এই স্থান অতি প্রাচীন। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই শৈলে আসিয়া আকাশগঙ্গা-নামক তীর্থের পার্শ্বে পঞ্চঅক্ষর মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর ধ্যান করিয়াছিলেন। সে হিসাবেও ইহা ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থস্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। পুর

মতে বেঙ্কটগিরি মেরুর অংশ। একসময়ে বিষ্ণু ও রমা অন্তঃপুরে ক্রীড়া করিতেছেন। শেষ নাগ দ্বাররক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে বায়ু তথায় আগমন করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাহিলে, শেষনাগ নিষেধ করিলেন ও উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু তথায় আগমন করিলেন এবং বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিষ্ণু বলিলেন—যে বায়ু সমস্ত লোকের আত্মা ও প্রাণ, উহা আমার প্রকাশমাত্র, কেহ উহাঁর গতি রোধ করিতে পারে না। শেষ সে কথা না শুনিয়া বলিলেন যে, কে বলবান্—ইহার পরীক্ষা হউক, আমি মেরুপুত্র বেঙ্কটগিরিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করি, দেখি বায়ু কিরূপ বলবান্, আমাকে তথা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে কি না। পরে বায়ু উক্ত নাগের সহিত বেঙ্কটগিরিকে সুবর্ণমুখী নদীর বাম তটে ফেলিয়া দিল। শেষ তথায় বহুকাল তপস্যা করিয়া বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাইল; বিষ্ণু বর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, নাগ বলিলেন, আপনি আমার কুন্তলে অবস্থান করুন, তদবধি বিষ্ণু তথায় অবস্থান করিতেছেন। ইহাই উক্ত পুরাণের আখ্যায়িকা।

এই আখ্যায়িকার অন্তরালে কি সত্য নিহিত আছে, সুধীগণের উহা বিবেচ্য। তবে সামান্যত এই বুঝা যায় যে, বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে সর্পের অবতরণ এবং অভেদ জ্ঞানে বায়ুর সর্ব্বত্রাবস্থিতি এবং লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট আদরও অবারিত-দ্বার। তীর্থদর্শনে বহুদর্শিতা লাভ, প্রাকৃতিক নব নব মনোরম দৃশ্য অবলোকনে হৃদয়ের উচ্চতা ও উদারতা ব্যতীতও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ হইয়া থাকে। যতদিন আমাদের ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই, মায়ামোহের আবরণ যতদিন উন্মুক্ত হয় নাই, ব্যক্ত, পরিচ্ছিন্ন জগৎ ও জীবভাব যতদিন একমাত্র অদ্বয় সত্তায় মিশিয়া স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থাদি গমনের আবশ্যকতা আছে।

> অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
> তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥
>
> উত্তরগীতা ২।৩৮

সর্ব্বতীর্থময় ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথে গমন করিলে, হৃদয়ে নিশ্চয়ই মহত্তর ভাব জাগরিত হইবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এভাব একেবারে আসে না, এভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলে, তখন আর তাহার বিধি-

নিষেধ কি। তখন তাঁহাদের কিছুই ভগবান্ হইতে ভিন্ন বোধ হয় না। বিশ্বের অন্তরে বাহিরে এক সত্তা তাঁহারা অনুভব করেন। যতদিন এই জ্ঞান পরিস্ফুট না হয়, ততদিন মহাপুরুষদিগের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবানও সেই কথা বলিয়াছেন,—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩।২১

ভগবদ্গীতা—

তাঁহাদের কর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্য নতুবা অনন্তের অবতার শ্রীবলদেবের এই ত্রিলোকে অপ্রাপ্তব্য কি ছিল? একমাত্র লোকশিক্ষার্থ, জীবকুলের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, প্রবৃত্তি মার্গ হইতে তাহাদের গতি ফিরাইয়া দুঃখালয়, অশাশ্বত, মৃত্যু-সংসার হইতে উদ্ধারের জন্যই তাঁহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষুরধারবৎ পথকে সরল করিয়াছেন। তাই শ্রীবলদেব ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তীর্থদর্শনে চিত্তশুদ্ধির সার্থকতা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনিও এই প্রাচীন শ্রীশৈলে আগমন করিয়াছিলেন। ভাগবতে দেখা যায়—

স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ং।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥

দশমস্কন্দ ৭৯।১৩

সেদিনও শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে আমরা অবতার বলিয়া পূজা করি, যাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বহু নরনারীর প্রাণ মাতাইয়া, পবিত্র প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জগতে যুগান্তর করিয়াছে। তিনিও সুদূর বঙ্গদেশ হইতে দুর্গম পর্ব্বতরাজি ও অসংখ্য স্রোতস্বিন-নদনদী অতিক্রম করিয়া এই প্রাচীন তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কটাতে চলে ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সকল মহাপুরুষেরা যখন তীর্থগমনাদি দ্বারা মোহান্ধ জীবকুলকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন আমাদের তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা আছে। তীর্থ-দর্শনের প্রথম সোপান ইন্দ্রিয়-সংবরণ, অহংকারত্যাগ, এষণাবর্জ্জন। যতদিন

এই গুণগুলি অর্জন না হয়, ততদিন তীর্থ গমনের কোন ফল পাওয়া যায় না। মহাভারত এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন।

যস্ত হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহংকারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অকল্ককো নিরালম্বো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলদৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে॥

৩।৮২।৯।১২

এই কয়েকটী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না ক্রমে কামক্রোধাদির হাত অতিক্রম করিলে, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ঘটিলে তীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতুবা কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহাকে আশ্রয় করা চাই, তীর্থ শব্দ তৄ ধাতু থক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। জনাঃ যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি। একমাত্র ভগবানই তীর্থ। কেবল বিশিষ্ট স্থানকে তীর্থ ভাবিলে ভুল হইবে, শ্রুতি বলেন "নমস্তীর্থায়" একমাত্র তিনিই তীর্থ। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই এই জগৎ প্রকাশিত, এই জগতের প্রকাশের ভিতর যিনি সেই স্বপ্রকাশকে বুঝিতে পারেন, তাঁহারই তীর্থ দর্শন হইয়াছে।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। মুণ্ডক।

সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপভাবে সর্ব্বদাই প্রকাশহীন। তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই সর্ব্বদা অপ্রকাশিত পরম তীর্থ আমাদের লক্ষ্য। সূর্য্য, চন্দ্র তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পরম ধামই প্রকৃত তীর্থ, সে তীর্থে গমন করিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

সেই অনন্তধাম হইতে এই জগতের বিস্তার হইয়াছে, সেই আদি পুরুষে ধামে আমরা যাইতে চাই, যেখান হইতে আর পুনরাগমন হয় না।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ গীতা ১৫।৪

সকল ব্যক্ত বস্তুকে সেই অব্যয় আদিতীর্থের প্রকাশ বলিয়া যদি আমরা মনে করি, মোহ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে সংযত করিয়া মনের বহির্ম্মুখীভাবের বোধ করতঃ, এক আদি অব্যক্ত সত্তার দিকে মনকে সংযুক্ত করিতে যদি আমরা সক্ষম হই, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল বিশেষ ভাবের ভিতর এক অবিশেষ ভাব অনুভব করিতে যদি প্রয়াস পাই, তবে একদিন আমরা সেই পরম তীর্থে গমন করিয়া তীর্থের প্রকৃত ভাব বুঝিতে সক্ষম হইব। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় সত্তাই জগতে আছে, তাঁহা হইতেই একঅংশ প্রকাশস্বরূপ স্বরূপব্রহ্মভাব, অপরাংশে প্রকৃতি এবং যোগিনী জ্ঞানশক্তি প্রকাশিত হন। এই শক্তিও তাঁহারই শক্তি। জগতে যাহা কিছু বিভিন্ন ভাব আছে যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট ভাব, দেখা যায় সকলের ভিতর দিয়া এক অদ্বয় জ্ঞান অনুস্যূত আছে। সকলতীর্থের আশ্রয় একমাত্র নারায়ণ, তিনি জগৎরূপে প্রকাশিত এবং সংযোগকারিণী শক্তিরূপেও তিনি। জীবভাবেও তাঁহারই বিকাশ—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। তিনিই বদ্ধ, তিনিই মুমুক্ষু, তিনিই মুক্ত। সকলের আশ্রয় তিনি। তিনি সকলের গতি এবং সাক্ষী এবং আশ্রয়স্থল।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ, সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

জীবকুল তাঁহারই পথে গমন করিতেছে—

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

যে পথে গমন করিলে জীব সেই মহাতীর্থে যাইতে পারিবেন সেই পথও তিনি—অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।

প্রকৃততীর্থ সেই ভগবান্। স্থূলতীর্থগুলি সেই মহাতীর্থের অনুকল্প সেই মহাভাবের ইঙ্গিত করিতেছে। এই তীর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, পর্ব্বত আরোহণের দুর্গম পথই উপনিষদুক্ত অনুকল্প।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি ॥ কঠ ৩।১৪

এই পর্ব্বতের সপ্তশৃঙ্গ সপ্তলোকের সূচনা করিতেছে, চারিটী প্রধান পথ –

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥

অন্যান্য অপ্রশস্ত পথগুলি—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈবভজাম্যহং।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্ব বোধ হয় সিদ্ধিজনিত কুহক। উর্দ্ধে উঠিলে যেরূপ নিম্ন সমতলভূমির বৈষম্য দূর হয়, ভগবানের দিকে যাঁহাদের গতি ফিরিয়াছে তাঁহারাও সমদর্শী হইয়াছেন। পথের ধারে বিশ্রামার্থ মণ্ডপগুলি দেখিয়া--

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,

শ্রান্ত হলে তথায় লভিবে বিশ্রাম। এই গানটী মনে পড়ে।

এইরূপে প্রত্যেক তীর্থে কতকগুলি গুহ্যতত্ত্ব স্থূলভাবে লোকশিক্ষার্থ ব্যক্ত রহিয়াছে। নতুবা যাঁহার একাংশে সমগ্রব্রহ্মাণ্ড স্থিত, সেই ব্রহ্মাণ্ডের অংশভূত একটী বিশিষ্ট স্থানে সেই পরম পদার্থ পরিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন, ইহা হইতে পারে না। নামরূপহীন সেই অব্যয়, একাত্মক, অদ্বয় জ্ঞান ভেদভাবাপন্ন বিশিষ্ট-জ্ঞানে নির্ণীত হইতে পারেন না। সেই অনির্ব্বচনীয় একত্ব স্তুতি-প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বৈতভাবাপন্ন জ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায় না। "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং" এই তত্ত্ব কেবল তীর্থগমনরূপ বিশিষ্ট কার্য্যদ্বারা লভ্য নহে। যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্ব্বসমন্বয়কারিণী আত্মাশক্তিতে সংলগ্ন, তিনিই ভেদাত্মক সৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, অভেদাত্মক একত্বে অবস্থান করিতে পারেন। সেইজন্য গীতায় বলিয়াছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। ৫ ১৯।

আমাদের ভিতরে যে ভগবৎশক্তি বা আত্মা-শক্তি নিহিত আছে, সেই একত্ব জ্ঞানই প্রকৃত তীর্থের সোপান। বিশিষ্ট-জ্ঞান বিশিষ্ট-কর্ম্মে সে মহাতীর্থের স্বরূপ বুঝাইতে পারে না, তবে যতদিন এই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত না হয় ততদিন ধ্যান, স্তুতি ও তীর্থাদিগমনের আবশ্যক আছে। সেই জন্যই মহাভাগবত ব্যাসদেব ধ্যান স্তুতি ও তীর্থাদির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং ...॥

আমাদের এ অপরাধ খণ্ডনের সময় আসে নাই। মূর্ত্তি বাদ দিয়া অব্যয় সত্তায় প্রেমের কল্পনা আমরা করিতে পারি না। বস্তু ও অবস্তুর ভিতর দিয়া যে সত্তা বিদ্যমান, ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাহা পরিস্ফুট হয় না। সেই সদা অপ্রকাশিত অপরিস্ফুট অনির্দ্দেশ্য সত্তা যতদিন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত না হয়, একভাবে অনুস্যূত, নির্ব্বিকার, অক্ষয় সত্তা যতদিনে উপলব্ধ না করিতে পারি, ততদিন তীর্থাদির ভিতর সেই তত্ত্ব দেখিবার প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য। কত মহাপুরুষের পদরেণু তথায় পড়িয়া আছে, উহার সংস্পর্শে হৃদয়ে সেই ভাব জাগরিত হইতে পারে, ক্রমে ঐ ভাবের সাধনা করিতে করিতে মোহ ও অভিমান দূরীভূত হইয়া, আসক্তি ও কামনা পরিত্যাগে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-মুক্ত হইয়া সেই পরম অব্যয় পদে মহাতীর্থে গমন করিতে পারি। ওঁ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

ত্যাগের ক্রমবিকাশ।

(শ্বেত-সরোজ-উৎসব উপলক্ষে লিখিত)

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অখণ্ড পদার্থ। অর্থাৎ একটি মাত্র বস্তু আছেন, দ্বিতীয় নাই। দ্বিতীয় মাত্রই অবস্তু অর্থাৎ মায়িক, কাল্পনিক, ক্ষণিক। এই অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তুটি ব্রহ্ম, আত্মা, প্রাণ, ভগবান্ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাঁর স্বরূপ কি বলা যায় না, জানা যায় না, কারণ ইনি "অবাঙ্‌মনসগোচরং"। তবে যুক্তি-বিচার দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞান—এই তিনের কোনটিই নন, এই তিনের অতীত। কারণ, তিনি এই তিনের একটি হইলেই, অপর দুইটিও তাঁহার সহিত থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং তাঁহার একত্ব অব্যাহত থাকে না। তিনি জ্ঞাতা হইলে, তাঁহার জ্ঞেয়

থাকিবে এবং জ্ঞানও থাকিবে; জ্ঞেয় হইলে, অবশ্য তাঁহার জ্ঞাতা কেহ থাকিবেন, এবং ঐ জ্ঞাতার জ্ঞানও স্বীকার করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই তিনের একটি থাকিলেই অপর দুইটিও উহার নিত্য সহচর,—অপরিহার্য্য। কাজেই তিনি কোনটিই নন; কারণ তিনি এক,—সদৈকরস। কিন্তু এই একরস তাঁহার বুঝি ভাল লাগে না, তাই তিনি বহুরস আস্বাদ করিতে চান, অনন্তরূপে,—অসংখ্য মূর্ত্তিতে লীলা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন সেই এক ও অনন্ত মহাশূন্যে "একোঽহং বহুঃ স্যাম" এই ইচ্ছা ধ্বনিত হইয়া উঠে। এবং গুটিপোকা যেমন নিজদেহ নিঃসৃত সূত দ্বারা নিজেকে বন্দী করে, তিনিও সেইরূপ স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলেন। এখন আর তিনি অনন্ত নহেন, সান্ত; অসীম নহেন, সসীম। এখন আর তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের অতীত নহেন; এখন তিনি দ্রষ্টা, সমস্ত প্রকৃতিই তাঁহার দৃশ্য। এই প্রকৃতিই এখন তাঁহার দেহ, তাঁহার বিরাট শরীর এবং পুরুষরূপে তিনি এই শরীরে অধিষ্ঠান করেন—অন্তরাত্মা রূপে ইহার সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত হন। এখন তিনি ঈশ্বর,—সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাকল্পে বিশ্বাদি যেরূপ ছিল, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, ভূর্ভুবস্ব আদি চতুর্দ্দশ ভুবন, এবং বৃক্ষ লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, দেবতা-মানব, মনু-প্রজাপতি প্রভৃতি যাহা যাহা ছিল, সেই সকলের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তিনি সৃষ্টিকামী হন। তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে একটি প্রবল শক্তিস্রোত সঞ্চারিত করেন। ইহাতে প্রকৃতি পরিণামিত—বিকার প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত উৎপাদন করে। শক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ভূতগুলি নানা প্রকারে সংহত ও সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম অসংখ্য আধার বা উপাধি (Vehicle) নির্ম্মাণ করে, এবং তিনি ইহাদের অন্তরাত্মা বা প্রাণস্বরূপে বিরাজিত হন। যেমন জলে দ্রবীভূত লবণ জলের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যেমন আকাশ (Ether) স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ তিনি এক ও অখণ্ড থাকিয়া অসংখ্য ভূতে, অসংখ্য উপাধিতে বিরাজিত। "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"

সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত থাকিলেও, তিনি সকল উপাধিতে সমভাবে প্রকটিত নহেন। আধারের তারতম্যানুসারে বিকাশের তারতম্য অনিবার্য্য

যেমন একই সূর্য্যালোক গোময়ে এবং দর্পণে পতিত হইলেও তুল্যরূপে প্রকাশ পায় না, যেমন একই শক্তি বাদ্যযন্ত্র ভেদে বিভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে, যেমন একই শুভ্র আলোক নীল-পীত-হরিৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া বিভিন্ন-রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ তিনি নিত্য একরূপ হইয়াও খনিজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত। উপাধি যতই স্থূল ও ক্ষুদ্র, তাঁহার অভিব্যক্তি ততই অল্প; উপাধি যতই সূক্ষ্ম ও বিশাল, অভিব্যক্তি ততই অধিক। এই জন্যই প্রস্তরাপেক্ষা বৃক্ষে, বৃক্ষাপেক্ষা পশুপক্ষীতে, পশুপক্ষী অপেক্ষা মানবে এবং মানবাপেক্ষা দেবতাদিতে তিনি সমধিক বিকাশ-প্রাপ্ত। কিন্তু বিকাশ অল্পই হউক বা অধিকই হউক, সর্ব্বত্রই তিনি সমভাবে বিরাজিত, তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ,—যাবতীয় জীব, একই নিয়মের অধীন,—একই নিয়মে পরিচালিত, উন্নীত, বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। যে নিয়মে একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান, সেই নিয়মেই একটি পরমাণুও তাহার অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ঘূর্ণিত হইতেছে। যে নিয়ম বশে একটি বিশাল সৌরজগৎ অকস্মাৎ মহাকাশে আবির্ভূত হইতেছে এবং লক্ষ লক্ষ কল্পান্তে পুনরায় অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, সেই নিয়মের দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের যাবতীয় জীবের সৃষ্টি-নাশ,-জন্ম মৃত্যু উত্থান-পতন, যৌবন জরা, জাগরণ-সুষুপ্তি, দিবা-রাত্রি, বসন্ত-শীত। সেই নিয়মের দ্বারাই চন্দ্রের বৃদ্ধি হ্রাস, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, মানবের আশা-ভয়, অনুরাগ-বিরাগ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি। সর্ব্বত্র একই নিয়ম, কারণ সবই এক।

তিনিই যুগপৎ ঈশ্বর ও জীবরূপে বিরাজ করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিতে সমষ্টিভাবে বিরাজিত হইয়া, তিনি ঈশ্বর, আবার প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে ব্যষ্টি ভাবে বিরাজিত হইয়া তিনিই অসংখ্য জীব। সমগ্র প্রকৃতি লইয়াই ঈশ্বর, প্রকৃতির এক একটি অংশ লইয়াই এক একটি জীব। ঈশ্বর যেন একটি মহা-সমুদ্র, জীব যেন এক একটি জলকণা; ঈশ্বর যেন প্রকাণ্ড দাবানল, জীব যেন এক একটি স্ফুলিঙ্গ। সমগ্রে যাহা আছে অংশে তাহা থাকিবেই থাকিবে, সমগ্রে যাহা নাই অংশে তাহা থাকিতে পারে না। মহাসমুদ্রে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও লবণাদি আছে, অতএব প্রত্যেক তরঙ্গে ও জলকণায় ঐ সকল

নিশ্চয়ই আছে :• দাবানলের দাহিকা শক্তি আছে, সুতরাং প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের উহা নিশ্চিত আছে। অতএব ঈশ্বরে যাহা আছে, জীবে তাহা অবশ্যই থাকিবে ; যতই অস্ফুট,অব্যক্ত বা বীজভাবে থাকুক না কেন, আছেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভগবান মায়োপাধি স্বীকার করিয়া আপনাকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিলেন কেন ? জীবের কল্যাণের জন্য, জীবের উন্নতির জন্য। যেমন তাঁহার অন্তরে অসংখ্য জীবের,—কোটি কোটি সন্তানের করুণ স্মৃতি জাগিয়া উঠে, অমনি তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, তাঁহার তুরীয় সুখ হাস্যমুখ ত্যাগ করিয়া, তিনি অনন্তকাল প্রকৃতি-নিগড়ে আপনাকে শৃঙ্খলিত রাখেন, এই বিশ্ব কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। যত কাল না তিনি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হইতে অসংখ্য জীবকে জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে তাঁহার তুল্য করিতে পারিবেন; তাঁহার ক্ষুদ্র অসহায় সন্তানগুলিকে ক্রমোন্নত করিয়া, সেই তুরীয় ধামের রসাস্বাদ করাইবেন, ততদিন তিনি নিজেও সে আনন্দ ভোগ করিবেন না, ততদিন তিনি এই বিশ্বকারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সন্তানগুলিকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিবেন। এই যে বিরাট ত্যাগ,—ইহার মহত্ত্ব ও বিশালতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতেও অক্ষম ;

সে যাহাহউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমগ্রে যাহা আছে,অংশে তাহা থাকিতেই হইবে। অতএব ঈশ্বরের এই ত্যাগ সর্ব্বজীবে,—সকল পদার্থে কোন না কোন আকারে অবশ্যই আছে। এখন দেখা যাউক, ইহা জীবে কিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে। অতি নিম্ন জীবে ইহা একটি অনিবার্য্য নিয়ম (An all complling law) রূপে প্রকাশ পায়। ভীষণ উত্তাপে, প্রচণ্ড শৈত্যে বা প্রবল জলস্রোতে শৈলখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে এবং ঐ বালুকারাশি নদীস্রোতে চালিত ও মৃত্তিকাতে পরিণত হইয়া, উভয় তীরস্থ ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া উদ্ভিদ জাতির পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতেছে। শৈলখণ্ড জানেনা যে, তাহার দেহত্যাগে উদ্ভিদের কল্যাণ সাধিত হইতেছে, সে প্রকৃতির একটি অনিবার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই উহা করে। আবার প্রবল ঝড়ে, ভীষণ বৃষ্টিতে গাছপালা ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইতেছে। বৃক্ষগণ বুঝিতেছে না যে, তাহারা জীবনপাত করিয়া কত কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর আহার যোগাইতেছে। তাহারা

ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে ত্যাগ করিতেছে, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা উহা করিতে বাধ্য। পশুপক্ষীর মধ্যে এই ত্যাগটি এক অভিনব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। সংগ্রামে যখন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তখনই তাহারা বাধ্য হইয়া ত্যাগ করে। একটি মাকড়সার জাল নাই, সুতরাং সে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। সে জালবিশিষ্ট একটি মাকড়সাকে আক্রমণ করিল, দুইজনে প্রবল সংগ্রাম বাধিল। যখন শেষোক্ত মাকড়সা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল, তখন অগত্যা সে নিজদেহ ও জাল আততায়ীকে সমর্পণ করিল। আততায়ী ঐ দেহ ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া গেল এবং ঐ জাল দিয়া ভবিষ্যতে কীট ধরিতে লাগিল। একটি হরিণ লইয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যখন সিংহের আঘাতে ব্যাঘ্রের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল, তখন সে সিংহকে হরিণটি ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইল। ইহারই নাম জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে যে পরাজিত বা হত হয়, সেই ত্যাগী। কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে ত্যাগ করে, জানেনা যে ত্যাগ করিতেছে। পশু-রাজ্যে এই জীবন-সংগ্রাম দেখিয়া হয়ত আমাদের মনে কখনো কখনো এই সংশয় আসিতে পারে "ইহাই কি করুণাময় ঈশ্বরের নিয়ম? ইহারই নাম কি ত্যাগ? প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহার সব কাড়িয়া লইবে, তাহাকে প্রাণে মারিবে। আর দুর্ব্বল বেচারা যখন কিছুতেই আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া সর্ব্বস্ব প্রবলকে অর্পণ করিবে, তখন আমরা ইহাকে বলিব ত্যাগ? এ কিরূপ?" কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইহা দুর্ব্বলের ত্যাগ নহে, ইহা ঈশ্বরেরই ত্যাগ। এক আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই নানা দেহে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজিত, তিনিই একটি দেহের কল্যাণের জন্য আর একটি দেহ ত্যাগ করিতেছেন। আমরা জীবকে ঈশ্বর বা আত্মা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবি বলিয়াই আমাদের এই ভ্রম ও সংশয় আইসে।

অসভ্য মানবের মধ্যে ইহা প্রথমে জীবন-সংগ্রামে পরাজয়রূপে প্রকাশ পাইলেও সত্বর অন্যরূপ আকার ধারণ করে। এতদিন যাহা অজ্ঞাতসারে ঘটিতেছিল, এখন তাহা জ্ঞাতভাবে ঘটিতে থাকে; এতদিন যাহা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছিল, এখন তাহা কতকটা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিতে আরম্ভ করে। প্রথম স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের নাম বিনিময়। তুমি আমাকে যে পরিমাণে

দিবে, আমিও তোমাকে সেই পরিমাণে দিব। তুমি আমাকে বস্ত্র দিলে আমি বিনিময়ে তোমাকে চাউল দিব। এইপরিমিত তৈল দিলে, এইপরিমিত কাষ্ঠ পাইবে। আমার জমিতে চাষ করিয়া দিলে, বা আমার গৃহকার্য্য সম্পাদন করিলে, তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, তোমার ভরণ পোষণ করিব। যাহার নিকটে কোন উপকার পাইব বা পাইবার প্রত্যাশা আছে তাহাকেই দিব, অপর কাহাকেও দিব না। ইহাই বিনিময়। মানব এই বিনিময় প্রথমে মানব সমাজের সহিতই করে, অতঃপর দেবতাদিব সহিতও উহা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম ও সকাম পূজার্চ্চনা আছে, সমস্তই বিনিময়ে ত্যাগ। ধন-পুত্র-ঐশ্বর্য্যাদির জন্য সে যাগ-যজ্ঞ করে, পীড়া শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়নাদি করে, স্বর্গলাভ বা পরকালে সুখ ভোগের জন্য কঠোর ব্রত-তপ বা দান-ধ্যানাদিরূপ ত্যাগ স্বীকার করে।

(ক্রমশঃ)

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১৪শ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। ২য় সংখ্যা।

গীতা-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরের কথা বলিতে গিয়া আমি অনেক স্থলে মূলপ্রকৃতির বিষয়ও বলিয়াছি। মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বর, দৈবী প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রভৃতির পার্থক্যও দেখাইয়াছি। মূলপ্রকৃতি পরব্রহ্মের আবরণ-স্বরূপা, অতএব পরব্রহ্মের সহিত গোলযোগ হওয়াও উচিত নহে। একটি শ্লোক আছে তাহা আমি এতক্ষণ দেখাই নাই। অষ্টম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥

এবং ইহার অগ্রের দুইটি শ্লোক দেখিলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যখন বিশ্ব-সৃষ্টি হয়, তখন ভূতেরা এই অব্যক্ত হইতে বাহির হইয়া আসে।

যখন প্রলয় হয়, তখন ভূতেরা এই অব্যক্তে ফিরিয়া যায়। পাছে পরব্রহ্মের সহিত এই অব্যক্তের গোলমাল হয়, সেই জন্য তিনি বলিতেছেন যে, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ অব্যক্ত, যে অব্যক্ত সাংখ্যদিগের অব্যক্ত হইতেও পুরাতন ও স্বতন্ত্র। ইহাই বাস্তবিক পরব্রহ্ম। ইহা কোন বিকশিত সত্তা নহে। সেই জন্য বিশ্ব-প্রলয়েও ইহার ধ্বংস হইবে না। ইহা কেবল মাত্র বিশ্বের ভিত্তি নহে, ইহা মূলপ্রকৃতিরও উৎপত্তি-স্থান। দৈবী প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি ৭ম অধ্যায়ের শ্লোকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সমস্ত তত্ত্বের বিষয় কোন মীমাংসা না করিয়া ব্রহ্মসূত্রের দোহাই দিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মসূত্রে এই সমস্ত বিষয় বেশ উত্তমরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। 'প্রস্থান-ত্রয়ম্' এর উপরই গীতার দর্শন স্থাপিত। দশ উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র ভাল করিয়া না পাঠ করিলে গীতার দর্শন বুঝা যায় না।

গীতার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দু-দর্শনের প্রধান তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দেওয়া। জগতে যে সমস্ত ক্ষমতা চিরস্থায়িরূপে কার্য্য করিতেছে, ও যে গুলি একেবারে সমস্ত সৌর জগতে বর্ত্তমান সেই গুলি নির্দ্দেশ করাও গীতার উদ্দেশ্য। উপ-নিষদের প্রধান উদ্দেশ্য এই বিকাশিত বিশ্ব ও তাহার তত্ত্ব সকল ও শক্তি সকলের মীমাংসা করা।

ব্রহ্মসূত্রে মানব কি, সেইটিই ভাল করিয়া বুঝান হইয়াছে। আত্মার সহিত উপাধি সকলের সম্পর্ক কি, উপাধি সকলের নিজেদের পরস্পর সম্পর্কই বা কি? এই তিন গ্রন্থ প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিষয় বলিতেছে। সমস্ত গ্রন্থগুলি এক সঙ্গে যুক্ত করিলে, তবে সমগ্র বেদান্ত দর্শন বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে সমস্ত যুক্তি গুলি ধরিয়া লইয়াছি তাহাদের মীমাংসা কি হয় এখন দেখা যাক্।

ভগবদ্গীতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ছয় অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় ভূমিকা। আর পঞ্চ অধ্যায় পঞ্চ দর্শনে মানব ও তাহার মুক্তির উপায় যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে সেই বিষয় গুলি লিখিত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন ও তাহার সুন্দর অর্থ-বোধক টীকা দিয়াছেন। এই মত সমূহের মধ্য হইতে সার গ্রহণ করিলে, কোন মতটি আমাদের যথার্থ পথ তাহাই শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন। শেষ ছয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে, মানব যে মানসিক ও নৈতিক উত্তম গুণ-সমূহ দেখায়, প্রেম,

ভক্তি ও অন্যান্য যাবতীয় ভাব এমন কি, সমস্ত কর্ম্মের জন্য প্রকৃতিই দায়ী। গীতা পড়িতে হইলে শেষ ছয় অধ্যায় আগে পড়া উচিত, কারণ গীতায় যে সমস্ত নানাবিধ মত ব্যক্ত আছে সে গুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে গেলে, যে প্রধান তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, তাহা এই শেষ ছয় অধ্যায়ে মীমাংসিত হইয়াছে। এই শেষ ছয় অধ্যায়ের মত যদি কোন রকমে ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র গীতার মত পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত মতের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। এই ছয় অধ্যায়ে আমরা আজ কাল জগতে যেরূপ ঘটনা দেখিতেছি, সেই সমস্ত ঘটনা হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে ছিলেন সেই সময়ের জগৎ ও সাধারণে বুঝিতে পারে, এমন উদাহরণ সকল লওয়া হইয়াছে। ইহা সম্ভব যে, এখনকার কোন লেখক যদি এই সমস্ত মত মীমাংসা করিতেন তাহা হইলে যেরূপ উদাহরণ দিতেন, আমরা যদিও না বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ সেকালের লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য সেকালের উপযুক্ত উদাহরণই দিয়াছেন। কিন্তু যুক্তি এরূপ প্রাঞ্জল ও মীমাংসা এরূপ সুন্দর যে, সর্ব্ব সময়েই খাটে। শীঘ্রই এই যুক্তির সপক্ষে উপস্থিত দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে উদাহরণ দেখান আবশ্যক হইয়াছে।

অধ্যাপক কেন ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থাবলী-সমূহের মত এখন অনেকটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাঁদের মতে মানবের শরীরের গঠন অনেকটা মানসিক বৃত্তি সকল নির্দ্ধারিত করে। অধিকাংশ আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ মনোবিজ্ঞানকে শরীর-বিদ্যার উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টায় আছেন। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, বাস্তববাদের (পজিটিরিজম্) জন্মদাতা কোমৎ বিজ্ঞানের তালিকায় মনোবিজ্ঞানের নাম দেন নাই। তাঁহার মত ইহা শরীর-বিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র।

শরীর-বিজ্ঞানের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির নিদর্শন—এই তালিকাই যথেষ্ট। যদি মানসিক কার্য্য-সমূহ শারীরিক কার্য্য ব্যতীত আর কিছু না হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞান যে, শরীর-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু হইবে না, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু বাস্তবিক শরীর ব্যতীত যে চৈতন্য আছে তাহা কি? এই মহাচৈতন্য হইতে জীবের আত্মজ্ঞান আসিয়াছে এবং ইহাই আমিত্বের বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞানের একমাত্র কারণ।

যত দিন না বৈজ্ঞানিক গুপ্ততত্ত্ববিদ্‌দিগের ন্যায় মনস্তত্ত্বের উপায় নির্দ্ধারণের উপায় অবলম্বন না করিবে, তত দিন এই রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবনীশক্তি যাহাই হউক না কেন, মানবের শরীরের অবস্থা অনেকটা মনের উন্নতি ও বিকাশের সাহায্য করে।

উপাধি-সমূহে যে শক্তি কার্য্য করে, তাহার স্বয়ং কিছু উৎপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যখন প্রকৃতির সহিত যুক্ত হয়, তখন এই শক্তি বিশ্ব জগতের সমস্তই করিতে পারে। যখন কোন বিশেষ চৈতন্য বা বিশেষ বিকাশের বিষয় বলা যায়, তখন সামান্য স্থলে উপাধি লক্ষ্য করিয়া বলাই হয়, শক্তি লক্ষ্য করিয়া বলা হয় না। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,সকল কর্ম্মেরই আদি উপাধি। এবং উপাধি বলিয়া প্রকৃতিই মূলউৎপত্তির স্থান। কর্ম্ম চৈতন্যপূর্ণ অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। মানবের মনের গঠনের উপর চৈতন্যের তারতম্য নির্ভর করে। শরীর ও স্নায়ু মণ্ডলীর গঠনের, সূক্ষ্ম শরীরের প্রক্রিয়া ও কারণ উপাধিস্থ সঞ্চিত শক্তি সকলের উপর আবার মানসিক গঠন ও ক্ষমতা নির্ভর করে।

সূক্ষ্ম শরীরেও এই নিয়ম সমভাবে কার্য্য করে। স্থূল শরীরেও এই নিয়ম সমভাবে কার্য্য করে। স্থূল শরীর যেরূপ স্থূল পদার্থে গঠিত, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর জ্যোতি বা ছটায় নির্ম্মিত, এই ছটাই যথার্থভাবে সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান কারণ। এই সূক্ষ্ম দেহে আবার অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। এই শক্তির জন্যই সূক্ষ্ম মানবও আমিত্বের অনুভব করিয়া থাকে।

কারণ শরীরেও এই অদৃশ্য রূপ-হীন শক্তি কার্য্য করিতেছে। এবং ইহাই সর্ব্ব উপাধিতেই আমিত্বের কারণ।

সর্ব্ব উপাধিতেই কর্ম্ম ও গুণ সকল প্রকৃতি হইতে নির্গত হয়। আবার উপাধিই ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কারণ। জীবচৈতন্য এই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এমন কি আধ্যাত্মিক চৈতন্যও এই প্রকৃতি হইতেই আসে। এখন একবার গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে দেখা যাক্। প্রথম অধ্যায়টি গীতার ভূমিকা। দ্বিতীয় হইতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-সংন্যাসযোগ ও আত্মসংযম-যোগের বিষয় লিখিত আছে। এই প্রথম ছয়টি অপর দর্শন সকলের মত। শ্রীকৃষ্ণ এই ২য় অধ্যায়ে আপনার মত বলেন নাই। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়েই তিনি নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস

এই, যে কোন দর্শনের মতই ছয়টির মধ্যেই পড়িতে পারে। এই গুলিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত, নূতন সার্ব্বভৌমিক, গুপ্ত, অদৃশ্য বিধান অন্তর্নিহিত আছে। যেটিকে সহজ করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার দীক্ষার উৎপত্তি হইয়াছে। কোন দর্শনই স্বতঃ সম্পূর্ণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল দর্শনের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া ও সকলগুলি হইতে সার সংগ্রহ করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার দীক্ষার উৎপত্তি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমলা।

তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে দেখা যায়—

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

সুতরাং উক্ত গ্রন্থের মতে বিরজাক্ষেত্রে বিমলা মহাদেবী এবং জগন্নাথ ভৈরবরূপে বিরাজিত। এই ক্ষেত্র উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিত। তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে আমি কয়েক বার উক্ত ক্ষেত্র দর্শনে গমন করি। অনন্ত নীলাম্বু-রাশির প্রশান্ত গভীর গর্জ্জনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রণব-বাচক শব্দ সর্ব্বদাই উত্থিত হইতেছে। এই চির মধুর চির নূতন ভগবদ্বিভূতি দর্শন করিলে, মনে সেই অনন্তের ঈষৎ ছায়া কথঞ্চিৎ পতিত হয়, সন্দেহ নাই। এই অসীমতার ভাব মনে না থাকিলে সেই অনাদিরাদি গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন হইবে না। তাই এই ক্ষেত্রের প্রথম কর্ত্তব্য সাগর-স্নান। এই ভাব লইয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বিমলাদেবীর আরাধনা। তাঁহার পূজা-সমাপনান্তে যাত্রিগণ ক্ষেত্রাধিপতি জগন্নাথ দেবের দর্শনে গমন করে। এই মন্দির কত কাল হইতে রহিয়াছে, ইহার গঠন প্রণালী কিরূপ, সাধারণ পূজা-পদ্ধতির কিরূপ নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে বহু পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে, এই তীর্থে বিমলাদেবীর স্থান কোথায়, তাঁহার স্বরূপ কি, কেন জগন্নাথ দর্শনের পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন

করার বিধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে। এই ক্ষেত্র সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিংবা এই দেহের অনুকল্প বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। গীতাও এ কথার সমর্থন করেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ১৩,৫,৬।

পঞ্চমহাভূত, অহংকারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (মনোবৃত্তি) ও ধৈর্য্য ইন্দ্রিয় বিকারের সহিত ক্ষেত্র উক্ত হইল। দেহ সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।১৩।১

সুতরাং এই ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং দেহের ইঙ্গিত করিতেছে বলিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহা তাঁহার অপরা প্রকৃতি। এই ক্ষেত্রে বিমলা দেবী ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বা পরা প্রকৃতি।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
বিষ্ণু পুরাণ। ৬-৭-৬০।

ইহা ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি বা জীবভূতা প্রকৃতি। এই শক্তি এই ক্ষেত্র-শক্তিকে ধারণ করিয়া অবস্থিত, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের আধার শক্তি। 'আধার-ভূতা জগতস্ত্বমেকা।'

এই শক্তি জগতকে ধারণ করিয়া আছে। গীতায় ইহাই পরাপ্রকৃতি। 'জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।'

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তির অন্তরালে ভগবান্ গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি অপাণি-পাদ, 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।' শ্বেতাশ্বতর।

তিনি এই শক্তির অন্তরালে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত। "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" তিনি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন। এই জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে সমুদ্ভূত।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥১৩।২৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে ভগবান্—

সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

এই মহা সত্য শিক্ষা দিবার জন্য জগন্নাথ-বিগ্রহ হস্তপদ-বিহীন একটী মূর্ত্তিরূপে গঠিত হইয়াছেন। এই ক্ষেত্রের অপর নাম :পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। ভগবান্ ব্যক্ত অব্যক্তের অতীত, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তাই লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণিত হন, সেইজন্য এই ক্ষেত্রের নাম:পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ গীতা ১৫।১৮

এই পুরুষোত্তমই জগন্নাথ, তিনিই সকল কারণের কারণ, তিনিই প্রধান পুরুষেশ্বর ও "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি"। কারণ তিনি প্রকৃতি-পুরুষের অতীত এবং আদি-অন্তহীন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ গুরুগৃহে পাঠ সমাপন করিয়া প্রত্যাগত হইলে, বিষ্ণুদ্বেষী অতুল-পরাক্রম হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতাবৎকাল কি শিক্ষা করিয়াছ বল। প্রহ্লাদের সুমধুর কণ্ঠে বংশীধ্বনির ন্যায় নির্গত হইল।

অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতং।

প্রণতোহস্মি জগন্নাথং সর্ব্বকারণকারণং॥

এক শ্লোকেই তিনি সকল শিক্ষার সার ব্যক্ত করিলেন। জগন্নাথের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত এবং জন্মবৃদ্ধি-ক্ষয়হীন, সকল কারণের কারণকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ইহাই প্রকৃত জগন্নাথের জ্ঞান বা দর্শন, নতুবা আমাদের মত ক্ষুদ্রজীব বিশিষ্ট, সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অনির্দ্দেশ্য, নাম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বময় পরম পুরুষকে কিরূপে দর্শন করিবে।

ভগবানের প্রকৃতি সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে। এই ক্রিয়ার রহস্য, মা বিমলা আত্মাশক্তি প্রকাশ করিলে, আমাদের তমঃ নাশ হইবে, দিব্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হইবে। সর্ব্ব আধারের মধ্যে একত্ব দেখাইবার অধিকারী মা আত্মাশক্তি, ইনি বিমলারূপে উৎকলে পূজিতা হইতেছেন, তাই বিমলাদেবীর পূজার পর জগন্নাথের দর্শন।

তাঁহার কৃপা ভিন্ন অপ্রাকৃত বিরজক্ষেত্রে ভগবানের "সদসদ্‌ তৎ পরং যৎ" ভাব হৃদয়ে আবির্ভাব হয় না।

আমরা কেবল বিশিষ্ট জ্ঞান লইয়াই খেলা করিতেছি. যে জ্ঞানে সমস্ত ভূত আপনাতে দেখিয়া, পরিশেষে সমস্ত ভগবানের ভিতর দেখা যায়, সে জ্ঞান আমাদের নাই, তাই আমাদের ন্যায় অজ্ঞানীদের নিকট শাস্ত্রোক্ত গুহ্য রহস্য স্থূল ভাবে বুঝাইবার জন্য প্রতিমারূপে তাঁহার কল্পনা। তাই তন্ত্রে—

অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমা পরিকল্পিতা।

এই প্রতিমার ভিতর দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। যখনই এই জ্ঞান পূর্ণভাবে হৃদয়ে উদিত হইবে, তখনই সমস্ত ভেদভাব দূরীভূত হইয়া এক অভেদাত্মকজ্ঞানে সেই পূর্ণ ভগবানের পূর্ণশক্তি উপলব্ধ হইবে। তখনি—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা ৫।১৮

এই সমদর্শিতা আত্মজ্ঞানের লক্ষণ। যাঁহারা মহামায়ার দয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের কি আর ভেদাভেদ থাকে? এযে ত্রিগুণের অতীতাবস্থা, এখানে বিধিনিষেধের বাঁধ কেন।

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

এই ভাবটী আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য শ্রীক্ষেত্রে জাতি-নির্ব্বিশেষে এমন কি, এক পাত্রেও অন্নগ্রহণে কোন দ্বিধা দৃষ্ট হয় না। এই সমজ্ঞানই জগন্নাথের পূজা। প্রহ্লাদের মুখের বাণী—

সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

এই আরাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। সেই জন্যই শোনা যায়—

জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

এই জগন্নাথ দর্শনই জীবের পরমা গতি, ইহাই শ্রেষ্ঠধাম, শ্রীক্ষেত্রকে সেই কারণে কেহ কেহ ধাম বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ধামকে গীতা লক্ষ্য করিতেছে—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮।২১

এক্ষণে এই ধামে যাইবার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিমলাদেবীর শরণ গ্রহণ। সেই বেদগর্ভা বিশালাক্ষী আদ্যাশক্তি মহামায়া ভিন্ন কে আমাদিগকে মদনমোহনের সাক্ষাৎ করাইবেন। আমাদের হৃদয়স্থিত প্রসুপ্ত আদ্যাশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে, অভেদাত্মক জ্ঞান ব্যতিরেকে কিছুতেই অবিশেষ পরম পদার্থের ভাব উপলব্ধি হইবে না। বিশিষ্টক্রিয়া, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান কিং বা অধ্যয়নে সে ভাব জাগ্রত হইবে না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

আমি বিশিষ্ট এই জ্ঞানে যে কর্ম্ম করি না কেন, তাহাতে অবিশেষ আমি প্রকাশিত হইতে পারে না, তাই অনন্ত সাগর-স্নানে অনন্তের ছায়া ঈষৎ হৃদয়ে পতিত হইলে, তবে ক্ষেত্রস্থিত চিদাকাশ-রূপ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিমলা দেবীর পূজা করিবার ব্যবস্থা।

আমরা কি ভ্রান্ত। ব্যক্ত জীব-ভাব অব্যক্তের ছায়া বলিয়া বোধ করিব, তাহা না করিয়া একটী 'অহংকে' খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। যতদিন এই ক্ষুদ্র অহংকে "আমি" বলিয়া মনে করিব, ততদিন যতই চেষ্টা করি না কেন, ভগবদ্ভাব কিছুতেই ফুটিবে না, অহংভাবই ফুটিয়া উঠিবে। যখন সর্ব্বব্যাপিনী এই মহাশক্তি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে কুলকুণ্ডলিনীরূপে জাগ্রত হইয়া বিশিষ্ট ধূলাখেলা ভাঙ্গিয়া দিবেন, এতদিন যে ক্ষুদ্র "আমিকে" স্থাপন করিয়া, কামনা-বারি-সেচনে ফলমূল-শোভিত করিয়া মনের সাধে খেলা করিতেছি, যতদিন এই আমিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া "পরম আমির" ইঙ্গিত না করিবেন, ততদিন ভগবান্ প্রকাশিত হইবেন না। "আমি"র ছায়াই ভগবান বলিয়া দেখিব।

মহামায়া ভগবান হইতে স্বতন্ত্র নহেন। ভগবানের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই।

শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। শঙ্করাচার্য্য।

এই ক্ষেত্রও তাঁহার প্রকাশ মাত্র। নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন এই শক্তি-সাহায্যে জগৎরূপে প্রতিভাসিত। তাঁহারই অভিব্যক্তি এই সংসার। এই সংসার সৃষ্টি

করিয়া তিনি গূঢ় ভাবে বিদ্যমান। মহামায়া এই খেলা খেলিতেছেন। তাই মহামায়ার আশ্রয় ভিন্ন সর্ব্বভূতে সমভাবে অনুস্যূত পদার্থের জ্ঞান সম্ভব নহে।

চৈতন্যরূপিণী মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে খেলিতেছেন। চৈতন্যের প্রবণতা যখন এক পুরুষোত্তমের দিকে ইঙ্গিত করে তখনই উহা বিদ্যা, যখন উহা এক পদার্থকে না দেখাইয়া, বহুকে নির্দ্দেশ করে তখনই অবিদ্যা বলিয়া কথিত হন। এক আমি আপাতত বহুরূপে প্রতীয়মান হইবার প্রবণতাই সৃষ্টি-মূলক অবিদ্যা। আর যেখানে চৈতন্যের কোন খেলাই নাই উহাই গীতার— অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং। আমাদের ভিতরেও অহংকারের ক্রিয়া যখন বিশিষ্ট আমিকে ইঙ্গিত করে তখনই উহা অবিদ্যা, এবং যখন ঐ ক্রিয়া অবিশেষ পরম আমিকে ইঙ্গিত করে তখনই তাহা বিদ্যা। এই একত্ব নির্দ্দেশ-কারিণী আদ্যাশক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে, সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য, সেই পরম-অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, অক্ষর পরম সত্তার জ্ঞান কিরূপে আসিবে। এই বিদ্যারূপিণী মহামায়া "সূত্রে মণিগণাইব" সমস্ত জগৎকে এক করিয়া রাখিয়াছেন। ইনিই ব্রহ্মবিদ্যা, রাজবিদ্যা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, মা, উমা। ইহাই Theosophy। এই বিদ্যা লাভ হইলে তবে পুরুষোত্তম দর্শন করা যায়।

তিনি প্রসন্ন না হইলে জীব মুক্তির অধিকারী হয় না। সেই জন্যই দেবতা-গণ মহামায়ার স্তব করিতে করিতে নিঃসংশয়ে বলিয়াছিলেন—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

দৈবী সম্পৎ লাভ করিলে মা ভগবতী দৈবী প্রকৃতি প্রসন্না হন। দৈবী সম্পৎ কি ভগবান তাহা বলিয়াছেন।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচং অদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

গীতা ১৬।১—২—৩।

এই ষড়্‌বিংশতি প্রকার বৃত্তি অর্জ্জিত হইলে, মা প্রসন্ন হন; তখন মায়ের প্রকাশ উপাধি-স্বরূপ মহাত্মাগণ আমাদিগকে উপদেশ করেন মহাপুরুষেরা মায়ের স্বরূপভাব জানেন সেইজন্য তাঁহারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। গীতা ৯।১৩

এই দৈবী শক্তির অঙ্গস্থিত ঋষিরাই ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন এবং ইঁহারাই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ গীতা ৪।৩৪।

প্রণিপাত সাধারণ ভাবে কাহারও চরণে মস্তক অবনত করা বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে নিঃশেষিতরূপে আত্মনিবেদনই প্রণিপাত। নিজের ব্যক্তিত্ব না রাখিয়া সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান তাঁহার চরণে সমর্পণই আত্ম নিবেদন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥

হস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান, এবং মস্তক বিবেকের প্রকাশ-কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, দুইহাত এবং মস্তক তাঁহার চরণে স্পর্শ—সাধারণ অর্থে—প্রণিপাত বুঝায়। মূলতত্ত্ব—আত্মত্যাগ, "আমি" বাদ দিয়া তুমির স্থাপন। জগৎকে এইভাব শিক্ষা দিবার জন্য প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ব্রজধামে শ্রীমতীর চরণ-যুগল ধারণ করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—

ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
স্মরগরলখণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং। গীতগোবিন্দ।

ইহার নাম প্রণিপাত। সেবাও সহজ নহে, সর্ব্বভূতে সমভাবে ভগবান্ অবস্থিত, এই জ্ঞানে জগতের সেবা প্রকৃত সেবা বলিয়া উক্ত হয়। পরিপ্রশ্ন—বিবেক-শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অন্তরে বিবেক-শক্তি নির্ভিন্ন না হইলে, বাহিরে স্থিত ভগবদ্ভাব উপলব্ধ হইবে না। দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে, সূর্য্যের আলোক চক্ষুতে পতিত হইলে কি হইবে। যাহার শ্রবণ-শক্তি নাই, সুমধুর বীণা-নিক্বণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হইবে না। Light on the path নামক পুস্তিকায় লিখিত আছে—For withen you is the light of the world the only light that can be shed on your path, আত্মজ্যোতি প্রকাশিত হইলে, তখন বিশিষ্ট গুণগুলি বিশিষ্ট আমিত্বের সম্পত্তি না হইয়া, দৈবী সম্পৎরূপে জানিতে পারা যায়। তামসিক বশ্যতার তখন নাশ হয় এবং মা আমাদিগকে কোলে উঠাইয়া লন।

যে কেহ এই বিদ্যা-লাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কোন সম্প্রদায়িতা ইহাতে নাই, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই বিদ্যা-লাভের চেষ্টা করিতে পারেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

গীতা ৯।৩২—৩৩।

ভেদভাব দূর করিবার জন্যই এই গুণগুলি অর্জ্জনের চেষ্টা, ভেদভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভেদভাব-মূলক দেহাত্মজ্ঞানকে ক্রমে পুষ্ট করিয়া বসিয়া আছি, মহামায়া প্রসন্ন হইয়া জীব ও শিবকে মিশাইয়া এক অভেদাত্মক ভাব প্রকট করিলে, তবে অহং-বীজের নাশ হইবে। মা ভগবতীর কৃপায় এই পরিচ্ছিন্ন অহংভাব বিনষ্ট হইবে। অধিদৈবভাবের সাধনা করিয়া, সকল দেবশক্তিকে বিশিষ্ট অহংকারের অধীনে আনয়ন করতঃ যে অহং মূর্ত্তিমান্ রাবণরূপে প্রকট হইয়াছিল, স্বয়ং রামচন্দ্র তাহার বিনাশার্থ এই দৈবী শক্তি মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি একদিন রণরঙ্গিণী বেশে বিশিষ্ট

কামনারূপ রক্তবীজের নাশ করিয়াছিলেন। এস তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার কৃপাতেই সরলা গোপবধূরা আত্মারামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এস তাঁহাকে নমস্কার করি। মা বিমলা! হৃদয়ে বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ কর। ভক্তিভরে বলিতেছি মা, প্রসন্ন হও।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥

মা! তুমি একমাত্র নিস্তারকর্ত্রী এবং মোক্ষদাত্রী, তুমি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই।

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

মা আবার বলি, প্রসন্না হও। মা দুর্গে! অধম, জ্ঞান-হীন সন্তানের প্রতি একবার করুণা-কটাক্ষে চাও। মা তুমিই জীবের একমাত্র বল, আশ্রয় ও পরমগতি।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ওঁ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

আলোক।

"ওরে! আঁখি মেলি দেখো মাকে তিমিরে তিমির হরা"—রামপ্রসাদ।

আলোক দর্শনের সহায়! দর্শন নানা প্রকার। চক্ষের দ্বারা জ্যোতি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, মুখের দ্বারা রস দেখি। আবার মনের দ্বারা চিন্তা ও সত্য দেখি। হৃদয়ের দ্বারা ভাব ও হৃদয় মনের যোগে পরমাত্মাকে দেখি। হৃদয়ের দ্বারা মন উদ্ভাসিত হইলে সত্যকে ও সত্য ব্রহ্মকে দর্শন করা যায়। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই, সে জ্যোতি প্রকাশ হয়। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "Blessed are the pure in heart for they shall see God.". (Math. 5. 8). পবিত্র হৃদয় হও, এখনই ব্রহ্মকে দেখিবে।

দেখিবার আর অন্য উপায়, ইন্দ্রিয় নাই। পবিত্র হৃদয়ই আত্মার সেই ইন্দ্রিয় যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে অর্থাৎ সত্যকে সাক্ষাৎ করা যায়। সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য।

জড়-জ্যোতির বিষয় বিজ্ঞান-মন্দিরে অধীত হয়। মন ও হৃদয়ের আলোকের কথা শিখাইবার বিজ্ঞান-মন্দির এখন ভারত হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই আলোকের কথা দেখিতে পাই। জ্ঞানকেই চিরদিন মহাত্মাগণ আলোক বলিয়াছেন। "চাও, তবেই পাইবে। খোঁজ, তবেই মিলিবে। আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিবে।" ইহাই মহর্ষি ঈশার বাণী। (Luke 11. 9.) হিন্দুদের বেদাদিতে ভগবানকে সবিতা বলিয়াছেন। গায়ত্রীতে আছে, "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।" সেই সূর্য্যের বরণীয় রূপ ধ্যান করি, যিনি বুদ্ধির ভিতর থাকিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্ম হইতে মনের জ্যোতির উৎপত্তি, যেমন পার্থিব জ্যোতির উৎপত্তি সূর্য্য হইতে। সকল বেদেই গায়ত্রী মন্ত্র আছে। সাম মন্ত্র এই,—"অসতোমা সদ্গময়। তমসোমা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" (যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক।১।৩।২৮) অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যায়। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অ-মৃতেতে লইয়া যাও।

বৃহদারণ্যক পুনরায় বলিতেছেন,—"তদ্বৈ তদেতদেব তদাস। সত্যমেব সঃ"। (৫।৪।১।)—সেই হৃদয়ই (ব্রহ্মই) প্রথমে ছিলেন। তিনিই সত্য।" আরও বলেন,—

"তৎ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো।" (৫।৫।২।) সেই যে প্রথমজ সত্য তিনিই আদিত্য।

বেদ এবং উপনিষদই হিন্দুগণের আদি ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মকে সত্য, সূর্য্য ও সবিতা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়কে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় প্রকাশ করেন। "বহ্নিভাতি।" (মুণ্ডক।২।২)৭।) "তমেব ভান্ত-মনুভাতি সর্ব্বং।" (শ্বেত।৬।১৪। মুণ্ডক।২।২।১০। কঠ।৫।১৫।) তিনি প্রকাশিত ও প্রকাশক। অর্থাৎ আলোক। মুণ্ডক পুনরায় বলিতেছেন,—

"তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাত্মবিদো বিদুঃ।" (মু।২।২।৯।)—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি, যাঁহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন।

প্রাচীন হিব্রু বাইবেলের প্রথমাধ্যায়ে আছে, " And darkness was

upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

"And God said, Let there be light; and there was light" (Genesis 1. 1-3.) সৃষ্টি কালে স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়া ব্রহ্মবাণী হইল, জ্যোতি হউক, অমনি জ্যোতি হইল। এই প্রাথমিক সৃষ্টির বস্তুই আলোক। অর্থাৎ আত্মাশক্তির প্রকাশে, গতি হইতে আলোক উৎপন্ন হইল।

মহর্ষি ঈশার শিষ্য মহাত্মা জন বলিয়াছেন,—"And the light shineth in darkness; and the darkness comprehendeth it not. (John. 1. 5.) অর্থাৎ অন্ধকারে (আপনাদিগেরই মধ্যে) আলোক জ্বলিতেছে। আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই দেখি না, জানি না।

এই জ্ঞানই আলোক। এই জ্ঞানস্বরূপই সেই ধ্যেয় সবিতা। সংসারী মানব বিত্তমোহে মূঢ় হইয়া এতৎ প্রতি নেত্রপাত করে না। তাই আত্মজ্ঞানান্বেষীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচন এই,—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"—(গীতা ২।৬৯।)

সকল ভূতের পক্ষে যাহা রজনী, সংযমী তাহাতেই জাগ্রত। ভূত সকল যাহাতে জাগ্রত, মুনির (মৌনীর ?) তাহাই রজনী!

এই অজ্ঞানের ঘোর ত্যাগ করিয়া, বিষয়-মোহ ভুলিয়া, ইন্দ্রিয়-সুখে লিপ্ত, মুগ্ধ, ভ্রান্ত না হইয়া, সত্যকে খুজিলেই পাওয়া যায়। সেই আলোক লাভ করিবার জন্যই প্রাচীন হিন্দুদের জীবনের প্রথমাংশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল এবং সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যুবকদের প্রতি এই উপদেশ ছিল,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" ইত্যাদি (কঠ ।৩।১৪।)

হে বন্ধু! ওঠ! জাগো! উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা কর। ধীরগণ বলেন যে ধর্ম্মের পথ ক্ষুরধার সদৃশ দুর্গম।

ঐ পথে চলিতে হইলে, সত্য ও আলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে. যাহা চাই তাহা ব্রহ্মচর্য্য!

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই সত্য ও আলোক বিদিত হয়েন, তাঁহারাই বিদিত

হয়েন। অন্যে নহে! "তদ্ য এ বৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেনানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ।" (সামবেদীয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৮।৪।৩।)

বর্ত্তমান ভারত যদি এই সত্যকে; এই ব্রহ্মকে,—এই সবিতাকে,—এই আলোককে লাভ করিতে চাহেন তো, এই ব্রহ্মচর্য্যের পথেই চলিতে হইবে। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (শ্বেত।৩।৮।) অন্য পন্থা নাই। অন্য পন্থা নাই। অন্য পন্থা নাই।

আমরা সেই সবিতার বরণীয় রূপের সম্মুখে নত-জানু হইয়া স্পার্জনের ভাষাতে বলি,—"হে প্রেমময় জ্যোতি! তুমি আমাদিগকে চালিত কর।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

সত্য।

"সত্যং ব্রহ্মেতি। সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক।৫।৪।১)।

"সত্য কি?" পাইলেট্ মহর্ষি ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঈশা বলিয়াছিলেন, "তুমি ঠিক বলিতেছ যে, আমি একজন রাজা। এই জন্যই আমি জন্মিয়াছি। এই জন্যই সংসারে আসিয়াছি যে, আমি সত্যের সাক্ষ্য দিব। সত্য যিনি, তিনিই আমার কথা শুনিবেন। ঈশা। (জন্।১৮।৩৭-৩৮।)

প্রশ্ন ত হইল। উত্তর কি? শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঈশার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতি বলিতেছেন, "সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য। সত্যের জয় হইবে। সত্যজ্ঞেরই জয় হইবে।" (বৃহদারণ্যক। ৫।৪।১। এবং ৫।৫।২।)

যে বস্তু প্রকৃত, বাস্তব ভাবে যাহা ঘটে, তাহাই,—তাহার বিষয়ই—সত্য। তাহার জ্ঞানও সত্য। জড় ও অজড় উভয় বিষয়েরই সত্য আছে। বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু, চন্দ্র সূর্য্য,—জড় বস্তু, শক্তি, প্রকৃতি, কার্য্য, পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যথাযথ অবস্থা সত্য। এতৎ বিষয়ে যথাযথ তত্ত্বকে জড় সত্য এবং উহার জ্ঞানকে জড়-বিজ্ঞান বলা যায়। নিউটন্ অশেষ ধৈর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য সহকারে এই সত্যকে জানিয়াছিলেন। ফ্রেন্‌কলীন্ তন্ময় হইয়া, উড়ন্ত ঘুড়ি দেখিতে দেখিতে ও ঘুড়ি

উড়াইতে উড়াইতে এই সত্যকে দেখিয়াছিলেন। আর্কিমিডিস্ স্নান-টবের জল মধ্যে লম্ফ দিয়া, এই সত্য দেখিয়াই, "পাইলাম! পাইলাম!" বলিয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সত্যকে হৃদয়ে লাভ করিয়াই, গেলিলিও কারাদণ্ড প্রভৃতি সর্ব্ব লাঞ্ছনাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে এই সত্যকে ধরিয়া ছিলেন। নিউটন পতনশীল আতাফলের মধ্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষিণী শক্তির তত্ত্ব দেখিলেন। ফ্রেন্‌কলীন উড্ডয়নশীল ঘুড়ির মধ্যে বিদ্যুৎতত্ত্ব দেখিলেন। আর্কিমিডিস্ জলে পড়িয়া জলের সঙ্গে অন্য পদার্থের ওজনের তারতম্য বুঝিলেন। গেলিলিও দেখিলেন, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে নাই। এই প্রকার শত শত জড় প্রকৃতির তত্ত্ব নয়নগোচর করিয়া কতই এডিসন, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই সংসারে, আবিষ্কৃত সত্যের মত, অমর কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিলেন।

জড় জগতের হউক, অজড় জগতের হউক, সত্যকে যিনি চিন্তা করিবেন, জানিবেন, জীবনে আচরণ করিবেন, প্রচার করিবেন, তিনিই সত্য হইবেন,— সত্যের মত অ-মর হইবেন,—অ-মর কীর্ত্তি ও জীবন লাভ করিবেন। আর যিনি অসত্য লইয়াই থাকিবেন,—সত্যকে জানিলেও, অগ্রাহ্য করিবেন,—মিথ্যা ভাবিবেন, বলিবেন, আচরণ করিবেন, তিনি মিথ্যাই হইবেন,—মিথ্যার মত মরণশীল হইবেন,—দুঃখ দুর্গতি লাভ করিবেন।

সত্যকে যিনি ভাবিবেন, জানিবেন, কহিবেন, আচরণ করিবেন, তিনি সত্যই হইবেন,—সত্য তাঁহারই হইবে,—তাঁহারই দিকে হইবে,—সত্যের বল তাঁহারই হইবে। তিনি সত্যের শৈলে দণ্ডায়মান হইয়া, নীচে, সংসারের ধূলি ও অসত্য লইয়া মারামারি, ও মরণ দর্শন করিবেন।

যিনি অসত্যকে লইয়াই থাকিবেন,—অসত্য ভাবিবেন, জানিবেন, বলিবেন, আচরণ করিবেন, তিনি অসত্যই হইবেন, মরিবেন,—সত্যের বিরুদ্ধে, সত্য ব্রহ্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন,—অস্ত্রধারণ করিবেন। যিনি অসত্যের পথে যাইবেন, তিনি সত্যকে নাশ করিবার, হত্যা করিবার পথে চলিবেন। সত্য তাঁহাকে বিনাশ করিবে। কারণ সত্যেরই দ্বারা অসত্য বিনষ্ট হয়।

সত্যের দিকে দণ্ডায়মান হওয়াই বুদ্ধির কার্য্য, হিসাব নিকাশের কার্য্য। অসত্যের পক্ষে যোগ দেওয়া, বুদ্ধিহীনের বে-হিসাবী কথা। অতএব এই

সত্যকে লইয়াই থাকিতে হইবে। ইহাতেই জয়। সত্যেরই জয়! সত্যেরই জিৎ!

সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য। অন্য সত্য নাই। অন্য ব্রহ্ম নাই। অন্য ঈশ্বর নাই। এই সত্যই, সূর্য্যের মত, মনের অন্ধকার, অজ্ঞান, অসত্যকে দূর করেন, তাই শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বা বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বলিতেছেন, "এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" (ঈশোপ-নিষৎ। ২)। হে মনুষ্য! তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত আর অন্য পথ নাই, যদ্দ্বারা অশুভ কর্ম্মে আর লিপ্ত হইবে না।

এই সত্যই অ-মর,—অ-মৃত। ইঁহার মরণ নাই। যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনিও অমর হয়েন,—অমৃতকে লাভ করেন। সামবেদীয় তালবকার উপনিষৎ বলিতেছেন,—ইহাকে জানিলেই সত্য হয়। না জানিলে মহৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥"

——কেনোপনিষৎ। ২।৫।

এই সত্যকে জানাই অমৃত লাভ করা। আর অন্য অমৃত নাই। আর অন্য অমৃত লাভের পথ নাই। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন,—ইঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অমরত্ব, অমৃত লাভের আর অন্য উপায় নাই।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।১৫।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা এই সত্যকে জানিয়াই, শাক্যসিংহ পুরুষোত্তম, তথাগত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই যে সত্য, জড় জগতে, অজড় জগতে, মনোময় রাজ্যে, আকাশে, চিদাকাশে রহিয়াছেন, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই ব্রহ্ম! অন্য ঈশ্বর নাই! অন্য ব্রহ্ম নাই। ইনি মানব প্রাণে বিদ্যুতের মত প্রকাশিত হয়েন। নারদের প্রাণে, চিদাকাশের বিদ্যুৎ রূপে এবং ফ্রাঙ্কলিনের প্রাণে জড়াকাশের বিদ্যুৎ রূপে,

ইনিই প্রকাশিত হয়েন। কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,--সেই ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুতের ন্যায়।

"তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি।"

—কেনোপনিষৎ। ৪।৪।

এই সত্যই ব্রহ্ম। এই সত্যই জ্ঞাতব্য। এই সত্যকে জানিবার জন্য, সাধু, যোগী, বৈজ্ঞানিক, তত্ত্বজ্ঞ প্রাণপণ করিয়াছেন। এই সত্যকে জানিতে হইলে, যোগী, ঋষি ও নিউটনাদির ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়।

"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।"

—কঠোপনিষৎ। ১।২।১৫।

এই সত্যের দর্শন সহজে হয় না, যেন কি এক আবরণ রহিয়াছে। মন অন্যমনস্ক রহিলে, মানুষ চক্ষের সম্মুখের বস্তুও দেখে না। এই আনমন থাকাকেই মোহ বলে। এই মোহ, অজ্ঞান দূর করিয়া দিবার জন্য এবং সত্যকে দেখাইবার জন্যই প্রাচীন কালের হিন্দুগণের প্রাণ কাঁদিত ও বলিত,—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"

—ঈশোপনিষৎ। ১৫।

হে জগতের পোষক সূর্য্য! তোমার সুবর্ণময় জ্যোতিতে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যধর্ম্মাচরণকারী আমার দৃষ্টির জন্য আবরণ উন্মোচন কর। আমি দেখি। তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখি।

এই সত্যকে জানিলেই মুক্তি হয়,—মোক্ষ হয়,—অ-জ্ঞান দূর হয়। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। জ্ঞান, সেই সত্যকে জানাই, মুক্তি,—বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলা, খসিয়া পড়া। তাই জন বলিয়াছেন,—"And ye shall know the Truth and the Truth shall make you free." জন (৮।৩২।) সত্যকে জান। সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে।

সংসারের লোক কল্পনা লইয়াই মত্ত,—মিথ্যা লইয়াই সুখ পায়। বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার বেকন্ বলিয়াছেন, সৃষ্টির প্রথমে জড় জ্যোতি সৃষ্ট হইল,—শেষে জ্ঞান জ্যোতি সৃষ্ট হইল,—এবং সর্ব্ব শেষে,—আত্মার জ্যোতি! তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া মন

বিচরণ করাই মানব ভূ-স্বর্গ। (Bacon's Essay on of Truth.) অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষদে আঙ্গিরস শৌনককে বলিয়াছেন,—"এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য" (মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।১০। এই সত্যকে, এই পুরুষকে যিনি হৃদয়ে জানেন, তিনি এই পৃথিবীতে, এই দেহেতে থাকিয়াই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেন,—মুক্ত হন।

সত্যই অমর। অন্য বস্তু মরণশীল। সত্য সকল দেশ ও কালেই এক, অপরিবর্ত্তনীয়। সত্যের হ্রাস, বৃদ্ধি নাই। দেশ ও কাল সত্যকে পরিবর্ত্তন করে না। দুই দুগুণে চার চির দিনই সত্য। কাশী, মক্কা, রোম বা লণ্ডনে পৃথক্ পৃথক্ নহে।

এই সত্যই ব্রহ্ম। এই সত্যই ব্রহ্মের দেহ। এই সত্যই ব্রহ্মমন্দির। ব্রহ্মের অন্য রূপ, স্বরূপ নাই,—অন্য দেহ নাই,—অন্য মন্দির নাই। তাঁহাকেই জান। ইঁহাকে জানিলেই জীবন ধন্য হয়,—মুক্ত হয়,—অমৃত হয়,—মানব বলিতে পারে,—"আমি আলোকে আত্মহারা হইলাম।"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভ্যাট্স্কি।

আজ প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল এই অসার সংসার হইতে এক মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে, ৮ই মে তারিখে, Helena Petrovna Blavatsky (হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভ্যাট্স্কি) তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অসীম শক্তি, আসমুদ্রহিমাচল-ভারতবক্ষ স্পন্দিত করিয়াছিল। তিনি এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিলেও, সেই স্পন্দনের বেগ এখনও ভারত-গগনে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বিভাসিত রহিয়াছে। তিনি যে আলোক বিস্তার করিয়াছেন, সেই আলোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজ ভারত ধন্য হইয়াছে।

এই পাশ্চাত্য রমণী যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারতের অতীব দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারত সেই পুরাকালের মুনি ঋষি প্রতিপাদিত মহান্‌ আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শ অবলম্বন করিয়া ভারত-সন্তানগণ পবিত্র, জ্ঞানময় এবং সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সনাতন ধর্ম্ম অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া, জড়বাদকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। কিসে শারীরিক সুখ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই তাহারা পাশ্চাত্যদের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, ইউনিভার্সিটির উপাধি করতলস্থ করিয়া, তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে মূর্খ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থকে তাহারা অন্তঃসার শূন্য বলিয়া ভাবিত। তাহারা ইংরাজির চর্চ্চা করিত, এবং মোক্ষমূলার, হাক্‌স্‌লি প্রভৃতি পাশ্চাত্য কর্ত্তৃক অনুমোদিত পুস্তকাদি ভিন্ন আর কিছুই পাঠ করিত না। যতক্ষণ না তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদাতৃগণ বলিয়াছিলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ সকল পাঠোপযোগী, ততক্ষণ তাহারা ঐ সকল পুস্তকাদিকে স্বজাতীয় শৈশব অবস্থার বালভাষিত-শব্দযোজনা-মাত্র (Babblings of infant race) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। তাহাদের ঐ সকল শিক্ষাদাতৃগণ, জড়বাদে পরিপূর্ণ থাকায় এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন ধার ধারিতেন না বলিয়া, সঙ্কেত কিম্বা রূপকের আবরণের ভিতরে যে, ধর্ম্মের অমূল্য রত্নরাজি নিহিত থাকিতে পারে, তাহা তাহাদের মস্তিস্কে প্রবেশ করে নাই। এই জন্য তাঁহাদের অনুগমনকারী, শিক্ষিত সমাজও ধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত।

তখন শিক্ষিত সমাজের দশাত এইরূপ ছিল কিন্তু, অশিক্ষিত সমাজের দশা আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল লোকে ত্যাগ করিয়া বাহ্যাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কতিপয় অর্থপিশাচের মোহজালে পড়িয়া ভারত জড়োপাসক হইয়া পড়িতেছিল। অন্ধসংস্কার লোক সকলকে আকণ্ঠনিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া, লোকে জ্ঞান হইতে দূরে পড়িয়া অজ্ঞান অর্জ্জন করিতেছিল,—যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। "অন্ধেনৈর্নীয়মানা যথান্ধাঃ", তদ্বৎ অর্থলোলুপ যাজক ও মূর্খ যজমান উভয়েই মজিতেছিল। এমনকি শাস্ত্র সকল দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত

হইয়াছিল। একদিকে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা এবং অন্যদিকে অশিক্ষিত সমাজের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বীভৎস কাণ্ড ও পরস্পরকে আক্রমণ, এই দুই প্রকার অবস্থার ভিতরে পতিত হইয়া, ভারত অশেষ প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন ভারত-গগনে, ব্লাভাট্স্কি রূপ চন্দ্রমার উদয় হইয়াছিল।

হেলেনা অদম্য উৎসাহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবে সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও তাঁহার উৎসাহের কোন প্রকার হ্রাস হয় নাই। অগণ্য নরনারীর জন্য যাঁহার দিবা-নিশি চক্ষের জল ঝরিত, যাঁহার বিশ্বপ্রেম, দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা প্রতিহত হইত না, তাঁহার বিশ্বজনীন দয়া বাল্যকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল। যেখানে রোগ, যেখানে শোক, যেখানে তাপ, সেই খানেই তিনি দেবীরূপে বিরাজিত হইতেন। পীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুঃখীর রোদন তাঁহার কোমল প্রাণ সহিতে পারিত না। অতি শৈশব অবস্থা হইতে তিনি অতি আশ্চর্য্য ঘটনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শৈশবাবধি তিনি অতীন্দ্রিয় রাজত্বের জীবের সহিত কথোপকথন ও আদান প্রদান করিতেন। তাঁহার খেলার সাথী ও ধাত্রী, এই সকল ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তিনি শিশু কালেই প্রকৃতির গূঢ়রহস্য অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেন। যখন প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ভয়, ভক্তি ও কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেন।

যত তাঁহার বয়স্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বিশ্বপ্রেম ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, জীবনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তিনি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য যে কি প্রকারে সফল হয় তাহাও অবগত হইয়াছিলেন। যে সকল মহাপুরুষ, মনুষ্যের হিতের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল অতীন্দ্রিয় মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে তিনি অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া, তিনি শম, দমাদি এবং ধ্যান ধারণাদি অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং যে বিশ্বজনীন প্রেম তাঁহাকে মাতাইয়াছিল, সেই প্রেমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি উক্ত মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা

সমিতির (Theosophical society) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মহাপুরুষগণের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া এই সভার সংবর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। জড়বাদ-পরিব্যাপ্ত এই দুর্দ্দশার দিনে সমাজের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিয়া, তিনি এইরূপ প্রকাশ করিলেন যে, বিশ্বজনীন ভালবাসা এবং ভ্রাতৃভাব বিস্তার করাই এই সভার প্রধান লক্ষ্য। যে কোন ধর্ম্মের 'গণ্ডির' ভিতর আবদ্ধ থাকিলে, কোন ক্ষতি নাই ; কিন্তু যাহাতে পরোপকার করা যায়, তাহাই এই সভার বিশেষ চেষ্টা। ইহা ভিন্ন ঐ সভার আরও দুইটী গৌণ উদ্দেশ্য আছে। একটী হইতেছে, আর্য্য এবং অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করা এবং অপরটী হইতেছে—প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের এবং মনুষ্যের ভিতর যে সকল গুপ্তভাবে নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তাহাদিগের তথ্যানুসন্ধান করা। প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা জড়বাদ দুরীভূত হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের উদয় হইবে বলিয়া, এই সভা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের ভ্রান্ত সংস্কার এবং বিশ্বব্যাপক সন্দেহ দূর করিবার জন্য,—মনুষ্য যে তাহার নিজের ভাগ্য গঠন করিয়া থাকে এবং ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পরও যে তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য,—যাহাকে আমরা আশ্চর্য্য ঘটনা বলি, তাহা যে, প্রাকৃতিক নিয়মের অভিব্যক্তি মাত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য এবং প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য, হেলেনা এই সভার স্থাপনা করিয়াছেন। মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই সভা স্থাপন করিয়া, ভবিষ্যযুগধর্ম্মের সূত্রপাত করা হইয়াছে। পরের হিতের জন্য যাঁহারা জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের জন্য যাঁহারা লোক সংস্থান করিতেছেন, এবং যাঁহারা এই সভার স্থাপয়িতা, সেই সকল মহাপূজ্য অতীন্দ্রিয় 'অমানব' পুরুষের শ্রীচরণ দর্শন কিরূপে পাওয়া যায়, তাহার জন্য এই সভা, প্রবেশদ্বার স্বরূপ অবস্থিত।

হেলেনা তাঁহার জীবন-ব্যাপী ব্রত লইয়া এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পরোপকার করাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সত্যের স্বরূপ অবগত করানই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন ভালবাসার দ্বারাই যে, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে, এই পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যই যে ভ্রাতার ন্যায়—তাহা বুঝা-

ইয়া দিবার জন্য এই সভা দূতস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই জন্য ঐ সভার প্রথম নিয়ম করিয়াছেন যে, সভ্য হইতে হইলে, সকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখিতে হইবে। এই নিয়মটী সকলকে পালন করিতে হয়; আর দুইটী নিয়ম পালন করা সভ্যগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহার জন্য তৃতীয় নিয়মটী করা হইয়াছে। নিজে কে, তাহার বৃত্তান্ত কি, ইত্যাদি অবগত হওয়াই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। উহা জানিতে পারিলে লোকে দেখিবে যে, সকলেই ভ্রাতার ন্যায়। তখন ভ্রাতৃভাব আরও দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মটী এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করা; এইরূপ করিলে, আমরা পরস্পরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কিছু না কিছু শিখিতে পারি। এই প্রকারে পরস্পরের উপকার হইয়া থাকে। তখন আর বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না। এই নিয়মটীর দ্বারাও যাহাতে ভ্রাতৃভাব দৃঢ় হয় তাহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্যে হেলেনা মহাজন-নির্দ্দিষ্ট এই সভার স্থাপনা করিয়াছেন।

কিন্তু হৃদয়ের যে আবেগ লইয়া তিনি সুখের সংসার, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য খণ্ডে ঘুরিতেছিলেন, সেই আবেগ ব্রহ্মবিদ্যা সভা (Theosophical Society) স্থাপনা দ্বারা কতক পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় নাই। যতই দিন কাটিতে লাগিল ততই এই আবেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া জীবন সার্থক হয়, কেমন করিয়া ভগবানের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার জন্য তিনি আবেগময়ী হইয়া উঠেন। তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে তিনি পাশ্চাত্য খণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতে পদার্পণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, সেই মুনি ঋষি-সেবিত হিমাচলের বক্ষে সাধন-ভজনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতের দশা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত জগতের শিক্ষাগুরু ভারত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্ম-আচার প্রভৃতির শীর্ষস্থানীয় ভারতের আজ এই দশা! বিভিন্ন সম্প্রদায় ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়া মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে 'এই মহাবিপ্লব হইতে ভারতকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে আবার উহাকে প্রতি-

ষ্ঠিত করিব'। এক মাত্র সহায় গুরুদেবের অনুগ্রহ—এক মাত্র উপায় বিশ্বজনীন ভালবাসা। এই ভালবাসারূপ ভিত্তির উপর তিনি ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এবং এইরূপ উপদেশ দেন যে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের পরিমাণযুক্ত, আকৃতিযুক্ত এবং সজ্জিত পাত্র সমূহে একই প্রকার জল রাখা যাইতে পারে এবং যখন তৃষ্ণা হয়, তখন যে কোন পাত্রের জল দ্বারা তৃষ্ণা মিটাইতে পারা যায়,—সেই প্রকার সমুদয় ধর্ম্মরূপ পাত্র-সমূহে একই অধ্যাত্ম-পিপাসার জল পাওয়া যায় এবং সেই জল দ্বারা তৃষিত আত্মার পিপাসা মিটিয়া যায়। সুতরাং কাহারও ধর্ম্মের নিন্দা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, সে যাহাতে নিজের ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় রাখিয়া আত্মার পিপাসা মিটাইতে পারে, তাহার জন্য এই সভা উপদেষ্টৃস্বরূপ। বিশ্বজনীন ভালবাসার উপর এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা আংশিক সফল হইলেও পূর্ণ সফলতার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলিত হইয়াছিল। হিমাবর্ত্তের গভীর প্রদেশে গুরুদেবের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, জীবনকে ধন্য করিবার জন্য তিনি তিব্বতাভিমুখে গমন করিয়া যে কত অত্যুৎকট সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। সাধনায় যে সকল সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাও আপনাদের বিদিত আছে। তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারেই তিনি এই সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন সেই সমিতির উন্নতির জন্য জীবন অর্পণ করিলেন। যাঁহারা ভক্তের জন্য সর্ব্বদা হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন, অন্যান্য নরনারীর ক্রন্দনে যাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সেই সকল মহাপুরুষদের কর্ম্মে তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন। কত লোকের নিকট তিনি এই জন্য লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুদেবের বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন! ব্যাধিগ্রস্ত শরীর লইয়া প্রায় সমস্ত দিনই তিনি আবিষ্ট হইয়া Secret Doctrine লিখিতেন; তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে Theosophical Society এবং Secret Doctrine যুগ যুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান থাকিবে। Theosophical Societyর দ্বারা যে, দেশের কি উপকার সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র অনুভব করিতেছেন। হিন্দু-সন্তানদিগের

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা আর নাই। এখন শিক্ষিত সমাজ গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের চর্চ্চা করিতেছেন। এখন শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবদের বিবাদ মন্দীভূত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে একেবারে লোপ পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য এবং তাহাদের যে সারমত তাহা এক,—তাহাদের ভিতর আর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। শিক্ষিত সমাজ যতই Secret Doctrine চর্চ্চা করিতেছেন ততই মোহিত হইতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের রচিত বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র যে কি মহান্ ভিত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া বিস্মিত হইতেছেন। Secret Doctrine হিন্দু ধর্ম্মের Key স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই পুস্তকের আলোচনা করিলে H. P. B.র মহীয়সী কীর্ত্তি অনুভূত হইয়া থাকে।

আজ আমরা সেই মহাসাধিকার এবং মহাভক্তের স্মৃতি উদ্যাপন করিবার জন্য একত্রে মিলিত হইয়াছি। যাঁহার নিকট আমরা অশেষ প্রকারে ঋণী, তাঁহার চরণে মস্তক আপনি অবনত হইয়া আইসে। তাঁহার জীবনী স্মরণ করিলে আমাদেরও এই আশা হয় যে, গুরুদেব আমাদের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আমরা যাহাতে অগ্রসর হইতে পারি তাহার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন যে,—

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্য
বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তদ্ কবয়ো বদন্তি॥"

না উঠিলে, না জাগিলে সেই ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু দিয়া চলা যায় না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীআশুতোষ দেব।

ত্যাগের ক্রমবিকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপ করিতে করিতে তাহার অন্তরে স্নেহ ও ভালবাসা অল্পে অল্পে উদিত হয়। এই ভালবাসা প্রথমে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির প্রতি জন্মে, পরে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবাদির উপর প্রবাহিত হয়। তখন সে তাহাদের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করে। তাহাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য, সে নিজের সুখ কতকটা ত্যাগ করে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা অনাহারে থাকিলে সে দুঃখ পায় সুতরাং নিজে না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়ায়। উত্তম বস্ত্রাদি পাইলে নিজে না পরিয়া তাহাদিগকে পরায়, কারণ ইহাতেই সে এখন অধিকতর আনন্দ পায়। তাহারা পীড়িত হইলে সে সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের চিকিৎসা করায়, ভবিষ্যতে অর্থাভাবে ক্লেশ পাইবে ইহা মনে হয় না। তাহাদের যাতনা-শান্তির জন্য সে নিদ্রা ত্যাগ করে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে, ইহাতে সে নিজে অসুস্থ হইবে ভুলিয়া যায়। কেহ নিবারণ করিলেও শুনে না, বলে "আমি ভুগি তাহে ক্ষতি নাই, ইহারা সুস্থ হউক।" বহুজন্ম এইরূপে কাটিয়া যায়। বহুজন্ম নিঃস্বার্থভাবে পরিবারের সেবা করিতে করিতে, তাহার দেহ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতে থাকে, উপাধি নির্ম্মল ও সূক্ষ্মতর হইয়া উঠে। সুতরাং আত্মাও অধিকতর অভিব্যক্ত হন, প্রেম প্রসারিত হইতে থাকে, ত্যাগ আরও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যে প্রেম কেবল পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ তাহা বিশ্বব্যাপী হয়, সমস্ত জগৎকে,—সমস্ত জীবকে তাহার স্নেহময় বিশাল ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিতে চায়। পূর্ব্বে স্ত্রীপুত্রের দুঃখে তাঁহার যেরূপ দুঃখ হইত, এখন জীবমাত্রের দুঃখে তাঁহার প্রাণ সেইরূপ কাঁদিয়া উঠে। এখন জীব মাত্রই তাঁহার নিজের বস্তু, তাঁহার প্রিয়তম, সুতরাং জীবের সুখেই তাঁহার সুখ, জীবের দুঃখেই তাঁহার দুঃখ। জীবের রোগ শোক জরামৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তিনি সাশ্রুনয়নে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে থাকেন "হায়! কিসে ইহাদের দুঃখমোচন হয়? কোন উপায় নাই কি? আমার এই ক্ষুদ্র দেহটি পাত

করিলে যদি ইহাদের কিছুমাত্র উপকার হয়, তবেই জীবন ধন্য, জন্ম সার্থক হয়।”

অতএব আমরা দেখিলাম ভগবানের অনন্ত প্রেম ও বিরাটত্যাগ জীবে কিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, এক নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা সর্ব্বজীবে সমভাবে বিরাজিত থাকিলেও আধারের তারতম্যানুসারে বিকাশের কিরূপ তারতম্য ঘটিতেছে। জীব যখন শেষোক্ত অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন, যখন তাঁহার প্রেম জগদ্ব্যাপী হইয়াছে, যখন তিনি জীবের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আনন্দ পান, তখন আর তিনি সাধারণ মানব নহেন, তখন তিনি মহাপুরুষ, সাধু, ঋষি। এই অবস্থায় জীব আর নিজে খাইয়া সুখ পান না, নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া তৃপ্ত হন না, নিজে ভক্ত হইয়া আনন্দ পান না, তিনি জগৎকে, সর্ব্বজীবকে খাওয়াইতে চান, জ্ঞানী করিতে চান, ভক্ত করিতে চান। তিনি নিয়ত যে, স্বর্গ সুখ ভোগ করেন তাহাতে আনন্দিত না হইয়া বরং নিরানন্দ হন, কারণ তখনই তাঁহার দুর্ব্বল অসহায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের কথা মনে পড়ে। তাহারা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া কিরূপ যাতনা ভোগ করিতেছে স্মরণ হয়, আর অমনি তাঁহার করুণাময় হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তিনি বলিতে থাকেন “যত দিন আমার ভাইদিগকে তুলিতে না পারিব, যতদিন তাহাদিগকে জ্ঞানে ও প্রেমে উন্নত করিয়া এই সুখের ও আনন্দের আস্বাদ দিতে না পারিব, ততদিন আমিও স্বর্গ সুখ ভোগ করিব না। আমি স্বর্গ চাহি না, কারণ ভাইদিগকে ফেলিয়া আমি কোনখানেই সুখ পাইব না; অতএব, হে প্রভো, আমাকে পুনঃ পুনঃ মর্ত্তে যাইতে দাও, যেন আমি শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা ভাইদের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।”

এই মহাপুরুষগণের পদপ্রান্তে আশ্রয় লইবার জন্যই আমরা আজ এখানে সমবেত, ভক্তি-কমল দ্বারা তাঁহাদের চরণ পূজা করাই আমাদের আজিকার কার্য। কারণ মহাপুরুষদিগের স্মরণে ও কীর্ত্তনে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, পাপ বিদূরিত হয়। তাঁহাদের জীবন্ত প্রেম, সর্ব্বজীবে করুণা ও অমানুষিক ত্যাগের কথা স্মরণ করিলে, আমরাও ক্ষণকালের জন্য তদ্ভাবে ভাবিত হই; আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী সেই সুরে কাঁপিয়া উঠে; কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া আমরাও জীবের দুঃখে এক বিন্দু অশ্রুপাত করিতে পারি।

ইহাই পরম লাভ, কারণ এইরূপ করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় আমাদের অন্তরে প্রেমের বিকাশ হয়। অতএব, ভ্রাতৃগণ, আসুন, আজ আমরা সমবেত হইয়া মহাপুরুষগণের কৃপা ভিক্ষা করি, আসুন, আজ সকল ভাইয়ে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলি "হে জ্যেষ্ঠ, হে মান্য, হে পূজ্যগণ! তোমরা আমাদিগকে চরণে স্থান দাও। এত দিন ভগবানকে চিনিতে পারি নাই, তোমরাই সেই প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম বস্তুটিকে চিনাইয়া দিতেছ। তোমাদের প্রেম, তোমাদের করুণা, তোমাদের ত্যাগ দেখিয়াই, সেই অনন্ত করুণা ও বিরাট্ ত্যাগের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছি। তোমাদের অসীম প্রেমই সেই অসীম প্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। অতএব তোমরা ধন্য! তোমাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার! এখন ভিক্ষা এই, আমাদিগকে চরণে স্থান দাও, পায়ে ঠেলিও না। জীবহিতরূপ যে মহাব্রতে তোমরা ব্রতী হইয়াছ, যে কার্য্যে তোমরা জীবন মন সমর্পণ করিয়াছ, আমাদিগকেও সেই কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া লও। জানি আমরা অযোগ্য, স্বার্থপর, অজ্ঞান, কিন্তু তোমাদের কৃপা ও শক্তি অসামান্য। তাই আবার বলি আমাদিগকে প্রেম দাও, দয়া দাও, বল দাও যেন অন্ততঃ একটি জীবেরও দুঃখ মোচন করিতে পারি, একটি ভাইয়েরও অজ্ঞান দূর করিতে পারি, একটি নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার করিতে পারি। এখন, এস ঋষিগণ, এস দেবগণ, এস যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সুর, অসুর, মানব, পশু, ব্রহ্মাণ্ডের যে যেখানে আছ, এস, আজ সকল ভাইয়ে মিলিত হ'য়ে,

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ
বাচোহবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ ;
(যিনি চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, ও মনের মন।)
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং।

যিনি এই বিশ্বরূপে প্রকটিত, যাঁহার কণামাত্র পাইয়া ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রের আধিপত্য, সূর্য্যের তেজ, যাঁহার বলে সকলে বলীয়ান্, যিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হইয়াও অসংখ্যরূপে, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, আজ এসো ভাই বিশ্ববাসিগণ, সকলে তাঁহাকে একতানে সমস্বরে বলি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥*

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

ব্রহ্মবিদ্যা ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতের আচার্য্য Sir William Lodge একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন ;—

"Modern science is rediscovering some of the forgotten truths of Ancient Science.

(বর্ত্তমান বিজ্ঞান অনেক পুরাতন ও বিস্মৃত তত্ত্ব আবার জগতে প্রকাশ করিতেছেন।)

বাস্তবিক এই কথা সত্য ; আমরা দেখিতে পাই যে মহর্ষিরা যোগবলে যে সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব জগতে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সত্য বর্ত্তমান ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি যখন ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে পুনঃ প্রচারিত করিলেন, তখন জগতের সর্ব্বস্থানের বিদ্বান্ সম্প্রদায় সেই কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই দশ বৎসরে তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; এবং Lord Kelvin, Lodge প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ সেই সমস্ত প্রচারিত তত্ত্বকে উপহাস করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সত্যতার বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছেন,—এবং আপনারা তাহা জগতে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।—অস্মকার এই প্রবন্ধে আমরা ইহার উদাহরণ দিব, ও আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও মনোতত্ত্বের সহিত ঋষি-প্রচারিত মূলতত্ত্বের তুলনায় সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কলিকাতাস্থ মদন মোহন ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির শ্বেত-শতদল-উৎসবের উদ্দেশ্যে রচিত।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কোনও সত্যে উপনীত হইতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা এই ;—(১) সমীক্ষা observation, (২) পরীক্ষা (experiment) এবং (৩) অন্বীক্ষা (inference)। এই আধুনিক বিদ্বন্মণ্ডলী যে কঠিন অধ্যবসায়, বিপুল আয়াস ও প্রাণ পণ করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চায় আপনাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গিত করিয়াছেন ; এবং যে প্রাণোৎসর্গের ফলে তাঁহাদিগের পার্থিব ও বাহ্য উপায় অবলম্বনে ঋষিদিগের অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ সার কথা প্রকাশ পাইতেছে ;—তাহার জন্য তাঁহারা আমাদিগের ধন্যবাদ, সুখ্যাতি ও পূজা পাইবার যোগ্য। পূর্ব্বকালে এই সকল তত্ত্বকথা বর্ত্তমান প্রথায় জানিবার উপায় ছিল না,—তখন বিজ্ঞানশালার (Laboratory) সাহায্য লওয়া হইত না। এখন মানবেরা বুদ্ধির (intellect সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করেন ; তখন "বোধির" (intuition) সাহায্যে ঋষির অন্তরে—ওই সত্য প্রতিভাত হইত। (এই "বোধি" হইতে "বোধিসত্ত্ব" কথার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং বোধিক্রমের তলদেশে জগতের দয়াপ্রবণ শিক্ষকও বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিশব্দের মৌলিক অর্থও তাহাই।)

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বেও প্রতীচ্যবিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইয়া আসিয়াছেন যে, জড়ের তিনটি অবস্থাভেদ আছে —তাহার কঠিন ভাব, তাহার তরল ভাব, ও বাষ্পায় অবস্থা। তাই পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে মহামতি H. P. B, যখন নানাদেশীয় ঋষিবাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রমাদপূর্ণ জগতে নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, "তোমাদিগের দৃষ্টি অতিশয় স্থূল ; প্রকৃতির তিন অবস্থা আমাদিগের সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় সত্য, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত তাহার সূক্ষ্ম আর চার অবস্থা আছে।" যখন তিনি জগতে এই কথা প্রকাশ করিলেন, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাহা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তিনি কখনও একথা বলেন নাই যে, এ সমস্ত তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ; তিনি ঋষিদিগের ধ্যানলব্ধ স্থূলজ্ঞানের অবোধ্য বিষয় আধুনিক ভাবে যাহাতে আধুনিক লোকের বোধগম্য হইতে পারে এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। ঋষিরা শিখাইয়াছেন, জড়ের সাধারণতঃ পাঁচ অবস্থা,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। তন্ত্র আরও দুই প্রকার অবস্থার কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আদি ও অনুপাদক এই দুইটা নাম দিয়াছেন। প্রণববাদ নামক একখানি

অপ্রকাশিত গুপ্ত তত্ত্বকথাপূর্ণ গ্রন্থে এই দুই অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্যকার এই দুই ভাবকে মহৎ ও অহং তত্ত্ব বলিয়াছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমাদিগের যে ঋষিবাক্য কল্যাণময়ী H. P. B. আমাদিগকে বুঝাইতেছেন, যে কথা আমরা বুঝিতাম না বলিয়া এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার অননুমোদিত, অতএব ভ্রমপূর্ণ ও প্রমাণবিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিতাম, তাহাই আমাদিগের মস্তিষ্করোচক করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে শুকধর্ম্মী হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত পঞ্চ প্রাকৃতিক তত্ত্বের সম্মিলনে জগৎ সৃজিত এই মত উপহাস করিতাম। ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের (compound) যোগে কিরূপে অম্লজান Oxygen জলজান Hydrogen ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ হইতে পারে— এইরূপ অসম্ভববাদ, মূর্খের ও উন্মাদের যোগ্য এই বলিয়া আমাদিগের বিদ্যাবত্তার ও অহংকারের পরিচয় দিতাম মাত্র। তেলেনা এই ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে, ক্ষিতি অর্থে অম্লজান ও ক্যালসিয়মের (Calceum) সম্মিলনে উদ্ভূত মৃত্তিকা নহে; বা অপ অর্থে অম্লজান ও জলজানের সম্মিলনে উদ্ভূত আমাদিগের জল বা (420) নহে, ক্ষিত্যপাদি একই পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র। গর্ভ উপনিষদেও এই কথা সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিত আছে ; যথা—

'তত্র যৎ কঠিনং সা ক্ষিতিঃ যৎ দ্রবং তৎ আপঃ ... ইত্যাদি। একই পদার্থ এই বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়।

এইবার বৈজ্ঞানিক মতের আলোচনা করিব।—

কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার —আলোক, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কোনরূপে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম না হইয়া বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ ইথর স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবং তাহার অভ্যুপগমিক ইথর Hypothetical Ether নাম দিলেন। ইহাই ইথর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রথম অবস্থা। তাৎকালিক এক বিখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের পুস্তিকায় ইথর সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"I make a sharp distinction between ether and matter."

Dalham's Matter, Ether Function.

ডলহাম সাহেব তাঁহার প্রাকৃতিক ভূত, ইথর, ও গতি-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "তিনি অবশ্য প্রাকৃত ভূত ও ইথরের বিভিন্নতা স্বীকার করেন।"

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে সেই সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা ইথরকে কাল্পনিক ব্যতিরেকে বাস্তব ভূত বলিতে স্বীকৃত ছিলেন না।

এই মতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং ১৯০১ সালের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের সমক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান-রাজ Lord kelvin স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে-তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে আমাদিগের পার্থিব পদার্থের এরূপ একটি অবস্থা আছে, যে অবস্থায় নিউটনের বিশ্ব-মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম কার্য্য করেনা।

"I am convinced that there *does* exist *matter* which is not subject to Neuton's Law of Gravitation."

এবং ইহাকেই ইথর বলা যাইতে পারে।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ল্যাণ্ডর Dr. Lander সাহেব বলিয়াছেন যে ইহাকে ভারবিহীন পদার্থ বলা যাইতে পারে।

"Matter is either ponderable or imponderable. The latter is generally termed ether."

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বহু পূর্ব্বে মাননীয়া শ্রীমতী বেসেণ্ট ১৮৯৫ সালে ইংলণ্ড হইতে প্রচারিত Lucifer পত্রিকায় "সূক্ষ্ম রসায়ন" (Occult Chemistry) প্রবন্ধে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়াছিলেন :—

"By intuition people came to know other four stages of matter above solid, lequid and gas. . . . . . Ether has 4 different degrees and these with the three before mentioned form the seven states of matter."

মানব সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে কঠিন, তরল ও বাস্পীয় ব্যতিরেকে সূক্ষ্মতর আর চারিটি অবস্থার পরিচয় পাইয়াছেন; তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন, যে বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে ইথর বলে, তাহা মৌলিক এক অবস্থা নহে—তাহার চারিটি মৌলিক অবস্থা আছে।

তিনি যখন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন হইতে এই কথা প্রকাশ করেন, লোকে এবং বৈজ্ঞানিক দৈনিকে ও মাসিকে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল—অতি সূক্ষ্ম ভারহীন ইথর—তাহার আবার সূক্ষ্ম স্থূল অবস্থাভেদে চারিভাগ! সময়ে

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ১৯০২ সালে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ফসাণ্ডার সাহেব (Dr. R. A. Fosunder) আমেরিকা হইতে লিখিলেন যে, "যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ইথর বলেন, তাহা একটী মৌলিক পদার্থ নহে—তাহা কতকগুলি বিভিন্ন অবস্থার সংযোগে উৎপন্ন; তিনি আরও বলিলেন যে, ইথেরন্-সাগরের ঘূর্ণায়মান স্রোতে ডিম্বাকার ইথর অণুর উৎপত্তি হয়।"

"The so called ether is a composite body. . . . . Ether is a structure of vortices in a fluid called Etheron."

অতএব আমরা দেখিলাম কঠিন তরল ও বাষ্পীয় ব্যতিরেকে আরও দুই প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব পাশ্চাত্য জগতে অনুমোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং এই দুই অবস্থাকে তাঁহারা ইথর ও ইথেরন এই দুই নাম দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অমানিশা।

(ক্ষুদ্রগল্প)

(১)

সেবার বসন্তকালে আমি কলিকাতায়। কলিকাতা আমার জন্মভূমি হইতে অনেক দূরে। কোন বিশেষ কার্য্যগতিকে এবার প্রায় সমস্ত বসন্তকালই আমাকে কলিকাতায় কাটাইতে হইল।

বাটীতে স্ত্রী আছে, একটি শিশুপুত্র আছে। মাঝে মাঝে স্ত্রীর—স্ত্রীর নাম হেমলতা—সেই প্রেমপূরিত হাস্যবিভাসিত সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে, শিশুর সেই অর্দ্ধস্ফুট বাক্যগুলি মনে পড়ে। কিন্তু কি করি! বিশেষ কার্য্য না থাকিলে কি আর থাকিতাম!

কলিকাতায় অবশ্য আমার পরিচিত অনেকেই ছিলেন—তৎসত্ত্বেও আমি একটি 'মেসে' আছি। এইরূপভাবে প্রায় দুই মাস কাটিল।

দুই মাস পরে আমার কার্য্য সম্পন্ন হইল। মনে আনন্দ হইল—আবার স্বদেশে যাইব—আবার হেমলতার হাস্যবিভাসিত ওষ্ঠাধর চুম্বন করিব—শিশুর আধকথা আবার শুনিব।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, হেমলতার নিকট হইতে আমি এই দুই মাস রীতিমত-পত্র পাইয়াছি এবং নিজেও লিখিয়াছি। কিন্তু পত্র পাইলে কি হয়? হেম-লতার সেই পত্রগুলি পাইয়া আমি অধিক অধৈর্য্য হইয়া পড়িতাম।

যাহা হউক কার্য্য শেষ হইলে—'মেসের' কর্ত্তাকে বলিলাম "মহাশয়! আমি কাল বাড়ী যাব আপনার হিসাব পত্র বুঝিয়া লউন।"

আমার নিকটে খুচরা টাকা অধিক ছিল না—সুতরাং একখানি নোট ভাঙ্গাইতে মনস্থ করিলাম—পকেটে হাত দিয়া দেখি—কি সর্ব্বনাশ! মণিব্যাগ ত নাই!" প্রত্যেক পকেট ভাল করিয়া খুঁজিলাম—বিছানা বাক্স সব খুঁজিলাম কোথাও ত নাই!—তাহাতে প্রায় পাঁচ শত টাকা ছিল—সবই দশ টাকার নোট আর হেমলতার চিঠিও তার মধ্যে ছিল!

এখন উপায় কি? ব্যাগটি হারাইলাম কি কেহ চুরি করিল, তাহাওত বুঝিতে পারিতেছি না! গত কল্য বৈকালে আমি ইহা বুকপকেটে রাখিয়াছি—রাত্রে যখন আমি শুইয়াছি তখন ত উহা বুকপকেটেই ছিল বোধ হইতেছে। আমার ভয়ানক মনকষ্ট হইল—মনে মনে বলিলাম "সে কালের মত যদি পিশাচেরা মানুষের আত্মার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে আমি ফাঁকি দিয়া একটা কাজ সারিয়া লইতে পারিতাম।"

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা লোকের কথা মনে পড়িল—এক দিন বিডন গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া একটি অদ্ভুত-মূর্ত্তির লোক দেখিয়াছিলাম, লোকটি খর্ব্বাকার—বয়স অনুমান চল্লিশ—বদন-মণ্ডল শ্বেত কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশিতে পূর্ণ, মুখের চেহারা অতি কর্কশ। লোকটাকে দেখিলেই ভয়ানক বদমায়েস বলিয়া মনে হয়। বিডন উদ্যানে একটি লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে এই অদ্ভুত মূর্ত্তি একবার হাসিয়াছিল, সে হাসি মনে করিলে এখন আমার হৃদ্‌কম্প হয়! বাস্তবিক লোকটা যেন প্রকৃত পিশাচ-মূর্ত্তি! আমার প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল—তবু ভাবিলাম যদি সে আমার মণিব্যাগ ফিরাইয়া দেয়, তবে তাহাকে পর্য্যন্ত আমি অভ্যর্থনা করিতে কুণ্ঠিত নই।

দ্বারে আঘাত হইল—হাঁ—সেই লোকটা নাকি?—ছুটিয়া দ্বার খুলিলাম, সেইত বটে, সেই রক্তবর্ণ কোট-পরিহিত খর্ব্বাকার পিশাচ-মূর্ত্তি!

(২)

"ক্ষমা করিবেন মহাশয়! আপনার নাম কি?—"

"আজ্ঞে—আমার নাম—প্রিয়নাথ দত্ত।"

"কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! লোকটা পুলিশের চর—নিশ্চয়! সম্মুখে আমার নামে একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র পড়িয়াছিল—আমি সেইখানি লইয়া ঠিকানা দেখাইলাম। "ভাল! কিন্তু তবু আমি একটু ভাল প্রমাণ চাই। আপনার সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।"

"মাপ করুন, মহাশয়; আমি এখনি যাইব। হয়ত আপনার ভুল হইয়াছে, আমার নিকটে আপনার কাজের কথা কি থাকিতে পারে—আমি সওদাগরও নই, কোন গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরিও করি না।"

লোকটি বিস্মিতের মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল—অবশেষে বিদায় লইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল "আপনি অবশ্য কার্য্যগতিকে কলিকাতায় বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ভ্রাতা ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া লালবাতি দেখাইবার চেষ্টায় আছেন না?"

কি সর্ব্বনাশ! এ বিষয় ত অতি গুপ্ত, আমি এবং আমার ভ্রাতা ব্যতীত ইহা ত আর কেহ জানে না। আমি বলিলাম "আপনার ভুল হইয়াছে আমার একটি কেন তিনটি ভাই আছে, কিন্তু আপনি যে রকম বলিলেন কেহই ওরূপ নহে।"

"বাস্তবিক!"

আমি বলিলাম মহাশয়! আপনি অন্য লোককে ধরিয়াছেন—আপনার কি কাজ অনুগ্রহ করিয়া সত্বর বলুন আমার এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করিবার নাই।"

"একটু ধৈর্য্য ধরুন। আপনার সহিত কথা কহিবার উদ্দেশ্য আছে। আপনাকে যেন কিছু ম্লান দেখিতেছি, কিছু অশুভ ঘটে নাই ত! আপনার কি টাকার দরকার আছে?"

আবার সেই হাসি, উঃ কি ভয়ানক! লোকটার প্রতি আমার সন্দেহ

ক্রমেই প্রগাঢ় হইতে লাগিল। যাহা হউক আমি বলিলাম যে, "আমার টাকার দরকার নাই। আপনি আমার প্রতি এত সদয়, আপনার নাম শুনিতে পাই কি ?"

"শুনিয়াই বা আপনার কি হইবে ? আমার নাম জগদানন্দ "

এই সময় পোষ্টম্যান আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল।

লোকটি বলিল "পত্রখানি আগে পড়ুন তার পরে কথা কহিব—ইহা অবশ্য আপনার হেমলতার পত্র।"

আমি অধিকতর বিস্মিত হইলাম।

লোকটা বলিল "আমাকে চিনিতে পারেন নাই ! আমার কার্য্য কি তাহাও বুঝিতে পারেন নাই ?"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম "মহাশয় ! আপনি যে স্বয়ং সয়তান (পিশাচ) অবতার সে বিষয় আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—আমার আত্মাকে কখন গ্রাস করিবেন জানি না।" কিন্তু আমি হঠাৎ বলিলাম না।

লোকটি বলিল "আপনি ত ষ্টেসনে যাবেন আমিও সেই দিকে যাব। আমার গাড়ি উপস্থিত চলুন একগাড়িতে যাওয়া যাউক।"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"আমার গাড়ি ঠিক হইয়াছে।"

লোকটি বিরক্তভাবে বলিল "আপনার সঙ্গে ব্যবহার করা ত বড় কঠিন ব্যাপার দেখছি। আমি আপনার বাড়ী যাব ভাবিতেছি। আমি কে চিনিতে পারিলেন না।"

আমি "আপনি যদি যাদুকর হন্—তবে ত আমার মণিব্যাগ পাইব ! বলুন কি উপায়ে পাইব।"

"মণিব্যাগের কথা ! আর কিছুত নয় ?"

"আর যাহাই হউক—আমার মণিব্যাগটি দরকার। ইহাতে অনেক টাকার নোট আছে। বলুন আমি কি উপায়ে ইহা পাইব।"

"কি রকম মণিব্যাগ ?"

আমি মণিব্যাগটির আকার প্রকার বর্ণনা করিলাম।

"আচ্ছা বেশ। আমি যদি সেটি দিতে পারি আপনি আমাকে কি প্রতিদান করিবেন ?"

লোকটি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল—উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—আমি বলিলাম। "আমার আত্মা আপনাকে দিব।" লোকটি পকেট হইতে ব্যাগটি টানিয়া বাহির করিল।

ব্যাগের মধ্যে সমস্ত জিনিস ঠিক আছে। আমি বিস্মিত ভাবে বলিলাম "আপনি কিরূপে পাইলেন ?"

"আমি গত কল্য সাড়ে চারিটার সময়ে বিডন গার্ডেনের দ্বারের সম্মুখে কুড়াইয়া পাইয়াছি। একখানি চিঠিতে আপনার নাম ও ঠিকানা দেখিয়া কালরাত্রেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

আমি জগদানন্দকে কত ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "হেমলতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আবার দেখা হইবে।"

(৩)

রেলে চড়িলাম, যতক্ষণ চলিলাম ততক্ষণ কেবল ঐ অদ্ভুত লোকটির কথাই মনে হইতে লাগিল—তাহার সেই খর্ব্বমূর্ত্তি—সেই কুগঠিত পদদ্বয় আর তাহার সেই লম্বিত কেশ ও শ্মশ্রুরাজি—সেই কর্কশ মুখ—আর সেই ভীষণ হাস্য। যতই ভাবি ততই প্রাণের মধ্যে ভীতি-সঞ্চার হয়।

যাহা হউক, মণিব্যাগ সম্বন্ধে লোকটির আচরণ খুব ভদ্রোচিত দেখা গিয়াছে—আবার ভাবিলাম হয় ত আমার আত্মাকে জড়িত করিবার ইহা একটি প্রধান কৌশল !

ভাবিলাম সে কি প্রলোভনে আমাকে বশ করিবে—অর্থ ! আমার খুব অভাব নাই, স্ত্রীলোকের রূপ ! আমার হেমলতার অপেক্ষা সুন্দরী কি আর আছে ? পাঠকগণকে এই খানে বলিয়া রাখি হেমলতাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে লবঙ্গলতানাম্নী একটি সুন্দরী বালিকাকে আমি বড় ভাল বাসিয়াছিলাম—লবঙ্গও আমাকে ভাল বাসিত—কিন্তু লবঙ্গের পিতা আমাদের বিবাহে সম্মত হইলেন না। লবঙ্গ অন্যের সহিত পরিণীতা হইল—বিচ্ছেদের সময় উভয়ে কত কাঁদিলাম—কত দুঃখ করিলাম—কত চুম্বন প্রতিচুম্বন হইল।

ট্রেণ হইতে নামিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে প্রবেশ করিলাম। জগৎ সুষুপ্তির আরামময়ী ক্রোড়ে বিশ্রান্ত—আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানিতেও সুষুপ্তির রাজ্য। বসন্তের মৃদুল পবনে শরীর স্নিগ্ধ হইল, অদূরে স্বকীয় বাটী দৃষ্টে মন শীতল হইল।

বাটীতে সব নিদ্রিত—আমি কোনরূপ উত্তেজন না করিয়া বাটী-সন্নিহিত উদ্যানটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি উপলখণ্ডে বসিলাম—ক্রমে সেই খানেই একটু শয়ন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

মালীর গান।

আয় মা আনন্দময়ি আমার সনে খেলবি আয়,
গাছ পোঁতা মা বাই চেপেছে তুই একটা পুঁতবি আয়।
ত্বরা করে আয় মা শ্যামা বর্ষা বুঝি কেটে যায়,
(ওমা) মাটির টব আর ক দিন রবে নোনা লেগে ভেঙ্গে যায়॥

সংসার অনলে মাগো পুড়িয়ে নে তোর টবটায়,
ওমা এক মুঠা তোর সত্যসার ছড়িয়ে দে মা মাটির গায়।
মা মধ্যেতে তার ব্রহ্মবীজ ও রাঙ্গা হাতে পুঁতে দে মা,
এমনি করে ছড়িয়ে দে জল, যেন দুদিনে গাছ গজিয়ে যায়॥

এই ব্রহ্মবীজে যবে অঙ্কুর উদ্গম হবে;
ব্রহ্মময়ি রূপের ছটায় চির আঁধার ডুবে যাবে।
ব্রহ্মময়ি তোর দয়াতে, এ অঙ্কুর যাবে মেতে;
নব নব পল্লবেতে, তোর প্রেম মা ছুটাইবে।

কমল কোরক কত, শোভিবে তায় নিয়ত,
দেখে তায় সপ্ত লোক, আনন্দেতে ভেসে যাবে।
ব্রহ্ম শিশু না জানিবে ফুল সব ফুটে যাবে,
কাল ভ্রমর হয়ে, মধু খেতে মাতিবি আয়॥

ফুল সব ফুটে গেল, সৌরভে বিশ্ব মাতিল।
মাতিল আনন্দময়ি আনন্দে হৃদয় তোর॥

নব যুবতী কুলবালা, জানে না মা তোর খেলা।
মা হয়ে যে হোস্ পুনঃ যুবতীর হৃদি চোর ॥

ফুল গুলি গেল ফুটে নিভৃত নিকুঞ্জে উঠে,
ছেড়ে অসি নিয়ে বাঁশী, হানিলি মধুর স্বর।
নব বধূ কুল বালা, সহিতে নারিল জ্বালা,
আকুল হৃদয়ে ডাকে, কোথা মোর প্রাণেশ্বর ॥

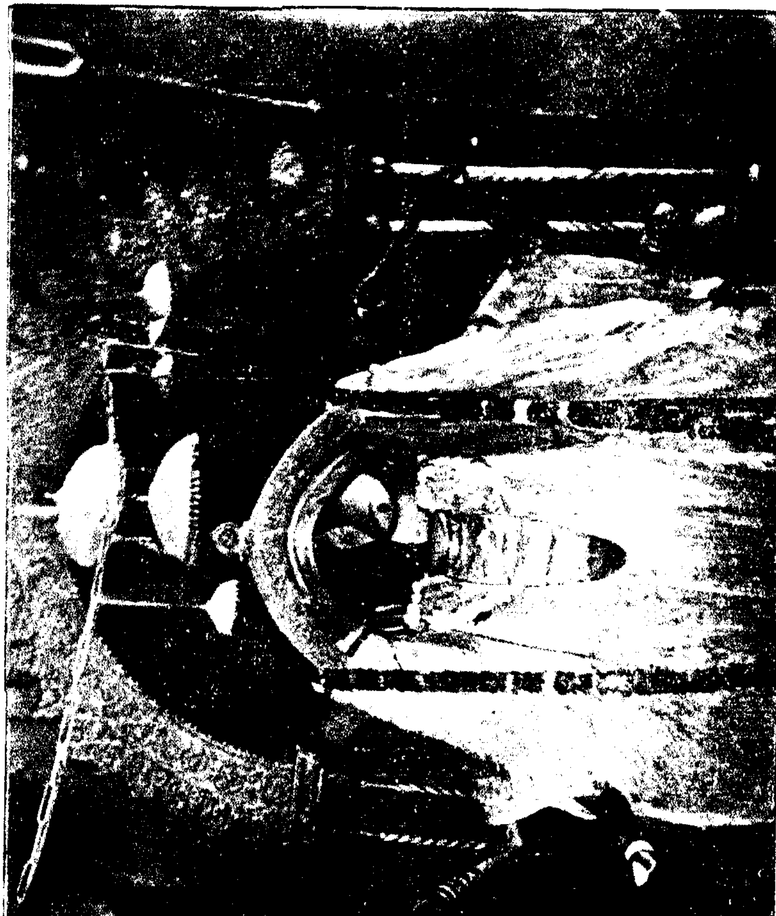
নাচিল হৃদয় তোর প্রেমে মেতে হয়ে ভোর,
পশিলি তাদের হৃদে, হয়ে বিশ্ব মনচোর।
প্রেমভরা ফুল আর, সহিতে পারে না আর,
আবেশে এলায়ে পড়ে খসে তার বাধা ঘোর ॥

দেখে তোর (এ) আলাপন, বিভোর মা ত্রিভুবন।
আব্রহ্ম সকল লোকে, প্রেমে মেতে ভেসে যায়।
অধম এ শিশু তোর, কণা মাত্র প্রেম চায়।

জনৈক মালী।

—— 0 ——

পট্ট।



ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। আষাঢ় ১৩১৭। ৩য় সংখ্যা।

গীতা-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন দর্শনই স্বতঃ সম্পূর্ণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল দর্শনের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া ও সকল গুলি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নিজের মতের সহিত যুক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটি মতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাংখ্য দর্শনের মত দেখা যাক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাংখ্যদিগের অব্যক্ত সর্ব্ব উপাধিতেই প্রকাশিত। ইহাই তাহাদের পুরুষ, এই পুরুষ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। ইনি কার্য্যশালী সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহেন। ইনি একরূপ জগতের নিষ্ক্রিয়-সত্তা। জগতে যাহা কিছু কার্য্য হয় সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিশ্বের উপাধি-সমূহের ও তাহার সমষ্টির একমাত্র কারণ। এই কর্ম্মের জন্যই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব ও ইহার জন্যই মানব ইহজগতে দুঃখশোক হইতে কষ্ট পায়।

এই কর্ম্ম হেতুই জীব জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে পারে। তাঁহাদের মতে জীবনের উদ্দেশ্য, পার্থিব কষ্ট-সমূহ দূর করা। অতএব এরূপ করিতে হইলে তাঁহাদের কর্ম্মনাশ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ এই মাত্র বলিলাম কর্ম্ম ব্যতীত দুঃখের উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু কিরূপে কর্ম্মনাশ করিতে পারা যায়? পরব্রহ্ম সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি তাঁহার কোন সাহায্য ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। প্রকৃতি বা তাহার গুণের বিনাশ-সাধন কোনরূপেই সম্ভব নহে। জল কিম্বা অগ্নির গুণও তাহা হইলে নষ্ট করিতে পারা যায়। কর্ম্ম প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল এবং যতক্ষণ তুমি মানবদেহে আছ প্রকৃতিও ততক্ষণ বর্ত্তমান আছে—অতএব তোমার পক্ষে কর্ম্ম নাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাংখ্যেরা বলেন যে, পরব্রহ্মের ন্যায় নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে থাকিয়া কর্ম্মের ফল নাশ করা যাইতে পারে। কর্ম্ম কর—তাহার জন্য কোন ক্ষতি নাই, যেন ইহা করিতে হইবে বলিয়া, কর্ত্তব্য বোধে করিতেছ। আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত নহে। সাংখ্যেরা বলেন সঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর, কারণ ইহাই আত্মাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহার জন্যই আত্মা দায়ী। তাহা হইলে কি হইবে? কর্ম্ম ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিবে পরিশেষে ক্রমে এত ক্ষীণ হইয়া আসিবে যে, কর্ম্ম আর তোমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। সেইটিকেই সাংখ্যেরা তোমার মুক্তির অবস্থা বলেন। তুমি তখন আদিতে যাহা ছিলে পুনরায় তাহাই হইবে। তুমি ত অব্যক্তের ছায়াময় বিকাশ ব্যতীত কিছুই নহ। যখনই তোমার ভ্রম চলিয়া যাইবে, তখনই তুমি দেখিবে যে, তুমিই পরব্রহ্ম। ইহাই সাংখ্য-মত। সর্ব্বব্যাপী অনন্ত এই অব্যক্ত কিছুরই দ্বারা চালিত হয় না। ইহাই মানবের যথার্থ আত্মা। এবং ইহাই কর্ম্মের জন্য যথার্থ দায়ী।

এই অধ্যায়ে এইটিকে অর্জ্জুনের ভ্রমপূর্ণ ভাব বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। যাহা কিছু, যথার্থ আমি-কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহা বাস্তবিক প্রকৃতির নানা ভাব হইতে সৃজিত। কিন্তু প্রকৃতির সেই এক স্থায়ী সত্তা প্রকৃতির কোন কার্য্যেই মুগ্ধ নহেন। কোন অদ্ভুত কারণে সেই যথার্থ আত্মা আপনার নিরপেক্ষ সাক্ষিবৎ অবস্থা ত্যাগ করিয়া, মায়াময় তোমার আমিত্ব রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই ভ্রমপূর্ণ আমিত্ব রূপটুকু পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর, ফলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ এই মত সমালোচনা করিতেছেন। তিনি এই যুক্তির মূলভিত্তি পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মতে কর্ম্ম উপাধিসম্ভূত এবং জীবনের কষ্ট দুঃখপূর্ণ অস্তিত্বে লইয়া যাইবার ইহাই কারণ। এই অব্যক্তে পৌছানই যে জীবনের উদ্দেশ্য এ মত তিনি সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে ঈশ্বরে পৌছান—এই অব্যক্তে পৌছান অনেক আয়াস সাধ্য। আর যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরে অব্যক্ত যোগ দেওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অব্যক্তে পৌছান এক প্রকার অসম্ভব। যদিও সাংখ্যদিগের দুইটি সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহার মতে সাংখ্যদিগের ঐ দুইটির কোনটিই যথার্থ পরিণাম নির্দ্দেশ করে না।

এখন দ্বিতীয় দর্শনের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক—এই দর্শনের নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা। কর্ম্ম-কাণ্ড সকল ক্রিয়ার মূল ভিত্তি। বলিয়া রাখা ভাল যে, শ্রীকৃষ্ণের নিম্ন-লিখিত যুক্তিগুলি আমাদের সহজে বোধগম্য হইবে না, কারণ সময় বদলাইয়া গিয়াছে। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়াছিলেন তখন হইতে ৫ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। তখনকার লোকেরা বৈদিক ক্রিয়া সকল পালন করিত এবং পূর্ব্ব-মীমাংসা সাধারণ কথার ন্যায় সকলের জানা ছিল। তখনকার ও পূর্ব্বের দর্শন-সমূহের কতকগুলি কথার নিষ্পত্তির জন্যই পূর্ব্ব-মীমাংসার সৃষ্টি। তবে কর্ম্মযোগীদিগের কতকগুলি কথা আজ কালের জীবনেও খাটে। যেমন কর্ম্মযোগীরা বলে কর্ম্ম উপাধিসম্ভূত সত্য বটে কিন্তু কেবলই যে উপাধিসম্ভূত তাহা নহে। উপাধি ও চৈতন্য উভয়ে যুক্ত হইলে তবে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যে সকল দার্শনিকেরা সকল কর্ম্ম বাদ দিতে চায়, তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিবার ছলনা করে মাত্র। কিন্তু ছলনা করিলে কি হয়—কার্য্যতঃ কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। মানবদেহ ধারণ করিয়া কেহই কর্ম্মত্যাগ করিতে সক্ষম নহে। অন্ততঃ শরীর-ধারণের উপযোগী কার্য্য করিতে ত নিশ্চয়ই বাধ্য। তবে বলা যায় না—যদি নিরাহারে বা অসময়ে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকে।

আচ্ছা তুমি যেন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে। তুমি যদিও বাহিক ইহা বন্ধ করিতে পারিলে কিন্তু অন্তর হইতে কখনই বন্ধ করিতে পারিবে না। কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই সেই বিষয়ের চিন্তা করিবার ফল কি?

তোমার যদি কর্ম্ম ত্যাগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে তোমার মনে স্থির

-রা উচিত যে, কর্ম্মের বিষয় একবারও ভাবিবে না। তাহা হইলে তোমার কিরূপ অবস্থা হইবে? আমাদের মন জগতের ঘটনাবলীর সহিত এতই জড়িত যে, মনের নাশ বা অনন্ত সুষুপ্তি ব্যতীত যে কিরূপে মানবের কর্ম্মনাশ, তাহা একরূপ চিন্তার অতীত। আবার কর্ম্ম অর্থে কেবলই দুষ্কর্ম্ম বুঝায় না। দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম উভয়ই বুঝায়। তাহা হইলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে গেলে, উত্তম অধম সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি জগতে সকলেই কর্ম্ম ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে কি করিয়া জগৎ থাকে। স্বদেশ ও জগতের মঙ্গল ইচ্ছা ও উন্নত ভাব সকল কি এক কালে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। পরদুঃখ-নিবারণের নিঃস্বার্থ বিমল ইচ্ছা কি একেবারে বিনষ্ট হয় না? যদি তুমি কর্ম্মনাশ করিতে চাও তাহা হইলে, তুমি সজ্জনের নাশ করিয়া কতকগুলি আলস্যপূর্ণ ব্যক্তির সৃষ্টি করিবে না কি?

তার পর সকলেই কিছু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। জগতে কয়টি প্রাণী আছে, যাহারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত আলস্যে নিমগ্ন হইতে চাহে? তুমি যদি এই সকল লোককে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আলস্যে নিমগ্ন হইতে বল, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই কার্য্যহীন জড় পদার্থে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ কিন্তু কিছুই পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে না কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কথার অর্থ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, কর্ম্ম হইতে অনেক সময়ে বিরত থাকিলেও প্রকৃত কর্ম্মের ফল ফলে, আবার অনেক সময়ে প্রকৃত কর্ম্মেরও ফল ফলে না। যদি তুমি হত্যা কর তাহা হইলে, তুমি খুনের জন্য দায়ী, কিন্তু তোমার কর্ম্মে বিরত থাকা-সম্ভূত অযত্ন হইতে যদি তোমার বৃদ্ধ পিতা অনাহারে মরিয়া যায়, তাহা হইলে কি তুমি দায়ী নহ? পূর্ব্ব-মীমাংসাবাদীদিগের এই মত যে, তুমি যতই কোন দার্শনিক ভাবে কথা কহ না, কোন ক্রমেই তুমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কর্ম্মযোগীদিগের একটি বিষম ভ্রম আছে। তাহা এই—ইহাদের দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। তাহারা তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বীকার করে এবং বেদকে ঈশ্বর বা মহাবাক্য বলে। তাহাদের মতে বেদ যে বিষয়, কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, সে কথা তোমাদের অকর্ত্তব্য বিবেচনা করা বা যথার্থ ফলে সন্দিহান হওয়া অনুচিত। বেদ অভ্রান্ত স্বীকার করিয়া যদি

তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। দেবতারা তোমার সাহায্য করিবেন এবং তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সুখলাভ করিবে। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ড নষ্ট করা কোনরূপেই উচিত নহে।

এই কর্ম্মবাদীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন "তোমাদের একটি সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিতেছি কিন্তু আর একটি স্বীকার করিতে সম্মত নহি, অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলে নানাবিধ অনিষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু তোমাদের দেবপূজাকে আমি কোনরূপে বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারি না।"

এই দেবতারা কি এবং কে? উত্তর—তাঁহারা কারণ-জগতের জীব। তাঁহারা নিজেরাই অমর যখন নহেন, তখন তোমাকে কি করিয়া অমরত্ব দিতে সক্ষম? যদিও তাঁহাদের পূজা করিয়া তোমার স্বর্গলাভ হইল কিন্তু তাহা ক্ষণ-স্থায়ী। আবার অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে বাহ্য জগতের জীবনে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবেত স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নহে। এমন ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গসুখে প্রয়োজন কি? আর যদি একান্তই তুমি মনসংযোগ করিয়া দেবপূজা কর, তাহা হইলে তুমি তাহাদের ভাব প্রাপ্ত হইবে, আমার ভাব পাইবে না। এই সমস্ত তেত্রিশ কোটি দেবতা মন্বন্তরে উদ্ভূত হইয়া প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন যাহাতে সকল দিকে সুবিধা হয়। এই পথ অনুসরণ করিলে, চেষ্টা করিয়া অমরত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া আবার জন্মিতে হইবে না, বা কোন কারণজগতের আধ্যাত্মিক জীবের সহিত মিলিতও হইতে হইবে না। দেবতারাই যেখানে চিরস্থায়ী নহেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মিশিয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা দুরাশা মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে কোন বিঘ্নই নাই।

এখন তৃতীয় যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ কিরূপ বিবেচনা করা যাক্। শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা একটি অসম্ভব ও বিশেষ ক্ষতিজনক পথ। ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিলে ইহার সমস্ত সুবিধা-গুলিই পাওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ দর্শনের নাম জ্ঞানযোগ। লোকেরা যখন দেখিল যে, ক্রিয়াকলাপ

বাহ্যিক কর্ম্ম-ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞান ব্যতীত এই সমস্ত কর্ম্মের কোনই অর্থ নাই, তখন তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, পূর্ব্ব-মীমাংসাবাদীদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে কোন ফল নাই। জ্ঞান বা কর্ম্মে অন্তরঙ্গ মানসিক অবস্থাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং তাহাই মুক্তির সেতু।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,—এই মতবাদীরা যখন দেখিল, কর্ম্ম কেবল জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্যই প্রয়োজনীয়, তখন তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিবারণ করিয়া, নিজেরা মুক্তির কতকগুলি অন্য উপায় আবিষ্কার করিল। তাহাদের মত "কর্ম্ম- একরূপ শিক্ষা কর্ম্ম—একরূপ সংজ্ঞাস্বরূপ—প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি গভীর অর্থ আছে। ক্রিয়া সকল যথার্থ সত্তা, স্বভাবের রহস্য বা মানবের প্রজ্ঞান্বিত কোন গুণকে লক্ষ্য করে, নচেৎ কেবলই বাহ্যিক ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে।" বাস্তবিক বাহ্যতঃ তাহাদের যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ ব্যতীত ক্রিয়া সকল আর কিছুই নহে। কেবল কর্ম্মযোগের স্থলে তাহারা আরও কতকগুলি যোগের নির্দ্দেশ করিয়াছে, যেমন জপযোগ ইত্যাদি। যথার্থ বলিতে গেলে কর্ম্মযোগ যোগের মধ্যেই নহে। বাহ্যিক ক্রিয়া-সমূহকে মার্জ্জিত করিয়া তাহারা অন্তর্যোগ প্রাণাগ্নিহোত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যোগের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মতে কেবল জপ বা তপ আচরণ না করিয়া, তাহাদের জ্ঞানের অপর কোন লক্ষ্য থাকা উচিত। এই সমস্ত উপায় কেবল অন্তর্লক্ষ্যের জন্য উদ্ভাবিত, ইহাতে কোন পরিষ্কার পথ নির্দ্দিষ্টও নাই, বা ইহারা কোন বিশেষ ফলে লক্ষ্য রাখে না। যদি জ্ঞান উপার্জ্জনই তোমার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এমনও হইতে পারে—ঈশ্বর বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে তুমি অনেক দূরে পড়িয়া আছ। যথার্থ দেখিতে গেলে সমস্ত বিজ্ঞানবিৎ—যাঁহারা স্বভাবের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় আছেন—সকলেই এই জ্ঞানযোগের উপদেশ অনুসারে চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুসন্ধান কি কখন মানবকে অমরত্ব দিবে? কার্য্যটিই এত ফল প্রদান করিতে সক্ষম নহে। শ্রীকৃষ্ণের মতে এই মতের সুবিধা আছে। যদি অনুসন্ধিৎসা জগতের তত্ত্বসমূহ বাহির করিবার জন্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে। মানুষ—এই সমবেত চেষ্টা—যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তত্ত্ব-সমূহ নির্দ্দেশ করিবার জন্য লক্ষ্য করে, তাহা হইলে মানুষ যাহা চায়, মোক্ষ অর্থাৎ চরম সুখ, কালে

পাইলেও পাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য এই মতের অসুবিধা অস্বীকার করেন না—তবে যদি তাঁহার মতে কার্য্য হয়।

পঞ্চম দর্শন—এই মতবাদীরা সাংখ্য ও অন্যান্য মত পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, যদি মনের কার্য্য বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ কর্ম্মনাশ করা হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি মনকে তোমাতেই স্থির করিতে না পার অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার স্থির আত্মদৃষ্টি জন্মে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দমন বা কর্ম্ম ছাড়াইয়া উঠা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

তাহারা কতকগুলি নিয়ম বাহির করিয়াছে। তাহাদের মতে এই সকল নিয়মই মনকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত সাংখ্য, কি জ্ঞানযোগ কিছুই সম্ভব নহে। ইহারই নাম হঠযোগ—এই প্রক্রিয়াই মনকে দমন করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার অভ্যাস-যোগ আখ্যা দিয়াছেন। হঠ-যোগই হউক, বা রাজযোগের যে বিভাগ গুপ্ত নহে সেই রাজযোগই হউক মনকে দমন করাই সকলের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন যে, এইরূপে আত্ম দমন করা যায়। কিন্তু তিনি যাহাতে শীঘ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এরূপ সহজ উপায় বলিতে সক্ষম। তাঁহার মতে এই অভ্যাস-যোগ যে, কেবল মাত্র এই জন্মে উপকার করে তাহা নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে ও ভবিষ্যৎ জন্মেও ইহারা শক্তি বিস্তার করে। হঠযোগের পথে যে কত বাধা আছে, তাহা আমি এখানে বলিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে কি কষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ এই পাঁচটি দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া, ঈশ্বর-বাদ, মানবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক, ও বিশ্বের তত্ত্ব-সমূহ যোগ দিয়া মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ভাবে মত ব্যক্ত করেন নাই। পরের ছয় অধ্যায়ে তিনি নিজের মতই স্থাপন করিয়াছেন।

এই ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে-ই যথেষ্ট বলিয়াছি, এখন আর বিশেষ নূতন কিছু বলিবার নাই।

গীতায় উত্তরায়ণম্ ও দক্ষিণায়নম্ দুইটি—কথার অর্থ দিবা ও রাত্রি, আলো ও অন্ধকার। এই দুইটি প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ এই দুইটি পথকে লক্ষ্য করিতেছে। উত্তরায়নম্ নিবৃত্তিমার্গ, দিবা বা আলোকময় পথ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের

অনুমোদিত। অপরটি প্রবৃত্তিমার্গ, এই পথে যাইয়া জীব ক্রমাগত পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,দ্বিতীয় মার্গের পথিকেরা চান্দ্রমসম্ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু প্রথম মার্গের ব্যক্তিরা ব্রহ্মে পৌছায়। এই চান্দ্রমসম্ জ্যোতি দেবযান ব্যতীত আর কিছুই নহে। চন্দ্র নিজের আলোকে উজ্জ্বল নহেন, সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, সেইরূপ দেবযানে কারণ-শরীর ঈশ্বরের জ্যোতিতে আলোকিত থাকে। কারণ-শরীরের নিজের কোন জ্যোতি নাই। কারণ-শরীর দেবযান বা স্বর্গে যায়। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মানুষের আর এক দুর্ঘটনা হইতে পারে—তাহা আমি পূর্ব্বে বলি নাই, এই বিষয়টি অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন। অতি ভয়ঙ্কর অবস্থাতে কারণ-শরীরের ধ্বংস হয়। যেরূপ স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর মরিয়া যায়, সেইরূপ কারণ-শরীরের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সচরাচর এরূপ ঘটে না। সময়ে কারণ-শরীর কুকর্ম্মের ফলে এরূপ স্থূল হয় যে, আর ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিফলিত করিতে পারে না। অথবা কারণ-শরীরের, খাদ্য স্বরূপ মানবের সুকর্ম্মের ইচ্ছার ক্ষমতার যদি নাশ হয়, তাহা হইলে ঐ কারণশরীরের ধ্বংস ঘটিয়া থাকে। স্থূল শরীর মরিলে যেরূপ পচিয়া যায়, কারণ-শরীর সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়।

কারণ-শরীরের ধ্বংস হইলে আর জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাই মানবের চরম অবনতি। ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর অবস্থা কল্পনার অতীত।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই চারিটি প্রবন্ধ গীতা-পাঠের ভূমিকা মাত্র। নানাবিধ টীকা না দেখিয়া মনোবিজ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, আমার মত যদি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, ইহাই গীতার যথার্থ মত, অনেক টীকা না দেখিয়া নিজের মনে যদি ভাবিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে কি ঠিক। অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিছু হয় না, বা অনেক বক্তৃতা শুনিয়াও কিছুই সুবিধা হয় না। মনের স্থিরতা ও চিন্তায় অনেক অধিক ফল পাওয়া যায়। প্রবন্ধ সকল ভাল করিয়া চিন্তা না করিলে, কোন ফলই দেয় না। পাঠ কর, চিন্তা কর, তোমার জ্ঞানে দেশের ও জগতের

মঙ্গল কর, নচেৎ সাংখ্যবাদীদিগের ন্যায় জড়ভাবে বসিয়া থাকায় কোনই ফল নাই। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের অমূল্য মত সকল এখন কুসংস্কারে পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ঞানই আমরা হারাইয়াছি। পূর্ব্বে যে জীবন্ত ধর্ম্ম ছিল, এখন তাহার চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের গম্ভীর দর্শন এখন ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছে। অনেক অদ্বৈতবাদীর মত, ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধদিগের ন্যায়, নির্ব্বাণকে সাংখ্য দর্শনের প্রতিশ্রুত নির্ব্বাণ মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের দর্শন নিয়মিত রূপে না মানিয়া সকল মতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া পঞ্চায়তন পূজা প্রভৃতি কতকগুলি অমূলক সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মঠপূজায় নামিয়া আসিয়াছে ও ক্রমে মানবের মন হইতে অপসৃত হইতেছে। মাধ্ব-দর্শন গোঁড়ামিতে পরিণত হইয়াছে। উত্তর ভারতে সপ্তশতী-পাঠ ও শক্তি-পূজার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের সমস্ত নগরের মধ্যে কলিকাতায় কালীপূজার আয়োজন অধিক। শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত যথার্থ মতের সহিত এই সমস্ত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমরা কতকগুলি ভ্রম ও কুসংস্কারে পড়িয়া যথার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের রাজনৈতিক অবনতি অপেক্ষা এই সমস্তই আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ।

এখন প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বধর্ম্মের সমাদর করিয়া ও সার সঙ্কলন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করা,—সর্ব্ব ধর্ম্মের অন্তস্থিত ভিত্তি স্বরূপ পূর্ব্বতন সনাতন ধর্ম্মের বিস্তার করিয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ স্বদেশবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়া। যদি সকলে মিলিয়া ঐরূপ চেষ্টা করা যায় তবে, সময়ে লুপ্ত, পুরাতন, পবিত্র ধর্ম্ম আবার ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারে।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখনও সপ্তম অবস্থার বিষয় প্রাচ্য বিজ্ঞান-জগতের জ্ঞানচক্ষুর বিষয়ীভূত হয় নাই। কিন্তু, কে বলিতে পারে, দুই এক বৎসর মধ্যে এ বিষয়েও তাঁহাদিগের নয়ন আকর্ষিত হইবে না।

এইবার আমরা পাশ্চাত্য অণু পরমাণু এবং জগৎ গঠন-সিদ্ধান্তের সহিত আর্য্য ঋষিদিগের ঐ বিষয়ক মতের তুলনা করিব এবং দেখাইব "থিওসফি" কেমন পূর্ব্ব ঋষিদিগেরই মত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পরিচ্ছদে আবরিত করিয়া আমাদিগের চিত্তাকর্ষক করিয়াছে।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অতিশয় বিচিত্রতাময়; যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, অনন্ত পদার্থ শ্রেণী আমাদিগের নয়ন-সমীপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু শতাব্দীর রাসায়নিক পরীক্ষা ও বহুপ্রকার অন্বাক্ষার পরে জগতে প্রচার করিলেন যে, এতপ্রকার যে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা ৬৭টি মূলভূতের (Elements) পরিবৃত্তি ও সংহতিতে (Permutation and Combination সৃষ্ট হইয়াছে; যেমন ৩৫টী অক্ষরের সঙ্কলনে বিশ্বকোষেয় যাবতীয় শব্দ ও আমাদিগের বেদ পুরাণাদি যাবতীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ এই ৬৫ মৌলিক পদার্থে এই অনন্ত বিচিত্রতাময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক পদার্থকে বিভিন্ন করিতে করিতে অবশেষে অচ্ছেদ্য মৌলিক অণুতে পরিণত হওয়া যায়। তাঁহারা সেই অণুর Atom (A+tom)—যাহাকে আর ছেদ করা যায় না—অচ্ছেদ্য অণু—এই নামকরণ করিয়াছেন।—তাঁহাদিগের মতে অম্লজান বা উদকজানকে বিভিন্ন করিতে করিতে চরম অবস্থায় উপনীত হইলে অম্লজান বা উদকজান অণুতে পরিণত হয়। কিন্তু এই মতের সহিত আমাদিগের ঋষি-প্রচারিত মতের ঐক্য নাই। সমস্ত পদার্থই এক প্রকৃতি হইতে হইয়াছে। সেই প্রকৃতি আবার "অমূলং মূলং" তাহার আর আদিতে কিছুই নাই, এবং তাহাই পদার্থের চরম পরিণাম।—

সাংখ্যকার বলিয়াছেন সবই সেই এক গুণময়ী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।—

তাঁহার গুপ্তবিদ্যা নামক গ্রন্থে মহামতি ব্লাভাটস্কী লিখিয়াছেন—চরমে এক পদার্থে—সবই বস্তু পরিণত হয় এবং সেই একের বিভিন্ন সংযোগে বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। "There is one fundamental element. That one undergoes dissociations and agglomerations forming different objects" কিন্তু কেহই সে সময় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই বরঞ্চ তাহা উপহাস করিয়াছেন।—

অবশেষে সপ্তদশ, অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে—বিজ্ঞানাচার্য্য ক্রুক্স্ সাহেব পরমাণু-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, "প্রোটাইল" নামক পদার্থ হইতে এই জাগতিক সর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।— All things came out of one substance called "Protyle".—Crook's Lecture on the Genesis of the Elements প্রথমে ইহা একটা Hypotheisis বলিয়া বিবেচিত হইত।

এক্ষণে এই অভ্যুপগমিক সত্য একটী নিশ্চয় সত্য বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের বিশ্বাস।—

বর্ত্তমান বৎসরে কোন এক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন "ক্রুক্স্ সাহেবের রসায়ন মতে সমস্ত পদার্থের স্বরূপতঃ পরস্পরের কিছুই প্রভেদ নাই, এবং সমস্তই সেই এক প্রোটাইলের বিভিন্ন পরিণাম মাত্র।

জ্ঞানী টেম্প্লার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ আচার্য্য কেলভিনের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং সমস্ত ভৌতিক পদার্থ যে ইথরের ঘূর্ণায়মান স্পন্দন-সম্ভূত এই কথা বিশ্বাস করেন।" According to the adopted theory first clearly formulated by Lord Kelvin all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word 'Either' * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses ; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible—Nikola Tesla.

গীতায় ভগবৎ বাক্যেও ঐ ধ্বনি শুনিতে পাই :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত" ২য়—২৮

আচার্য্য ফ্যারেডে সাহেব কোন মৌলিক ধাতুর অপর ধাতুতে পরিণাম সম্ভব, এই কথা বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে মানব এক ধাতুকে অপর ধাতুতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে এবং তখন আর Alchemy, পণ্ডিত সম্প্রদায়ে উপহসিত হইবে না।—"It will be possible to transmute one substance into another and Alehemy will be proved to be true"

ব্ল্যাভাটস্কীও লিখিয়া গিয়াছেন যে, গুপ্তবিদ্যা মতে এক ধাতু হইতে অন্য ধাতু পরিণত হইতে পারে; এবং বর্ত্তমান রসায়ন ভবিষ্যজগতে আলকেমি (Alchemy) রূপ প্রকাশিত হইবে।

"Occultists claim that one element can be changed into another and Chemistry will reappear as need Alchemy."

ঋষি দুহিতার এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে এবং ধাতু-তত্ত্ববিৎ আচর্য্য ইমেন্‌স্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ৩ আউন্‌স্ রৌপ্যকে ৪ আউন্‌স সুবর্ণে পরিণত করিয়া বৈজ্ঞানিক আমেরিকাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। বিদুষী করি (Mdme Currie) এবং তাঁহার পতি, এই ফরাসিস্ দম্পতি 'রেডিয়াম' নামক এক অপূর্ব্ব মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার এক অত্যাশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহার এক কণা হইতে এক অবর্ণনীয় উজ্জ্বল পদার্থ, তুবড়ি হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইতে থাকে। এবং আচার্য্য Ramsay (র‍্যামসে) ওই সব স্ফুলিঙ্গকে কাচ নির্ম্মিত আধারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বর্ণমান-যন্ত্র সাহায্যে (spectroscope) দেখিয়াছেন যে, তাহা হিলিয়ন (Hilion) নামক আর এক প্রকার মৌলিক ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। অতএব আমরা এইরূপে দেখিতেছি, ঋষিদিগের যোগলব্ধ প্রাচীন শিক্ষা এক্ষণে বিজ্ঞান আবার জগতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেমন একই মৃত্তিকা ইষ্টকে পরিণত হইয়া, দেবতা, মন্দির ও মানবের বিলাস-আশ্রম নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ একই প্রকৃতি হইতে নানারূপ পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পদার্থের এইরূপ অনন্ত পরিণাম,

এই তত্ত্বের উপর যোগ বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক প্রবর Sir William Lodge "Romanes" বক্তৃতায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন "An atom is an atom no longer. Not single indivisible unit but a congeries of moving and warring bodies."

(পরমাণু অধুনা আর পরম অণু বলিয়া পরিচিত হয় না; ইহারও আবার অনন্ত বিভাগ হইতে পারে এবং প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর বিরোধি, সূক্ষ্মতর, পরম অণুর যোগে নির্ম্মিত।)

একটী জলজান অণু সাত শত বৈদ্যুতিক সূক্ষ্মতর অণুদ্বারা সৃষ্ট এবং এই সমস্ত সূক্ষ্মাণু সৌর লোকস্থ গ্রহগণ যেরূপ এক কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গ্রহ পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে; সেইরূপ এক একটী পরিভ্রমণ সমষ্টিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরমাণু বলে। আচার্য্য জে জে টমসন্ বলিয়াছেন একটী পরমাণু অনেক বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে তিনি corpuscels নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন একটী জলজান অণুতে সহস্র করপাসলস্ আছে।

"An atom of a gas is composed of smaller bodies which he called corpuscels; one atom of Hydrogen consists of 1000 corpuscels."

বৈজ্ঞানিকেরা এইখানেই নিবৃত্ত হয়েন নাই। কিলি সাহেব, (Profesor Keley) ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে একটী পরমাণুকে বৈদ্যুতিকাণুতে (electrons) বিভাগ করিলে যে শক্তির আবির্ভাব হয় তাহা প্রভূত। কোনও পদার্থের ১ গ্রেণ লইয়া তাহার অণুগুলিকে বৈদ্যুতিকাণুতে বিভাগ করিলে যে শক্তির সমাবেশ হয় তাহা ১৪৩,৩৬০,০০,০০,০০০ গ্রেণ বারুদে অগ্নি সংযোগে যে কর্ম্ম করিতে পারে, তাহাতে সক্ষম হয়। আর্য্য ঋষিরা অস্ত্রবিদ্যার এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, কৌশলে উহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলে ১০০০০ মানব ও হস্তীকে নিমেষের মধ্যে কোনও আয়াস ব্যতিরেকে ইহা ধ্বংস করিতে পারে। এই শক্তিই আটলান্টিয়ন্স্‌দিগের (দানব জাতির) প্রসিদ্ধ "মসমক্" অস্ত্র ও Bulwer Lytton সাহেবের Coming Race গ্রন্থের প্রসিদ্ধ ভ্রিল্।

ঋষিদুহিতা প্রাচ্য জগতে এই তত্ত্ব যখন প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন,

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার বাক্যের সমর্থন করা দূরে থাকুক তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং পরীর গল্প বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি ইহাতে দুঃখিত বা ভগ্নমনোরথ হয়েন নাই; তিনি যোগবলে বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও মানব এখন তাঁহার প্রদত্ত সত্য ও তত্ত্ব কথা গ্রাহ্য করিতেছে না, বিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে ওই সকল কথা আদৃত হইতে থাকিবে, এবং তখন বৈজ্ঞানিকেরা গুপ্ত-বিদ্যা-গ্রন্থের বিষয়ীভূত আলোচনা, সত্যের সার-সংগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে। তিনি ওই গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিয়াছিলেন,

"Out of the many truths revealed orally to man in the beginning, preserved and perpetuated in the Adyta of the temples through initiation, during the Mysteries, and by personal transmission, they selected one or more of such grand verities —actualities visible only to the eye of the real sage and seer, and revealed them to the masses·········The rejection of these teachings may be expected and must be expected beforehand They will be derided and rejected "a priori" in this century (19 th) but only this one. For in the twentieth century of our era scholars will begin to recognise that the S. D. has neither been invented nor exaggerated but, on the contrary, simply outlined; and finally that its teachings antedate the Vedas."

তিনি বলিয়াছেন যে, "যে সমস্ত তত্ত্ব কথা ঋষিদিগের শিষ্য-পরম্পরায় জগতে প্রচারিত হইয়াছে, অথবা তিনি মহর্ষিদিগের অনুগ্রহে যাহা তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি গুপ্ত তত্ত্ববিদ্যা-(Secret Doctrine) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু তাহা পঠন মাত্রেই ১৯ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা উপহাস করিবেন; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মানবের মত পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহার একটী বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে এবং প্রতি কথার ভিত্তি সত্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত।"

এইরূপ কেবলি যে পদার্থ-বিজ্ঞান আর্য্য ঋষিদিগের, এবং তাঁহাদিগের প্রিয় শিষ্য ব্লাভাটস্কীর মত সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমত নহে। প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞানও তাঁহাদিগের অনেক কথা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাতঞ্জলের দিব্য দৃষ্টি, আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞানে clairvoyance বা Internal autoscopy, নামে আবির্ভূত হইয়াছে। চিকিৎসাচার্য্য কোমর এবং সলিয়র বিবিধ রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিতে করিতে মানবের সাধারণ দৃষ্টি হইতে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দর্শন ক্ষমতার আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে Second sight বা দ্বিতীয় দৃষ্টি—এই বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, নিরক্ষর স্ত্রীলোক তাঁহার সহজ ভাষায়, (কারণ বিজ্ঞানের ভাষা সে কখনও শিক্ষা করে নাই) কিরূপে দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চলন—এই তত্ত্ব অতি আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহারা একটী স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই স্ত্রীলোক Apendisitis রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং এই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে আভ্যন্তরিক রোগাবস্থা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার দিব্য দৃষ্টি-প্রভাবে জানিতে পারিয়া অবশেষে সে বলে যে এক খণ্ড চ্যুত অস্থি তাহার সমস্ত রোগের মূলীভূত কারণ। তাহার পর অস্ত্রের সাহায্যে সেই অস্থিখণ্ড বাহির হইলে, দেখা গেল যে, তাহার আকার, বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তাহার বর্ণনানুযায়ী।

ভারতবর্ষে ইহা চিরকাল হইতে প্রচার হইয়া আসিতেছে যে, একের চিন্তা-স্রোত অপরের মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে সভ্য ইউরোপ খণ্ডে ইহা হাস্যাস্পদ ছিল, কিন্তু অধুনা এমন কি ইংলণ্ডের Royal Society এই তত্ত্বের আলোচনায় যত্নবান্ হইয়াছেন।

বহু পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিরা ত্রিলোক এবং মানবের তিন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যখন যোগালোকে উদ্ভাসিত হেলেনা জগতে ওই সব বিষয় প্রচার করিলেন তখন তিনি বিদ্বান মণ্ডলীর কাহার না নিকট হইতে স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষভাবে উপহাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহাদিগের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং অনেক গবেষণার পর Myers তাঁহার Human

Personality, মানবের জীবত্ব নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মানুষ অবস্থাভেদে ভাবত্রয় লইয়া প্রকাশ হইতে পারে—তাহা স্থূলবিষয়ক চৈতন্য (physical), সূক্ষ্মবিষয়ক চৈতন্য, (ethereal) এবং আধ্যাত্মিক প্রকাশ (spiritual).

Man lives in three environments—physical, etherial and not etherial, which is called in religion the spiritual world.

এইরূপে প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও প্রতীচ্য দর্শন যতই উন্নত হইতেছে, –যতই তাহারা সীমাবদ্ধ কতগুলি সত্যের অংশে সম্পূর্ণ মনোনিবিষ্ট না হইয়া, সত্যের সম্পূর্ণতাকে পাইতে আকুলিত হইয়া, পর্ব্বত-নির্গতা স্রোতস্বিনীর মত সবেগে কূল ছাপাইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, ততই তাহাদিগের হৃদয়ে ঋষিদিগের অনন্ত জ্ঞান-সূর্য্যের রশ্মি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইতেছে। ঋষিদুহিতা মহামতি ব্ল্যাভাটস্কী যে অলৌকিক পুস্তক তাঁহার যোগবলে ও ঋষি অনুগ্রহে জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাই তাহার আলোচিত তত্ত্বগুলি মানবের বুদ্ধির অগম্য বলিয়া উপহাস্য হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা তাহার কতক অংশ মানবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগকে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে,—প্রথম উপায়, তাঁহাদিগের পূজা ও যজ্ঞ ও বেদোক্ত অপর বিধি, দ্বিতীয় উপায় তপস্যা। পূর্ব্বে তাপসেরা তপস্যার দ্বারা দেহকে নানা উপায়ে নিয়মিত ও প্রপীড়িত করিয়া, তাহা হইতে এক শক্তির আবির্ভাব করিতেন এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই নবজাত শক্তিকে আপনাদিগের কার্য্য সাধনে দেবোদ্দেশে প্রেরণ করিতেন। এই উপায়ে তাঁহারা আশানুযায়ী ফল পাইতেন। ইহার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। অধুনা প্রাচ্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণেরও চেষ্টা অপর প্রকার জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা। এই বিজ্ঞান-চর্চ্চারূপ তপস্যাদ্বারা তাঁহারা সুতীব্র চেষ্টায়, মহান্ ধৈর্য্যে, অবিচলিত অধ্যবসায়ের সাহায্যে দেবতাদিগের গুপ্ত নিয়ম ও আচরণ জগতের মঙ্গলের তরে প্রকাশ করিতেছেন। এক্ষণে এই যুগের ধর্ম্ম অনুরূপ এবং তাঁহারা এই যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী বিধিতে সেই এক সত্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এইটী বুঝিতে পারিলে, তবে আমরা এই মহান শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে, "ভগবান

এক তাঁহার শক্তি এবং সেই এক শক্তি অনন্ত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক জ্ঞান, ভাগীরথীর মত শতধারা হইয়াছে এবং মানব ইহার যেটীকেই আশ্রয় করুন না, সেই এক সর্ব্বজ্ঞানের আধার সচ্চিদানন্দময় ভগবান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকিবেন।

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

কি ধর্ম্মবিদ্ মণ্ডলী, কি মনীষী মণ্ডলী, কি রাজনীতিজ্ঞ বা সমাজ নীতিজ্ঞ মণ্ডলী, যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই এক ঘোর অশান্তি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। প্রায় সকল বিভাগের লোকই বিচলিত মনে পুরাতন প্রথায়, শাস্ত্র বা ঋষিবাক্যে অনাদর ও অবিশ্বাস করত, উপস্থিত নানা সমস্যার মীমাংসার, নানা সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ব্যস্ত। সদাই তাহারা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের ক্ষীণ ও ক্ষণিক উত্তর প্রাপ্তে তাহাদিগকে সত্য বোধে গ্রহণ করিতেছে এবং ক্ষণপরেই তাহাতে অতৃপ্ত হওয়ত সেই গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা স্থায়ী ও অন্তঃস্পর্শী উত্তর লাভের আশায় সহস্রদিকে ধাবিত হইতেছে। এইরূপে অশান্তি আপাততঃ সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভূত। নির্ম্মল জ্ঞানলাভে অতৃপ্তকাম হইয়া হতাশ হওনানন্তর অনেকে ঘোর অবিশ্বাসীরূপে পরিণত হইয়াছেন। চির সত্যে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা হইতে এভাব উৎপন্ন হয় নাই। মূলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এই প্রকার সন্দেহ-পূর্ণ হইয়া জীব সমগ্র জগৎ কেবলমাত্র ক্লেশের আগার এবং জীবন অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মজগতে এবং মনোজগতে অশান্তির উদয়, সাধারণ সমাজে ও রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে অশান্তি প্রসারের প্রধান কারণ হইয়াছে। বিশুদ্ধ চিন্তা ও প্রতিভার উদয়ে চিত্তপ্রসাদ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই শান্তিলাভে

সক্ষম হইবে না। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান, পরাবিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা অলীক ও সাধ্যাতীত এমত নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা সুসাধ্য ও যথার্থ। চৈতন্যের অন্তরতম কেন্দ্র ভিন্ন সত্য কোথায় পাইবে? সেই হিরণ্ময় কোষের অভ্যন্তরে পরম সত্য নিহিত—সেই স্থানেই অনন্ত বিরাজিত। অনন্তে সমাপন্ন জীবেরই সেই পরমপদলাভ হইয়া থাকে—তাঁহারই পক্ষে শান্তি সুলভ।

যতকাল জীব তাহার প্রশ্নের উত্তর বহির্জগতে অনুসন্ধান করিবে, ততকাল তাঁহার ত্রিতাপের কিছুতেই উপশম হইবে না; কারণ প্রকৃতির স্বভাবই সদা পরিবর্ত্তনশীল, সদাই অস্থায়ী; বহির্জগতে একরূপ উত্তর আদরে গৃহীত হইয়া ক্ষণপরেই তাহা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হয় এবং তৎ পরিবর্ত্তে অপর একটী গৃহীত হইয়া থাকে। চরম কিছুই বাহিরে মিলিবে না--সেখানে সকল অনিশ্চিত। অন্তরস্থ গূঢ়স্থান হইতে জাত শান্তি ক্রমশঃ বাহিরে সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে প্রসৃত হইয়া সকলই শান্তিময় করিয়া থাকে। যথা হইতে অনাহতধ্বনি নিঃসৃত হয়, সেই স্থানেই শান্তির কেন্দ্র স্বরূপ। "শব্দো ব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতো যত্র দৃশ্যতে। অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং"। "তন্মধ্যে অযুতসূর্য্যসমপ্রভ শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গমস্তি।" অশব্দের শব্দমধ্য হইতেই প্রভূত শক্তিসমন্বিত ঐন্দ্রজালিক সেই ধ্বনি উত্থিত হয়,—"শান্তিঃ শান্তিঃ",—যাহা বহিস্তরঙ্গ সমুদায়ের নিশ্চলতা সম্পাদনে সক্ষম।

যে সন্দেহ সমূহ জীবের মনোমধ্যে উদিত হইয়া নানাবিধ প্রশ্নাকারে পরিণত হয়, তন্মধ্যে নিম্ন কয়েকটী প্রবল ও সকলের মনে দৃঢ়সংলগ্ন:— "আমি কি অনশ্বর বা অমর পুরুষ?" "এই দেহান্তে কি আমি নিত্যস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিব?" "আমরা যাহাকে জীবনের আরম্ভ ও শেষ বলিয়া দেখিতেছি, ইহাই কি জীবনের যথার্থ আদি ও অন্ত?' 'কোথাও কি নিশ্চয়তা বা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি হইতে পারে?" "জীবের আত্মা কি তাহার শাশ্বতীসমা প্রকৃতি বশত স্বভাবতই নিত্য?' 'আমরা কি অন্তে নিত্যানন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হইব?' জীবমাত্রেই প্রাণকে মহার্ঘ নিধিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে—লোক-প্রসিদ্ধ এই সকল বাক্যই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে, "সততং আত্মানং রক্ষেৎ"। অতি ভীরু জীবও স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং বিপদ হইতে দূরে থাকিতে যত্নবান হয়—যাহাতে প্রাণের

কোন আশঙ্কা নাই এরূপ পথেই মন প্রধানত ধাবিত হয়। নিম্ন জান্তব প্রভৃতি রাজ্যে এই আত্মরক্ষা চেষ্টা ক্রমে একটী সহজ জ্ঞানে (Instinct) পরিণত হয়; এবং মানবরাজ্যে ঐ আত্মরক্ষার যত্ন, স্থিরচিন্তা ও বিচার প্রসূত হইয়া থাকে। মৃত্যুভয় স্বভাবসিদ্ধ হইয়া থাকে ও সম্যক্‌নাশ বা ধ্বংসের চিন্তন হইতে মন স্বতই পরাঙ্মুখ হয়। দারুণ রোগ ও শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কখন কখন কোন কোন ব্যক্তিকে সম্যক্‌নাশে বিশ্বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা অসহ্য যন্ত্রণাজনিত ক্লিষ্ট মনের ক্ষণিক-ভাবমাত্র। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে, দর্শনশাস্ত্রে প্রকাশিত চির-জীবনের অসম ইচ্ছার সহিত তুলনায় ঐ প্রকার বিনাশেচ্ছা বা বিনাশে বিশ্বাস অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার, প্রকৃত পক্ষে ঐ ইচ্ছা জীবনে গতস্পৃহা নহে, কিন্তু জীবনের কতকগুলি অবস্থায় নিতান্ত ঘৃণা মাত্র—সেই সেই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবারই ইচ্ছা। এবং স্পৃহনীয় উজ্জ্বল জীবনলাভে হতাশ হইতেও ঐপ্রকার বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র স্বাভাবিক চক্ষুষ্মান্ জীবগণের মধ্যে যেমন দুই চারিটী মাত্র অন্ধ দেখা যায়—সুপরিবর্দ্ধিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বহুসংখ্যক মানবগণের মধ্যে ঘোরতর অবিশ্বাস বা নাস্তিকতারূপ ব্যাধি যেমন কদাচ দুই চারিটী মাত্র দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চির-জীবনে বিশ্বাসী কোটি কোটি লোকের মধ্যে তাহাতে অবিশ্বাসী লোকসংখ্যা অতি সামান্য মাত্র, অতি বিরলই দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্ন জান্তব প্রভৃতি রাজ্যে তাহা নাই। অত্যুন্নত মানবের মধ্যে, মহাপুরুষগণের ভিতর, তাহা কদাচ লক্ষিত হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সামান্য মাত্র উক্ত প্রকার অস্বাভাবিক উদাহরণ পরিত্যাগ করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বিনাশের আতঙ্ক সাধারণ মানবকুলের অন্তরে গভীর নিহিত; আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণের বিস্তৃতি ও বর্দ্ধনের নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র—প্রাণশক্তির প্রসারণে সকলেই আনন্দিত; প্রাণের ক্রিয়ায় পরিসমাপ্তির জন্য ক্লান্ত হইয়া কেহ বিনাশেচ্ছা প্রকাশ করেনা, বস্তুতঃ প্রাণের ক্রিয়া সম্যক না হওয়াতেই হতাশ হইয়া লোক বিনাশের প্রার্থনা করে। অতি জঘন্য বৃত্তি সমূহের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন. সুরা সেবন ও বেশ্যা-গমনের প্রথমাবস্থায় সমধিক স্ফূর্তি ও উল্লাস অনুভূত হয় বলিয়া লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রাণের সংবর্দ্ধনা উপলব্ধি করে, বলিয়া প্রথমাবস্থায় সেই

উল্লাস ও উৎফুল্লতা সুরাপানে ও বেশ্যাগমনে উত্তরোত্তর সমধিক আকৃষ্ট করে। "To be more alive is man's constant craving—to realise that he lives."

কোন এক যশস্বী ও উন্নতমনা অথচ এখনও সংসারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ ব্যক্তিকে যখন হৃদয়ভেদী কোন যন্ত্রণার তীক্ষ্ণধারাগ্রভাগ স্পর্শ করে, তখনই জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে তৎসম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। জীবাত্মার বিকাশের জন্য সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রয়োজন, সুখের আশা এবং সুখ সম্ভোগেচ্ছা জীবকে কার্য্যে রত করে, এবং দুঃখ অনাত্মার পরিণামিত্ব সুতরাং অস্থায়িত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে। রোগ-শোকে পীড়িত ব্যক্তিই সাধারণত আত্মানুসন্ধান-তৎপর হইয়া নিজের ভিতরে প্রবেশ করেন। যদ্দারা জীবন পরিশোধিত ও দীপ্তিমান হয় তাহা অপসৃত হইয়া জীবনকে ঘোর তমাবৃত করিলে, এবং যখন দুঃখ ও হতাশ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন পরিবর্ত্তন, পরিণাম হইতে সুদূরে—পরিণামের অপরপারে—অন্য এক অবস্থা বর্ত্তমান, ইহা মনোমধ্যে উদিত হয়—যে অবস্থায় পূর্ণানন্দ বিরাজিত। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে দুঃখ ও ক্লেশের মধ্যেই জ্ঞান ব্যবস্থিত। বৈরাগ্য, বীতরাগ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব রূপ, ক্ষণস্থায়ী নামরূপের উপর্য্যুপরি নাশ বা রূপান্তর হইতে এই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই জীব অক্ষয় বস্তুর অনুসন্ধানে তৎপর হয়—নাম রূপের পরিবর্ত্তে প্রাণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পরিণাম বা বিকার প্রাপ্তি জনিত উৎকট ক্লেশ, এবং নামরূপের ক্ষয়ভাব ও বিনশ্বরতা হইতে ক্রমে লোকের মনে মনে তর্ক উপস্থিত হয়,—"আমি ও আমার প্রিয়জনের জীবন কি অক্ষয়? যাহা হইতে সকল প্রাণ নিঃসৃত হইয়া আসিতেছে, সেই বৃহৎ প্রাণই বা কিরূপ?" দেশ, কাল পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহার বাহিরে মানব অনন্তের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আমরা চাহিতেছি যাহা কালের বাহিরে অবস্থিত—যাহা সদাই সমভাবে বর্ত্তমান। আমরা অনুসন্ততির অনুসন্ধানে তৎপর নহি, কিন্তু সেই নিত্য, শাশ্বত, অপরিণামী ও অপ্রতিসংক্রমী বিশুদ্ধ অবস্থার অন্বেষণ করিতেছি—যাহা জীবের পরমধাম।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে দেখিতে হইলে এই সকল প্রশ্নের অসংখ্য ও বহুরূপ উত্তর পাইব, কিন্তু সেই উত্তর সকলকে দুই প্রধান শ্রেণীভুক্ত

করিতে পারা যায়। (১)—যেখানে উত্তরগুলি একটী চরম একত্বে অবস্থিত। (২) যেখানে উত্তরগুলি একটী চরম দ্বন্দ্বে অবস্থিত।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহাদের এক বিভাগের অন্যতরটীর মধ্যে পড়িবে—যদিও অদ্বৈত ও দ্বৈতমত উভয়ের মধ্যেই বহুশাখা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের দ্বৈতবাদী মধ্যে নানা প্রকার বিচার চলিতেছে।

আমরা 'ব্রহ্মকে' লক্ষ্য করিয়াই 'অদ্বৈত' বা 'এক' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং তাঁহাতেই সকল বিকাশের মূলকারণ অবলোকন করি। প্রথমতঃ এই শ্রেণীমধ্যে দেখিতে পাই কতিপয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় (আরম্ভবাদী) ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিশ্বকে দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন তাহারই সৃষ্টি বিবেচনা করেন। হিব্রু, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম মধ্যে দুইটী বিভাগ লক্ষিত হয়—একটী গুপ্ত ও অপরটী বাহ্য। কারীকর ও তাহার কার্য্য যেরূপ ভিন্ন, বাহ্যবিভাগে ঈশ্বরকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে সেইরূপ ভিন্ন বলিয়া ধারণা আছে। সাধারণ লোকের যেরূপ ঈশ্বরকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান, গুপ্ত-বিভাগের লোক সে পরিমাণে ঈশ্বরকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র অনুমান করে না কিন্তু আধুনিক মনীষীগণের মধ্যে অনেকে--বিশেষতঃ পাশ্চাত্য অঞ্চলে—সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টি এই আরম্ভবাদ হইতে উপজাত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কিছুকাল স্থির ছিলেন—জগৎস্রষ্টার জ্ঞান ও প্রেমেই মৃত্যু, দুঃখ ও অনিষ্টপাতের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে. এই বিশ্বাসে তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কহেন,—আমাদের পক্ষে তাহার কারণ নিরূপণ করা অসাধ্য, কিন্তু কোন একদিন সেই ব্রহ্মেই সেই সকলের মীমাংসা প্রাপ্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ব্রহ্মবিদ্যা ও ইহার উদ্দেশ্য।

যে বিদ্যা বা জ্ঞান আপনাকে বা অন্য কিছু না দেখাইয়া, যাবতীয় দৃষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান। চৈতন্যের দুইটিভাব—বিদ্যা ও অবিদ্যা। একত্ব-নির্দ্দেশক ভাবই বিদ্যাভাব ও অসীম পৃথক পৃথক বস্তু বা বহুত্ব-প্রদর্শক ভাবই অবিদ্যাভাব। এই দুই ভাব সর্ব্বঘটে সর্ব্বদাই ওতপ্রোত ভাবে ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু উভয়ই একত্ব-প্রতিপাদক; অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় ভাব দ্বারা এক ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। এই বহুত্ব বা অবিদ্যা দ্বারা একত্বের প্রতিষ্ঠা করাই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অবিদ্যার খেলাই—ভেদ দর্শান বা ভেদ করণ; সুতরাং "আমি" ও "আমা হইতে পৃথক অন্য" অথবা "আমি, তুমি ও অন্যান্য জীব বা পদার্থ" এইরূপ ভেদ জ্ঞান অবিদ্যা হইতেই উদ্ভূত। এখন দেখিতে হইবে এই ভেদ জ্ঞানের তাৎপর্য্য কি? এই ভেদ জ্ঞান না থাকিলে সকলের "আমিত্ব" স্থাপিত হইত না, এবং "আমিত্ব" স্থাপিত না হইলে "একত্ব" ও প্রতিষ্ঠিত হইত না; কেননা "আমি"র "আমিত্ব" বা "একত্ব" অর্থাৎ "আমি যে একটি" এই যে বিশিষ্ট জ্ঞান স্থাপিত না হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব বা পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ "আমিত্ব" বা "আমি যে একটি" এই বিশিষ্ট জ্ঞানও স্থাপিত হইত না; সুতরাং সমস্ত "আমি"ই যে "এক আমি" তাহাও প্রমাণীকৃত হইত না। এই স্থলে উদাহরণ দ্বারা এই জটিল ব্যাপার একটু সরল করা প্রয়োজন। প্রথম "আমার" "আমিত্ব" ধরা যাউক। "আমি" অর্থ কি? "যাহা আমি নাই" এইরূপ অন্য পদার্থ হইতে সম্যক্ পৃথক এবং সসীম ও বিশিষ্ট পদার্থই "আমি"; অথবা "আমি"—একটি বিশেষত্ব প্রতিপাদক পদার্থ; সেই বিশেষত্ব অন্য পদার্থ হইতে "আমার" "আমি" কে সম্যক্রূপে বিশিষ্ট ও পৃথক্ করিয়াছে; এবং এই বিশেষত্ব, রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি মানবে নাই, পশ্বাদিতে নাই, অন্য জীবে, উদ্ভিদে, ধাতব পদার্থে, কিম্বা চরাচরে কোনও পদার্থেই নাই। এইরূপে রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি প্রত্যেক মানবের এমন কি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের পৃথক্ পৃথক্

"আমিত্ব" স্থিরীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যেক জীবের মধ্যে "আমি" রূপ একটি স্থৈর্য্যভাব সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হয়। এই স্থৈর্য্যভাব হইতে "আমি" কি ও "যাহা আমি নাই" তাহাই বা কি এবং এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, ইহা জানিবার জন্য মানব-হৃদয়ে এক প্রবল ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। এই ইচ্ছা-প্রবণতা মানবকে অনুসন্ধিৎসু করে, ও ক্রমে সে নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারে যে, সকলের মধ্যেই "আমি" রূপ এক মহাভাব নিহিত রহিয়াছে;—সকলেই এক একটি "আমি"। এই মহাভাবটি কি, ও উহার উৎপত্তি কোথায়? ইহাই চৈতন্যের মূলভাব; ইহার উৎপত্তি "তাহা" হইতে "একোঽহম্ বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়" এই মহাবাক্য বা মহাসঙ্কল্প হইতে ভগবান বা বাসুদেব প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, সঙ্কল্প করিলেন "একোঽহম্ বহু স্যামঃ প্রজায়েয়;" সেই "একোঽহম"রূপে মহাভাব দৃষ্ট প্রত্যেক অণু ও পরমাণুতে সঙ্কল্পরূপে নিহিত থাকিয়া, এই "অহম্" ভাবকে পূর্ণ বিকশিত করিতেছে, এই "অহম্" ধ্বনিকে সম্যকরূপে প্রতিধ্বনিত করিতেছে; সুতরাং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না কেন, সে তাহার নিজের ভাষায় এক "আমি" ই উত্তর প্রদান করিবে। এইরূপ প্রত্যেক "আমিত্ব" এক এক একটি "পূর্ণ আমি" রূপে বিরাজ করিতেছে। * তাঁহার সঙ্কল্প হইল (বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়) বহু হইব; সেই সঙ্কল্প প্রত্যেক অণু, পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সেই মহাভাবে প্রণোদিত করিতে লাগিল, সুতরাং এক অণু ও পরমাণু হইতে বহু অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি হইতে লাগিল। তবেই "এক" ও তিনি "বহু" ও তিনি; অতএব "একত্ব" হইতে "বহুত্ব" ও "বহুত্ব" হইতে "একত্বে" র উপলব্ধি স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। মাতৃগর্ভে কি উপায়ে জীবদেহ উৎপন্ন হয় (Embryology) ভ্রূণ-বিজ্ঞান হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। স্ত্রী ও পুং মূলভূত পদার্থের (Element) সংমিশ্রণে জরায়ুতে একটি কোষ ("One simple cell") উৎপন্ন হয়; উক্ত কোষ আপন হইতে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া বহু কোষ-সমূহে পরিণত হয় (Processes of segmentation or clenage of ceels their differentation)। আধুনিক পাশ্চাত্য

---

* বাসুদেবের "আমিত্ব" বাসুদেব; তদন্যের "আমিত্ব" অহঙ্কার মাত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন "কোষমধ্যে অজ্ঞাত শক্তি বা সঙ্কল্প নিহিত রহিয়াছে" (…Unknown power or tendency impressed on cells)। কিন্তু আমরা জানি যে, বাসুদেবের সেই "একোঽহং বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়"-রূপ সঙ্কল্প কোষে নিহিত আছে বলিয়াই, একটি কোষ বহু কোষে পরিণত হয়। এইরূপ প্রত্যেক কোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে কোনও কোষ-সমষ্টি হইতে ত্বক্, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী, কোনও কোষ সমষ্টি হইতে শারীরিক যন্ত্রাদি, মাংসপেশী, শোণিত প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহুকোষ-সমষ্টি একটি মানবদেহে পরিণত হইল; ইহার নাম "যদু" অর্থাৎ এই দেহের উপাদান-কোষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিই "যদু"। অথবা এই কোষ-সমূহের ব্যষ্টি ও সমষ্টি এক যদুকেই নির্দ্দেশ করে; কারণ বাসুদেবের "একোঽহম্" সঙ্কল্প প্রত্যেক কোষের প্রত্যেক অণু ও পরমাণুতে, সঙ্কল্পরূপে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই "একত্ব" বা "এক যদুকে" প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ বাসুদেব হইতে উদ্ভূত এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই বাসুদেবকেই দেখাইতেছে। অথবা এই যাবতীয় "পূর্ণ আমি" সমূহ, সেই সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ "একোঽহম্"—মহাভাব বা "মূল আমি" কে নির্দ্দেশ করিতেছে—কিম্বা উহারা যে "মূল আমি" র অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন ইহাই দর্শাইতেছে; অতএব উহারা যে "মূল আমি" র সহিত "অভেদ" বা "এক" ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

কি উপায়ে "বহুত্ব" হইতে "একত্বে" র উপলব্ধি হইতে পারে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে প্রয়াস করিব। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক পরিবারস্থ কোনও এক ব্যক্তির সহিত অন্য পরিবারস্থ কোনও এক ব্যক্তির বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পরিবারই "এক" হইয়া পরস্পরের উপর প্রতিশোধ পাইতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। তখন উভয় পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই এইরূপ বলিয়া থাকে—"আমার ঘরের লোককে অপমান বা প্রহার করায়, আমাকেই অপমান বা প্রহার করা হইয়াছে"; অর্থাৎ তখন সকলের ব্যক্তিগত "আমি"-ভাব যেন সেই অপমানিত বা প্রহৃত ব্যক্তির "আমি"র সহিত লীন বা "এক" হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ের জন্য তাহাদের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া, অভেদ বা একত্ব ভাবের সুর হৃদয়-তন্ত্রী হইতে ঝঙ্কারিত হইয়া থাকে। আবার যখন এক

পল্লীর সহিত অপর পল্লীর বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সকলেই পারিবারিক কলহ ভুলিয়া একযোগে অপর পল্লীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তাহাদের সুর সেই একই সুর—"আমার পল্লী"। সেইরূপ এক গ্রামের সহিত অপর গ্রামের বিবাদ উপস্থিত হইলে "আমার গ্রাম"-সুর ধরিয়া গ্রামস্থ সমস্ত পল্লী "এক" হয়; এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের কলহ ঘটিলে সমস্ত গ্রাম "আমার প্রদেশ" এইরূপ ধ্বনি করিয়া একযোগে বিবাদে মত্ত হয়; এক দেশের সহিত অপর দেশের বিবাদ উপস্থিত হইলে "আমার দেশ" বলিয়া সমস্ত প্রদেশই "এক" হয়, এক মহাদেশের সহিত অন্য মহাদেশের কলহ উপস্থিত হইলে, মহাদেশস্থ সমস্ত দেশ "আমার মহাদেশ" রব করিয়া এক হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ মানব-হৃদয়ে এই মহৎ বা একত্বভাব "নলিনীদলগত" জলের ন্যায়; অথবা প্রাবৃটের অমানিশায় নবঘনবক্ষে বিদ্যুল্লতিকার চপলক্রীড়ার ন্যায়; কিংবা পাণ্ডুরোগীর নয়নে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেমন পীতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; তেমনই ভেদমূলক চৈতন্যের আবরণের মধ্য দিয়া অভেদ চৈতন্যের সাময়িক ক্রীড়াও তাহাদের নিকট ভেদ চৈতন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পাণ্ডুরোগ-মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, অথবা যে এই মেঘাচ্ছন্ন গভীর অমানিশাতে তড়িতালোকে পথ দেখিয়া চলিতে চেষ্টা করে, সেই প্রকৃত মানব। এইরূপ মানব বা "নর" দেখিতে পায় যে, ব্যক্তিগত "আমি" (অর্থাৎ যে "আমি"র সীমার মধ্যে আর অন্য কিছুই স্থান পায় না) অতিক্ষুদ্র, তৎপর তাহার "আমি" পরিবারগত হইল অর্থাৎ তাহার "আমি"র সীমার মধ্যে পরিবারস্থ লোক স্থান পাইল; ক্রমে তাহার "আমি"র সীমার মধ্যে পল্লী, গ্রাম, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ ও ক্রমে মানবজাতি আসিয়া পড়িল, এইরূপে তাহার "আমি"র সীমা বর্দ্ধিত হইয়া, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে লাগিল। পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি কোনও জীবকে কেহ যন্ত্রণা প্রদান করিলে এইরূপ মানবের প্রাণে আঘাত লাগে। তখন সে চিন্তা করে "কেন এইরূপ হয়" উহাদিগের ও আমার মধ্যে একটি সাধারণ (common) পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; কেননা একের মধ্যে ধ্বনি হইলে অপরের মধ্যেও সেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে; অথবা আমার "আমিত্বে"র সহিত উহাদিগের "আমিত্বে"র এক নৈকট্য সম্পর্ক নিশ্চ-

য়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার স্বহস্ত-রোপিত কোনও উৎকৃষ্ট বৃক্ষলতাদি কিংবা তাহার কোনওরূপ প্রিয়বস্তু যদি কেহ নষ্ট করে, তখন তাহার প্রাণে কষ্ট বা দুঃখের সঞ্চার হয়, এবং "কেন দুঃখ হয়" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে পূর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই প্রকার চিন্তাপরম্পরা-ফলে অবশেষে তাহার "সর্ব্বঘটে একত্ব" উপলব্ধি হয়। তখন তাহার "আমিত্বে"র সীমা অতিবৃহত্তম হয় ও তাহার "আমিত্ব" সর্ব্বভূতগত হইয়া "সোঽহম্" ভাবগত হয়। কিন্তু এইরূপে চৈতন্যের অভেদ বা বিদ্যাভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া "একত্বে" উপনীত হইবার মূলে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই রহিয়াছে। এই দুইটিভাব কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। যখন এক পরিবারস্থ, এক পল্লীস্থ, এক গ্রামস্থ, এক দেশস্থ বা এক মহাদেশস্থ লোক একতাসূত্রে বদ্ধ হয়, তখন সকলেরই হৃদয়ভাব "আমরা এক" এইরূপ হইয়া থাকে; সকলেই একভাবে প্রণোদিত, সকলের হৃদয় একসুরে প্রতিধ্বনিত, সকলের মধ্যে যেন এক প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষণিকের জন্য তাহাদের অন্তরের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়,—ইহাই বিদ্যার খেলা। কিন্তু সাধারণ মানবগণ ইহা দেখিয়াও দেখে না বা দেখিতে চাহে না; তাহারা "আমার পরিবার" "আমার গ্রাম" "আমার দেশ", এইরূপ বাহ্যিক ভেদজ্ঞানে বা অবিদ্যায় মোহিত হয় ও তাহা-তেই তন্ময় হইয়া থাকে;—ইহাই অবিদ্যার খেলা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা হইতে "অহং", "অহঙ্কার," বা "আমি"-রূপ স্থৈর্য্যভাব সর্ব্বঘটেই স্থাপিত হয়, এবং এই "অহঙ্কার" হইতে "বিদ্যা"ভাব বা "আত্মজ্ঞান" (Self-consceousness) ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হয়। অতএব অবিদ্যাকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য সহকারে পরিত্যাগ করা যায় না; এমন কি এজগতে অবজ্ঞার বস্তু কিছুই নাই। নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীরগ্রাহী মরালের ন্যায়, যে ব্যক্তি অবিদ্যা হইতে বিদ্যাভাব গ্রহণ করিতে পারে, অথবা যে ব্যক্তি অবিদ্যা, জীবত্ব বা বহুত্বকে, বিদ্যা, শিবত্ব বা একত্ব প্রাপ্তির উপায় বা পন্থা-স্বরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিতে পারে সেই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত পাত্র, সে ক্রমে দেখিতে পায় যে, জগতে "এক" আছে "দুই" নাই; তাহারই সম্মুখে "অবিদ্যা" অবিদ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া "বিদ্যা"রূপে আবির্ভূতা হন; তাহার জন্যই ব্রহ্মবিদ্যার মন্দির-দ্বার

আপনা হইতে উন্মুক্ত হয়। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা মানবকে উপযুক্ত পাত্র করাই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা বা যে বিদ্যা এই লক্ষ্যভ্রষ্ট ও এই উদ্দেশ্য হারা হয় তাহা ব্রহ্মবিদ্যানামে অভিহিত হইতে পারে না বা হইবেও না।

শ্রীশরৎচন্দ্র সেন গুপ্ত।

ন্যায়ের পঞ্চাঙ্গ তত্ত্ব।*

ন্যায়শাস্ত্রে যে পঞ্চ অবয়বের উল্লেখ আছে, তাহা এই—

(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন। এই পাঁচটী সাঙ্কেতিক (Symbolical) শব্দ সংযোগে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বোধ প্রক্রিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ সর্ব্বত্রই এই প্রক্রিয়া কোন না কোন আকারে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কি প্রণালীতে বিশ্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞান-প্রবাহ বিভিন্ন আধারে অবতীর্ণ হইয়া, দেশকাল অবচ্ছিন্ন খণ্ড জ্ঞান রূপে ব্যক্ত হয়, আবার, এই খণ্ড জ্ঞান কিরূপে সেই অখণ্ড জ্ঞানসিন্ধুতে পুনরায় নিমজ্জিত হয়; কেমন করিয়া স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব জগতের বিধসম্মত পন্থার (Casmic Laws) অনুসরণ পূর্ব্বক বিশ্বজগতের সঙ্গে স্বীয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য (Harmony) বিধান করিয়া সমস্ত দুঃখ অর্থাৎ অসামঞ্জস্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; তাহা নির্ণয় করাই এই পঞ্চাবয়বের উদ্দেশ্য।

কোন আচার্য্যের নিকট শিষ্য অবগত হইল যে, অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখরে অগ্নি আছে। তারপর, ধূম দেখা গেল। শিষ্য দেখিয়াছে যে, রন্ধন-গৃহে যথন অগ্নি জ্বালান হয়, তখন ধূমও বাহির হয়। তাহাতে পর্ব্বতে ধূমের আবির্ভাব দেখিয়া, ধূমের আনুষঙ্গিক জ্ঞানের উপলব্ধি হইল। তারপর পর্ব্বতে যে অগ্নি আছে, আচার্য্যের এই কথাটী শিষ্যের নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি হইল। এই বিষয়টী ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়;—

---

* বিগত ১লা মে বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (Bengal Theosophical Society) সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

১। প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বত বহ্নিমান্।

২। হেতু—পর্ব্বত ধূমবান্।

৩। নিদর্শন বা উদাহরণ—যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি, যথা—মহানস (চুল্লী)।

৪। উপনয়—পর্ব্বত ধূমবান্।

৫। নিগমন—পর্ব্বত বহ্নিমান্।

১। প্রতিজ্ঞা—যদু মরণধর্ম্মী। (Proposition)

২। হেতু—যদু মনুষ্য। (Reason)

৩। উদাহরণ—মনুষ্য মরণধর্ম্মী। যেমন যোগেন্দ্র মরিয়াছে ইত্যাদি। (Instance)

৪। উপনয়—যদু মনুষ্য (Application of Reason).

৫। নিগমন—(অতএব) যদু মরণধর্ম্মী। (Conclusion).

আধুনিক পাশ্চাত্য ন্যায়ে (Logic) শেষের তিনটী অঙ্গ মাত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতার কারণ এই যে, আমাদের ন্যায়মতে কোন "আপ্ত বাক্য" (Intentional) কে অবলম্বন করিয়া 'অবরোহী' (Deductive) প্রণালীতে ব্যক্তিগত জ্ঞানে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য কার্য্যাদি সমাপনান্তে পুনরায় আরোহী (Inductive) প্রণালীতে "আপ্তবাক্যে" প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যমতে ব্যক্তিগত জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আরোহী প্রণালীতে পূর্ণজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া। ন্যায়শাস্ত্রমতে অনন্ত জ্ঞানের বাক্যাংশটী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধারণ করিয়া সেই অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে একীভূত হওয়া, আর পাশ্চাত্য মতে বাক্যাংশটী ধারণ করিয়া উহার ক্রমাগত বৃদ্ধি সাধন করা। শেষোক্তমতে কোন বিশেষ শ্রেণীর যতদূর সম্ভব উৎকর্ষতা সম্পাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন একটী স্থূলশ্রেণীকে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম কিম্বা উহার কারণ-শ্রেণীতে পরিণত করা যাইতে পারে না। কোন বালককে "কাল" (Time) এই শব্দটি দুই প্রকারে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তাহাকে "কাল" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, পরে বিশ্লেষণ (aneltytical) প্রক্রিয়া দ্বারা "ক্" য়ে আকার আর "ল", এইরূপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া, পুনরায় সংশ্লেষণ (Synthetical) প্রক্রিয়া দ্বারা "কাল" শব্দ বুঝাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ

বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা "ক" যে আকার আর "ল" "কাল", এইরূপ শিক্ষা দেওয়া। সুক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে অমূর্ত্ত অনন্তকালের যে কার্য্যরূপ মূর্ত্ত অংশকে লক্ষ্য করিয়া এক "কাল" শব্দ দুইটী বর্ণ-সঙ্কেতে উচ্চারণ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য সেই কারণরূপ অনন্ত কালকে উপলব্ধি করা,— প্রথমোক্ত প্রণালীর ইহাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় প্রণালীতে সাঙ্কেতিক বর্ণদ্বয় দ্বারা পরিস্ফুট বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার উপযোগী কার্য্যরূপ মূর্ত্ত কালাংশ মাত্র বোধগম্য। পাশ্চাত্য মতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটী এইরূপ হয় ;—

3. Man is mortal (Major premiss)

4. John is a man (Minor premiss).

5. Therefore John is mortal (Conclusion).

এক্ষণে আমরা এই পঞ্চ অবয়বের প্রত্যেকটী শব্দের লক্ষণ নির্ণয়ে চেষ্টা করিব। ১। প্রতিজ্ঞা—এই প্রতিজ্ঞা শব্দের লক্ষ্য আচার্য্যের নিকট হইতে শিষ্যের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, যাহা কিছু বোদ্ধব্য, যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই (Casmic consociousness) এই প্রতিজ্ঞা শব্দের বাচ্য। আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত এক জ্ঞান শিষ্যের পক্ষে প্রথমে "প্রতিজ্ঞা" অবস্থায় অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম রূপে Potential থাকে, পরে "নিগমন" অবস্থায় ব্যক্ত বা স্থূলরূপে প্রকাশ পায়। ২। হেতু—এই হেতু শব্দের লক্ষ্য জগতের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিধি সমূহের (Casmic Laws) অনুগমন। পরমপিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য আদিতে যে সমস্ত বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই হেতু। যে যে বিধির যে যে ভাবে অনুবর্ত্তন করিলে প্রত্যেক বিষয় সামঞ্জস্যভাবে সিদ্ধ হয়, তাহাই হেতু। হেতুর অন্য নাম "সাধন" "জ্ঞাপক" বা "লিঙ্গ"। জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞাপক, ভক্তের পক্ষে সাধন ও কর্ম্মীর পক্ষে লিঙ্গ, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ৩। নিদর্শন—নিদর্শনশব্দের লক্ষ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। ইহার অন্য নাম উদাহরণ বা প্রমাণ। মানসিক বিকাশের তারতম্য অনুসারে এই অভিজ্ঞতারও তারতম্য হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতাসিদ্ধি নিরপেক্ষ ভাবে না হইলে, সাধারণতঃ দুই পক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি পক্ষদ্বয় সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তবে তত্ত্বনির্ণয়ই উভয় পক্ষের লক্ষ্য হয়, ইহাকে "বাদ" বলে। যদি রাজসিক প্রাধান্য বশতঃ কোন পক্ষ

সমর্থন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে পরাজয় করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাকে "জল্প" বলে। আর যদি তামসিক প্রাধান্য বশতঃ কেবল পরপক্ষেই দোষার্পণ করিয়া পরাজয় করা অভিলাষ হয়, তবে তাহাকে বিতণ্ডা বলে। জীবের ক্রমবিকাশ অনুসারে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে। মানুষের প্রথম অবস্থায়, যখন সে প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া সংসার স্রোতে ভাসিতে থাকে, কখন তমঃ প্রাধান্য বশতঃ উদ্দেশ্যভ্রান্ত হইয়া কেবল বিতণ্ডায় জীবন যাপন করে। তারপর যখন মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হয়, কখন প্রবৃত্তির জয় নিবৃত্তির পরাজয়, কখন প্রবৃত্তির পরাজয় নিবৃত্তির জয়, আবার প্রবৃত্তির জয় নিবৃত্তির পরাজয়, তখনই তাহার মধ্যে জল্প বিচার আরম্ভ হয়। অবশেষে যখন সত্ত্বগুণাধিক্য বশতঃ নিবৃত্তির সম্পূর্ণ জয় হয়, তখনই লোকের বাদ বিচার আরম্ভ হয়। এই উদাহরণ—অবস্থা মানবজীবনের একটী বিশাল কার্য্যক্ষেত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের অধিকাংশ লোকই এই অবস্থার অন্তর্গত। মানুষের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত উপাসনা এই অবস্থায়ই পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত চিত্ত-শুদ্ধি ইহারই লক্ষ্য। এই উদাহরণ-দোষে, জ্ঞান-লাভের নানা প্রকার দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা এই দোষের উদ্ভব হইয়া থাকে। শুক্তিতে যে রৌপ্যবোধ বা রজ্জুতে যে সর্পবোধ হইয়া থাকে, আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিই ইহার কারণ। রাগ (শুক্তিতে রৌপ্যবোধ) ও দ্বেষ (রজ্জুতে সর্পবোধ) বশতঃই এরূপ মানসিক চাঞ্চল্য সংঘটিত হইয়া থাকে। কেমন করিয়া এই উদাহরণের দোষে জ্ঞানরশ্মি বক্রীভবন (Refraction) ও প্রতিফলন (Reflection) হইয়া দোষযুক্ত হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই,—একদা কতকগুলি কৃষক কোন ক্ষেত্রের শস্য কর্ত্তনানন্তর বিশ্রাম করিতেছিল; সেই সময় এক অন্ধ তথায় উপস্থিত হয়। কথা-প্রসঙ্গে অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই সকল, বল দেখি দুগ্ধ জিনিসটা কেমন? একজন কৃষক উত্তর করিল, কেন দুধ বকের মত। অন্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বক কেমন? কৃষক বলিল, বক কাস্তের মত। অন্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কাস্তে কেমন? তখন কৃষক তাহার হস্তস্থিত কাস্তেটী অন্ধের হাতে দিয়া বলিল, এই দেখ কাস্তে। অন্ধ অনেকক্ষণ কাস্তেতে হাত বুলাইয়া বলিল, বটে তবে দুধ এই রকম! এখানে দৃষ্টান্ত (Middle term)

নির্ব্বাচনে কেমন দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমে দুগ্ধের শুভ্রতা ও বকের শুভ্রতা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণে মানসিক ধারণা-শক্তির অভাব বশতঃ বকের শুভ্রতার পরিবর্ত্তে উহার বক্রাকারের সঙ্গে কাস্তের বক্রাকারের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। এই যে বকের শুভ্রতাকে আবৃত করিয়া, বক্রাকারে বিক্ষিপ্ত হওয়া—এই যে বরুণা ও অসীর প্রবাহদ্বয়, ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার জনাই কি মিত্রাবরুণের স্তুতি-সংহিতা?

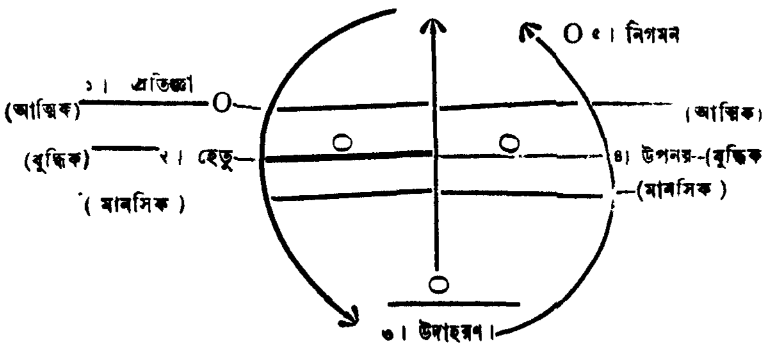
৪। উপনয়—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাধন বা কর্ম্মদ্বারা লব্ধ বা জ্ঞান দ্বারা আত্মস্থ (Asimilation) করার নাম উপনয়। অবশ্য ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি বা সাধন অনুসারে এই উপায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই উপনয়ই দীক্ষা বা নিগূঢ়তত্ত্বে উপনীত হওয়া, —"উপনয়নের" বিকাশ। যাহা হেতুরূপে নিদর্শনের বাহিরে ছিল, তাহাই উপনয় রূপে অন্তরস্থ হইল, যাহা আমিত্বের বহির্ভূত ছিল, তাহা প্রসারিত হইয়া আমিত্বে বিকাশিত হইল। যে সূত্রাত্মা প্রতিজ্ঞায় পূর্ণরূপে ছিল, হেতুতে আংশিক ভাবে বিকাশ পাইয়া ছিল এবং নিদর্শনে সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত ছিল, সাধন প্রভাবে সেই সূত্র লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে, উপনয়ে তাহা বিস্তৃত হইয়া এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হইল! ৫ নিগমন—ব্যক্তিগত সাধনার যাহা চরম সিদ্ধি,—সমগ্র সৃষ্টির যাহা চরম লক্ষ্য তাহাই "নিগমন"। প্রথমে অবরোহী (Deductive) প্রণালীতে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান হইতে ব্যক্তিগত জ্ঞানে অবতরণ, তৎপর আরোহী (Inductive) প্রণালীতে ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানে অধিরোহণ, এবং এতদুভয়ের একত্ব সংস্থাপন, ইহাই নিগমনের অভিপ্রায়। সমস্ত উপাসনা, পূজা ও অর্চ্চনার ইহাই উদ্দেশ্য। সমস্ত শাস্ত্রের ইহাই লক্ষ্য।

এই পঞ্চাবয়ব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনের বিষয়। ইহা পণ্ডিত বিশেষের পুস্তকগত বদ্ধ-বিদ্যা নহে, পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া, এক অখণ্ড তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার মুক্ত-বিদ্যা। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন একটী বিশেষ অভিপ্রায়কে পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ধারণ পূর্ব্বক, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সমস্ত লৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যশাসন ব্যাপারটী ন্যায়ের একটী সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞা (Troblem) মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডাধিপের বিশ্বপালন সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়ের যে অংশটী নর-

লোকে প্রতিষ্ঠিত তদীয় ক্ষুদ্র প্রতিনিধি কর্তৃক অবধারিত হয়, তাহাই প্রতিজ্ঞা। যে সমস্ত রাজবিধির অধীন হইয়া সেই অভিপ্রায়টী সম্পাদিত হয়, তাহা হেতু। আবার প্রকৃতিপুঞ্জের ব্যক্তিগত আচারধর্ম্ম ও প্রচলিত শাসনবিধি, এতদুভয়ের সংশ্রবে যে সমস্ত বৈধ বা অবৈধ ঘটনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত। এতাদৃশ কোন ঘটনা বিশেষকে যখন পূর্ব্বোক্ত বিধির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হয়, তখন উপায়। তৎপর সেই ঘটনাটী পূর্ব্বোক্ত রাজকীয় পূর্ণ অভিপ্রায়ের সহিত সমঞ্জসীভূত হইলেই নিগমন। বিচারকার্য্য ও নগরের একটী উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা (Theorem মাত্র। রাজকীয় স্বত্ব ও অধিকারকে পূর্ণস্বরূপ অবধারণ করিয়া বিধিশাস্ত্রের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি গ্রহণানন্তর ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব ও অধিকারকে বিধিশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রদর্শন করিয়া যে মীমাংসা করা হয়, তাহাই বিচার। কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি সমাজ সম্বন্ধীয়, সমস্ত বিভাগের শাসন ও বিচারকার্য্য এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, জীব ও ঈশ্বর-সম্বন্ধগত ভাবাদি-সাধন পরিবার-পরিজন সম্বন্ধীয় পরস্পরের ব্যবহার, লোকাচার পরম্পরা, ধর্ম্মাচার্য্যের যাজনাদি, সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি-পরিচালন, সেনা-বিন্যাস, যুদ্ধ, চিকিৎসা-কার্য্য, তর্ক, সমস্যাপূরণ, পরীক্ষাগ্রহণ, সভাসমিতি, কীর্ত্তন-কবি-পাঁচালী প্রভৃতি সঙ্গীত, তাস-পাশাদি ক্রীড়া, ক্রয়, বিক্রয়, বিনিময় ইত্যাদি বিষয় এই পঞ্চাবয়বকে আশ্রয় করিয়া, ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার অবলম্বন মাত্র। যাহা সত্য, তাহাই "ন্যায়"। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমস্ত বিষয়ে "ন্যায়" চায়। একটু "ন্যায়ের" ব্যতিক্রম হইলেই লোকে "অন্যায়" "অন্যায়" বলিয়া তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া থাকে। ন্যায়ই নীতি, ন্যায়ই ধর্ম্ম, ন্যায়ই কর্ম্ম আবার ন্যায়ই কর্ম্মফল। এই জন্য ন্যায়কে বলা হইয়াছে,—প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মানাম্ বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥ —ন্যায়সূত্র-ভাষ্যধৃত কারিকা। ইহার ভাবার্থ এই—ন্যায়শাস্ত্র প্রদীপের ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাকে প্রকাশ করে, উপায় হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং আশ্রয় হইয়া সর্ব্বধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই পঞ্চাবয়বকে তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রতিজ্ঞা ও নিগমন, প্রথম পর্য্যায়; হেতু ও উপনয় দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং উদাহরণ

তৃতীয় পর্য্যায় ভুক্ত। এই পর্য্যায়ত্রয় ক্রমান্বয়ে আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানস লোকের (Planes) সহিত সমান অধিকরণ-সূত্রে অবস্থিত। আত্মিক লোকে যাহা পূর্ণরূপে বিরাজিত, বুদ্ধিক লোকে যাহা অখণ্ডরূপে অবস্থিত, মানসিক লোকে তাহা ব্যক্তিগত স্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। আত্মিক লোক হইতে প্রজ্ঞা-রশ্মি প্রথমে বুদ্ধিক জলে স্নাত হইয়া মানসিক কমলে প্রতিভাত হয়, তৎপর তাহা নিম্নমানসিক, বাসনাময় ও স্থূল লোকজাত-শুদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা শোধিত মানস-ক্ষেত্রে অর্চ্চিত হইয়া আবার মানস, বুদ্ধিক ও আত্মিক লোকে যে একীকৃত হয়, তাহা এই পঞ্চাবয়ব প্রণালীর লক্ষ্য। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়; পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তন; মানবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু; সংক্ষেপে, সমস্ত পদার্থের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং পুনরায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও কারণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—এই প্রণালী দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।



ন্যায়রূপ তৌলদণ্ডে প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের কর্ম্মফল তৌলিত হইয়া সমানুপাতিক ফল প্রসব করিতেছে। ন্যায়দণ্ডই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সমষ্টি ন্যায়ানুমোদিত হইয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপ বিশাল ব্যাপারটী যে, সর্ব্বন্যায়ের আশ্রয় পরমেশ্বর হইতে স্বতঃ সমুৎপন্ন একটি প্রতিজ্ঞা মাত্র, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র।

ন্যায়ের পঞ্চাঙ্গ।

১। প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বত বহ্নিমান্।

২। হেতু—পর্ব্বত ধূমবান্।

৩। নিদর্শন—যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি, যথা মহানস (চুল্লী)।

৪। উপনয়—পর্ব্বত ধূমবান্।

৫। নিগমন—পর্ব্বত বহ্নিমান্।

১। প্রতিজ্ঞা—যদু মরণধর্ম্মী (Proposition)

২। হেতু—যদু মনুষ্য। (Reason)

৩। উদাহরণ—মনুষ্য মরণধর্ম্মী। যেমন যোগেন্দ্র মরিয়াছে ইত্যাদি (Instance).

৪। উপনয়—যদু মনুষ্য। (Applicaton of Reason)

৫। নিগমন- (অতএব) যদু মরণ ধর্ম্মী। (Conclusion)

---

3. Man is mortal (Major Premiss).

4. John is a man (Minor Premiss).

5. Therefore John is mortal (Conclnsion).

ন্যায়ের পঞ্চাঙ্গ।

১। প্রতিজ্ঞা 0 0 ৫। নিগমন

(আত্মিক) (আত্মিক)

২। হেতু 0 0 ৪। উপনয়

(বুদ্ধিক) (বুদ্ধিক)

0

৩। উদাহরণ

(মানসিক) (মানসিক)

শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সংসার-ত্যাগ মোক্ষ নহে।

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন যাঁহারা জগৎকে অসার ও মিথ্যা ভাবিয়া মোক্ষ লাভের জন্য লালায়িত এবং জগতের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, মহাদেব সেইরূপ ত্যাগীরই আদর্শ।

গুরু। মহাদেবের ত্যাগ, মোক্ষের জন্য সংসার ত্যাগ নহে, সংসারের জন্য মোক্ষত্যাগ,—জীবহিতের জন্য পরম ধাম ত্যাগ। যাঁহারা ভাবেন জীবকে ও জগৎকে ভুলিয়া স্বার্থপর কঠোর সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়, মোক্ষ কি বস্তু তাঁহারা জানেন না। প্রেমের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ না করিলে মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় না। জগৎ হইতে আপনাকে পৃথক্ ভাবিয়া একটি উচ্চ রাজ্যে গিয়া সুখ ভোগ করার নাম মোক্ষ নহে, জগতের সহিত নিজের সত্তাটি মিশাইয়া দেওয়াই মোক্ষ, সর্ব্বভূতকে আপনার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করাই মোক্ষ। আমিত্বের সঙ্কোচ মোক্ষ নহে, বিশ্বব্যাপী প্রসারই মোক্ষ। সুতরাং মুক্ত পুরুষ জীবের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারেন না, কারণ ইহাতে নিজের দুঃখেই উদাসীন থাকা হয়।

(পরলোক।)

শিষ্য। একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যে "উচ্চতর লোক" "উচ্চ রাজ্য" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলেন এবং শাস্ত্রেও যে ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন প্রভৃতি লোকের কথা পাঠ করি, এ গুলি কোথায় ও কিরূপ? আমার তো মনে হয় এই পৃথিবীতেই সব, পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করি। ইহা ছাড়া যে অন্য ভুবন বা জগৎ আছে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা অনেক সময় আমরা পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ বা নরক-যাতনা ভোগ করি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে পরলোক নাই তাহা নহে। পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ত্রিবিধ প্রমাণ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান

ও আপ্তবাক্য। স্বয়ং দেখাই প্রত্যক্ষ। যাঁহারা গুপ্তবিদ্যা (Occultsience) এবং যোগাদির দ্বারা দিব্যদৃষ্টি (Clairvoince) লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তোমারও যদি প্রবল ইচ্ছা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকে, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পার। বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা দ্বারা যেমন তুমি উত্তম গায়ক, চিত্রকর, রাসায়নিক বা যোদ্ধা হইতে পার, সেইরূপ কঠোরতর পরিশ্রম ও বিভিন্ন প্রকার সাধনা দ্বারা তুমি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার শক্তি লাভ করিতে পার, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিকতা নাই। শক্তিগুলি আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, তবে তাহাদের বিকাশ সাধনা-সাপেক্ষ। দিব্যদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের বাক্যই আপ্তবাক্য। তাঁহারা স্বয়ং দেখিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই পরলোকের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ।

শিষ্য। অনুমান দ্বারা কিরূপে পরলোক প্রমাণিত হয়?

গুরু। এই মনে কর পৃথিবীটি আমাদের সৌর জগতের একটি গ্রহ, কিন্তু ইহা একমাত্র গ্রহ নহে, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি আরো কতকগুলি আছে। আমরা দেখিতেছি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জীবের বাস। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য গ্রহ গুলিতে জীব থাকা অসম্ভব নহে। আবার ধর পদার্থের নানা অবস্থা আছে—কঠিন, তরল, বায়বীয়, আকাশ (Etheric) ইত্যাদি। আমরা দেখিতেছি কঠিন পদার্থের দ্বারা জীবের দেহ নির্ম্মিত। ইহা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না কি যে, বায়বীয় বা সূক্ষ্মতর পদার্থের দেহবিশিষ্ট জীব থাকা অসম্ভব নহে? কঠিন দেহ—হইতেই সূক্ষ্মদেহের অনুমান আসিয়া পড়ে। আবার দেখ অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সৌর জগৎ রহিয়াছে। আমাদের সৌর জগতের ন্যায় তাহারাও গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত। আচ্ছা, ভগবান কি কেবল আমাদের জগৎটিকেই জীববাসোপযোগী করিয়াছেন? অন্যান্য সৌর জগতেও কি জীব থাকা অসম্ভব?

শিষ্য। তবে কি এই গ্রহ তারাগুলি শাস্ত্রোক্ত ভুব, স্ব, মহ প্রভৃতি উচ্চতর লোক?

গুরু। না, ঠিক তাহা নহে। আচ্ছা, তুমি তো বিজ্ঞান পড়িয়াছ, পদার্থের কয়টি অবস্থা পরিজ্ঞাত আছ?

শিষ্য। চারিটি অবস্থা জানি—কঠিন, তরল, বায়বীয় ও ইথার (Solid, Liquid, Gas, Ether)।

গুরু। বেশ। ইহার মধ্যে কঠিন অবস্থাটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল; তরল তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, বায়ু আরও সূক্ষ্ম, ইথার আরও সূক্ষ্ম। কেমন? এই নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

গুরু। আচ্ছা। এই ইথারের ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে আবার ৪টি অবস্থা আছে, ১নং ইথার, ২নং ইথার, ৩নং ইথার, ৪নং ইথার। ১নং অপেক্ষা ২নং, ২নং অপেক্ষা ৩নং এবং ৩নং অপেক্ষা ৪নং সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম। ইহা তোমাদের বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করে নাই, সে কেবল ১নং ইথার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত আছে। সে যাহাহউক, এই সাতটি পদার্থের বা পদার্থের *সাতটি অবস্থার (কঠিন, তরল, বায়ু এবং ৪টি ইথারের) নাম ক্ষিতিতত্ত্ব।*

শিষ্য। উত্তাপদ্বারা কঠিন বস্তুকে তরল এবং তরলকে বাষ্প করা যায় জানি। কিন্তু বাষ্পকে ইথারে পরিণত করা যায় নাকি?

গুরু। যায় বৈকি। তবে উত্তাপ দ্বারা নহে, অন্য উপায় আছে। সে যাক্। পূর্ব্বোক্ত সাতটি পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত তাহার নাম ভূলোক।

৪নং ইথার অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম অপ্‌তত্ত্ব। ইহা দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত, তাহাই ভুবর্লোক।

শিষ্য। ঠিক বুঝিলাম না। ভুবর্লোক আছে কোথায়?

গুরু। কেন? ইথার যেমন সূক্ষ্ম বলিয়া কঠিন তরলাদি সকল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সকল বস্তুর ভিতর দিয়া অবাধে গতায়াত করিতেছে, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব আরও সূক্ষ্ম বলিয়া ইথারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

শিষ্য। তাহা হইলে ভুবর্লোক ভূলোকের মধ্যেই অবস্থিত। হয়ত ভুবর্লোকের অধিবাসিগণ আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে, অথবা এই ঘরের মধ্য দিয়া বা দেয়াল ভেদ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, অথচ আমরা স্থূল চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। হাঁ তাই বটে। তবে পৃথিবীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও এই ভুব-

লোকটি পৃথিবীর ঠিক সমায়তন নহে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে শত শত মাইল বিস্তৃত। ভুবর্লোকের আবার দুইটি বিভাগ আছে,—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। অপেক্ষাকৃত স্থূল ভুবর্লোকটির নাম প্রেতলোক, এবং সূক্ষ্ম ভুবর্লোকের নাম পিতৃলোক।

শিষ্য। ভুবর্লোকে যে সকল জীব বাসকরে তাহাদের দেহ ও আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ?

গুরু। তাহাদের দেহ অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। অপ্‌তত্ত্বের বিশেষগুণ এই যে ইহা বাসনাময়। জীবের যত কিছু বাসনা আছে,—কাম, ক্রোধ, লোভ বা দয়া, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি সমস্তই এই অপ্‌তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। এই জন্যই এই দেহের নাম বাসনাদেহ এবং ভুবর্লোকের অপর নাম কামলোক। এখানে জীবমাত্রের বাসনা অতিশয় প্রবল।

শিষ্য। এখন স্বর্গ ও অন্যান্য লোকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিন।

গুরু। অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম তেজস্তত্ত্ব বা অগ্নিতত্ত্ব। এই তেজস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত যে জগৎ তাহাই স্বর্লোক বা স্বর্গ। অপ্‌তত্ত্ব যেমন ইথারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তেজস্তত্ত্ব সেইরূপ অপ্‌তত্ত্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং স্বর্গ ভুবর্লোকের মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহা ভুবর্লোকের সহিত সমবিস্তৃত (Co-extensive) নহে, ভুবর্লোকের পরিধির বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। স্বর্গবাসীর দেহ তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম, অর্থাৎ তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত এবং একটির ভিতরে আর একটি অবস্থিত।

শিষ্য। একটির মধ্যে আর একটি কিরূপে অবস্থিত ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছি না। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বিষয়টি পরিস্ফুট হয়।

গুরু। এই মনে কর এক-গ্লাস জলে তুমি এক টুক্‌রা কাট বা সোলা ডুবাইয়া রাখিয়াছ। জল ঐ কাঠের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, বায়ু ঐ জলের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত, আবার ইথার ঐ বায়ুর অন্তরে ও বাহিরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে। এখন মনে কর কাঠটি ভূলোক, জল ভুবর্লোক, বায়ু স্বর্গ এবং ইথার উচ্চতর লোক।

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, সকল গুলিতেই কি জীবের বাস ?

গুরু। জীব বাস না করিলে এগুলি সৃষ্ট হইবে কেন ? যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা কিন্নর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ দেবগণ ভুবর্লোকে, আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ দেবগণ স্বর্গলোকে, এবং ঋষি, জীবন্মুক্ত, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি উচ্চতর পুরুষগণ উচ্চতর লোকগুলিতে বাস করেন।

শিষ্য। আর মানব ! মানব কি এই ভূলোক ছাড়া অন্যত্র বাস করে না ? তবে যে শুনিতে পাই মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যায় ?

(বিভিন্ন দেহ বা কোষ)

গুরু। শাস্ত্রে যে মানবের স্বর্গ গমনের কথা পাঠ করিয়াছ তাহা মিথ্যা নহে। এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। শ্রবণ কর। এই পৃথিবীর ভিতরে (ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বাহিরে) যেরূপ ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোকাদি অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক জড় পদার্থের প্রত্যেক স্থূল দেহের ভিতরে (ও কিয়দ্দূর অবধি বাহিরে) অনেকগুলি সূক্ষ্মদেহ বর্ত্তমান। মনে কর মানব-দেহ। প্রথমতঃ তাহার স্থূল দেহ। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে দেহটি আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই তাহার ভিতরে ঠিক তৎসদৃশ একটি ইথারের দেহ রহিয়াছে। রক্ত মাংসের দেহটির নাম অন্নময় কোষ এবং ইথারের দেহটির নাম প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষে আমাদের জীবনী শক্তি (Vital energy) খেলিতেছে, সুতরাং ইহাই অন্নময় কোষকে ধারণ ও সংরক্ষণ করিতেছে। অন্নময় ও প্রাণময় কোষকে সংক্ষেপে স্থূলদেহ বলে। আবার এই প্রাণময় কোষের মধ্যে অপ্‌তত্ত্ব নির্ম্মিত একটি দেহ রহিয়াছে। ইহার নাম বাসনা-দেহ (Desire-body)। ইহার আকৃতি স্থূলদেহের ন্যায় নহে, কতকটা ডিম্বের ন্যায় (oval)। ইহা স্থূল দেহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া চতুঃপার্শ্বেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাসনা-দেহের মধ্যে এইরূপ ডিম্বাকৃতি আর একটি দেহ বর্ত্তমান। ইহার নাম ভাবনা-দেহ (Thought body or mind body)। ইহা তেজস্তত্ত্বের স্থূলাংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এই বাসনা-দেহ ও ভাবনা-দেহের সংক্ষিপ্ত নাম সূক্ষ্মদেহ বা মনোময় কোষ।

শিষ্য। আচ্ছা, একবার বলি, আপনি শুনুন। প্রথম, অন্নময় কোষ। ইহার মধ্যে প্রাণময় কোষ। ইহা ইথারে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে অপ্‌তত্ত্ব-

নির্ম্মিত বাসনা-দেহ। আবার তাহার মধ্যে ভাবনা-দেহ। ইহা স্থূল তেজ-স্তত্ত্বে নির্ম্মিত। আর কোন দেহ আছে না কি?

গুরু। আছে বৈ কি মনোময় কোষ বা ভাবনা দেহের মধ্যে আর একটি দেহ আছে। ইহা তেজস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। আবার বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত আরও দুইটি দেহ আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে আনন্দময় কোষ ও হিরণ্ময় কোষ। এই বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষকে সংক্ষেপে কারণ-শরীর বলে। ইহা মনে রাখিবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি :—

অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ	... ...	স্থূল শরীর
মনোময় কোষ	... বাসনা-দেহ ভাবনা-দেহ	সূক্ষ্মশরীর
বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষ হিরণ্ময় কোষ	... ...	কারণ-শরীর

শিষ্য। আচ্ছা, আমাদের এত গুলি দেহের প্রয়োজন কি?

গুরু। এক একটি দেহের সহিত এক একটি জগতের (বা এক এক প্রকার অনুভূতির) সম্বন্ধ। স্থূল জগতের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্থূলদেহ থাকা চাই। সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির জন্য সূক্ষ্মদেহের এবং কারণ-জগতের অনুভূতির জন্য কারণ-দেহের প্রয়োজন।

শিষ্য। তবে কি স্থূলদেহ দ্বারা ভুব, স্বঃ প্রভৃতি লোকের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পন্থা।



ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৭। ৪র্থ সংখ্যা।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গুরু। কিরূপে সম্ভব হইবে? জ্ঞান-লাভ বা অনুভূতির অর্থ কি জান? বাহিরের স্পন্দন সর্ব্বদাই আমাদের দেহকে আঘাত করিতেছে। যখন আমাদের দেহটি ঠিক তদনুরূপ স্পন্দিত হয় বা তদাকারে আকারিত হয়, তখনই আমাদের একটি জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মে। এখন মনে কর তোমার সূক্ষ্মদেহ নাই; কেবল স্থূল দেহ আছে। অপ্‌তত্ত্বের বা তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করিবে কিসে? স্থূল দেহের দ্বারা? স্থূলদেহ অত সূক্ষ্ম আঘাতে স্পন্দিত হইতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্ম দেহ না থাকিলে ভুবর্লোকের বা স্বর্গের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব।

শিষ্য। সূক্ষ্ম দেহ না থাকিলে আমরা উচ্চতর লোক দেখিতে পাই না

তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের তো সূক্ষ্ম দেহ রহিয়াছে, তবে আমরা ভুবর্লোক দেখিতে পাইতেছি না কেন?

গুরু। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আচ্ছা, ঐ যে আমার পকেট-ঘড়ীটি হুকে ঝুলিতেছে, উহা সর্ব্বদাই একটি টিক টিক শব্দ করিতেছে। ঐ শব্দ কি তুমি শুনিতে পাইয়াছ বা পাইতেছ?

শিষ্য। আজ্ঞে না।

গুরু। কেন পাইতেছ না? তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় তো অক্ষুণ্ণ আছে। ঐ ক্ষুদ্র শব্দের স্পন্দন তো নিয়তই তোমার কর্ণপটাহে আঘাত করিতেছে। তবে তুমি শুনিতে পাইতেছ না কেন?

শিষ্য। নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে। ১ম, চতুর্দ্দিকের নানাপ্রকার শব্দ ও গোলমাল হয়ত ঐ ক্ষীণ আওয়াজটিকে ডুবাইয়া দিতেছে। ২য়, আমার মন হয়ত অন্যদিকে আছে। ৩য়, যে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আবদ্ধ, ঐ শব্দটির স্পন্দন সংখ্যা হয়ত সেই সীমার মধ্যে নাই। কি কারণে ঘটিতেছে তাহা ঠিক করিতে হইলে, আমি প্রথমে বাহিরের শব্দ ও গোলমাল রুদ্ধ করিব, পরে শব্দটি শুনিবার জন্য মন একাগ্র করিব। ইহাতেও যদি শুনিতে না পাই বুঝিব যে, যে সংখ্যক স্পন্দন আমার কর্ণে পৌঁছিতেছে তাহা আমার শব্দ জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অর্থাৎ কর্ণ যে সংখ্যা হইতে যে সংখ্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম, ইহার স্পন্দনসংখ্যা তাহাপেক্ষা কম।

গুরু। সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে না পাইবার কারণও ঠিক তাই। সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দনে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ অনবরত স্পন্দিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ভূলোকের তীব্র ও প্রবল স্পন্দন এই সকল সূক্ষ্ম ও মৃদু স্পন্দনকে ডুবাইয়া দিতেছে। আমরা যদি পার্থিব সকল স্পন্দন দূর করিতে পারি, মন হইতে পার্থিব যাবতীয় চিন্তা, কল্পনা ও ছবি বিদূরিত করিয়া চিত্তকে শূন্য ও একাগ্র করিয়া রাখিতে পারি, তাহাহইলে সূক্ষ্ম স্পন্দন আমাদের মস্তিষ্কে পঁহুছিবে, আমরা ভুবর্লোক দেখিতে পাইব।

শিষ্য। কিন্তু আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটা সীমা আছে তাহার কি? এতগুলি হইতে এতগুলি পর্য্যন্ত স্পন্দনে আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই। যদি ভুবর্লোকের স্পন্দন ঐ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে পড়ে?

গুরু। এই নির্দ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করা যায় না, ইহা তোমাকে কে বলিল? কিছুকাল একাগ্রতা অভ্যাস কর, বুঝিতে পারিবে। যে সকল ক্ষুদ্র কীট সাধারণ দৃষ্টির অগোচর তাহা দেখিতে পাইবে, যে সকল ক্ষীণশব্দ অপরে শুনিতে পায় না তাহা শুনিতে পাইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, মানব স্থূলজগতের সকল স্পন্দন ও চিন্তা দূর করিয়া যদি মনকে শূন্য ও একাগ্র করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শন হওয়া অসম্ভব নহে কতকটা বুঝিলাম। এখন মৃত্যুর পরে কি ঘটে কৃপা করিয়া বলুন।

(মৃত্যুর পরে)

গুরু। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা আর কিছুই নহে, এই স্থূলদেহের ত্যাগ। বহিরাবরণটি খসিয়া যাওয়ার নামই মৃত্যু। পাঁচপুরু কাপড়ে একটি হীরকখণ্ড জড়ানো আছে, যদি বহির্বস্ত্রটি খুলিয়া লওয়া হয়, দ্বিতীয় বস্ত্রটি বাহির হইয়া পড়ে। ইহাও সেইরূপ। স্থূলদেহ (অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ) খসিয়া গেলে,বাসনা-দেহটি বাহির হয়, জীবাত্মা এই বাসনা-দেহে প্রেত-লোকে বিচরণ করে। এই প্রেত-লোকটি ভুবর্লোকের স্থূলাংশ, অর্থাৎ অপ্-তত্ত্বের স্থূল পরমাণু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। এখন ঐ মানবের অবস্থাটি ভাবিয়া দেখ। ভূলোকের স্পন্দন তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, কারণ স্থূলদেহ নাই; সুতরাং পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে তাহা সে জানিতে পারে না। সে এখন ভুবর্লোকের স্পন্দনই গ্রহণ করে, ভুবর্লোকই দেখিতে পায়। কিন্তু তাহার মনের বা বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, সে এখানে যেরূপ ছিল, সেখানেও ঠিক সেইরূপ থাকে, কেবল স্থূলদেহ নাই,—কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির অভাব। যাহার ধনলোভ প্রবল ছিল সে ধনসঞ্চয়ের তীব্রবাসনায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, যাহার কামপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল, সে স্ত্রীসম্ভোগের দুর্দ্দমনীয় বাসনায় পুড়িতে থাকে, যে মাতাল ছিল সে সুরাপান লালসায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে,—অতৃপ্ত বাসনার তীব্র কষাঘাতে ছটফট করে। বাসনা তৃপ্ত করিবার উপায় নাই, কারণ কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, ভোগ্য বস্তু নাই। কিছুকাল এইরূপ ভুগিতে ভুগিতে তাহার বাসনাগুলি নিস্তেজ হয়, কামদেহের স্থূল পরমাণু গুলো ঝরিয়া যায়, সে পিতৃ-লোকে উন্নীত হয়। এখানেও বাসনা থাকে, কারণ বাসনা দেহ সে এখনও

ত্যাগ করিতে পারে নাই) তবে নীচ পার্থিব ও স্থূল বাসনার পরিবর্ত্তে সে এখন কতকটা উচ্চ ও সূক্ষ্ম বাসনা অনুভব করে। যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি বা অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য বা কলাবিদ্যাদির প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া উঠে, এই সকল কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কিছুকালের মধ্যে এগুলিও ক্ষীণ ও লীন হয়, স্বার্থময় বাসনা মাত্রই বিলুপ্ত হয়। তখন তার দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটে, সে বাসনা-দেহটি ত্যাগ করে। এই পরিত্যক্ত দেহটি ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে এবং ভাবনা-দেহে সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়। এই ভাবনা-দেহটি কামগন্ধ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ স্বার্থপর বাসনার লেশমাত্র ইহাতে নাই। সুতরাং পৃথিবীতে সে যাহা কিছু নিঃস্বার্থভাবে করিয়া গিয়াছে, দয়া, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, পরোপকার, ত্যাগ, দান, পরার্থে বিদ্যানুশীলন ইত্যাদি ইত্যাদি—সমস্তই শতগুণ তেজে তাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠে, সে শতগুণ উৎসাহে, শতগুণ বলে, শতগুণ আনন্দে তাহাদের পুনরভিনয় করিতে থাকে। এখানে দুঃখ নাই, কারণ স্বার্থ নাই, ক্ষুদ্রত্ব নাই; সে সদাই বিমল আনন্দে বিভোর। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে তাহার ভাবনা-দেহটি খসিয়া যায়, তাহার তৃতীয়বার মৃত্যু ঘটে। সে তখন বিজ্ঞানময় কোষে উচ্চতম স্বর্গে গমন করে। কিন্তু অধিকাংশ মানবেরই এই দেহটি (বিজ্ঞানময় কোষ বা কারণ-শরীর) এখনও সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হয় নাই, সুতরাং এই দেহটি আশ্রয় করিবামাত্র সে কিয়ৎকালের জন্য অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। অতঃপর পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা-বলে তাহার পুনরায় সংসারের দিকে গতি হয়,—সে স্বর্গলোক ও ভুবর্লোক ভেদ করিয়া এবং তত্তৎ উপাদানে নির্ম্মিত একটি নূতন সূক্ষ্ম দেহ লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

শিষ্য। এখন কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম, ভুবর্লোকে ও স্বর্গলোকে কতকাল বাস করিতে হয়? সকলকেই কি সমকাল বাস করিতে হয়, না কিছু ইতর বিশেষ আছে?

গুরু। সাধারণ মানবের পক্ষে এই পৃথিবীটাই কেবল কর্ম্মক্ষেত্র, ভুব ও স্বর্গলোক ভোগক্ষেত্র, অর্থাৎ এখানে সে যেরূপ কর্ম্ম করে ঐ দুই লোকে

তদনুরূপ ফল ভোগ করে। সুতরাং দুষ্কর্ম্মদ্বারা যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ঐহিক আসক্তিটাকে খুব প্রবল করিয়া দেয়, সে ভুবর্লোকে অনেক কাল যাতনা ভোগ করে। আর যিনি দয়া, ভক্তি, পরোপকার প্রভৃতি নিঃস্বার্থ ভাব ও কর্ম্মদ্বারা ইহজীবন যাপন করেন, তাঁহাকে ভুবর্লোকে অতি অল্পকাল, বাস করিতে হয় (হয়ত যাতনা আদৌ পাইতে হয় না), এবং স্বর্গে তিনি অনেককাল সুখ ভোগ করেন। মনে কর একটা বাদ্যযন্ত্রে কতকগুলি মোটা ও কতকগুলি সরু তার আছে। তুমি উহা বাজাইয়া রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ তারগুলি কাঁপিয়া শেষে আপনিই থামিয়া যায়। তুমি যত জোরে তারগুলিকে আঘাত করিবে, থামিবার পর তাহারা তত অধিককাল স্পন্দিত হইবে। ধর, আমাদের বাসনা-দেহই এই মোটা তার এবং ভাবনা-দেহ সরু তার। যদি তুমি মোটা তার গুলিকেই আঘাত করিয়া ছাড়িয়া দাও, সরু তার স্পর্শই না কর, তাহা হইলে থামিবার পর মোটা তারগুলিই কাঁপিবে, সরু তার কাঁপিবে না; অর্থাৎ ভুবর্লোকে যাতনা ভোগ করিয়াই তোমাকে ফিরিতে হইবে, স্বর্গ-সুখ ঘটিবে না। আবার যদি মোটাগুলিকে খুব মৃদুভাবে ও সরুগুলিকে জোরে আঘাত করিয়া ছাড়িয়া দাও, মোটাগুলি একটু কাঁপিয়াই থামিবে, সরুগুলি অনেকক্ষণ কাঁপিবে। অর্থাৎ ভুবর্লোকে ঈষৎ ক্লেশ পাইয়াই বহু-কাল স্বর্গে সুখভোগ করিবে। আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে এই বাদ্য-যন্ত্রটি বাজাইতেছি, কেহ মোটা তারে এবং কেহ বা সরু তারে আঘাত করিতেছি, কাজেই আমাদের ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে বাস কখনও এক রূপ হইতে পারেনা।

শিষ্য। বুঝিলাম। আচ্ছা, এই ভুবর্লোকেই কি পুরাণাদি-বর্ণিত নরক এবং খৃষ্টানদিগের Purgatoary?

গুরু। হাঁ। তবে পুরাণে কুম্ভীপাকাদির যে বর্ণনা আছে তাহা রূপক মাত্র, অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিলে চলিবে না। পাপিগণ যে ভীষণ যাতনা ভোগ করে তাহা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য, ঋষিরা এই সকল রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন।

(প্রেতের যাতনা-শান্তি)

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে ভীষণ যাতনা ইহার শান্তি কিসে হয়? এ রোগের কোনও চিকিৎসা নাই কি?

গুরু। ভোগেই ইহার শান্তি। তবে আমরা চেষ্টা করিয়া যাতনার তীব্রতা ও ভোগকাল কতকটা কমাইতে পারি। একটি তার যে সুরে বাজিতেছে উহাকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে কাঁপাইয়া দিলে আওয়াজটি বন্ধ হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা—এগুলি আর কিছুই নয়, সূক্ষ্মদেহের বিশেষ বিশেষ স্পন্দন মাত্র; একপ্রকার স্পন্দনের নাম কাম, আর এক রকম স্পন্দনের নাম ক্রোধ ইত্যাদি। এখন মনে কর একটি প্রেতের বাসনা-দেহ ক্রোধের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে, অতৃপ্ত প্রতিহিংসার জ্বালায় সে ছট ফট করিতেছে। তুমি যদি উহাতে বিপরীত বল প্রয়োগ করিতে পার যদি উহাতে ক্ষমার বা তিতিক্ষার স্পন্দন উৎপাদন করিতে পার, তাহার ক্রোধ থামিয়া যাইবে, যাতনার শান্তি হইবে।

শিষ্য। তাহা যেন হইল। কিন্তু আমি আছি এই ভূলোকে, আর তিনি আছেন ভুবর্লোকে; আমি তাঁহার দেহে বিপরীত স্পন্দন উৎপাদন করিব কি রূপে?

গুরু। চিন্তা দ্বারা ও মন্ত্রের দ্বারা। তুমি যদি নিয়ত তাঁহার মঙ্গল কামনা কর, যদি দয়া, ভক্তি, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা কর যে তাঁহাতেও এই ভাব গুলি সঞ্চারিত হউক, তাহা হইলে তোমার সূক্ষ্ম দেহের স্পন্দন অপ্‌তত্ত্ব ভেদ করিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম দেহে অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতে থাকিবে, অচিরে তাঁহার কাম, ক্রোধ ও ভোগলালসাদি প্রশমিত হইবে, তিনি যাতনামুক্ত হইয়া উচ্চতর লোকে উন্নীত হইবেন। মন্ত্রও এইকার্য্যে বিলক্ষণ সহায়তা করে। মন্ত্র কি? কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। এই অক্ষর গুলি এরূপে সংযোজিত হইয়াছে (দিব্যদর্শী ঋষিদিগের দ্বারা) যে উহা উচ্চারণ করিবামাত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন উত্থিত হয়। সিদ্ধ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে মনের গতি নিয়মিত হয়, চিত্ত স্থির ও শান্ত ভাব ধারণ করে, কুভাব ও কুচিন্তা

বিদূরিত হয়। অতএব কোন প্রেতের উদ্দেশে এইরূপ একটি মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার সূক্ষ্ম দেহে শুভ স্পন্দন উত্থিত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণা-মুক্ত করে।

শিষ্য। তা যদি হয়, তবে এরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা নাই কেন?

গুরু। ব্যবস্থা নাই কে বলিল? ওরে, সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ কার্য্যটা কি, কখনো ভাবিয়াছ কি? খৃষ্টান, মুসলমানাদির মধ্যেও প্রেতের সদ্গতির নিমিত্ত উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে কেবল শুভচিন্তারই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রাদ্ধে চিন্তা ও মন্ত্র—দুইটি শক্তিই সমবেত হয়, সুতরাং উদ্দেশ্যটা শীঘ্রই সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। শ্রাদ্ধ-রহস্য আজ কতকটা বুঝিলাম। আচ্ছা, আপনি বলিলেন সকল জীবেরই অন্নময়াদি পাঁচটি কোষ আছে। একটি বৃক্ষেরও আছে এবং ব্যাসদেবেরও আছে। তবে এ দু'য়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন?

গুরু। এই দুইটি জীবেরই পাঁচটি কোষ আছে সত্য, কিন্তু বৃক্ষের একটি কোষও সুনির্ম্মিত ও কার্য্যোপযোগী হয় নাই, ব্যাসদেবের সকল কোষই সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম। এই জন্যই দু'য়ে এতো প্রভেদ।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

(জীবের ক্রমোন্নতি)

গুরু। জীবের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি কিরূপে হইতেছে তাহা অগ্রে বুঝা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান ঈশ্বর-রূপে আবির্ভূত হইয়া প্রথমে মহৎ, অহঙ্কার, ও ক্ষিত্যপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমাদি ভূতের সৃষ্টি করেন। তৎপরে দেব সৃষ্টি, পরিশেষে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হয়। যেমন এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই মহাচৈতন্য হইতে অসংখ্য খণ্ড চৈতন্য বিনিঃসৃত হয়। এক একটি খণ্ড চৈতন্যই এক একটি জীব, এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। এই জীবসঙ্ঘের অধোমুখে গতি হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলতর আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহারা নিম্নাভিমুখে আসিতে থাকেন। প্রথমে মহত্তত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তার পর অহঙ্কার তত্ত্বের পাতলা খোলস, তার উপর ব্যোমাদি ক্ষিত্যন্ত ক্রমশঃ স্থূলতর আবরণে এইরূপে আচ্ছাদিত হইয়া তিনি পৃথিবীতে খনিজ পদার্থরূপে আবির্ভূত হন। লোহা সোণা বা পাথরের মধ্যে যে জীবাত্মা অবস্থিত, তিনি এরূপ প্রচ্ছন্ন,

প্রসুপ্ত ও অচেতন যে তাঁহার কোন অভিব্যক্তি নাই বলিলেও চলে। লক্ষ লক্ষ বৎসর উত্তাপ, শৈত্য ও বজ্রপাতাদির ভীষণ আঘাতে ইহাঁর বহিরাবরণটি যতই স্পন্দিত হইতে থাকে ততই একটি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র সুখ বা দুঃখের অস্পষ্ট অনুভূতি ক্রমশঃ ইহার অন্তরে জাগিতে থাকে। যেমন সুখের অনুভূতি হয় অমনি তাহা পুনরায় ভোগ করিবার বাসনা জন্মে এবং যেমন দুঃখের অনুভূতি অমনি তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবে তাঁহার বহিরাবরণটি গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহার আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির কতকটা উপযোগী হয়। তখন সেই জীবাত্মা খনিজাবস্থা ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়. লক্ষ লক্ষ বৎসর নানা বৃক্ষ রূপে ভূপৃষ্ঠে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। বসন্ত-বায়ুর মৃদুস্পর্শে, বর্ষার কোমল ধারা-সম্পাতে, ভীষণ ঝটিকায়, প্রচণ্ড উত্তাপে বা পশ্বাদির আক্রমণে তাহার বহিরাবরণটি নিয়ত কম্পিত ও আলোড়িত হওয়ায়, তাহার চৈতন্য আরও স্ফূর্ত্তি পায়, সুখ-দুঃখের অনুভূতিটি স্থায়ী ও তীব্র হইতে থাকে, সুখ-ভোগের ও দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা প্রবলতর হয়। তখন সে যে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, সে ছাড়া যে একটা বহির্জ্জগৎ আছে—এই জ্ঞান উদিত হয় এবং এই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জ্জগৎটা দেখিবার—ভোগ করিবার বলবতী বাসনা জাগিয়া উঠে। এই বাসনা তাহার স্থূল আবরণের উপর এরূপ শক্তি বিস্তার করে যে উহা নবভাবে গঠিত হয়, উহাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয়, প্রত্যুত সে এখন উদ্ভিদবস্থা ত্যাগ করিয়া পশুশ্রেণীতে উন্নীত হয়। লক্ষাধিক বৎসর নানা পশুদেহে বাস করিয়া, অসংখ্য সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে, যখন তাহার ইন্দ্রিয়গুলি বেশ সতেজ ও বলবান হয়, যখন কাম, ক্রোধ, লোভ হিংসাদি বেশ পরিপুষ্টি লাভ করে, যখন মানসিক শক্তি (যথা স্মৃতি, কল্পনা, ধারণাদি) ঈষৎ অঙ্কুরিত হয়, তখন তাহার দেহ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া নরদেহে পরিণত হয়।

শিষ্য। কিন্তু বৃক্ষ ও মানবে যে এত প্রভেদ কেন তাহা তো বুঝিলাম না। বৃক্ষে যে আত্মা, মানবেও সেই আত্মা ; বৃক্ষের পাঁচটি দেহ, মানবেরও পাঁচটি দেহ।

গুরু। এইখানেই ভুল করিলে। বৃক্ষের পাঁচটি কোষ আছে বটে, কিন্তু কোষ আর দেহ এক জিনিষ নহে। জীবাত্মা নামিবার সময় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্যোম-তত্ত্ব প্রভৃতি যে আবরণ গুলির দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেই আবরণ

গুলিই এক একটি কোষ। এই কোষগুলি তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ ঢাকিয়া ফেলে, এই জন্যই এই অধোগমনকে ক্রমঃ-আচ্ছাদন (Involution) বলা হয়। পৃথিবীতে আসিয়া সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রামের দ্বারা সে এক একটি কোষ হইতে এক একটি দেহ নির্ম্মাণ করে এবং উদ্ভিদ্, পশু, মানব ও দেবতাদির পদ লাভ করতঃ ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে! এই দেহ গুলি তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশ করে। এই জন্যই এই ঊর্দ্ধগমনের নাম ক্রম-বিকাশ (Evolution) এখন কোষ ও দেহে প্রভেদ বুঝিলে তো? কোষ যেন কতকগুলো মাল-মসলা আর দেহ যেন একটি সুনির্ম্মিত অট্টালিকা। জীবাত্মারূপ মিস্ত্রি কতকগুলো মাল-মসলার বোঝা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং ইহাদ্বারা এক একটি বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। যখন সকল গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়া যায়, তখন তাহার কার্য্য শেষ হয়, তখন সে স্বচ্ছন্দে নিজধামে বাস করিতে পারে, অথবা যে গৃহে ইচ্ছা সেই গৃহে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পারে।

শিষ্য। তাহা হইলে এই দেহ নির্ম্মাণের নামই কি ক্রমোন্নতি? দেহ-নির্ম্মাণের জন্যই কি আমাদের পৃথিবীতে আসা?

গুরু। ঠিক তাই। আত্মা নিত্য ও পূর্ণ, তাঁহার উন্নতি ও অবনতি নাই। এই দেহ বা উপাধিগুলি যতই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে এবং যত অধিক-সংখ্যক উপাধি আমরা নির্ম্মাণ করিতে পারিব, আত্মা ততই প্রকাশিত হইবেন। যেমন একই আলোক নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই আত্মা বিভিন্ন উপাধিতে বিভিন্ন চৈতন্যরূপে প্রকটিত হন। আর একটি উপমা দিতেছি শুন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একটিমাত্র মূল শব্দ আছে। তাহা অজ্ঞাত ও অব্যক্ত অর্থাৎ কিম্বিধ ও কিম্ভূত কেহই জানে না। পৃথিবীতে আমরা যত শব্দ শুনিতে পাই, সূচিপতনের শব্দ হইতে মেঘগর্জ্জন, যাবতীয় জীবের কণ্ঠস্বর, যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি প্রভৃতি যত কিছু শব্দ জগতে আছে সমস্তই সেই এক মূল শব্দ হইতে উৎপন্ন,—তাহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র (different manifestations)। এখন মনে কর এক সুনিপুণ শিল্পী তোমাকে কাঠ, লোহা, তামা, রূপা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া এক কারখানাতে পাঠাইলেন। তুমি

সেখানে দিবারাত্রি খাটিয়া নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলে। অবশ্য তোমার যন্ত্রগুলি প্রথমে মোটা ও অসম্পূর্ণ হইতে লাগিল, উহা হইতে ভাল সুর বাহির হয় না। ক্রমে তুমি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিলে। এইরূপে তুমি যতই সূক্ষ্ম তার যোজনা করিতে লাগিলে, যতই কোমল পর্দ্দা বসাইতে শিখিলে, তোমার বাদ্যযন্ত্র হইতে ততই সুন্দর, ও সুমধুর স্বর নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে তুমি দেখিলে, তোমার যন্ত্রগুলি পূর্ণতার সীমায় উপনীত হইয়াছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট উপকরণ দ্বারা পূর্ণতর বা সূক্ষ্মতর যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না,—হয়ত তার কাটিয়া যায়, বা কাঠ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তুমি বুঝিবে তোমার কারখানার কাজ ফুরাইয়াছে, তুমিও একএকজন শিল্পী হইয়াছ, তখন তুমি ঐ সকল উপকরণ দ্বারা যে যন্ত্র ইচ্ছা সেই যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারিবে। আচ্ছা, এখন কি বুঝিলে বল দেখি।

শিষ্য। আজ্ঞে, এখানে মূল অব্যক্ত শব্দটি ব্রহ্ম বা আত্মা, সুনিপুণ শিল্পী ঈশ্বর, আমি একটি জীব (monad), কাঠ-লোহাদি উপকরণ ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত বা প্রকৃতি (matter), কারখানা এই বিশ্বসংসার, বাদ্যযন্ত্র নানাবিধ দেহ বা উপাধি এবং যন্ত্রের সুর জীবের অনুভূতি বা জ্ঞান (consciousness)। বুঝিলাম এই যে, জীবাত্মা ক্ষিত্যপ্‌তেজাদির আবরণে জড়িত হইয়া এই পৃথিবীতে আসে এবং বহু সংগ্রামের পর এগুলিকে বশীভূত করিয়া এতদ্দ্বারা এক একটি দেহ নির্ম্মাণ করে। এই দেহ যতই সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল হয়, আত্মা ইহাতে ততই বিকাশ পান, অর্থাৎ ততই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। অবশেষে, তাঁহার দেহ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজাদির দেহ যতটা পূর্ণ হইতে পারে ততটা যখন হয়, তখন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। এখন একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যখন তিনি সকল রকম যন্ত্রই প্রস্তুত করিতে শিখিলেন— সর্ব্বপ্রকার উপাধি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, তখন উঁহার অবস্থাটি কিরূপ?

গুরু। তখন তিনি একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইয়াছেন, একটি ব্রহ্মা হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতি-জাত অসংখ্য ভূতকে (ক্ষিত্যপ্‌তেজাদিকে) যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে চালাইতে ফিরাইতে, গড়িতে ভাঙ্গিতে সমর্থ, সুতরাং একটি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ তাঁহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। এখন তিনি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছেন,—স্ববশে আনিয়াছেন; তিনি আর প্রকৃতির দাস

নহেন, প্রভু। এখন একটা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার দেহ বা উপাধি। ব্রহ্মাণ্ড কি জানতো? এক একটা সৌরজগৎই এক একটা ব্রহ্মাণ্ড। আমার কিম্বা তোমার যেমন সাড়ে তিন হাত পরিমিত এক একটি দেহ আছে, সেইরূপ গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত একটা গোটা সৌরজগৎই তাঁহার দেহ। আমাদের এই ক্ষুদ্রদেহে অনন্ত ব্রহ্মের (বা আত্মার) যতটুকুই প্রকাশ পায়, ততটুকুই যেমন আমাদের চৈতন্য (consciousness), সেইরূপ তাঁহার এই বিরাট দেহে অনন্ত ব্রহ্মের যতটা প্রকাশ পায় ততটা তাঁহার চৈতন্য। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের (microcosm এর) মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ আছে, তাঁহার দেহের (macrocosm এর) মধ্যেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আছে। সমগ্র ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোকই তাঁহার স্থূলদেহ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারি লোক তাঁহার সূক্ষ্মদেহ এবং তদতীত অবস্থাই তাঁহার কারণ-দেহ। আমরা যেরূপ জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে এবং স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে বাস করি, তিনিও সেইরূপ যত দিন জাগরিত থাকেন, তত দিনই ভূ, ভুব, স্বঃ থাকে, নিদ্রিত হইলে এ গুলি থাকে না, লয় পায়। এই জন্যই তাঁহার নিদ্রার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। আমাদের ১২ ঘণ্টা দিবা, ১২ ঘণ্টা রাত্রি, তাঁহার এক কল্প দিবা, এক কল্প রাত্রি। এক কল্প চারশ' বত্রিশ (৪৩২) কোটি বৎসর। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের যেমন জন্ম ও মৃত্যু আছে, তাঁহার বিরাট দেহেরও সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু আছে। তাঁহার জন্মের নাম ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব বা সৃষ্টি, এবং মৃত্যুর নাম মহাপ্রলয়। আমাদের মৃত্যু হইলে, যেমন আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, এবং আমরা কিছুকাল কারণাতীত অবস্থায় অবস্থান করি, তাঁহার মৃত্যু হইলেও সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহটি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, ক্ষিতিতত্ত্ব অপ্‌তত্ত্বে, অপ্‌ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু অকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহৎ প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং তিনি সেই কারণাতীত অনন্ত সৎ-এ বিলীন হইয়া যান।

শিষ্য। সবই তো অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। তখন তবে থাকে কি?

গুরু। থাকেন কেবল মায়া। যেখানে সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড ছিল, এখন সেখানে আর কিছুই নাই, আছেন কেবল এক অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি, মায়া।

শিষ্য। এই মায়াটি কি?

গুরু। মায়া কি, বলা বড় কঠিন। তবে এক দিক থেকে বলা যায় উপাধি নির্ম্মাণের শক্তিই মায়া। এ শক্তি কার? ব্রহ্মের। এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম বা আত্মা অসংখ্য উপাধি নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

শিষ্য। ঠিক বুঝতে পারিলাম না।

গুরু। আচ্ছা, সেই বাদ্যযন্ত্রের উপমাটাই লও। তুমি সমস্ত দিন শ্রম ক'রে একটা নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিলে। রাত্রে যখন নিদ্রা যাও, ঐ শক্তিটা কোথায় থাকে? লোপ পায় কি? কখনই না, কারণ ঘুম ভাঙ্গিলেই উহা আছে জানিতে পার। তোমার নিদ্রাবস্থায় যেমন ঐ শক্তিটি তোমার মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, সেইরূপ মানবের মৃত্যুর পর তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, সে ঐ জীবনে যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছে,—স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা, রচনা শক্তি বা দয়া, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি—যাবতীয় শক্তি, বীজভাবে তাহার কারণ-দেহে অবস্থান করে। এই শক্তিপুঞ্জের নামই মায়া, কারণ উহাই উক্ত জীবাত্মার উন্নতির পরিমাপক ও পরিচায়ক, উহা দ্বারাই বুঝা যায় ঐ জীবাত্মা কতদূর উন্নত হইয়াছেন, কতদূর সূক্ষ্ম উপাধি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম। জীবাত্মা যতকাল কারণ-দেহে (বা কারণাতীত অবস্থায়) থাকেন, এই শক্তিপুঞ্জ বীজভাবে তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে এবং যখন তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হন, এই শক্তিপুঞ্জই তাঁহার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ নিয়মিত করে। মানবের পক্ষে যে নিয়ম, ব্রহ্মার পক্ষেও ঠিক তাই। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি পরব্রহ্মে লীন হইলে, যেখানে ব্রহ্মাণ্ড ছিল সেখানে থাকেন কেবল মায়া। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহধারণ কালে তাঁহার যে জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা বা দয়া, প্রেম প্রভৃতি ছিল, সেই সমস্ত শক্তিই অনন্ত শূন্যের সেই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে থাকিয়া যায়, তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে। ইহা কিরূপ জান? একটা খোলস বা আবরণের মত। যে খোলসটি পরিয়া তিনি এতকাল আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্রষ্টা, কর্ত্তা ও পাতা হইয়াছিলেন, এখন সেই খোলসটি ছাড়িয়া অসীম হইয়া যান। খোলসটি শূন্যে ঝুলিতে থাকে। আবার সহস্র সহস্র কল্পান্তে তিনি যেমন ঐ খোলসটি পরিধান করেন অমনি তাঁহার যাবতীয় পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে, তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলেন "বাছারে, তোদের এতদিন ভুলিয়াছিলাম।

আর তো'দিগকেও সেই অনন্তের সুখভাগী করিব।" এই বলিয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডাদি রচনা করেন।

শিষ্য। তা'হলে বুঝিলাম যে এই খোলসটিই (মায়াই) জীবের শেষ উপাধি। এই উপাধিটি নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই জীব ঈশ্বর হইয়া যান। আচ্ছা প্রত্যেক জীবই কি এক একটি ঈশ্বর হইবেন?

গুরু। নিশ্চয়ই। জীব যে কি বস্তু তাহা কি ভুলিয়া গেলে? স্বয়ং ব্রহ্মই জীব, সুতরাং জীবের শক্তির সীমা আছে কি? একবার অনন্ত শূন্যের দিকে চাহিয়া দেখ! দেখিবে কোটি কোটি সৌরজগৎ উহাতে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এক একটি সৌরজগৎই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেরই এক একজন ঈশ্বর বা ব্রহ্মা আছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবই ছিলেন, কোটি কোটি কল্পে ক্রমোন্নত হইয়া এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন। এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কি জান? অনন্ত ব্রহ্মের এক একটি শক্তিকেন্দ্র বা লীলা-ক্ষেত্র। এইরূপ কোটি কোটি,—শক্তিকেন্দ্র তাঁহাতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া আরও কোটি কোটি শক্তিকেন্দ্র নির্ম্মিত হইবে। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন আপনাকে অসংখ্যরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া (অসংখ্য মায়ার খোলস পরিয়া) অসংখ্য ঈশ্বর-রূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও পালন করেন। আবার যখন তাঁহার লীলা সাঙ্গ হয়, তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন থাকেন কেবল তিনি একাকী—একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য শক্তিকেন্দ্রে তাঁহার অনন্ত মায়া (বা বিশ্ব-রচনা-শক্তি) অতি সূক্ষ্ম ভাবে—বীজ ভাবে অবস্থান করে, এবং তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করে। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইলে, আবার তিনি প্রকাশিত হন, আবার অসংখ্য শক্তিকেন্দ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়। এই প্রকাশ ও অন্তর্ধান, আবির্ভাব ও তিরোভাব, সৃষ্টি ও লয় অনন্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিয়াছে। ইহাই তাঁহার লীলা, তাঁহার খেলা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব —যাবতীয় পদার্থ ঠিক এই খেলাই খেলিতেছে, স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে এই লীলারই অভিনয় করিতেছে,—বিরাট বিশ্বনৃত্যের ঠিক তালে তালে নাচিতেছে। জন্ম মৃত্যু, জাগরণ সুষুপ্তি, যৌবন জরা, বসন্ত শীত, জোয়ার ভাটা, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ইত্যাদি সমস্তই এই বিশ্বনৃত্যের

এক একটি ক্ষুদ্র অভিনয় মাত্র—যবনিকার বাহিরে আসা এবং ভিতরে যাওয়া—আর কিছুই নহে। একই প্রাণ,—একই বস্তু অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একই লীলার অভিনয় করিতেছেন; অভিনেতা একজন, নাটক বা বিষয়ও একটি, কেবল পোষাক অসংখ্য,—ইহাই জগৎ, ইহাই সব।

শিষ্য। প্রভো, আজ আপনার কৃপায় অনেক শিখিলাম, অনেক বুঝিলাম। আজ গীতার,

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।"
"অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।"
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"
"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

গুরু। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। গীতা বুঝিলেই সব বুঝা হয়।

শিষ্য। আজ বিদায় দিন। (পদধূলি গ্রহণ)

গুরু। এস, বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তুমি ভগবানের সেবা করিয়া জ্ঞানে ও প্রেমে উন্নতি লাভ কর।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরেরই একটী কার্য্য, যাহার পরিণাম অশেষবিধ,—এইমত হইতে এক্ষণে নূতন নূতন ঘোর অশান্তিজনক প্রশ্ন সমূহ উত্থিত হইয়াছে, "যদি ব্রহ্ম অনাদি এবং বিশ্বরচনা তাঁহার একটী পৃথক্ কার্য্য মাত্র হইল, তাহাহইলে এই সৃষ্টি কি কারণে হইয়াছে? কি কারণে আত্মন্তরহিত

নিশ্চলতার মধ্যে অকস্মাৎ ঈষৎ স্ফুরণ হইল? যিনি তাঁহার অনন্তে নিত্য-তুষ্ট, সেই আত্মারাম ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই নিদারুণ ক্লেশ ও নিরাশাপূর্ণ জগৎ-সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য? আদিরহিত অতীতে যে পূর্ণানন্দে তিনি তুষ্ট ছিলেন, তিনি সেই আনন্দেই কেন স্থির রহিলেন না?" এইরূপে সন্দেহের উপর সন্দেহ, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন আসিয়া পড়ায়, তাহাদের উত্তর প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য কবিবর শেলী (Shelley) তাঁহার কুইনম্যাব (Queen Mab) নামীয় কবিতায় অনাময় ন্যায়-সহকারে ব্যঙ্গচ্ছলে এই অবস্থা সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন; তাঁহার ভাবটী এই—"সর্ব্বতোভাবে প্রসুপ্তের ন্যায় ঘোর তমাবৃত চিত্ত ও শরীরের প্রযত্নাভাব হইতে আমি, ঈশ্বর, জাগরিত হইয়া সপ্তদিন দারুণ পরিশ্রম করত শূন্যমধ্য হইতে জগৎ-রচনা করিয়াছিলাম; এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-লাভের পর আদিমানব সৃজন করিয়া তাহাকে স্বর্গে স্থাপিত করি। তথায় মৃত্যুফলবাহী একটী মনোহর তরু রোপণ করিয়াছিলাম—যে ফল ভক্ষণে নর পতিত হইবে, এবং আমার আত্মা দ্বেষ প্রকাশের জন্য তাহার চির-অভিলষিত ছলটী পাইতে পারিবে ও পাষাণহৃদয় জগৎবিজেতাগণসদৃশ মানবের ক্লেশরাশি আমার গৌরবে পরিণত করিবে।"

কেহ কহেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। পাপ ও তজ্জন্য অনন্ত নরক বিধান সম্বন্ধে শেলীর নিদারুণ ব্যঙ্গ তাহার অভিপ্রেত কার্য্য যথার্থতঃ করিবে। মুসলমান ধর্ম্ম অধিকতর সুমিষ্টভাবে ইহার উত্তর প্রদান করিয়াছে; ডেভিট্ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তাঁহার বিশ্ব রচনার উদ্দেশ্য কি?" উত্তর আসিল:—"আমি একটী গুপ্ত নিধিস্বরূপ, এবং আমি প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিলাম"—এই উত্তরে ঈশ্বরের হৃদয়ে পরম প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। অপর কেহ কহেন, "ব্রহ্মানন্দকে বিশ্বের সারাংশ করিবার অভিলাষে এই সৃষ্টিরচনা।" সত্য বটে, কিন্তু যন্ত্রণা সম্বন্ধে কি? উপরোক্ত উত্তর সকল বলবত্তর প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করে না। "ক্লেশ কেন"? "অবিদ্যা কি জন্য"? প্রধানতঃ "পাপ কি জন্য"? 'ঈশ্বর যিনি পূর্ণস্বরূপ, তিনি কেমনে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং ক্লেশই বা কেন তাঁহার সৃষ্টির একটী অঙ্গ হইল? যদ্যপি তিনি ইচ্ছানুসারে তাহা দূর করিতে

না পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন ; এবং যদ্যপি তাহা পারেন, অথচ করেন না, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন।"

(Gohn stuart mill) মিল সাহেবের মৃত্যুর পর তৎকৃত যে প্রবন্ধ-সমূহ বাহির হইয়াছে, তাহাতে তিনি স্পষ্ট লিখিতেছেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা যুগপৎ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় হইতে পারেন না ; তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় হইতে পারেন এবং জড় পদার্থের সম্বন্ধে যতদূর ভাল করিতে পারা যায় তাহা যথাসাধ্য তিনি করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তাহাহইলে লোকে যাহাকে 'মঙ্গলময়' কহে তিনি তাহা নহেন। কিন্তু এপ্রকার উত্তরে মন তৃপ্তিলাভ করেনা ; জগতে মানসিক বিবিধ ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য, জাতি, কুল, ধনমর্য্যাদা, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উচ্চ-নীচতা আরও অনেকানেক অসামঞ্জস্য, যাহা অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্ববৎ এসম্বন্ধেও কোন মীমাংসা দৃষ্ট হয়না।

মনুষ্যের পরলোক সম্বন্ধেও বিশেষ বিচার আবশ্যক :—দেহান্তে মানব কোথায় যায়, তাহার কি অবস্থা প্রাপ্তি হয়,—কেহ বলেন অস্তিত্ব থাকে, এবং কেহ কহেন কিছুই থাকেনা "অস্তীত্যেকে নায়মস্তি চান্যে"—এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রয়োজন। বিশ্বের এক কণামাত্র অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইলে, একটী উদ্দেশ্যবিহীন জটিল ভাবমাত্র হইয়া পড়ে। যগুপি এই সমস্ত পরিশেষে পুনরায় অনন্ত তমোভূত অকর্ম্মণ্যতা ও নিরর্থকতা মাত্র প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অজস্র অশ্রুকণা বিসর্জ্জনে অপার যন্ত্রণা সহ্য করত লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রকৃতির কঠিন হস্ত হইতে যে ফল অতিক্লেশে অর্জ্জন করা যায়, তাহার কি প্রয়োজন হইতে পারে ?

'দ্বৈত' বা 'দ্বন্দ্ব' দ্বিভাব বহন করে—দুইটী মূল ও সদা বিরোধিভাব—একটি কূটস্থ নিত্য ও অপরটি পরিণামি নিত্য—উভয়ই একইরূপ নিত্য ও অসীম—যাহাদের ক্রিয়া পরস্পরে সংক্রমণে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দুইটী চরম অবিভাজ্য বস্তু আছে, তাহাদের পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া হইতে বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হয়। তাহারা বহুধা আখ্যায়িত হইয়া থাকে :—"রয়ি ও প্রাণ," "প্রকৃতি ও পুরুষ" "জড় ও চিৎ," "সৎ ও অসৎ," "Positive and negetive"—সদাই দুই, এবং সদাই পরস্পর বিরোধী। সাংখ্য দর্শনে ইহা

পুরুষ প্রকৃতিরূপে অভিধেয় হইয়াছে। পুরুষ—যিনি চৈতন্য—তাঁহার সান্নিধ্যবশাৎ প্রকৃতি যিনি জড়, নানা মূর্ত্তি উৎপাদন করেন। এই দর্শনশাস্ত্রে পুরুষকে নানা ও প্রকৃতিকে এক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক ঝোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কহিয়া থাকে যে, জগতে দুইটী পৃথক্ শক্তি বর্ত্তমান আছে এবং তাহারা পরস্পর সদা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। উহাদের মধ্যে একটী উত্তম ও হিতকারী, তাহার কার্য্য—রচনা করা, এবং অপরটী মন্দ ও অহিতকারী, তাহার কার্য্য—সমস্ত নষ্ট করা; মানব স্বেচ্ছাক্রমে প্রথমটী কিম্বা দ্বিতীয়টী অবলম্বন করিতে পারেন। পুরাতন ঝোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মমতে উল্লিখিত আছে যে, ঐ দুইটী শক্তির পশ্চাতে একটী মাত্র শক্তি অধিষ্ঠিত আছে। আধুনিক মতের উপর একটী ব্যাবহারিক ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করা যায়; কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্তি-লাভ করেনা, ইহাতে সন্দেহ-সমূহের চরম মীমাংসা কিছুই পাওয়া যায় না। সাংখ্য ও আধুনিক ঝোরোয়াষ্ট্রীয় দ্বৈতমত এবং আধুনিক বিজ্ঞান-বাদীদিগের জড় ও শক্তি (Matter and Energy)—দ্বন্দ্বাশ্রিত এই সকল মতদ্বারা সম্প্রতি অধিকাংশ মনীষিগণ চালিত হইতেছেন। এতদ্দ্বারা অনেককে শেষে (Agnostic) অজ্ঞেয়ত্ববাদী হইতে হইয়াছে—তাঁহারা কহেন ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কেহ কখনও জানিতে পারেনা। ইহাতে চরম প্রশ্নসমূহ অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে—কারণ উক্তদ্বন্দ্বের ক্রিয়া প্রবাহরূপে চলিতে থাকিলে, অন্ত কোথাও পাওয়া সম্ভবে না—জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অসার বস্তু-সমূহ আসিতেছে, যাইতেছে এবং যাইয়া পুনরায় উদিত হইতেছে। বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাণ ও চৈতন্য, জড় এবং জড়শক্তি (Energy) হইতে উদ্ভূত—উহা কতিপয় বিশেষ সন্নিবেশন ও পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং 'প্রাণ' কোথা হইতে আইসে ও কোথায় যায় এ প্রশ্নই নিষ্প্র-য়োজন ও ভ্রমমূলক হইয়া পড়িল—'প্রাণ' আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট দ্রব্যমাত্রের পরস্পর সংঘাত ক্রিয়া হইতে উপজাত একটি অবস্থা বিশেষে পরিণত হইল। কারণ ও নিয়ম জিজ্ঞাসিত হইলে, পদার্থের বিশেষ সন্নিবেশন দেখাইয়াই সকলে স্থির হইলেন। মনুষ্যের শাশ্বত ও নিত্যভাব জড়-বিজ্ঞান-বিদ্‌দিগের দ্বৈত প্রমাণ দ্বারা দূরীভূত হইল—কিন্তু ধর্ম্ম ও দার্শনিক শাস্ত্রের দ্বৈত হইতে সেরূপ হইল না, (কারণ) পুরুষ বা প্রাণ তাহাদের

দ্বন্দ্বভাবের একটী বা অপরটী হইতেই হইবে এবং সেই 'পুরুষ' অন্যটীর (প্রকৃতির) ন্যায় নিত্য।

ঐরূপ দ্বৈতমত যতই পরিষ্কৃতরূপে প্রমাণ করুক না কেন, যে ক্লেশ ও দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্মবশাৎ কিম্বা (Apriman) নষ্টাত্মা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হওয়ত হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসু জীব তাহার নিজের স্বভাবজ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া দ্বন্দ্বোৎপন্ন জ্ঞানে কোনরূপে চিরতৃপ্তিলাভ না করিয়া, দ্বৈতমত পরিশেষে পরিত্যাগ করে, এবং পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়—জীবমাত্রেরই অন্তর হইতে স্বতঃ উদ্ভূত একটী সহজ জ্ঞান, প্রথমাবধি একত্ব অনুভব করে, এবং সেই জ্ঞান অতি অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত থাকায়, জীব সত্যানুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীব প্রথমে আরম্ভবাদ আশ্রয় করিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হওয়ত, পরিণামবাদে দুইটী নিত্য মূল-কারণের আশ্রয় গ্রহণে অপেক্ষাকৃত অধিককাল সন্তুষ্ট থাকিয়া, তাহার মধ্যেও ক্রমে বহু অসামঞ্জস্য দর্শনে চরম সত্যলাভে হতাশ হওনানন্তর তাহাও পরিত্যাগ করত, পুনরায় ধ্রুবজ্ঞান-লোলুপ হইয়া, অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকে। যে পরম সত্যে পূর্ব্বার্জ্জিত আংশিক সত্যসমূহও অন্তর্নিহিত থাকিবে, অথচ কিছুমাত্রও অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য স্থান পাইবে না, সেই উত্তর মীমাংসার জন্য জীব এক্ষণে ধাবিত।

পূর্ণজ্ঞান কি সম্ভবপর? যতকাল বহুত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি না হয়, তাবৎ অসম্ভব। আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে ব্যবস্থিত ব্যবধানটী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণতর করিয়া আনিতে পারিলে একত্বে উপনীত হইতে পারা যায়। (Tyndall) টিন্ডল্ সাহেব কহিয়াছেন সেই ব্যবধানটী কোন সেতুর দ্বারা সঙ্কীর্ণ করণ অসাধ্য। যদ্যপি তাঁহার উক্তি সত্যে পরিণত হয়, যদি চিৎ জড় কোন প্রকারে একটী গভীর একত্বে পরিণত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে চির অসম্ভবনীয় হইয়া পড়ে। কারণ, পরিদৃশ্যমান বহুধা পৃথক্ ভাব-সমূহ একত্রে আবদ্ধ হইলে, একীভাবে পরিণত হইলে, যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে—দ্বন্দ্বভাবে ঐ জ্ঞান অবস্থিত নহে। আমরা [illegible] স্পন্দন দেখিতে পাই, স্নায়ু যন্ত্রের কম্পন অনুভব করি, স্নায়বীয় বায়ু বা শক্তি পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে দেখি; আমরা সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ, ঐ সকল গতির সহিত কিরূপ

তৎ গতি-বোধকারীর সম্বন্ধ কি ? ঐ সম্বন্ধ অজ্ঞাত থাকিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। মানবসত্তার দুইটী পার্শ্বের অর্থাৎ চিৎ জড়ের যোজককে চরম উত্তর-মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। কারণ, মানব স্বয়ং যথার্থতঃ অদ্বৈত, যদিও অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকাতে বহির্দৃষ্টিতে আপনাকে দ্বিভাবাপন্ন জ্ঞান করেন। ব্যক্তাবস্থার দুইভাগই—পুরুষ ও প্রকৃতি—মানবে (উচ্চস্তরে) বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় ; জীবাত্মা ও দেহ, শক্তি ও মূর্ত্তি, চৈতন্য ও উপাধি লইয়াই মনুষ্য। সেই সেতু মানুষের স্বভাবে গুপ্তভাবে অবস্থিত রহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পক্ষে যতই কঠিন ও অসম্ভব বলিয়া গণিত হউক না কেন—এ বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ।

কেহ কেহ কহেন একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন। "Mattar is the product of mind, imagined by the mind, exists by the mind." মন হইতে জড়ের উদ্ভব ; মন চিন্তা করায় ইহা আইসে, এবং উহাতে মনোযোগ না দিলে অর্থাৎ চিত্ত উহা হইতে বিকর্ষিত করিয়া লইলে, উহার নাশ হইয়া থাকে—যতদিন কোন বস্তুতে মনোনিবেশ করিবে, ততদিন সেই বস্তুর নাশ হইবে না। এতদ্দ্বারা তিনি এক গভীর সত্য-উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তাহাকে সামান্য রূপান্তরও করিলেন। জড়বাদীরা কহেন মন জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—উহা কেবল কতিপয় দ্রব্যের বিশেষ সন্নিবেশন ও তাহাদের সংযোগের ফল মাত্র। ইহারাও কিয়ৎ পরিমাণে সত্যস্পর্শ করিয়াছে—কিন্তু সামান্য অংশ মাত্র। শেষ মীমাংসায় উভয়কে একত্র মিলিত করিবে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ কেহই দেখায় নাই। সেই সম্বন্ধ অবগত হইলেই সকল দ্বন্দ্বই পরস্পর পরস্পরে মিশিয়া সমস্ত একীভূত হইয়া যাইবে।

আমি কি মুক্ত, না বদ্ধ ? আমি কি কতকগুলি অবস্থার ফল মাত্র, না তাহাদের কর্ত্তা ? আমি জানিতেছি যে, যে সকলের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহারা সকলেই আমার উপর স্ব স্ব শক্তি সঞ্চালন করিতেছে, এবং আমিও আমার পার্শ্ববর্ত্তী সকলের উপর প্রয়োজনানুসারে আমার শক্তি-প্রয়োগ করিতেছি। এইরূপ সতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা আমার চরিত্র গঠিত হইতেছে। রবার্টওয়েন (Robert owen) সাহেবকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া, কাহাকেও এক্ষণে কহিতে দেখা যায় না যে, মানব-সমূহ

তাহাদের অবস্থার অধীন ; এবং অনুকূল দেশ কাল ও সঙ্গলাভে সকলে সুস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই তাহাদের পূর্ব্বকর্ম্মজাত জীবন্ত স্বভাব সঙ্গে লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে—তদ্দ্বারা তাহাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কহিতেছে যে, স্বভাব শিক্ষাদি হইতে প্রবলতর।

আত্ম বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সততই জানিতে পারি যে, আমরা বদ্ধ। যখন স্বয়ং প্রশ্ন করি ; "কেন আমি ইহা মনোনীত করিলাম ?" "কেন আমি এই পথ অবলম্বন করিলাম ?" "কেন আমি আমার ইচ্ছা অপর দিকে সঞ্চালিত না করিয়া এই দিকে সঞ্চালিত করিলাম ?" তখন আমরা দেখিতে পাই, প্রভূত পরিমাণে (কত অধিক) বংশ-পরম্পরানুগত গুণ, কত অধিক মানসিক ও নীতি-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব সংস্কার আমাদের নির্ব্বাচনের অন্তরালে অবস্থিত হইয়া তাহাকে দলিত করিতেছে—তদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আমাদের জীবন দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ; এবং মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, শিশুমাত্রেই তাহাদের গলদেশে অদৃষ্ট-সংলগ্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহাও তত অসঙ্গত বোধ হয় না। অদৃষ্টের প্রধান অঙ্গ চরিত্র, প্রতিশিশুই তাহার চরিত্র সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে আমরা সকলে বদ্ধ, এই মত সমর্থনে অদৃষ্টবাদী (Determinists) অনেক কহিতে পারেন।

তথাপি চৈতন্যের গভীরতম স্থল হইতে আমাদিগের স্বাধীনতার জ্ঞান—জীব স্বতই মুক্ত এইজ্ঞান, উত্থিত হইয়া থাকে। এই সুগভীর-নিহিত জ্ঞানকে ভ্রমমূলক কহায় কোন ফল নাই এবং সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ তাহা হইলে, জীবাত্মার আত্মোপলব্ধি-জনিত বলবৎ প্রমাণ অস্বীকার করিতে হয়—একমাত্র চরম ধ্রুবস্ত এবং 'আমি'র অর্থাৎ প্রত্যক্-চৈতন্যের যাথার্থ্যেও সন্দেহ করিতে হয়। জীব-চৈতন্য বহুবিধ ঘটনাবলী হইতে কিম্বা তাঁহার নিজের বাহ্য দর্শন হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহাও সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ ভ্রান্তিপূর্ণ হইবার সম্ভব। কিন্তু তাঁহার আত্মদর্শন-জনিত জ্ঞান সদাই অভ্রান্ত—সেই জ্ঞান অপর সকল জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। "আমি আছি" এই "আছি মাত্রের" স্বাবলম্বনতা, স্বকীয় অনন্তের এই ধ্রুবোক্তি, স্বীয় মুক্তিভাব বা অসীম স্বাধীনতা প্রকাশ করিতেছে। পরাধীনই বদ্ধ ; স্বাধীনই মুক্ত। বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে 'উত্তর-মীমাংসা' বিশদরূপে বর্ণনা করিবে।

উপরোক্ত যে সকল প্রশ্ন লইয়া, আমরা অবতারণা আরম্ভ করিলাম এবং অপর-বহু প্রশ্নও মীমাংসার অপেক্ষা করিতেছে। আমরা চরম উত্তরের অনু-সন্ধানে ব্যস্ত, যদ্দ্বারা সকলই মীমাংসিত হইবে। এমন কুঞ্চিকা অন্বেষণ করিতেছি, যদ্দ্বারা সকল অবরোধনই মুক্ত হইবে। যত্তপি ইহা লাভে সক্ষম হই, তাহা হইলে শান্তি পাইতে পারিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

পুরুষোত্তম-দর্শন।

(১)

"কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে রাধাকান্ত।
শ্যাম-শ্যামা কেন ভেদ কররে জীব ভ্রান্ত॥
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।
কিবা, কালোপরে কালো-শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী, অট্টহাসি, বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ-পদদ্বয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,—
সুর-নরে সাধে সারা দিনান্ত॥
দিয়ে, সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিনী রাই করেন সেবা,
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত॥" *

অপার জলধির অতলস্পর্শ বারিগর্ভ ভেদ করিয়া তরুণ অরুণ, প্রাচ্য-নভোমণ্ডল সিন্দুর-ছটায় রঞ্জিত করিয়াছেন। উষার স্নিগ্ধ সমীরণ ভক্তিভরে অবনত-মস্তকে পক্ষপুট দ্বারা পুরুষোত্তমের মন্দির ব্যজন করিতেছেন; দিন-মণি দিব্যকুসুম-কর-নিকর দ্বারা প্রসন্ন-বদনে অঞ্জলি-প্রদান করিতেছেন।

---

* রাগিণী সিন্ধু, তাল কাওয়ালী। দাশরথি রায় কৃত।

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ যেন শান্তি ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছে। জনৈক বৃদ্ধ ধীরে ধীর উল্লিখিত গানটী গাইতে গাইতে ক্রমে শ্রীমন্দিরের সম্মুখীন হইতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাজুট, ভালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল, পরিধানে রক্তবস্ত্র। তাঁহার আনাভি পলিত শ্মশ্রুরাজি, গোমুখ হইতে জাহ্নবী-ধারার ন্যায় বদনমণ্ডল হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। বৃদ্ধ যত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন ততই উচ্চৈঃস্বরে গানটী গাইতেছেন এবং তাঁহার নয়ন-যুগল দরদরিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান ফুরাইল। এক দৃষ্টে মন্দিরের বহিরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন।

কলিকাতার দুইটী বাবু বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য পুরীতে গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ "মর্ণিং ওয়াক্" করিতে বাহির হইয়াছেন। সমুদ্র-বায়ু সেবন করিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মন্দির প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের একজন অপরকে বলিতেছেন, "ভাই! ঐ দেখ জনেক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একদৃষ্টে মন্দিরের গায়ের ছবিগুলি দেখিতেছে। ওরকম অশ্লীল ছবি আমি কুত্রাপি দেখি নাই। ঐ গুলি অপরের সমক্ষে দেখা দূরের কথা, একাকী দেখিতেও লজ্জা হয়। ভাই! বল দেখি, ঐসকল ছবি দেখিলে মনে কুভাবের উদ্রেক হয় কি না। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তবু উহার মনের কুবৃত্তি যুবকের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে। নৈলে ঐ অশ্লীল ছবিগুলি এক মনে দেখিবে কেন?"

দ্বিতীয় বাবু। "ভাই ঠিক বলিয়াছ! বুড়া রসের গুড়ঁা; দেখিতেছ না, বুড়াটা তান্ত্রিক। মদ্য, মাংস, মৈথুন উহার ধর্ম্ম; তাই ঐ অশ্লীল ছবি গুলি উহার মন-প্রাণ হরণ করিয়াছে।"

প্রথম বাবু। "আচ্ছা, জগন্নাথ ত তান্ত্রিকের দেবতা নন, তবে তাঁহার মন্দিরের গায়ে এ সব কীর্ত্তি কেন?"

দ্বি, বা। "জগন্নাথ তান্ত্রিকের দেবতা নন সত্য বটে কিন্তু তিনি বৃন্দাবনে মধুপান করিতেন, একালে মধুপান করেন না, মাংসও খান না, মুৎস্তটা তাঁহার অনেক ভক্তে খায় বটে, উৎসর্গ করিয়া খায় কি না বলিতে পারি না। শেষ দফাটা তাঁহার চিরকালই আছে—বৃন্দাবনে ও দ্বারকায় পূর্ণমাত্রায় ছিল;

এই মন্দিরেও দেবদাসীগণ আছে, তাহারা প্রতিরাত্রে তাঁহাকে নৃত্য-গীত দ্বারা সুখী করিয়া থাকে। এ সব মনের কথা মনে থাকাই ভাল; লোকে শুনিলে আমাদিগের মান সম্ভ্রম এককালীন নষ্ট হইবে। আমরা পদস্থ লোক, Public opinion এর স্রোতে গা ঢালিয়া চলাই আমাদিগের ধর্ম্ম। আমরা সুতরাং পরমভক্ত বৈষ্ণব চূড়ামণি! সে যাহা হউক, বুড়া ব্যাটার ভাব দেখে অবাক্ হলুম।"

এইরূপ সারগর্ভ, সুমিষ্ট আলাপ করিতে করিতে বাবুদ্বয় বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন এবং জগন্নাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। "তোমাদিগের মঙ্গল হউক, মনের অন্ধকার ঘুচিয়া যাউক," এই বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাবুদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহাশয়! আমাদিগের মনে কি অন্ধকার আছে?" বৃদ্ধ বলিলেন, "যে অন্ধকারের মোহে পড়িয়া তোমরা দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছিলে সেই অন্ধকার।" বাবু বলিলেন, "বুঝাইয়া বলুন, আপনার প্রহেলিকা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা কাহারও নিন্দা করি নাই, যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছি।" "তোমরা যাহা বুঝিয়াছ তাহাই যে সত্য, ইহা কিরূপে জানিলে?" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ শ্রীমন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য পদ-সঞ্চার করিলেন। বাবুটী বোধ হইল অনুসন্ধিৎসু; তিনি বলিলেন, 'মহাশয় যাইবেন না, আমরা যাহা বুঝিয়াছি. আপামর সাধারণে তাহাই বুঝে; তাহা যদি সত্য না হয় তবে সত্য কি বলিয়া যান।" বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি শ্রীমন্দিরে যাইতেছি, এখন আর বিলম্ব করিতে পারি না। যদি সত্য সত্যই জগদম্বা তোমাদিগের মনে সত্যানুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিয়া থাকেন, তবে অদ্য রাত্রি দশটার সময়ে বিমলা-মন্দিরে আমার নিকটে যাইবে, জগতের সত্য কি বুঝাইয়া দিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্র, বাবু। 'ভাই! বৃদ্ধ নিতান্ত সামান্য লোক বলিয়া বোধ হইল না; বৃদ্ধের চক্ষুর বিমল জ্যোতিঃ, মুখের দিব্য কান্তি এবং ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। তাঁহার মুখে রহস্য কথা শুনিতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ বিমলা-মন্দির দেখা হয় নাই, তাহাও দেখা হইবে। আমি তথায় রাত্রে যাইব; তুমি যাইবে কি?"

দ্বি, বাবু। "তোমার দেখ্‌ছি, ভাই! মাথা ঘুরিয়াছে! রাত্রি দশটায় সময়ে? বিমলা-মন্দিরে? হা! হা! হা! ভাই! আমি বুদ্ধি বেচিয়া খাই; ওকালতী করি। আমি মনুষ্য-প্রকৃতির সওদাগরী করি। বঙ্কিম বাবুর "কপালকুণ্ডলা" পড়িয়াছ? ঐ বৃদ্ধ নরবলি দিবে, তাই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। তথায় অত রাত্রে কখনও যাওয়া হইবে না।"

প্র, বাবু। "তুমি দেখিতেছি, ভাই! ওকালতী করিয়া অতি-বুদ্ধি হইয়াছ। তোমার অনুমান-শক্তি পুরুভুজের ন্যায় অসংখ্য হস্ত-পদে পরিণত হইয়াছে, নতুবা ঐ বৃদ্ধের সহিত নরবলির সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপন করিলে? পূর্ব্বকালে ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকেরা নরবলি দিত শুনিয়াছি; ঐ ভীষণ ক্রিয়া বহুকাল লোপ পাইয়াছে। এখন, বিশেষতঃ এই পুরী নগরে, ইংরেজ রাজ্যে, উহার কোনই আশঙ্কা নাই।

দ্বি, বাবু। "স্কুল মাষ্টারী করিয়া তোমার বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি। তোমার ইচ্ছা হয় যাইও, আমি ভাই! যাইব না।"

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। জ্যোৎস্না-রাত্রি, মেঘ নাই; শারদীয় চন্দ্রমার বিমল-কিরণমালায় ভূষিত সমীরণ চারিদিকে নৃত্য করিতেছে পক্ষিগণ তালে তালে ললিত স্বরে কাকলী বর্ষণ করিতেছে। একটী বাবু ধীরে ধীরে রাজপথ দিয়া বিমলা-মন্দিরে উপস্থিত। মন্দির-প্রাঙ্গণ নিঃশব্দ, শান্তিময়। বাবুটী নিম্নে জুতা রাখিয়া অলিন্দে আরোহণ করিলেন। ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিলেন, কোথাও মনুষ্য নাই। হঠাৎ উকিল বাবুর কথা মনে পড়িয়া তাঁহার ভয় হইল। পরক্ষণেই মন্দির মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি মন্দির মধ্যে আলোক দেখিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। দ্বারে গিয়া দেখেন, দ্বার উদ্‌ঘাটিত, এক ক্ষুদ্র প্রদীপে মিটি মিটি করিয়া ঘৃতমাখান পলিতা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু দেবী-অঙ্গের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর আভা বিস্তৃত রহিয়াছে। বৃদ্ধ শ্রীঅঙ্গের সম্মুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। আগন্তুক ধীরে ধীরে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধ যোগাসনে বসিয়া শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বনে মালা জপ করিতেছেন। আগন্তুক দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি প্রথমে ভয়ে, পরে বিস্ময়ে দেবীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়াছেন। এখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইবার পর বৃদ্ধের নির্নিমেষ চক্ষুতে

পলক পড়িল; বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বাবা! আসিয়াছ, বেস্ করিয়াছ এখানে নরবলির কোন আশঙ্কা নাই।" আগন্তুক এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন; উকিল বাবুর সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা বৃদ্ধ কিরূপে জানিতে পারিলেন? ইহা মনের মধ্যে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবা? ঐ আসনে ব'সো। তোমার বন্ধুর কথা আমি কিরূপে শুনিলাম, ইহা তুমি আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিবে না। আমি উহা এইমাত্র মালাজপের পরে শুনিয়াছি, তাই তোমাকে আশ্বস্ত করিলাম।" আগন্তুক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ, তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নানারূপ গল্প দ্বারা তাঁহাকে অন্য মনস্ক করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "বাবা! মায়ের মন্দিরে আসিয়াছ, বিশেষতঃ আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, কিঞ্চিৎ জলযোগ কর, পরে কথাবার্ত্তা হইবে।" বৃদ্ধের এই কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে পার্শ্বস্থ কুটুরী হইতে অসামান্য-রূপবতী, এক ষোড়শী যুবতী নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য পূর্ণ দুই খানি থালা দুই হস্তে লইয়া মন্দির মধ্যে আসিল এবং থালা রাখিয়া জলের গ্লাস ও পান আনিল।

আগন্তুক। আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি, আর খাইব না, আমাকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন্।

ষোড়শী। সে কি মহাশয়! আমি যে অনেক পরিশ্রম করিয়া আপনার জন্য এই সকল উপাদেয় অমৃতোপম খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাদিগের বাঙ্গালা দেশে ওরূপ খাদ্য নাই। আমি কাশ্মীরে উহা শিখিয়াছি।

যুবতীর কমনীয় কান্তির সহিত কলকণ্ঠের যোগ হওয়ায় আগন্তুকের মনোমধ্যে বৈদ্যুতিক ঘাত হইতে লাগিল। তিনি কষ্টে মনের গতি দমন করিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "মহাশয়! দ্রব্যগুলি অতীব মনোহর, তাহা আকৃতি ও সৌরভে বুঝিতে পারিতেছি; ঐ রূপ দ্রব্য খাই নাই, ইহাও সত্য; কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই, উদর পূর্ণ রহিয়াছে; লোভ বশতঃ এখন আহার করিলে রোগ হইবে।"

বৃদ্ধ। আহার করিবার উদ্দেশ্য কি?

আগন্তুক। শরীরের ক্ষয় নিবারণ জন্য। শরীর নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ ক্ষয় পূরণ করিবার প্রয়োজনানুসারে স্বভাবতঃ ক্ষুধা হয়। ক্ষুধা

হইলে আহারে প্রবৃত্তি হয়। আহার না করিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয়। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যদি ক্ষুধা না দিতেন, তবে ক্ষয়রূপ নূতন ব্যাপার মানুষ বুঝিতে পারিত না; সুতরাং ক্ষয়পূরণ না হওয়ায় জীব-জগৎ ধ্বংস পাইত।

বৃদ্ধ। তবে আহার করিলে রসনার তৃপ্তি হয় কেন? মন প্রফুল্ল হয় কেন?

আ। উহা আহার-জনিত সুখ।

বৃদ্ধ। তবে ঐ সুখের জন্যেও ত আহার করা কর্ত্তব্য।

আ। তা বটে। কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করা, আহার-জনিত সুখ তাহার আনুষঙ্গিক যাহা আনুষঙ্গিক তাহাকে মুখ্য করিয়া মূল উদ্দেশ্য যাহারা ভুলিয়া যায় তাহারা লোভী, পেটুক তাহারা নানাবিধ রোগাক্রান্ত হয় এবং জন-সমাজে নিন্দনীয় হয়। লোভিগণ কেবল সুখের জন্য আহার করে, এমন কি, ঔষধাদি দ্বারা ভুক্তবস্তু শীঘ্র শীঘ্র পরিপাক করায়; পুনঃ পুনঃ আহার-জনিত তাহাদিগের কৃত্রিম ক্ষুধাও জন্মে।

বৃদ্ধ। বাবা ঠিক্ বলিয়াছ। আহারের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া আহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু তাহার মধ্যেও একটী সূক্ষ্ম কথা আছে। হিতভোগী, মিতভোগী এবং শ্রমোপভোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

আ। সে কি রকম?

বৃ। যে দ্রব্য শরীর-পোষক তাহাই আহার করার নাম হিতভোগ। তাহাও অপরিমিত আহার করিলে রোগ হয়; তজ্জন্য পরিমিতাহার কর্ত্তব্য। দৈহিক ব্যায়ামাদি না করিলে হিতাহার ও মিতাহারও রস-রক্তে পরিণত হয় না, তজ্জন্য ব্যায়ামাদিরও প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ নিয়ম পালন করিয়া চলিলে, দেহযন্ত্র আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ইহাই আহারের লৌকিক রহস্য।

আ। আহারের কি তবে একটা অলৌকিক রহস্য আছে?

বৃ। বাবা! কর্ম্মমাত্রেরই দুইটী ভাব আছে। লৌকিক ভাব দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পারমার্থিক ভাব দ্বারা পরমার্থ সাধন হয়। তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। তোমাকে বেশী কথা বলা অপ্রয়োজন। একালে যুবা, বৃদ্ধ; বালক, বালিকা; মূর্খ, পণ্ডিত; সকলেই গীতা পড়ে; উহা একটা ফ্যাসন্ হইয়াছে। তুমিও অবশ্য গীতা পড়িয়াছ।

আ। আজ্ঞে, হাঁ।

বৃ। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্র্হ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং" পড়িয়াছ ?

আ। আজ্ঞে পড়িয়াছি।

বৃদ্ধ। জগন্নাথকে যিনি জগন্ময় দেখেন এবং জগন্নাথে যিনি জগৎ দর্শন করেন তাঁহার আহারও ব্রহ্মযজ্ঞ। যিনি খাইতেছেন তিনি ব্রহ্ম, যাহা খাইতেছেন তাহা ব্রহ্ম এবং খাওয়াও ব্রহ্ম। শরীর ব্রহ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা জীব ব্রহ্ম। যিনি শরীর রক্ষার্থে আহার করেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া জগৎ-স্থিতিরূপ ব্রহ্মকার্য্যই করেন। এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ফল ঐ শ্লোকেরই শেষ চরণে ব্যক্ত আছে।

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"।

আ। মহাশয়! উহা অতি উচ্চ পারমার্থিক ভাব—উহার ধারণা করাই আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

বৃদ্ধ। ঠিক্ বলিয়াছ বাবা! পরমার্থ 'কাশী বাশী ভস্ম' নহে। উহা অনেক সাধ্য-সাধনার ফল।

আ। তাহা ত বুঝিতেছি—কি—স্তু—

বৃদ্ধ। হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি; তোমার প্রাতঃকালের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছি।

আ। আহারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?

বৃ। আছে বৈ কি? একই সূত্রে জগৎ গাঁথা। স্থূল বিকাশে যতই বিসদৃশ দেখা যাউক, সূক্ষ্মাবস্থায় জগৎ-যন্ত্র ব্রহ্মময়ীর একতারায় বাজে।

জগন্নাথের জগৎ-লীলার অনুকূল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম। জগতের স্থিতির জন্য আহার যেমন একটী ধর্ম্ম, জগৎ-সৃষ্টির জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনও সেইরূপ একটী ধর্ম্ম। ক্ষুধা যেমন শরীর-ক্ষয় ব্যঞ্জক, কাম সেইরূপ শরীর-সৃষ্টি ব্যঞ্জক। আহার দ্বারা ক্ষুধার শান্তি হয়, স্ত্রীপুরুষ-মিলনে কামের শান্তি হয়। আহারে যেমন সুখ, স্ত্রী পুরুষ-মিলনেও সেইরূপ। আহারে যেমন লোভ, মৈথুনে সেইরূপ আসক্তি। লোভী অক্ষুধায় বা কৃত্রিম ক্ষুধা সৃজন করিয়া, আহার করিয়া যেমন রোগে পতিত হয়, আহার-প্রবৃত্তি বলবতী করিয়া যেমন মনের উচ্চ প্রবৃত্তি গুলিকে রসাতলে দেয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হয়; কামুক ব্যক্তি, ভোগ-বিলাসের বৃত্তিকে স্ত্রী-পুরুষ-মিলনে মুখ্য স্থান দিয়া, রোগ-শোকে পতিত হয়, বিলাসের

মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হয় এবং সংসারানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

হিন্দু জাতির ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ দাম্পত্য সম্বন্ধে] ভোগ-বিলাসকে কখনও শ্রেষ্ঠ স্থান দেন নাই—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী-নিবন্ধনং ॥

মনু, ৯ অ।

অপত্যোৎপাদন ঐশিক কার্য্য। পুরাকালের শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের উহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালে স্ত্রী-সহবাস করিতেন না, ঋতুকালের মধ্যেও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পর্ব্বাদি ত্যাগ করিতেন। এইরূপে গৃহী হইয়াও তাঁহারা ব্রহ্মচারী ছিলেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, প্রতিভা-সম্পন্ন, ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান-সন্ততি জন্মিত। দুর্ভাগ্য ক্রমে পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় ভারতের সে শুভদিন দীর্ঘকাল হইতে অস্তমিত হইয়াছে। ঋষি-সন্তানগণ এখন ভোগ-বিলাসের ক্রীড়ার পুতুল হইয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধে ঐশ্বরিকভাব থাকা দূরের কথা, উহাতে ঐশ্বরিকভাব আছে, এ কথা বলিলেও হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এখন স্ত্রী-সম্ভোগ মুখ্য, অপত্যোৎপাদন তাহার একটা অনির্দ্দেশ্য ফল। তজ্জন্যই মনুষ্য জাতির ধর্ম্মভাব ক্রমেই অস্তমিত হইতেছে, সমাজে নানা বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, দৈহিক বল-বীর্য্যও হ্রাস পাইতেছে। সম্ভোগের প্রবৃত্তি যত বলবতী হইতেছে, স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ ততই দূষ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, ততই উহার উপর আবরণ দেওয়া হইতেছে, ততই শ্লীলতা ও অশ্লীলতার জ্ঞান দৃঢ়-ভূমিক হইতেছে। দাম্পত্য সম্বন্ধটা কুকর্ম্ম বলিয়া যদি ধারণা না থাকিত তবে উহার অত ঢাকা-ঢাকী হইত না। প্রকৃত পক্ষে লোকের মনই কু, মনই অশ্লীলতা-পূর্ণ।

অবশ্য, সংসারে সকল লোকেই দাম্পত্য সম্বন্ধকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে না—সে কালেও পারে নাই। একালের ত কথাই নাই। তাই, উহার উপর একটা আবরণ চিরদিনই আছে। তবে, আবরণের জমাটটা ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মুসলমান জাতি উহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

লৌকিক ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দেও। যেখানে পরমার্থ তত্ত্বের কথা, সেখানে লৌকিক জ্ঞানের অধিকার নাই। দেখিতে হইবে জগন্নাথ। তিনি কোথায়? মন্দির-মধ্যে। মন্দির কাহার? তাঁহার। বেস্ কথা। জগৎ তাঁহার মন্দির. তিনি জগতের ভিতরে আছেন, বাহিরেও আছেন, সত্য কিনা?

আ। আজ্ঞা তাত বটেই।

বৃ। তিনি স্বয়ং নট-নটী সাজিয়া এই জগৎ-লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক পুরুষে তিনি পিতৃশক্তি, প্রতি স্ত্রীতে তিনি মাতৃশক্তি। পিতৃমাতৃ-শক্তির সম্মিলন করিয়া তিনি জগৎ রচনা করিতেছেন। তিনি স্বর্গ নামক কোন স্থান হইতে এক একটী করিয়া জীব নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইতেছেন না। তিনি তাঁহার লীলা-খেলা করিবার জন্য এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, এবং যেমন সূত্রে মণি সকল গাঁথা থাকে, সেইরূপ সূত্রাত্মা সেই জগন্নাথ তাঁহার বহুত্বকে একত্ব-সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিতে চাও; যেখানে প্রবৃত্তি নাই, জগৎ নাই, কার্য্যকারণ নাই, কিছুই নাই— আছেন কেবল নটরাজ। তুমি যদি দৃশ্যমান জগতের মধ্যে তাঁহার অনুভব করিতে না পার, তবে লাফ্ দিয়া যবনিকার অন্তরালে কিরূপে যাইবে? জগৎ-নাট্যশালার মধ্য দিয়া, মঞ্চের উপর দিয়া, সাজঘরে যাইতে হইবে—অন্য পথ নাই। তোমরা নাট্যশালার নাম দিয়াছ রঙ্গালয়; তথায় রঙ্গ দেখিতে যাও। জগৎ-নাট্যশালাকেও রঙ্গালয় করিয়া তুলিয়াছ; কাজেই মন্দিরের বাহিরে যে সব মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা তোমাদিগের চক্ষে অশ্লীল। তোমাদিগের যখন মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির প্রকৃত জ্ঞান হইবে, তোমরা যখন জগল্লীলার মধ্যে জগন্ময় ও জগন্ময়ীর লীলানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমানন্দে ভাসিতে পারিবে; অশীতিলক্ষ যোনি-সঞ্চিত পশুভাব যখন তিরোহিত হইবে,তখনই জগন্মন্দির-মধ্যে জগন্নাথের দর্শন পাইবে। আঠার নালা পার হইতে না পারিলে মন্দির-দর্শন হয় না, এবং মন্দির-দর্শন না হইলে জগন্নাথ-দর্শন হয় না।

আ। মহাশয়! আঠার নালা কি?

বৃ। আঠার নালা পার হইয়া শ্রীমন্দিরে যাইতে হয়।

দশেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-শরীরে

যখন অহং জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি দূর হয় তখনই জীবের মধ্যে শিবের জ্ঞান হয়— প্রবৃত্তিময়ী লীলার মধ্যে নিবৃত্তিময় উদিত হন। তখনই বৃন্দাবনে রাসলীলা হয়, কৈলাসে হরগৌরী-মিলন হয়।

মানুষ-শিক্ষার জন্য আঠার নালা এবং মানুষ-শিক্ষার জন্য মন্দিরের বহিরঙ্গে জগৎলীলার অভিনয়।

যুবতী এ যাবৎ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "বাবা! আমার শ্রম বৃথা হইল। আপনি যে তত্ত্বোপদেশ দিলেন তাহা অপেক্ষা আমার রূপে ইনি অধিকতর মোহিত হইয়াছেন। হায়! হায়! মা সর্ব্বমঙ্গলা কতদিনে ভারতের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল করিবেন তা তিনিই জানেন।" এই বলিয়া যুবতী গৃহান্তরে গেলেন। আগন্তুক হতবুদ্ধি ও মর্ম্মাহত হইয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলেন এবং পুনরায় দর্শনের প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন "বাবা! চঞ্চলা বালিকার কথায় দুঃখিত হইও না, বৎসরান্তে পুনরায় এই স্থানে তোমার সহিত দেখা হইবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

অভয়।

গীতায় অনেক স্থলেই ভয়ত্যাগের কথা উপদিষ্ট রহিয়াছে। দৈবী-সম্পদ্ নামে ষড়বিংশতি গুণের উল্লেখকালে দেখা যায় যে, অভয় তাহার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। ১৬।১

ধ্যানযোগের উপদেশকালে, অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মের সহিত ভয় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ মনকে সংযত করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার শিক্ষা বর্ণিত আছে।

প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারী ব্রতেস্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥৬।১৪

দ্বাদশঅধ্যায়ে ভক্তিযোগের মধ্যেও দেখা যায় ভয় হইতে মুক্ত হইলে, তবে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।১২।১৫

সাধনা পথে অভয়ের জন্য এত আশঙ্কা কেন? ভয়ের নাশ জন্য এত আবশ্যকতা কেন? এ বিষয় সম্পূর্ণভাবে: আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ভয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে হয়. ভয়ের ভিত্তি কোথায় ইহা দেখিতে হয়। ভয়ের মূলে কি রহিয়াছে ইহা না জানিলে ভয় দূর করা সম্ভব নহে। রোগের কারণ জানিয়া সেই কারণের মূলোচ্ছেদ করিলে তবে রোগ দূরীভূত হইবে। নতুবা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাঘব কিংবা আরোগ্য বলিয়া ভ্রম হইলেও সেই কারণ বর্ত্তমান থাকিলে রোগ আবার ফুটিয়া বাহির হইবে। যে কোন প্রকার ভয়ই হউক না কেন, উহার মূলে কোন বিশিষ্ট বা বিশিষ্ট জ্ঞান-সংরক্ষণের চেষ্টা রহিয়াছে ; ঐ বিশিষ্টভাব নষ্ট হইবার কোন কারণ উপস্থিত হইলে ভয় নামক একটী অজ্ঞাত মানসিক ভাব আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। আমরা সাধারণতঃ নিজেকে দেহধারী বা কামনাময় বলিয়া মনে করি। নিজের স্বরূপভাব বুঝি না। স্বরূপতঃ আমি সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অংশ, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইলে ভয়ের স্থান আর থাকে না, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

এইজীবভূত অংশই জীবাত্মা। ইহার জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ নাই এই জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বগত।

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ॥

এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা বলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝি। এই পরিচ্ছিন্নভাব সংরক্ষণের প্রতিকূলভাব আসিলেই, নিজেকে 'হারাই হারাই' মনে করি ও ভয়ে ভীত হইয়া পড়ি।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। জীব যখন ভগবানের অংশ তখন জীবও সচ্চিদানন্দ। জীবে ভগবানে কোন ভেদ নাই, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ অর্থাৎ উপাধিগত ভেদ মাত্র। এই অভেদভাব বুঝিতে পারি না কেন? কারণ, জীবে সান্নিধ্য-বশতঃ দেহাদির ধর্ম্ম যেন সংক্রামিত হয়। তবে কি দেহাদির কোন আবশ্যকতা

নাই ? তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, উপাধি সাহায্যেই আমি আমার ভাব বুঝিতে সক্ষম হই। উপাধি আছে বলিয়া আমার প্রকাশ সাধিত হইতেছে। সূর্য্যের আলোক (Medium) সাহায্যে নয়ন গোচর হয়, উপাধি না থাকিলে সূর্য্যের আলোক বর্ত্তমান থাকিলেও আলোক বলিয়া বোধ হইত না। দর্পণ সাহায্যে যেমন আমার ভাব আমি স্ফুরিত দেখিতে পাই, উপাধিও ঠিক তদ্রূপ। আমি শুধু বিশিষ্ট উপাধি এই জ্ঞানই অজ্ঞান।

বস্তুতঃ এক অদ্বয় জ্ঞান জগতে বিদ্যমান ; কেবল উপাধি দ্বারা এই ভেদ-ভাব, সুতরাং ভেদ ভাবশীল মন ও বুদ্ধির অতীত "বুদ্ধের্যৎ পরস্তমঃ" এই ভাব বুঝিতে পারিলে আর উপাধিকে সংরক্ষণের চেষ্টা থাকিবে না এবং তখন ইহার প্রতিকূল কোন ভাবের অস্তিত্ব বোধও লুপ্ত হইবে।

সেই এক অদ্বয় জ্ঞান আপনাকে বুঝিতে গিয়াই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনি উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার ভাব আস্বাদন করিতেছেন। ভগবৎ-প্রতিবিম্ব জীবাত্মা আপন অস্তিত্ব অনুভব করিতে গিয়াই উপাধি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আমি যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এক একটি উপাধিকে আমি বলিয়া মনে করে এবং এইরূপে "আমি"র অনুসন্ধান করে। সেই অসীম অনির্দ্দেশ্যভাব বুঝিতে না পারায় "একটা অহং" খাড়া করিয়া রাখি ও এই বিশিষ্ট অহংকে যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া, যাহা কিছু এই "অহংএর" প্রতিকূল ও যাহা কিছু এই অহংএর বিরোধী তাহাকেই শত্রু বলিয়া মনে করি ও তাহা হইতে ভীত হই।

কলেরার মহামারীর সময় পেটের একটু গোলযোগ হইলেই অত্যন্ত ভীত হই। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় মূল কারণ কলেরায় অনেক লোক মরিতেছে ও আমি যাহাকে আমি বলিয়া মনে করি তাহার বর্ত্তমান স্থূল ভাবের নাশের সম্ভাবনা আছে ; তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে স্থূলদেহ-নাশের জন্যই ভয়। আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য-ক্ষেত্র এই স্থূল জগৎ ; সমস্ত আশা-উদ্দীপনা, উন্নতি, সুখাভিলাষ সমস্তই স্থূল দেহে ন্যস্ত। যদি স্থূলের অতীত সূক্ষ্ম ও কারণাদিদেহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম, স্থূলদেহের নাশেও আমার চৈতন্য অব্যাকৃত থাকিয়া যায় ইহা যদি অনুভব করিতাম, স্থূল পরিণামী ব্যাবহারিক জগতের অন্তরালে সূক্ষ্ম অপরিণামী দৈব জগৎ আছে এবং সেখানেও আমার আমি রহিয়া যায়, ইহা যদি

উপলব্ধি করিতে পারিতাম তাহা হইলে স্থূলদেহ-নাশে এত ভীত হইতাম না! বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আমির বিনাশ হইতে দেখিলে, মনে করি, বুঝি এত সাধের আমি হারাইয়া গেল। বস্তুতঃ আমি যাহা নহি, তাহাকে আমি মনে করিতে গিয়াই ভয়ের কারণ জন্মাইয়া থাকি ; সে কারণ ভয়কে একটী কাল্পনিক ভাব মাত্র বলা যাইতে পারে।

যতক্ষণ এই বিশিষ্ট ভাবের পরিবর্ত্তে আপনাকে অবিশেষ-ভাবে বুঝিতে না পারিব ততক্ষণ ভয়ের হাত হইতে নিস্তার নাই। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আপনাকে ভগবৎ-স্বরূপ জানিতে হইবে, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এই জ্ঞানে সর্ব্বভূতে একই সত্তা অনুভূত হয়।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে জগতে এক নিত্য জ্ঞান বিরাজিত, তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। তবে যে বিভিন্ন বোধ হয় ইহা কেবল উপাধির জন্য, জ্ঞানোদয়ে এক সত্তাই রহিয়া যায়।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তবস্তুং।
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বর্ত্ততে বস্তু সত্যং।
যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব॥ শিবসংহিতা। ১।১

অনন্ত সমুদ্র যেন এই এক অদ্বয় জ্ঞান ; ইহা হইতে কত তরঙ্গ, কত উর্ম্মিমালা, কত বুদ্বুদ্ উচ্ছ্বসিত হইয়া নিজেকে যেন ব্যক্ত করিতেছে। আবার তাহার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এই সকল ভেদভাবশীল তরঙ্গমালার অন্তরালে অভেদাত্মক সমুদ্র আপনার স্বভাবে অবস্থান করিতেছে। তরঙ্গ ও উর্ম্মিমালা সমুদ্রের সহিত স্বতন্ত্র নহে কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। জীবও সেইরূপ ভগবান হইতে অস্বতন্ত্র- এই ভাব স্ফুরিত হইলে অনুকূল প্রতিকূল সকল ভাবই বিলুপ্ত হয়। এই মাত্রই ভয় দূর করিবার একমাত্র উপায়। পরম ভাগবত প্রহ্লাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বিষধর সর্প দ্বারা দংশিত হইয়া, দিগ্‌গজ দ্বারা অবপীড়িত হইয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। বহ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন, দেখিলেন—

...পদ্মান্তরণানুভূতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥

সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ নির্ভীক। তাঁহার বিশিষ্ট অহং ভাব নাই, তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ ॥

তবে এ শক্তি কার? একমাত্র ভগবৎ-শক্তি। তিনি তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত "জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবে" মত্ত। তাঁহার নিকট কি ভয়ের স্থান আছে তাই মহাত্মা বলিলেন—

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্থিতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥

যাঁহার স্মরণে জন্ম-জরান্তকাদি সকল ভয় অপসৃত হয়, সেই ভয়াপহারী বিষ্ণু হৃদয়ে থাকিতে জগতে ভয়ের স্থান কোথায়? প্রকৃত ভয়ের নাশ এই একত্ব জ্ঞানে। অতএব যদি ভয় দূর করিতে হয়, তবে আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে হইবে। ক্ষণবিধ্বংসী নশ্বর দেহের সহিত আপনাকে এক ভাবিলে ভয় অপসারিত হইবে না। জগতের প্রত্যেক বস্তু "সূত্রে মণিগণা ইব" গাথা আছে ইহা বুঝিতে পারিলে, ভয়ের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। তাই উপনিষদ্ বলেন—

অভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। বৃহদারণ্যক ৪।৪

এই অভয়রূপ ব্রহ্মকে জানিলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না, ভয় আপনি দূরে পলায়ন করে। তখনই প্রকৃত অভয়-অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ওঁ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

অমানিশা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

অমানিশা—অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত— বাল্যকালে পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে অমানিশাতে পিশাচেরা পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। একাকী সেই অন্ধকারে—সেই নির্জ্জন উদ্যানে মনে একটু ভয়েরও উদ্রেক হইল—মাঝে মাঝে বৃক্ষপত্রগুলির বায়ুবিতাড়ন শব্দ যেন পিশাচের পক্ষচালনার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ সম্মুখ দ্বারে কিসের শব্দ হইল, আমি একেবারে উঠিয়া বসিলাম। কি বিস্ময়! সেই রক্তবর্ণ কোট-পরিহিত—খর্ব্বাকার অদ্ভুতমূর্ত্তি আমার সম্মুখে!

"আপনি! আপনি কোথা হইতে?"

"কলিকাতা হইতে। আপনি পৌঁছিয়াছেন বুঝিলাম—ভাবিলাম এখন আপনি জাগিয়া আছেন—তাই আপনাকে ও আপনার স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে আসিলাম। এখানে আপনার ঘুমান হইবে না—ঠাণ্ডায় শরীর খারাপ হইবে।"

আমি তাঁহার সহিত চলিলাম—যাইতে যাইতে বলিলাম "আপনাকে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে—আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। আপনি বাগানে আমার সন্ধান পাইলেন কিরূপে? আপনি যে সব জানেন দেখিতেছি।"

জগদানন্দ সেইরূপ ভীষণ হাস্য সহকারে বলিলেন "আমাকে এখন চিনিয়াছেন? আপনার সহিত কি কার্য্য তাহা বুঝিয়াছেন?"

"কলিকাতায়ও যাহা চিনিয়াছিলাম এখনও তাহাই। কিন্তু যদি দোষ না ধরেন, তবে আমি আপনার বিষয় যাহা বুঝিয়াছি বলিতে পারি। আমার বোধ হয় আপনি পিশাচ সিদ্ধ, না হয় নিজেই পিশাচ।"

আবার সেই হাসি।

"আচ্ছা ধরুন আমি পিশাচ। আপনি আমার একটি অনুরোধ রাখিবেন?"

"আপনি যদি আমার আত্মলাভের আশা করেন তাহা দুরাশা। আমি যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে আছি কোন বিষয়ই আমার পক্ষে প্রলোভন-জনক নহে।"

"হাঃ! হাঃ! সেকালে লোকে পিশাচে বিশ্বাস করিত পিশাচের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। একালে আর তাহা নাই—লোকে এখন যথার্থ হেতুবাদ ও তর্কশাস্ত্র-বলে সমস্ত পৈশাচিক ক্ষমতা পৃথিবী হইতে দূর করিতেছে। যে যত কম পাপ করিয়াছে, সেই তত ভাল লোক।"

"বেশ—পিশাচের মত কথাই বলিলেন।"

"ঠিক কথা। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি—কিন্তু আপনার সত্যের উপর বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। আপনি আমার। আপনার মস্তকের একটি মাত্র কেশ আমাকে দান করুন মস্তকটিতে আর আপনার অধিকার থাকিবে না। উঃ! বাতাস বড় ঠাণ্ডা—গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে চলুন।"

আমি তাঁহার সহিত পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে সে রাত্রি সেইখানে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন আমি ও সম্মত হইলাম।

(৫)

আমাদের আহার হইল—জগদানন্দ চলিয়া গেলেন—আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—সুতরাং সেই পান্থনিবাসেই শয়নের বন্দোবস্ত করিলাম। শয়ন করিতে যাইতেছি এমন সময়ে সম্মুখে দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক, হরি! হরি! এ যে লবঙ্গলতা! লবঙ্গলতা স্বামীর সহিত তাঁহার চাকরী স্থানে যাইতেছিল।

"এঁ্যা!—এ কে?—প্রিয়নাথ?"

আমি কেবল মাত্র বলিলাম? "লবঙ্গ"!

"প্রিয়নাথ! আমাদের অনেক কথা বলিবার ও শুনিবার আছে, আইস—আমার ঘরে আইস।"

আবার আমার হৃদয় লবঙ্গময় হইয়া উঠিল। লবঙ্গ বলিল—সে সুখী নহে তাহার স্বামী তাহাকে বড় কষ্ট দেয়। আবার সেই পুরাতন স্মৃতি! হেম-লতা আমাকে ক্ষমা করিও। আমি ও লবঙ্গ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলাম। হঠাৎ দ্বারোদঘাটিত হইল—একটি সুদীর্ঘ—সবলকায় পুরুষ প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "বেশ ব্যবহার! ও কে লবঙ্গ।"

উভয়ে চমকিত হইলাম—সম্মুখে লবঙ্গের স্বামী—ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, মুখে কথা বাহির হইতেছে না। সে লবঙ্গের ভ্রমরকৃষ্ণ অবেণী-সম্বদ্ধ কেশ-পাশ ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল "বিশ্বাসঘাতিনী--অসতী!" আমি লবঙ্গের সাহায্যে গেলাম—তাহার স্বামী আমাকে এক ধাক্কা দিল—আমি পড়িয়া গেলাম। উঠিয়া দেখিলাম তখন লবঙ্গের প্রতি অত্যাচার চলিতেছে। আমি নিকটে একটী অস্ত্র দেখিতে পাইয়া সেইখানি তুলিয়া লইলাম! লবঙ্গের স্বামীকে ভয় দেখাইলাম। সে আসিয়া সজোরে আমার কণ্ঠ ধারণ করিল—আমার চৈতন্য লোপ হইবার উপক্রম হইল। আত্মরক্ষার্থ আমি সেই অস্ত্র তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলাম সে পড়িয়া গেল, উঃ—তাহার বক্ষে অস্ত্রের পূর্ণ আঘাত হইয়াছে।

লবঙ্গ মৃত স্বামীর বক্ষে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল—আমি নির্ব্বাক্ বজ্রাহত! ভাবিলাম হায়! কি হইল! যদি ইহা স্বপ্ন হইত! আমি যদি আবার নিদ্রাভঙ্গে দেখিতাম যে, উদ্যানে উপলখণ্ড উপরি শায়িত আছি। আমার মণিব্যাগ আর জগদানন্দই এই অনিষ্টের মূল। হায় পুত্র! তোমার পিতা আজ নরহন্তা! হা প্রাণাধিকা প্রেমপুতলি হেম! তোমার সেই স্বামী আজ নরহন্তা! হঠাৎ পদশব্দ শ্রবণে আমার চমক ভাঙ্গিল— সেইখান হইতে একটি ল্যাম্প লইয়া আমি পলাইলাম।

(৬)

আমার বোধ হইল আমি অনুসৃত হইয়াছি, তখন গ্রামে প্রবেশ না করিয়া অন্যদিকে চলিলাম। একটি গোলাবাড়ী ছিল সেই দিকে চলিলাম—সেখানে একটি মহাজনের তিন শত গোলা ধান্য এবং অন্যান্য শস্য-পূর্ণ ছিল, অনুসারকগণ আমাকে ধরিল—হতাশে আমার যে হাতে ল্যাম্পটি ছিল সেই হাতটি ছুড়িলাম ল্যাম্পটি দূরে শুষ্ক তৃণরাশির উপর পড়িল, তৃণরাশিতে অগ্নিসংলগ্ন হইল অগ্নি উচ্চে উঠিল, এই গোলোযোগে আমি মাঠের দিকে পলায়ন করিলাম, দ্রুত—দ্রুত চলিলাম—বন জঙ্গল—কণ্টক খাত সমস্ত অতিক্রম করিয়া চলিলাম। উঃ! ইহা কি স্বপ্ন! না—না! এখন যে আমার হস্ত রক্তাক্ত! আমার শরীর আসন্ন হইয়া আসিল—আমি একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম। উঃ! গ্রাম দগ্ধ হইয়া গেল—

অগ্নি কি ভীষণ শিখা বিস্তার করিতেছে—লহ লহ রসনা বিস্তার করিয়া সমস্ত জগত গ্রাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক—নরহন্তা—গৃহদাহক তিনটি পাপেই লিপ্ত হইলাম! হে পিশাচ-রাজ! তুমি যখনই বলিয়াছিলে যে, যে যত পাপপথে যাইতে অল্প প্রলোভন প্রাপ্ত হয় সেই তত ভাল। আমি আবার উঠিলাম—মনে হইল আজ অমানিশা! এই রাত্রে প্রেত, পিশাচ পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়।

(৭)

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ললাটে হাত দিলাম, দেখিলাম—ললাট এখন রক্তমাখা। পরিচ্ছদ রক্তাক্ত, এই পরিচ্ছদগুলি বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে মনস্থ করিয়া, একে একে সব খুলিলাম সব একত্র করিয়া বাঁধিলাম—বনের ভিতর একটি গুপ্ত স্থানে সেগুলি লুকাইয়া রাখিলাম মণিব্যাগটিও সেই সঙ্গে রহিল। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখি, একখানি একঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। অগ্নিশিখার আলোতে ইহা দেখিতে পাইলাম। মাত্র একটী লোক—সেই গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছে। গাড়ীখানি টমটম। আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া লোকটি নামিল—তৎপরে গাড়ী সেইখানে রাখিয়া বনের মধ্যের দিকে চলিল।

গাড়ীখানি যদি আমার হইত, তাহা হইলে কত সুবিধা হইত—এও'ত বেশ সুবিধা, অর্থ—বস্ত্র—পলায়নের সুবিধা সবই আমার আয়ত্তের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত কার্য্য করিলাম। এক লম্ফে গাড়ীর উপরে উঠিয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিলাম। এই সময়ে গাড়ীর অধিকারী আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি অশ্বকে আবার কষাঘাত করিলাম, অশ্ব সম্মুখস্থ লোককে পদদলিত করিয়া চলিল,—লোকটী চীৎকার করিয়া উঠিল—একি! এ স্বর যে আমার পরিচিত! আমি অশ্ব-বল্গা সংযত করিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিলাম, এ যে, সে আমারই ভ্রাতা!

আমি তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া তাহাকে ডাকিলাম, সে উত্তর দিল না।—সে আমাকে চিনিতে পারিল না। ক্রমে তাহার জীবন ফুরাইল। আবার আমার হস্ত রক্তরঞ্জিত হইল। আমি ভ্রাতৃহন্তা!

(৮)

আমি ভ্রাতার মৃতদেহের উপর পড়িয়া মুখচুম্বন করিতেছিলাম—হঠাৎ বনের মধ্যে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

আমি উঠিয়া ক্রমে গভীর বনে প্রবেশ করিলাম—সূর্য্য এক্ষণে আকাশে প্রখরতেজে প্রকাশিত হইয়াছে। অমানিশার প্রভাত হইল—আমার জীবন কিন্তু অন্ধকারময়। আমি গৃহহীন—আশাহীন। আমার সম্মুখে ফাঁসী কাষ্ঠ যেন সজীব দেখিতে পাইলাম। এখন আমার উপায় কি? আমার এ জীবনে ফল কি? অনুতপ্ত হৃদয়ে—পাপ পূর্ণ জীবন রক্ষার চেষ্টায় ফল কি?

না এজীবন আর রাখিব না—আমি নিজেই পুলিসের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। এই ভাবিয়া আমি একটু সুস্থ হইলাম। হেমলতা ও শিশু পুত্রটির কথা মনে হইল—গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও এতক্ষণ মৃত্যু হইয়াছে। কি যন্ত্রণা! কেহ বুঝিবে কি?

আমি আবার চলিলাম—ক্ষণেক চলিয়া পথ হারাইলাম।—যাহা হউক আবার পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। জীবন আর রাখিব না।

(৯)

ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিলাম। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সম্মুখে সেই রক্তবর্ণ কোট-পরিহিত খর্ব্বাকার পিশাচাবতার।

আমাকে দেখিয়া জগদানন্দ আবার সেই হাসি হাসিল—বলিল "আসুন; আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে তাহা আমিও ভাবিয়াছি। আমি সমস্ত রাত্রি এইখানে আছি—আমার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি কোচম্যানকে গ্রামে সাহায্য অন্বেষণে পাঠাইয়াছি।"

"তাহারা আপনাকে সাহায্য করিবে কি! আপনার অপেক্ষা তাহাদের বিপদ অধিক। সমস্ত গ্রামে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

"আকাশের বর্ণ দেখিয়া তাহা আমি ভাবিয়াছি। কিন্তু আপনি এখানে কেন? আপনি তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন না কেন?"

"আমাকে রক্ষা করুন। আমি পাপের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। আপনার সঙ্গে দেখা হইবার পর এই তিন ঘন্টার মধ্যে আমি অবিশ্বাসী স্বামী—

সতীত্ব-নাশক—নরহন্তা—গৃহদাহক হইয়াছি—আমি ভ্রাতৃহন্তা! তবু মনে আমার কোন পাপ নাই।"

জগদানন্দ বলিল "এখন আমাকে চিনিলে? তোমার সঙ্গে আমার কি কাজ তাহাও ত বুঝিলে?"

"আমার আত্মা—আমার আত্মা আপনার। এখন আপনাকে চিনিলাম।"

"আমি কে?"

"স্বয়ং সয়তান (পিশাচ)।

"তবে আমায় নমস্কার কর—আমায় পূজা কর। এরূপ বিকৃত কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইল যে আমার রক্ত শীতল হইয়া গেল।"

আমি তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে বসিয়া আমাকে এবং আমার সরলা স্ত্রী ও সরল শিশুটিকে রক্ষা করিতে বলিলাম।

জগদানন্দ আমাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। আমি উঠিয়া আবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করিতে লাগিলাম। সে কর্কশস্বরে বলিল, "জ্ঞানী লোকের কি এই ব্যবহার। পাছে পাপ পূর্ণ না হয়, এই জন্য সে সয়তানের পদে সমস্ত জ্ঞানগর্ব্ব উৎসর্গ করিতেছে।"

আমি। "সয়তান পিশাচরাজ তোমাকে চিনিয়াছি, তোমার কৌশল বুঝিয়াছি। আমি তোমাকে চাহি না, আমার আত্মা এখন রক্ষা পাইতে পারে। অনুতাপে এবং পরম-পিতার নামে এখন আমার আত্মা পবিত্র হইতে পারে।

সে ঘৃণার স্বরে বলিল, "আমি সয়তান বা পিশাচ নহি। আমিও তোমার মত নরজগতের জীব সাধারণ মনুষ্যমাত্র। পাপ হইতে তোমার উন্মত্ততা জন্মিয়াছে। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমার ক্ষমতা থাকিলেও আমি তোমাকে রক্ষা করিতাম না। তোমার আত্মার ভাল মন্দে আমার কোন লাভ লোকসান নাই। তোমার আত্মা নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

"আমি আপনাকে যাহা ভাবিয়াছিলাম, আপনি যদি সে হইতেন, আপনি যদি আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ! আমায় রক্ষা করুন। আপনার জন্যই ত এ সমস্ত ঘটিল। কে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিল? কে আমাকে সেই নিশীথরাত্রে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

(ক্রমশঃ)

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। ভাদ্র ১৩১৭। ৫ম সংখ্যা।

নাদ অনাহত।

(১)

বিভূতি পাবার তরে
যে কেহ সাধনা করে,
সাধনের সার ধন করি পরিহার ;
নানা সিদ্ধি নানা বেশে,
আসিলে নিকটে হেসে,
হৃদয়ে ধরিতে তা'কে বাসনা যাহার ;
কামদেহ শক্তি যত,
বিপদের হেতু কত,
সৃজিত তাহারা সব গুপ্ত বাসনার ;

এ জ্ঞান না আছে যার,
কাঁচাতে পরাণ তার,
"অনাহত নাদ" এই জগতে প্রচার।
অতি উচ্চ সিদ্ধি যাহা,
আধ্যাত্মিক শক্তি তাহা,
সাধনের বিভূতি সে রাজ-যোগীদের।
পূর্ণব্রহ্ম রত্নাকর,
অনন্ত শকতি ধর,
অমৃত আধার যিনি, সারথি ভক্তের।
অভিমান পরিহরি,
যাঁহারা তাঁহার'পরি,
পরাণ-অর্পণ করি' পড়ে থাকে পদে,
সেই যোগীদের যত,
দাসানুদাসের মত,
অনুগত হ'য়ে সিদ্ধি পদে ধরি কাঁদে।
সে মুক্ত পুরুষগণ,
যেই জ্ঞান সনাতন,
লভেছেন নিজ নিজ সাধনের কালে,
"অনাহত গীতা" তার
গুটিকত সূত্র সার
মানব হিতের তরে এসেছে ভূতলে।

(২)

আছে সাধ নাদ-সুর তব শুনিবার?
সেই অনাহত ধ্বনি,
সাধকের সার মণি,
থাকে যদি অভিলাষ প্রাণে ধরিবার,
"ধারণা" কাহারে কয়,
"ধারণা" কেমনে হয়,

অগ্রে তব সেই তত্ত্বে হ'ক অধিকার,
পশিবে এ গীতানাদ প্রাণেও তোমার।

(৩)

বিষয়ে বৈরাগ্য যবে পরাণে আসিবে,
ইন্দ্রিয়গণের রাজা,
চিন্তারাজি যার প্রজা,—
যতন করিয়া তারে ধরিয়া আনিবে।
হে শিষ্য জাননা তুমি-
মনই চিন্তার ভূমি,
চিন্তারূপী পুত্র কন্যা মন হ'তে হয় ;
মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি, মনই জাগায়।

(৪)

ভয়ানক শত্রু মন,
করে সদা জ্বালাতন,
সৎ সত্য ভাবটুকু নষ্ট করে দেয়।
সেই ভাব নষ্ট হলে
দেবভাব যায় চলে
মায়া আবরিয়া ফেলে দুর্ব্বল হৃদয়।

(৫)

তাহার বাঁধিয়া করে বন্দী করি চিরতরে,
এইরূপ ভাবে রাখ
শক্তি যত
নষ্ট করি তার,
নাহি যেন মাথা তুলি, ছুটিয়া না যায় চলি,
স্মরণ রাখিও সদা
মন হয়
ভীষণ পামর।
মোহিনী মূরতি ধরে যাদুকরী খেলা করে,

মায়ার গভীর নীরে
টেনে আনি
ডুবাইয়া রাখে।
দেহের অস্তিত্ব নাই সুধু বাষ্প সুধু ছাই,
অসত্য দেহের মন
নিরয়েতে
সত্য ছবি আঁকে ॥

(ক্রমশঃ) শ্রীরাধা।

শ্বেত-সরোজাষ্টমী।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সম্বৎসরের পর সম্বৎসর ক্রমশঃ কাল-প্রবাহে বাহিত হইয়া অদ্য অষ্টাদশ বৎসর অতীত, এবং আমরাও আমাদের জননী স্বরূপিণী হেলেনার অন্তিম-ইচ্ছা প্রণোদিত শ্বেতসরোজ-অভিধেয় উৎসব উপলক্ষে আজ আমরা একত্রে মিলিত হইয়াছি। পুনরায় উদয়াচল সমাগমে ভগবান অংশুমালী অংশুজাল বিকিরণে যেমন সমগ্র পৃথিবী নব প্রভায় প্রভাসিত—নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, তেমনই ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতিমধ্যে আজ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাবে দেশ-বিদেশ নগর-নগরী, সর্ব্বস্থানে সন্নিবেশিত শাখা প্রশাখা সকল সমিতিই অভিনবভাবে উদ্ভাসিত হইয়া এক অনুপম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যে দুইটি প্রধান চেলার প্রভূত যত্নে ও অপ্রতিহত প্রভাবে এই ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অপর যাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়া আপাততঃ পরলোক গত হইয়াছেন, সেই সকল ভ্রাতা ও ভগিনীগণের স্মরণার্থ ও তাঁহাদের শান্তি কামনায় অদ্য সকলেই সর্ব্বত্র সমবেত। লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যা জগতে

পুনঃ প্রচারে তাঁহাদের অসাধারণ উদ্যম, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অমানুষিক স্বার্থত্যাগ জ্বলন্ত অক্ষরে সকলের স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে—এজগতে তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরদিন জাগরূক থাকিবে।

তাঁহারা সকলে লোকান্তর-প্রাপ্ত এবং স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জীবিত। স্থূলদেহ ধারণকালীন স্থূল অণুগণের গুণবশতঃ তাঁহাদের কার্য্যসকলে যে প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে সূক্ষ্মদেহে অবস্থিতি জন্য সে সকল বিঘ্ন অতি বিরল—সুতরাং তাঁহারা অধিকতর স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

অদ্য আমরা কেবল শ্রেষ্ঠগণের চিন্তায় মগ্ন নহি—লোকান্তরগত সকল সভ্যগণের মঙ্গলকামনায় আমরা উপস্থিত। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত হীনবল ছিলেন এবং যাঁহাদের কার্য্য সামান্য মাত্র ছিল, তাঁহারাও নববল প্রাপ্ত হইয়া পুনরাগমন করিবেন এবং ভাবী জন্মে অধিকতর ক্ষমতা ও যত্নসহকারে জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইবেন। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" ইহা সকলেই বিদিত আছেন। যতদিন জীব মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ-পদলাভ না করিতে পারেন, ততদিনই তাঁহার সংসারে যাতায়াত চলিতে থাকে। জীব পর্য্যায়ক্রমে এইরূপে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর যদি কেহ পূর্ব্ব সুকৃতিবশাৎ সদ্‌গুরু লাভে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উচ্চ সাধনাবলম্বনে মুক্ত হন।

যাঁহারা চলিয়াগিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন আমাদের President Founder Born 1832. Died 16 th Feb. 1907.—যিনি ৩ বৎসর ২ মাস মাত্রকাল দেহত্যাগ করিয়াছেন ও এক্ষণে তাঁহার গুরুদেবের চরণে বিশ্রামলাভ করিতেছেন। আমরা যাহাকে বিশ্রাম কহি, এ বিশ্রাম সেরূপ নহে—এই মহাসমিতি তাঁহারই হস্তার্জ্জিত বৃক্ষ—ইহাকে পূর্ব্বে যেরূপ ভাল বাসিতেন এখনও সেইরূপ ভাল বাসেন, এবং জীবদ্দশায় তাহার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন, উচ্চস্তরে থাকিয়া এখনও সেইরূপ আগ্রহসহকারে কার্য্য করিতেছেন; এবং পুনঃ দেহধারণ করিয়া কিরূপে অবশিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিতে পারিবেন, কিরূপে স্বরোপিত বৃক্ষকে আরও সুন্দরতর ফল-ফুলে

শোভিত করিতে পারিবেন ও তজ্জন্য কোন দিন গুরুদেবের অনুমতি পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতিপটে সেই অতীব প্রিয়তম নামটী উদিত হইল—যে হেলেনা ব্রহ্মবিদ্যার আলোক জগতে পুনরুদ্দীপনের জন্য শারীরিক ও মানসিক কত শত ক্লেশ সহ্য করিয়া অকাতরে এই (8th May 1891.) দিনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণ অনেকানেক চেলা ও শিষ্যগণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া রাজগুহ্যবিদ্যা প্রচার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে একই প্রেমময় সূত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন—যাঁহার জীবনী আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘোর ঝঞ্ঝানিল সদৃশ ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ (বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ১৮৭৫ সাল হইতে দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে)—যিনি কুলষ ষড়যন্ত্র, মিসনরিগণের দুরভিসন্ধি, P. S. R. সোসাইটীর মিথ্যানুযোগ, এবং গবর্ণমেণ্টের পদাভিষিক্ত কার্য্যকারকগণের সন্দেহ ও পূর্ণবিশ্বাসাভাব—এসকলই তাঁহার সহযোগী পূজ্যতম কর্ণেল মহোদয়ের সহিত স্থিরভাবে, অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া, কোন প্রকারে সমিতিকে রক্ষা করতঃ, দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহার নাম এই জগৎব্যাপী সমিতির সকল স্থানেই সভ্য মাত্রেরই নিকট সমভাবে আদরণীয়। তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহভাবী মাননীয় President Founder. যে মহাসমিতি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহার বর্ত্তমান সভ্যবৃন্দই নহে পরন্তু যাঁহারা এই সমিতি বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, W. Q. Judge সাহেবের সহিত যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি যাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া নূতন সমিতি সৃজন করিয়াছেন, একমাত্র H. P. B. নাম এখনও সেই সকলকে একত্র বদ্ধ করিতে সক্ষম—সকলেই তাঁহাকে পরমবন্ধু ও শিক্ষক (গুরু) বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা হইতে আমরা এক শিক্ষা পাইয়াছি—এক সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি—"Although life separates, death unifies." জীবদ্দশায় অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণকালীন যে সভ্যগণ সমিতির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা সমিতির সভ্য হয়েন নাই, তিনি পরলোকগত হইলে অনেক

প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া, তৎকৃত পুস্তক সমূহ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওত সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার নাম উল্লেখমাত্র অনেকস্থলে কুতর্ক, বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইত—এক্ষণে সেইস্থলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দেখা যাই-তেছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সত্যের প্রচারে—ব্রহ্মবিদ্যা-প্রসারণে—প্রথমাবস্থায় যতই কষ্ট, যতই বাধা আসুক না কেন, প্রচারকের বিরুদ্ধে যতই বিদ্বেষ ও সন্দেহের রটনা হউক না কেন—প্রচারকের অবর্ত্ত-মানে যখন সত্যের আলোক সকলের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করত একবার অন্তরে প্রবেশ করিবে, তখন ক্রমশঃ সকলেই প্রচারকের প্রতি দ্বেষভাব ভুলিয়া গিয়া সত্যকে আলিঙ্গন করিবে।

দেহান্তর-প্রাপ্ত ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া—তাঁহাদের শান্তির জন্য কায়মনোবাক্যে যথোচিত চিন্তা, ধ্যান ও প্রার্থনা করণানন্তর, যাঁহারা পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্থূলদেহধারণে পূর্ব্বকৃত অসম্পূর্ণ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার যত্ন পাইতেছেন তাঁহাদের প্রতিও এক্ষণে একবার অবলোকন করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা পুনর্জ্জন্মে ও কর্ম্মে বিশ্বাস করেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ভেদভাব বা বহুত্ব যথার্থতঃ নাই—চির-ভেদবুদ্ধি অসম্ভব। সামান্য মত ভেদ বা দ্বন্দ্ব প্রযুক্ত যাঁহাদের সমিতি হইতে ক্ষণিক বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চস্তরে প্রকৃত দ্বন্দ্বাতীতভাব দর্শনে উচ্চস্তরে অবস্থিতি কালেই ব্রহ্মবিদ্যা সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে W Q Judge একজন। তিনি পূর্ব্বে আমেরিকার T S এর কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন—তিনি অতি উন্নত শ্রেণীভুক্ত। হঠাৎ তাঁহার পদস্খলন হইয়া পতন হয়। এবং তাঁহাকর্ত্তৃক পরে সমস্ত আমেরিকা বিভাগ মহাসমিতি হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে তাঁহার সেই দেহত্যাগানন্তর তনুচ্ছদেহে অবস্থিতিকালে কথঞ্চিৎ ক্লেশ-ভোগ ও স্বল্প বহুল আয়াস দ্বারা তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হয়। তিনি দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিলেন—স্থূলদেহের অভাব সত্ত্বেও মনোময় শরীরের নিম্নবিভাগে অবস্থিতি কালে তাঁহার মত হঠাৎ কেহ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আরও

উচ্চবিভাগে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলতর দৃষ্টিলাভ করত নিজভ্রম দর্শনে তৎসংশোধনপর হইয়া তাঁহার প্রভূত জীবনীশক্তি এই সমিতিতে সঞ্চালিত করিয়াছেন। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, আমাদের স্থূলজগতে যে T S মহাসমিতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা বুদ্ধিক প্রভৃতি উচ্চস্তরে প্রবাহিত অদ্বৈত জীবনী-স্রোতের আভাসমাত্র বা আংশিক বিকাশ মাত্র। অন্তর্গঙ্গা (মহর্লোক, জনলোক প্রভৃতিতে এই গঙ্গা গুপ্তভাবে ভূমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহীশূরে একটী ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর সহিত সংযুক্ত) কিংবা অন্তঃশীলা ফল্গু প্রভৃতি নদীবৎ ব্রহ্মবিদ্যা উপরে প্রকাশিত, মধ্যে লুক্কায়িত এবং নিম্নে পুনরায় হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া সকলের কথঞ্চিৎ নয়ন গোচর হয়। রাজগুহ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপ প্রবলস্রোতস্বিনী ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শুক্ল সম্প্রদায়ের (Of the great white Ladge) মহর্ষিবৃন্দের মধ্যে পূর্ণায়তনে বিকসিত হইয়া মানসিক স্তর (যথা হইতে পৃথক ভাবের উৎপত্তি) হইতে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত। সকল স্তরই একই স্থানে সদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। ঐ প্রবাহের অধিকাংশই মানসিক ও তন্নিম্নস্তরে অদৃষ্টভাবে বর্ত্তমান—স্থূল জগতে Theosophical Society রূপে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত মাত্র। যে সকল উন্নত ভাবাপন্ন জীব ইতিপূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়া উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবিরাম ঐ প্রবাহে তাঁহাদের জীবনীশক্তি সঞ্চালনে তৎপর রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা লোকান্তর-গত হইয়াও আমাদের সমিতি হইতে পৃথক্ নহেন, এবং সেইস্থানে অবস্থিতি সত্ত্বেও এই মহাসমিতির কার্য্যসাধন করিতেছেন।

কয়েকটী উন্নত পুরুষ আমাদের মধ্যে অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে একটী মৃত্যুদ্বার দিয়া গমন করেন নাই, কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়া ছিলেন, তাঁহার নাম 'দামোদর'—তিনি H. P. B.র প্রিয় চেলা। কুলম্ব ঘটনার পরে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে (সুদূর শিগাট্‌ঝি নামক স্থানে) আশ্রয় লইয়াছিলেন। তদবধি তথায় বাস করিয়া স্বয়ং মহাপুরুষগণের নিকট নানাবিধ শিক্ষা লাভ করত সাধনা করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম আপাততঃ প্রায় ৫০ বৎসর। তিনি অতি শীঘ্রই আমাদিগের মধ্যে একজন শিক্ষক ও নেতাস্বরূপ হইয়া আগমন করিবেন—এরূপ আশা করা যায়। সূক্ষ্মশরীরে ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশ গ্রহণে আমরা উপযুক্ত হইলেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন—আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

মৃত্যুদ্বার দিয়া যাঁহারা গত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে H. P. B. পুরুষদেহ ধারণ করত পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অচিরাৎ তিনি প্রকাশ্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন—এখনও পূর্ব্ববৎ সমভাবে অনেকের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া চলিতেছেন। এবং তাঁহার সহিত একযোগে যিনি মান্দ্রাজে (আদিয়ারে) বহুদিন কার্য্য করিয়া রোগগ্রস্ত কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সাধকবর T. Subba Rao তাঁহার পূর্ব্বতন পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক ষোড়শবর্ষ মাত্র—তিনিও শীঘ্র স্বকার্য্যে ব্রতী হইবেন। এতদ্ব্যতিরেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত আরও বহুসংখ্যক লোক পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিবর্ত্তনের অব্যবহিত next higher stage উত্তরভূমি অভিলাষে তাঁহারাও উপস্থিত উদ্যমে যোগ দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রসর হইবার জন্য যথাবিধি প্রস্তুত হইতেছেন না—কিম্বা যাঁহারা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও কুতর্ককে ভজনা করিবেন—তাঁহারা পূর্ব্বভূমিতে Last stage ? ?. where they are at present. পড়িয়া থাকিবেন। ভূতলে যেকালে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়, তৎকালে তাঁহাদের হস্তস্থিত জ্ঞানরত্ন গ্রহণ করিবার যথার্থ অধিকারীর প্রয়োজন। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যাদান অবিধি—তাহাতে বিষময় ফলই ফলিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের শুভাগমন সময়ে লোকের হৃদয় সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দ্বেষাদিতে পূর্ণ থাকিলে, জ্ঞান বিতরণে তাঁহাদের পক্ষে বিষম বিঘ্ন হইবে। প্রাচ্য প্রদেশে যিনি বোধিসত্ত্ব সংজ্ঞায় আখ্যাত, জ্ঞান ও প্রেমের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ সেই মহর্ষি যেকালে ইতিপূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাধারণ সকল লোক তাঁহার উপদেশ যথাবিধি গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায়, ও তাঁহার প্রতি ঘোর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করায়, তিনি ৩ বৎসরের অধিককাল স্থির থাকিতে পারেন নাই। কাল যথাযথ পূর্ণ হইলে, তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন—জ্ঞানালোক বিতরণে পৃথিবী সমুজ্জ্বল করিবেন। ৩০।৪০ বৎসর মধ্যে তাঁহার পুনরাগমন সম্ভব। সেই সময়ের লোকগণের ভগবত্তত্ত্বোপদেশ গ্রহণের প্রবণতার উপর উক্ত পুনরাগমন-

কালের তারতম্য বিশেষ নির্ভর করিতেছে। আমাদের ঐ সম্বন্ধে প্রস্তুত হইতে হইলে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব হৃদয় হইতে দূর করিয়া তাহাদের স্থলে সমাদর, শ্রদ্ধা ও অভ্যর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত করণই প্রধান উপায়। যাঁহারা আমাদের মধ্যে ঐরূপ করিতে পারিবেন তাঁহারাই নূতন বংশের ও মূল ষষ্ঠবংশের ভিত্তিস্বরূপ হইবেন—তাঁহাদের মধ্য হইতেই বর্ত্তমান ও ভাবী মনু বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

আপাততঃ সমিতিকে আমাদের এরূপভাবে গঠনের প্রয়োজন যাহাতে দামোদর, সুব্বা রাও এবং H. P. B. অবাধে ইহার ভিতর কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন -ভাবী মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের জন্য তাঁহারা পথ প্রস্তুত করিবেন। একতা, সাম্যভাব জগতে প্রচুর পরিমাণে প্রচার করণই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্রমশঃ যে পরিমাণে লোকে উন্নত হইতে থাকিবে—একত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, তেমনই শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষগণের আগমন হইতে থাকিবে—পরিশেষে, যাঁহার জন্য আগ্রহ সহকারে অনেকে প্রতীক্ষা করিতেছেন—সকল দেশেই সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যাঁহার আগমন সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—তিনি অবতীর্ণ হইবেন। (অবতার অনেক প্রকার—তন্মধ্যে যে অবতারের উল্লেখ হইতেছে—ইহা 'আবেশ অবতার'। প্রতি কল্পে যেরূপ বিষ্ণু অবতার হয়েন, ইহা সেরূপ নহে—ব্রহ্মবিদ্যা জগতে অবিচ্ছিন্নরূপে স্থায়ী রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলেই মধ্যে মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষ বা মহর্ষি কোনরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করেন।)

দামোদর পূর্ব্বদেহেতেই অবস্থিত—সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন। কিন্তু অপর দুইজন অন্য দেহ গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের কেহ চিনিতে পারিবে না—তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের পরিচয় দিতে হইবে। হয়ত, তাঁহাদের মতের সহিত বর্ত্তমান সভ্যগণের মতভেদও অনেকস্থলে হইতে পারে। আমাদের দৃষ্টি কেবল স্থূলজগতে—তাঁহাদের দৃষ্টি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি স্তরে এক সময়ে যাইতে পারে। একমাত্র লোকে আবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি হইতে, সকল স্তরেই যাঁহাদের দৃষ্টি অবাধে যাইতে সক্ষম, তাঁহাদের দর্শন স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং তাঁহাদের ভাব,

চিন্তা আমাদের চিন্তা হইতে প্রভূত উন্নততর, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যেকালে তাঁহারা আমাদের উপদেশ দিতে—শিক্ষা দিবার জন্ম আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের সহিত আমাদের বহুল পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের সীমাবদ্ধ স্বল্পজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহাদের আচার ব্যবহার, কার্য্যকলাপ সম্যক্ বুঝিতে না পারাই সম্ভব। এই কারণে জনৈক বিজ্ঞ সভ্য কহিয়াছেন :—

"The mind often misleads, and the things we 'think' cover over the things we 'know.' Mrs. Besant এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন ; "Now the things you know, you know by the light of the spirit which is within you ; by that intention which is the voice of the pure, not the impure reason, speaking above the mind and through the mind, but very often in contradiction to the mind. And in order to hear the voice of intention, so far as I know, there is only one way, that when once you see the Light shine out through any human being, you hold to that human being, no matter what the mind may say.

প্রতিভাদ্বারা তৎপশ্চাদ্বর্ত্তিনী বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা, বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা, প্রকৃত সত্য অনুভূত হয় ; মনদ্বারা তাহা হয় না,--মন হইতে ভেদমূলক নানা ভাব চিন্তাপথে উদিত হইয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুতরাং কোন উন্নতপুরুষে সত্যের বিকাশ—জ্ঞানালোক পূর্ণমাত্রায় অবলোকন করিলে, অবিচলিত বিশ্বাস সহকারে তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাতে কোনও বৈষম্য দর্শন করিলে সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা, কোনও কুতর্ক করা উচিত নহে। H. P. B. র মধ্যে নানা সময়ে নানা বৈষম্য দৃষ্ট হইয়াছে—কিন্তু তাহার যথার্থ কারণ সাধারণ অজ্ঞ লোকে বুঝিতে অক্ষম হইয়া অনেকবিধ কুতর্ক উপস্থিত করিত। Mrs Besant লিখিতেছেন :—

"When I first met her and saw in her the power of the Master, from that day to this I have never challenged and

never doubted her. And very, very largely because of that have come the knowledge and power that I have won, not by reasoning or arguing "was she right or wrong"—but refusing to see anything else except the Messenger of the Master."

প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে পৃথক পৃথক গুণের বিকাশ আবশ্যক। কখন স্থৈর্য্যগুণ, কখন সাহস কখন বা বিশ্বাস এইরূপ সময়ানুসারে প্রয়োজন হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে উপদেশকে উপযুক্ত জ্ঞান হইবামাত্র তাঁহাতে স্থির বিশ্বাসস্থাপন এবং তাঁহাতে দোষানুসন্ধান রহিত হওন বা দোষ অদর্শন—ইহাই প্রথমে আবশ্যক হইয়াছে। তৎপরে সাধু, যোগী ও মহাপুরুষ দর্শনমাত্র স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁহাদের গুণগ্রাহী হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা বলা বাহুল্য যে নিজের অন্তরে কোন বিশেষ গুণ বা পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে বহির্জগতের সেই সেই গুণের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। নিজের চক্ষের ভিতরে Ether বর্ত্তমান থাকিলে বহির্জগতে বিদ্যমান Etherএর স্পন্দনে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ বায়ুর (Etherএর) কম্পন হওয়ায় আলোক অনুভূত হয়। বিবেকজ্ঞান-প্রতিবন্ধকস্বরূপ প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইলে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিকসিত হয়; সেই বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ 'প্রতিভা'—("প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য,তেন সর্ব্বমেব জানাতি যোগী…",) পাঃ ৩। সূ ৩৩॥ কথঞ্চিৎ জাগরিত হইলে জীব জগতে বিদ্যমান শক্তির উপলব্ধি করণে কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হয়। ঐ প্রতিভার ভিত্তি গুরুজনে পূর্ণ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সুতরাং ইহা সংযম-সাধ্য বলিতে হইবে। প্রথমে উপদেশকে, গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া চলিতে চলিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বরূপ প্রভার ন্যায় প্রতিভার উদয় হইবে। ঐরূপে উপজাত প্রতিভাবলে গুরুর অত্যুন্নত শক্তি যেমন ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে, তেমনই গুরুর প্রতি বিশ্বাস গাঢ়তর হইতে আরম্ভ হইবে এবং তদুপদিষ্ট সাধনা দ্বারা নিজের বিবেকজ জ্ঞান উত্তরোত্তর পরিষ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে। তৎপরে রজস্তমোরূপ মল নির্দ্ধূত হইয়া বুদ্ধিসত্ত্বের অতিশয় স্বচ্ছতা জন্মে, এবং বুদ্ধিসত্ত্ব পৃথক্, পুরুষ পৃথক্ এইরূপ জ্ঞান উদিত হইয়া সাধক সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন ও তাঁহার অবি-

আদি ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বন্ধন তিরোহিত হওয়তঃ ক্রমে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

"সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ"।

পাঃ ৩। সূ ৪৯।

উপস্থিত সময়ে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা এক্ষণে অনেকটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। আপনাতে মহত্ত্ব বর্ত্তমান থাকিলে অপরের মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়—অতএব মহাপুরুষদিগের অত্যুন্নতভাবের ছায়াস্বরূপ আমাদের হৃদয়েও সেই উচ্চভাব অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তজ্জন্য Mrs. Besant উপদেশ দিতেছেন :—

"To let go the spirit of criticism" পুনরায় :—"cultivate the faculty of admiration rather than of criticism. Try, when you meet a person or when you meet a book to see good things in the book or person. and not the faults. And the faults in the people around you, these are no business of yours. The foults of other people will work out through Karma, and they are not your business—a hard but true lesson. Of course. if you are a master or a teacher, and have others in your charge their foults are then yours to correct. Many of you are so anxious to get other people out of their faults that you really have no time to look after your own steps and put them in the right way. Take out of your friends the value of the good and let the faults go. You can say :—"That part of the man is not my business; let me help the god in him to manifest, and let the other side in him wear out in its own way. Admire the admirable and have aside the regrettable. If you can do that you will be more useful now than in any other spirit, and it is that lesson I would ask you to take with you."

দোষানুসন্ধান হইতে বিরত হইয়া অপার ঐশ্বরিক উচ্চভাব মাত্র দর্শন, তাঁহাদের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসস্থাপন, তাহাদের দোষ সংশোধনের একটী অতি সুন্দর উপায়—এই উপায় দ্বারা তাহাদের হৃদয় হইতে ভ্রান্তি ও কলুষরাশি অন্তর্হিত হইতে থাকিবে এবং ঐশ্বরিকভাব পরিস্ফুটনের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হইয়া ক্রমে ভগবদ্ভাব উদিত হইবে। কেবলমাত্র আমাদের মধ্যে নহে আমাদের চতুঃপার্শ্বে সর্ব্বত্র—সকলের মধ্যেই এইভাব প্রচারিত হইলে এবং সকলে ইহা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে, মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব অতি সহজ হইবে এবং তাঁহাদের স্থিতিও অপেক্ষাকৃত অধিককালস্থায়ী হইবার সম্ভব। বিশেষ অবধান সহকারে দেখুন আমাদের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ ও বিশ্বাস সম্যক্‌রূপে অঙ্কুরিত হইলেই মহাপুরুষদিগের আগমনের পথ যথাযথ প্রস্তুত হইতে পারিবে—সমস্তই আমাদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিহিত। এই মহাসমিতি এক্ষণে তুলনায় ঠিক John the Baptist সদৃশ সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া এই প্রেমময় ভাব জগতে প্রচার করুন—সদা সর্ব্বত্র মিষ্টভাষী হইয়া উত্তেজনা-বর্জ্জিত সদালাপে এই প্রচারে ব্রতী হউন। একার্য্যের আর অন্যতর উপায় হইতে পারে না।

অদ্য অতি শুভদিন—আসুন অদ্য হইতে আমরা এই মহাব্রতে ব্রতী হই। সকলে একত্র মিলিত হইবার আর হঠাৎ এরূপ সুযোগ হইবে না—এক্ষণে সকলেই একস্থানে একচিন্তায় একভাবে মগ্ন—আসুন আমরা এই শুভ স্মৃতি-উদ্বোধক শ্বেত-সরোজ-উৎসব দিনকে আরও একটু অলকৃত করিয়া ইহাকে শুভ-প্রতীক্ষার দিনেও পরিণত করি—অতীত শুভস্মৃতি উদ্দীপনার দিন ভাবী গৌর-বের প্রতীক্ষার দিনে একত্র সংযোগে অতি সুধাময় ফল প্রসবেরই সম্ভাবনা। কেহ কেহ এই কল্যাণকর উদ্যমে সামান্যমাত্র বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে? আমাদের সম্মুখে বিশ্বাস-রজ্জু, অন্তরে স্পষ্টজ্ঞান এবং পশ্চাতে গুরুবল—এই তিন মুখ্য সম্বল বিদ্যমানসত্ত্বে আমাদের অগ্রগতিরোধের কোনই আশঙ্কা নাই। বহির্জ্জগতের কোন ঘটনা আমাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। পূর্ব্বেও এই সমিতিকে অনেক বিঘ্ন অনেক বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও আরও গুরুতর অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে, সুতরাং বর্ত্তমান বিপত্তিতে

বিহ্বল হইবার কোনও কারণ নাই। যাঁহাদের জীবন অনন্তে সমাপন্ন, পার্থিব-অজ্ঞ মানবের নিকট যাহা মহাবিপদরূপে গণিত, তাহা তাঁহাদিগকে কেন বিচলিত করিবে? অতীত ঘটনাবলি তাহাদের ক্রিয়মাণকার্য্য সমাপনান্তে কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে—সেদিকে আর দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানের দিকে ও তন্মধ্যদিয়া কিঞ্চিন্মাত্র দূরে অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কত অধিক উজ্জলতর কার্য্যসমূহ সম্মুখে উপস্থিত। সকলেই ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে, প্রচারকার্য্যে প্রেরিত পুরুষগণের চেলারা এই সমিতির বল নহেন—কিন্তু সমিতির জীবনীশক্তি স্বয়ং মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে সঞ্চালিত হইতেছে এবং মহান্ শুক্লসম্প্রদায় (white Lodge) হইতে সমিতিতে বলের সঞ্চার হইতেছে। Mrs. Besant এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম: "Knowing that you need not mind even it those of us who are well known in the world make mistakes. are attacked, or evil spoken of. Never yet a Messenger of the Lodge that went through life without being evil spoken of and you need not grudge us the sign of our apostolate; for such has never been the sign of the Messengers through all ages. Rather rejoice with us that the stress for the time is over, and the days of going forward are upon us; do not let the remnent of the trouble shake any of you, but know that the Masters are with us, and where they are no failure can came."

একবার আমরা ক্ষণকাল করুণাময় Master দিগকে মনে মনে ধ্যান করিয়া যাঁহাদের বল সঞ্চারে এই সমিতি বলবতী, তাঁহাদের চরণকমল হৃদয়ে অল্প চিন্তা করিয়া—অদ্যকার কার্য্য শেষ করি—যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাঁহারা কৃপা বিতরণে সেইরূপ বিধান করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ওঁ

আমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

প্রথম বিধি,—আত্মরক্ষা। শেষ বিধি,—আত্মদান। প্রথমে জড়, তৎপরে চৈতন্য, সর্ব্বশেষে অধ্যাত্ম বিধির প্রকাশ।

আত্মদান করাই পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা।

আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার এই যে, আত্মা আপনাকে পরের জন্য,—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রিয়তমের জন্য, ভগবানের জন্য, নিজেকে দান করিতে পারে। ইহাই আত্মার সফলতা, পূর্ণতা!

সাদিতে আছে যে, "হে বুল্‌বুল্‌! তুমি গোলাপের প্রতি তোমার প্রণয়ের কি জারি কর? যদি প্রেম শিখিতে চাও, তো পতঙ্গের নিকট যাও। সে আলোকের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি একটী কথাও কহিবে না।"

বশ্যতাই স্বাধীনতার উপায়। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে, ঈশার মত, ভগবৎ-ইচ্ছার অধীন করেন। ভক্ত ভগবৎ-অধীন হইলেই, ভগবান ভক্তাধীন হন্!

স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের করতলগত করিতে চাহেন, তো নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বামীর ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই বশীকরণ মন্ত্র! প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী যেন ইহা শিক্ষা করেন!!

নিজের মনে খুব বড় হইলে, মানুষ অধ্যাত্ম হিসাবে ছোট হইয়া পড়ে। নিজেকে গুরু করিলে, আমি লঘু হই।

যতই আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্যরূপ লগেজ্‌ ত্যাগ করিয়া, আমার আত্মাকে লঘু করি, ততই আমি প্রকৃত পক্ষে গুরু হই!

কামাদি ছয়টার ভারে ভারাক্রান্ত হইলে, আমি লঘু হই!

আমি যতই সংসারের পুঁটুলি বাঁধি, ততই ধর্ম্মের সংস্থান হারাইয়া ফেলি।

আমি যতই সংসারে কৃতী,—কুশল হইতে চাই, ততই ধর্ম্মের ভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, ক্রমশঃ বাক্‌সর্ব্বস্ব ধর্ম্মবীর হইয়া পড়ি।

আমি সংসার করি ও ধর্ম্মেও মন রাখি ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধর্ম্ম করি ও সংসারেও মন রাখি, ইহা হয় না।

আমি ধর্ম্মটাকে চাট্‌নি ও সংসারটাকে ভোজ করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ ধর্ম্মই ভক্তদিগের নক্তন্দিবের ভক্ষ্য ও পানীয় হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম বক্তব্য নহে,—বক্তৃতা, কবিতা, প্রবন্ধ, রচনার বিষয় নহে। উহা কর্ত্তব্য! উহা নিত্য সাধ্য,—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয়! উহা চিন্তা, ভাবনা, আস্বাদন, ধ্যান, স্বপ্নের বিষয়। উহাতে আত্মা সর্ব্বদা সিক্ত হইয়া থাকে।

যতই আমাকে সংসারে বাঁচাইয়া চলি, ততই আমি মরি। যতই কাম, ক্রোধ, লোভাদি, সংসারের জীবনের মৃত্যু হয়, ততই আমি বাঁচি,—অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণতা ও উন্নতি লাভ করি। যতই কাম, মোহ, মদ, নষ্ট হয়, ততই আমি বাঁচি,—রক্ষা পাই, ততই আত্মা জীবন্ত, বলীয়ান, সতেজ, ঐশ্বর্য্যবান হয়!

যতই আত্মা সতেজ, বলীয়ান হয়, আমি ততই মানুষ হই!

ছাগল কুকুরের মত জীবন যাপন করিলে, আমি মানুষ হইতে পারি না! মানুষ হইতে হইলে, মানুষের মত হইতে হইলে—মানুষের মত চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কার্য্য করা চাই।

মহৎ হইতে হইলে, নীচ ও পশুজীবন যাপন করিলে চলিবে না। মহৎ হইতে হইলে, মহতের মত থাকিতে, ভাবিতে,—চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, কার্য্য, করিতে হইবে। তবেই মহৎ হওয়া যায়। মহৎ হইবার অন্য পন্থা নাই, অন্য হদীশ নাই, অন্য ফিকির নাই! পূজনীয় পিতা, পিতামহ দেব ও মহাত্মাগণের জীবনী আলোচনা করিয়া, ইহাই দেখিতে পাই।

আমি বানর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত দেখিয়াই অভিব্যক্তিবাদ সমাপ্ত করি না।

আমি দেখি যে, আনন্দ স্বরূপে আমার উৎপত্তি। আনন্দেই আমার স্থিতি। শেষ হইয়া গেলে, সেই আনন্দ সাগরেই ভাসি,—থাকি,—লীন হই!

আমি ইচ্ছা করিলে, পশু, মানুষ ও দেবতা এই তিনই হইতে পারি।

কারণ উহার দ্বারা সেই এক চৈতন্যেরই বিভিন্ন ক্রমের বিকাশ মাত্র। তা হইলেও, আমরা বানরের বংশাবলী ভাবিয়া, ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের মত নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারি না।

আমি অমৃতের সন্তান হইয়া, বানরের বংশোদ্ভব মনে করিব কেমনে? তাহা হইলে, নিজেও বাঁদর হই, ব্রহ্মকেও বাঁদর বানাই!

আমি ব্রহ্মপুত্র,—ব্রহ্মকুমার,—অমৃতের সন্তান! আমি অমর,—অমৃতের পথে চলিয়াছি। ইহাই ভারতের চিরপ্রাচীন শিক্ষা।

আমি ডারউনের মত বিজ্ঞানান্ধ হইয়া নিজেকে বানরের বংশধর মনে করিয়া, নিজেকে ও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতে চাহি না।

পুণ্যভূমি ভারত! তুমি চিরদিনই ব্রহ্মের লীলাভূমি,—চৈতন্যের লীলা-ভূমি,—অধ্যাত্মক্ষেত্র,—পুণ্য ধাম!

আমি যখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিষয়, বৈভব, মান, সম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত থাকি, তখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব মানসচক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায় না,—তখন আত্মা পরমাত্মা, জীবন মরণ, ইহ পরকাল আর ততটা চিত্তকে আকৃষ্ট করে না। সংসার-কার্য্য,—সংসারের উন্নতি,—সংসারের আমোদ প্রমোদ ছাড়া অন্য বিষয় ভাবিবার সময় ও সুযোগ পাই না।

কেবল পাই না, তাহা নহে। পাইলেও, তাহা ভাল লাগে না।

দেহটা ভাঙ্গিয়া বল ও যৌবনের গৌরব ঘুচিলে,—বন্ধুশূন্য,—শান্তি ও সুখ শূন্য হইলে,—অর্থহীন, বিষয় কার্য্যহীন হইয়া, ভাবিবার ও চিন্তা করিবার সময় পাই।

শাঁপে বর। যতই সংসারের দিকটা ভাঙ্গিয়া যায়, ততই ধর্ম্মের দিক্‌টা গড়ে।

রোগ, শোক, পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, লজ্জা, অবমাননা যতই ভোগ করি, ততই মনে হয়,—"বেশ হইয়াছে,—যেমনিকার তেমনি।"

জীবনের বৃথা আড়ম্বরগুলোকে লইয়া সত্যকে, প্রকৃত ধনকে, জীবনকে ভুলে থাকি বলিয়া, ওগুলিকে আমার নিকট হইতে কঠিন আঘাতে, কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। শেষে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, তাহাদিগকে এত আঁকড়াইয়া থাকা কেন? ক্রমে ক্রমে ছাড়াই তো ভাল।

যাহা একবারেই সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়িতে হইবে, তাহা ক্রমশঃ।—একে একে ছাড়াইয়া লওয়াই তো বন্ধুর কার্য্য,—তদ্দ্বারা আমার,—আত্মার প্রকৃত সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

যাহা সঙ্গে লইয়া আসি নাই, ও লইয়া যাইতে ও পারিব না,—তাহা ছাড়িয়া গেলেই বা এত কাঁদি কেন গো? উহাই তো মায়া, মোহ! এত হাসা-হাসি, কাঁদা কাঁদি, যেন স্বপনের!

যেই জাগিয়া উঠি, অম্নি মনে হয়,—অকারণ কাঁদিয়াছি!

একবার একবার জাগি, আবার আমি, যেন, ঘুমের ঘোরে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এত বোঝা বুঝি করিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, কার্য্যে, জীবনে, কতদূর আমার জ্ঞান দাঁড়ায় বলা যায় না।

এখন মনে হয়, এই গুলোর জন্যই, এত দৌড়াদৌড়ি, ছুটো ছুটি করিতেছিলাম!

কিন্তু যেই দেখি যে এ গুলো আমার নয়,—তাঁহার—সৃষ্টি-কর্ত্তার, তখন আর এক ভাব মনে উদয় হয়। তখন আর সে বলের ও যৌবনের গৌরব নাই,—আর সে ধনের ও বিষয় উন্নতির অহঙ্কার নাই। আর সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, আত্মীয় লইয়া, সুখ সম্ভোগ করিবার কল্পনা ও চেষ্টা নাই। তখন আমি তাঁহার সংসারের সেবক,—ভৃত্য,—দাসানুদাস!

সংসার যখন তাঁহার দেখি, তখন উহাই ধর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্গ-ধাম! সংসার যখন আমার করিয়া ফেলি, তখন উহা দুর্গন্ধময়,—নরক সমান!

সংসারটা যখন তাঁহার করিয়া ফেলি, তখন আমি লগেজশূন্য,—হাল্কা,—একা!

আমি একাকী না হইলে, ভাল করিয়া আমির কথা ভাবা হয় না। আমি একাকী ইহা অনুভব করিলে, ভাবি, কেন আর বৃথা পূর্ব্ববৎ কালের অপ-ব্যবহার করি? তখনই মনে হয়, আমি কি? আমার কি হবে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় যাইতেছি,—কোথায় আছি, কোথায় যাইব? কে আমার? নহে কে আমার?

তখন, এই সব ভাবিয়া সারা হই,—আকুল হই। ভাবিতে ভাবিতে,

আমি দেহহীন,—অঙ্গহীন,—অর্থহীন, বস্তুহীন হইয়া পড়ি। ভাবিতে ভাবিতে আমি মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ, আশ্রয়হীন, ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক কণার মত, অস্তিত্ববিন্দুতে পরিণত হই,—অনন্তের মধ্যে আত্মহারা হই! (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞান সম্ভব হয় না। অথচ ব্রহ্মের অজ্ঞানকৃত শক্তিতে রজতের ন্যায় কল্পিত জীবত্ব স্বীকৃত হয়। অতএব ব্রহ্ম স্বগত অজ্ঞান দ্বারা আপনাতে জীবত্ব কল্পনা করেন ইহাই বলিতে হয়। ঐ কল্পনাও অবশ্য ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বের অভাবে উৎপন্ন হয় না। অতএব পরিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা স্বমতেও ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি অপরিহার্য্য হইতেছে। এই অপরিহার্য্যা শক্তির অনঙ্গীকারে বেদান্তের অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বেদান্তের অনুবন্ধ চারিটি;—অধিকারী, বিষয়, সমন্ধ ও প্রয়োজন। উক্ত অনুবন্ধ চতুষ্টয়ই শাস্ত্র-প্রবৃত্তির হেতু। উহাদের অনুরোধেই শাস্ত্র-সমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকারী বা প্রথম অনুবন্ধের অনুরোধেই শাস্ত্রের আরম্ভ হয়। অধিকারী না থাকিলে, কাহার জন্য শাস্ত্র আরব্ধ হইবে! অতএব প্রথম অনুবন্ধ অধিকারী অবশ্য অপেক্ষিত। অভিলষিত বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। এই শাস্ত্র-অনুশীলন করিলে এই বিষয় জানিতে পারিব বুঝিয়াই লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে! অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধ অবশ্য অপেক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা না জানিয়া বিবেচক ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রয়োজনের জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। প্রয়োজনও প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া প্রয়োজনরূপ চতুর্থ অনুবন্ধও অবশ্য অপেক্ষিত। সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অনুবন্ধটী পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব উহাও যে

অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এক জীবশক্তি-রূপ অধিকারীর অস্বীকারে উক্ত চারিটী অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া যায়। এই অনুবন্ধের সিদ্ধির নিমিত্ত মায়াবাদীরাও কাল্পনিক অধিকারী স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টী অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, বেদ অধীত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের অবগতি হইবে। জন্মবন্ধের মোচনের নিমিত্ত কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীকরণার্থ নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনারূপ চিন্তাবিশেষ দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তদনন্তর-নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ-বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষা এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তন্মধ্যে স্বরূপত অধিকারী না থাকিলেও, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বা বেদান্তানুশীলনরূপ ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত উল্লিখিত গুণাবলী-সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই কল্পিত নহেন। তিনি জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধালু হইলেও সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে উক্ত সাধন-চতুষ্টয় দুর্লভ, সাধুসঙ্গের পরই ঐ সকল সাধন-সম্পত্তি লাভ হইতে দেখা যায়। সাধু সঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে জ্ঞান বা ভক্ত সাধুর সঙ্গে ভক্তি লাভ হইলে শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞানী মুমুক্ষুকে দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্রহ্মানুভব দ্বারা ব্রহ্মভাবাপন্ন এবং ভক্ত মুমুক্ষু শ্রীভগবদনুভব দ্বারা শ্রীভগবদ্ভাবাপন্ন হয়েন।

সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত পরব্রহ্মাখ্য শ্রীভগবানই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। বিবর্ত্তবাদীর মতে, সর্ব্ববিধবিশেষণরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ, যাঁহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি কখন শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারেন না। জাতিরহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞারহিত বস্তুকেই নির্ব্বিশেষ বস্তু বলা হয়। শাস্ত্র—শব্দাত্মক, শব্দ কখনই জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞারহিত বস্তুর বাচক হইতে পারে না।

শাস্ত্র জাত্যাদি-রহিত বস্তুর বাচক না হইতে পারিলেও, উহার লক্ষক হউক,

এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, লক্ষণা যে শব্দের শক্তি, সেই শব্দই যদি ব্রহ্মের বাচক না হইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণা দ্বারাই বা কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিবে? বিশেষতঃ "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈ-গীয়তে"—যিনি সকল বেদকর্ত্তৃক গীত হয়েন, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—সকল বেদ যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতি সকল ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্বই বলিয়া থাকেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার মহত্ত্ব প্রযুক্ত। বেদ সকল ব্রহ্মের মহিমা সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই উহাদের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, অতএব ব্রহ্ম ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকত্ব-লক্ষণ বা বাচ্যবাচকত্তা-লক্ষণ-সম্বন্ধও নির্ণীত হইল।

ব্রহ্মভাবাপত্তি-লক্ষণ মোক্ষই জীবের প্রয়োজন। বিবর্ত্তবাদীর মতে ঐ প্রয়োজন নিরূপণ করা যায় না। যাঁহার ব্রহ্মভাবাপত্তি-লক্ষণ মোক্ষ প্রয়োজন, সেই আত্মা এক বা অনেক? আত্মা এক হইলে, একের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তি-প্রসঙ্গ হয়; অনেক হইলে, অদ্বৈত-ভঙ্গ হয়। তদ্দোষ বারণার্থ ঔপাধিক ভেদের স্বীকারেও উপাধির মিথ্যাত্ব নিবন্ধন মিথ্যোপাধিকৃত বন্ধনের অনুসন্ধান অনুপপন্ন হওয়ায় মোক্ষও অনুপপন্ন হয়।

স্বপ্নের ন্যায়, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান সেই পর্য্যন্তই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এরূপও বলা যায় না; কারণ ঐরূপ বলিলে, একের মুক্তিতে বা অজ্ঞানে সকলের মুক্তি-সম্ভাবনা বা অজ্ঞান-সম্ভাবনা বশতঃ সর্ব্ব জগতের অন্ধত্ব বা অপ্রতীতি ঘটে। সর্ব্বজগৎ অন্ধ হইলে, উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হয়। সমষ্ট্যভিমানী ঈশ্বরের মুক্ত্যভাব বা অজ্ঞানাভাব স্বীকার দ্বারা জগৎ-প্রতীতির চক্ষুষ্মত্তা-প্রতীতির উপপাদন করাও সঙ্গত হয় না; কারণ তাহা হইলে, সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত তাদৃশ ঈশ্বরের অসুপ্তিতে ব্যষ্ট্যভিমানী জীবেরও অসুপ্তি নিবন্ধন বা অজ্ঞানাভাব নিবন্ধন অজ্ঞানকৃত বন্ধন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৺শ্যামলাল গোস্বামী।

ওঁ

III. Not-Self মূলপ্রকৃতি বা অনাত্মা।

যে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত,—আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, আমাদের যে অংশ নিত্য, অপরিবর্ত্তনশীল, সেই 'আমি' যাহা সূত্ররূপে নিত্য-অবস্থিত ও যাহাতে "সূত্রে মণিগণা ইব" পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সমূহ গ্রথিত, এবং যাহা আমাদের স্বস্ব অক্ষয়ত্ব ও ধ্রুবত্ব জ্ঞান প্রদান করে—গত প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ধারাবাহিক দর্শনদ্বারা, বিচারদ্বারা এবং আত্মার স্বকীয় ক্রিয়া দ্বারা, যাহা এই আত্মা নহে তাহার জ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমাদের বাহিরে যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহার সমষ্টিকে অনাত্মা বা জড়-প্রকৃতি কহে। যাহার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত সেই 'আমি' ব্যতীত, স্বকীয়জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই আত্মাব্যতীত যে কিছু, সেই সকল লইয়াই জড়-প্রকৃতি।

আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে মূল প্রকৃতির তথ্য নিরূপণ অধিকতর কঠিন —কেবল একপ্রকারে নহে, নানা প্রকারে, কারণ এই বিষয়টী বড়ই জটিল ও বিভ্রমাত্মক, দুরবগম্য ও দুরূহ। 'আমি' জ্ঞানটী সকলের অভ্রান্ত ও নিশ্চিত বলিয়া, দর্শনশাস্ত্র আত্মার সহিত ইহার তুলনা করিয়া এ সম্বন্ধে একটী গৌণ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে মাত্র।

যাহা আত্মা নহে তাঁহাকেই ফিক্‌টে (Fichte) অনাত্মা কহিয়াছেন। সমষ্টিভাবে দেখিতে হইলে মূলপ্রকৃতির নানাধর্ম্ম পরস্পর মিশ্রিত হওয়ায়, উহাকে একটী জটিল ভাবে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি তাহার কতকগুলি অংশ পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিয়া আত্মার বিপরীতে স্থাপিত করা যায়, তাহাহইলে তাহার অনেকগুলি প্রকাণ্ড, সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আমরা পৃথক্‌রূপে বুঝিতে, সক্ষম হইতে পারি। সেইগুলি আমাদিগকে ক্রমশঃ উক্ত বক্র ও জটিলীভাব সমূহের মধ্য দিয়া সুন্দররূপে পরিচালিত করিবে। তজ্জন্য আমরা এক্ষণে আত্মার বা 'আমি'র ধর্ম্মনিচয়ের যাহাকিছু বিরোধী, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং সেই আলোচনার জন্য মূলপ্রকৃতিকে অর্থাৎ তাহার বিশেষ বিকারসমূহকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একত্র স্থাপন করিলাম। এরূপে দেখিতে পাই :—

১। আত্মা এক, অদ্বৈত তথা অসীম ও অনন্ত।

তজ্জন্য অনাত্মা বহুত্বব্যঞ্জক, নানা পৃথক্ ও সসীমপদার্থ, এবং অগণ্য নির্দ্দিষ্ট ও অস্থায়ী পদার্থের সমষ্টি-প্রতিপাদক।

২। অদ্বৈতবিধায়, আত্মা সত্তাসামান্য সুতরাং নিশ্চল।

তাহা হইলে অনাত্মা জটিল ও মিশ্রভাবাপন্ন, নানা অংশে গঠিত, এবং সেই অংশগুলি সদাচলায়মান ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধে সদাই পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত।

৩। আত্মা—প্রাণ, সত্তামাত্র বা সৎস্বরূপ।

অনাত্মা—অপ্রাণ, অসৎ। (আমরা যাহাকে পদার্থ বলিয়া জানি,সে সকলেরই প্রাণ আছে, প্রতি অণু মধ্যে প্রাণ প্রবিষ্ট; এখানে অনাত্মা বা মূলপ্রকৃতি অর্থে সেই সকল নহে—কেবল জড়প্রকৃতি মাত্র, প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত—অর্থাৎ আত্মা যিনি প্রাণময় তাঁহারই সম্পূর্ণ বিপরীত।)

৪। আত্মা—জ্ঞানময়, চিন্মাত্র।

প্রকৃতি—অজ্ঞান, অচিৎ।

আত্মাকে সত্য ও সৎস্বরূপ বা ভাবমাত্র দেখিয়া, অনাত্মাকে অনৃত ও অসৎ বা অভাবরূপে দেখা যায়। আত্মা ও অনাত্মা ভাবগম্যমাত্র—স্থূল, সূক্ষ্ম কোনও সংহত পদার্থের সহিত যাহার তুলনা দিবার সাধ্য নাই। প্রাচ্য বৈদান্তিক ও আধুনিক জার্ম্মান দর্শনশাস্ত্রকারগণ, এই জগৎ মিথ্যা; আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদায়ই মায়ামাত্র, এইরূপ কহিয়া থাকেন—ইহা দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েন। কিন্তু আত্মা ও অনাত্মা উভয়কে উপরোক্ত রূপে বুঝিতে পারিলে, কাহারও কোন ভ্রম না হইবারই সম্ভাবনা। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ—আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত সদাই বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছি—ইহারা বাস্তবিক সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ঐন্দ্রজালিক মায়াবৎ নহে। জগৎ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে মিথ্যা—অর্থাৎ সদসৎ উভয়ই। কেবলমাত্র পরম সত্য যখন আপনাকে ইহা হইতে আকৃষ্ট করিয়া অন্তর্হিত হইবেন, তখনই মিথ্যামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি যদ্দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইতে পারে :—

আমাদের সৌর জগৎ অণুরাশিদ্বারা গঠিত, সেই সকলই ঈশ্বরের মহানিশ্বাস হইতে জাত অসংখ্য বুদ্বুদ-সম্ভূত; যাবৎ তাঁহার নিশ্বাস বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ

চতুর্দ্দশভুবন তাঁহার প্রাণে পূরিত থাকিয়া সত্যবৎ দীপ্তি পাইবে ; তিনি পুনরায় তাঁহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই সকলই লুক্কায়িত হইবে, কারণ তাঁহার নিশ্বাসই জগৎ-প্রাণ, তাহাই পরম সত্য, তাঁহা ব্যতীত অবশিষ্ট শূন্যময়।

আত্মা, চৈতন্য, প্রাণ সেইজন্য কেবল একমাত্র সত্য, ও তাহার বিপরীত অনাত্মা অধ্রুব ; এবং অনন্ত চৈতন্যের বিপরীত হওয়ায় অনাত্মা ক্ষণস্থায়ী।

এক্ষণে আমরা অনাত্মা বা মূলপ্রকৃতির বিশেষ বিকারসমূহের সমষ্টি সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবার্থ পাইলাম। ইহা বিশিষ্ট পদার্থসমূহের একটী পুঞ্জ, সমগ্র বিশেষের সংহতিমাত্র। ইহাকে আরও একটু ভালরূপে দেখা যাউক।

যাহা হইতে পারে তাহা অবশ্যই হইবে। নবম ও দশম শতাব্দীর মুসলমান দর্শন শাস্ত্রকারগণ দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্ম—নির্গুণ ও সগুণ। পূর্ণভাবে—যাহা কিছু হইতে পারে বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা সকলই তাঁহার মধ্যে ধারণ করেন। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"। যখনই সম্ভবপর কিছু বাস্তবিকরূপে পরিণত হয়, তখনই দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন একটী নির্দ্দিষ্ট বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমাদের পৃথক ও সসীম জ্ঞানের নিকটই কেবল সম্ভব ও বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়—সগুণব্রহ্মে, প্রত্যগাত্মাতে ঐ উভয়ই এক। দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন কোন এক বিশ্ব যখন আমাদের সসীম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তখনই সেই বিশ্বকে আমরা বাস্তবিক কহিয়া থাকি। কিন্তু চিদ্‌ঘন সমীপে, সম্ভব—বাস্তবিক, গুহ্য-স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান বা স্থূলে বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। অসত্য কখনও সত্য হইতে পারে না, এবং যাহা বাস্তবিক তাহা কখনও একেবারে বিনাশ পাইতে পারে না—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" গীতোক্ত এই বাক্য গুলির অর্থ সর্ব্বতোভাবে সত্য। অসতের কোন সত্তা নাই কখনও থাকিতে পারেনা ও কখনও ছিল না ; সতের নাশ নাই, ইহা সদাই নিত্য।

(মূল বর্ণনা হইতে একবার বিষয়ান্তরে গমন করিলাম।) এস্থলে আমরা ব্যক্তিগত অবিনশ্বরতা পাইতেছি। সকল মূর্ত্তিই অনন্তের বক্ষে সদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহারা চক্রবৎ আসিতেছে, যাইতেছে, যাইয়া পুনরায় আসি-

তেছে। যতদিন কোন এক নির্দ্দিষ্ট জীব কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির ভাবনা করিবেন, ও তৎপ্রতি তাঁহার চিত্ত সংলগ্ন রাখিবেন, ততদিনই সেই মূর্ত্তির জগতে স্থিতি সম্ভবে! পরম চৈতন্তের দ্বারা সদাই ঈক্ষিত হওয়ায় তাহাদের চিরস্থিতি—তজ্জন্য কোন জীব ইচ্ছা করিলে তাহার শরীর অধিককাল স্থায়ী রাখিতে সক্ষম হইতে পারে। যদি John Smith স্বীয় মূর্ত্তিদ্বারা মোহিত হইয়া তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট সামান্য জ্ঞানাবস্থা বহুকাল রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি করিতে পারেন—কেহই তাঁহাকে সে সম্বন্ধে বাধা দিবেনা। যত দিন তিনি John Smith রূপে থাকিতে ইচ্ছা করেন, ততদিনই ঐরূপ থাকিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, কিছুকাল পরেই তিনি John Smith সম্বন্ধে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িবেন, এবং অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। কিন্তু সেই John Smith মূর্ত্তি, তাহার পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে অপসৃত হইয়া একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না—অতি সূক্ষ্মভাবে অনন্তে থাকিয়া যাইবে, এবং ভাবী কল্পে বা অন্য কোন কালে ও দেশে প্রয়োজন মত বিকাশ পাইবে।

(আবার পূর্ব্বস্থানে দেখুন।) "ব্রহ্ম" এই বাক্যটী প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে, প্রথমেই সকলের তাহা জানা আবশ্যক—যদিও ব্রহ্মের প্রকৃত ধারণা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য; মুনি ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন না, আমাদের সামান্য চিন্তা দ্বারা কিরূপে তাঁহার অন্ত পাইব? স্থূলভাবে মাত্র দেখিয়া, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ঔপনিষদ বাক্যটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিই সমুদায়—চৈতন্য ও জড় উভয়েরই সমষ্টি —যাহা ছিল, আছে ও হইবে, সে সকলই তাঁহাতে অবস্থিত। তিনিই এই সমস্ত, এই জ্ঞান মনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত না হইলে, এবং বাস্তবিক তিনি যাহা তদপেক্ষা কিছু ন্যূন ধারণা হইলে, পরে অনেক সংশয়, উদ্বেগ ও গোলোযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। হঠাৎ মনে উদয় হইতে পারে, কি কারণ এই বিশেষ অসামঞ্জস্যটি বর্ত্তমান! কিন্তু যখন তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই, তিনিই সর্ব্বময়, তিনিই অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, দেশাতীত, কালাতীত, স্থির, নিশ্চল, সাম্য ও সকলের সমষ্টি, এইরূপ ধারণা হইবে, তখনই তাঁহাকে (Void) মহাশূন্যবৎ বোধ হইবে—কারণ সকল দ্বন্দ্বই পরস্পর বিনাশপ্রাপ্ত

হইয়া, একীভূত হইয়া তাঁহাতে মিশাইয়া যায়। অথবা, যখন অনন্ত তাঁহাতে, চরাচর সমস্তই সংস্কার বা ভাবমাত্রে পরিণত হইয়া অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত থাকে, এবং পুনরায় প্রলয়ান্তে দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন হইয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, তখন তাঁহাকে বিশাল পূর্ণতারূপেও (Plenum) অনুভব করিতে পারা যায়। সেইরূপ পূর্ণগতি এবং পূর্ণ নিশ্চলতাও সমতুল্য। কিন্তু অবচ্ছিন্ন (Relative) বা আপেক্ষিক গতি ও নিশ্চলতা পরস্পর বিপরীত।

জগতে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তাহা হইলে এই বুঝাইবে যে তাহারা প্রত্যেকে ক্ষণিক এবং যাহা চিরকাল আছে তাহার ক্ষণিক বিকাশ মাত্র—যাহা কখনও ছিলনা তাহার নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহারই পুনঃ আবির্ভাব মাত্র হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন সকল পদার্থই চিরকাল আছে ও তাহাদের বিনাশ অসম্ভব —এই মৌলিক ভাবটী আলোচনা করিয়া আমরা এখন দেখিব কি প্রকারে তাহারা দেশ, কাল ও অয়ন দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু, ইচ্ছাকারী ও ইষ্টদ্রব্য, কার্য্যকর্ত্তা ও কার্য্য বা রচিত বস্তু; এই উভয়ের মধ্যে মূল প্রতিবন্ধ বা ব্যবধান হইতে দেশ বা অবকাশের সম্ভব হইয়াছে। আত্মা ও অনাত্মা কহিলেই, উভয়ের পৃথক্ভাবটীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ব্যবধানের ভাবটীও আসিয়া উপস্থিত হয়— ঐ উভয় যদ্দ্বারা ভিন্নরূপে অবস্থিত সেই অবকাশটীই দেশ বা আকাশরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। আকাশের ভাব ভেদভাবেই সংলগ্ন। অলিঙ্গে বা ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত মূল প্রকৃতি (Abstract Not-self) যেমনই সংহত সূক্ষ্ম স্থূল পদার্থরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তেমনই যুগপৎ আকাশ আত্মার দর্শন গুলিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। অনেকে পূর্ব্ব হইতেই আকাশের বিদ্যমানতা স্বীকার্য্যরূপে অনুমান করিয়া লয়েন, বহুত্ব-প্রকাশ-প্রতিপাদন জন্য তাঁহারা ইহা প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন; মূল প্রকৃতিই আত্মায় ব্যবধান স্থাপন করেন। যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইচ্ছাকারী ও ইষ্টদ্রব্য, কার্য্যকর্ত্তা ও তাঁহার কার্য্য সকলই একে মিশাইয়া যায়, আকাশও তখন লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যেখানে ভেদভাব বিদ্যমান

সেই থানেই আকাশও বিদ্যমান, ও যেখানে ভেদ নাই সেখানে ব্যবধানের জন্য আকাশেরও প্রয়োজন নাই।

মূলপ্রকৃতি হইতে আর একটী ধর্ম্ম আত্মার উপর ন্যস্ত হইয়াছে; তাহা কাল বা সময়ের জ্ঞান। বদ্ধভাব এবং বহুত্ব হইতে আমাদের সময়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেখানে সীমাবধারণ এবং পৃথক পৃথক্ জীব উৎপন্ন হয়, সেইখানেই সময় দেখা দেয়,—এবং সসীম জীব সর্ব্বব্যাপী না হওয়াতেই, যাহাতে ক্রম বা অনুসন্ততি বর্ত্তমান সেই সময়ের প্রয়োজন হইয়া উঠে। * পৃথক পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত অনেকগুলি পদার্থ দেখিতে হইলে, কোন একা সীমাবদ্ধ জীব এককালে সকল গুলিকে দেখিতে পারে না—ক্রমে ক্রমে পরে পরে দেখিতে হয়, ঐ স্থানেই সময় উপস্থিত হইল। একটী দেখিয়া অপরটী তাহার পরে দেখাতে জ্ঞানের আনন্তর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে,—প্রথমে একটীর জ্ঞান হয়, পরে অপরটীর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল গুলির জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। এই জন্যই কালকে ঐন্দ্রজালিকের শ্রেষ্ঠ (Master of Illusion) কহিয়া থাকে;—আমাদের যুগপৎ সমস্ত দর্শনের ক্ষমতার অভাব, আমাদের বোধশক্তির বিশিষ্ট সীমা থাকায় কালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের এই ক্ষমতার অভাবে এবং সসীমতাতেই কাল দৃঢ় সংলগ্ন।

জনৈক লেখক পার্থিব ঘটনাগুলি দর্শনের ক্ষমতা যথাবৎ রক্ষা করিয়া দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত তমাচ্ছন্ন আকাশে গমন করিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে দ্যুলোকভুক্ত অতীত ঘটনাবলি জানিলেন, পুরাতন রাজত্ব-সমূহ দর্শন করিলেন, এবং ক্রমে আরও পশ্চাৎগমনে জগতের প্রথম গঠনাবস্থায় উপনীত হওত তাহাকে উত্তপ্ত বাষ্পময় দ্রব অগ্নিরাশিতে পরিণত অবলোকন করিলেন। যেমন একটী নক্ষত্র যাহা দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টা

---

* "পরমাপকর্ষ পর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ।" যেখানে আর বিভাগ হয় না, সেই নিরবয়ব কালের অংশকে ক্ষণ বলে। (ব্যাসদেব)

"ক্ষণস্তু বস্তু পতিতঃ ক্রমাবলম্বী ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে।"

ক্ষণটী ক্রমের অবলম্বন, কারণ ক্রম আর কিছুই নহে, কেবল ক্ষণের আনন্তর্য্য অর্থাৎ অবিরল ভাবে ক্ষণপ্রভাবই ক্রম। এই ক্রমবিশিষ্ট ক্ষণকেই কালজ্ঞেরা কাল বলিয়া থাকেন।

করিতেছি, এবং যাহা সম্ভবত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কিরণজাল তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া কেবলমাত্র সম্প্রতি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে, তেমনই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুদূর অতীতে বিশাল গগনের সেই নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত এই জগতের তৎকালিক অবস্থা, যিনি দেশ কাল বন্ধন অতিক্রম করিয়া তথায় উপনীত হইতে সক্ষম, কেবলমাত্র তিনিই অবলোকন করিতে পারেন।

কল্পনাকে সূক্ষ্ম ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে আমরা কালের অমূলকতা কিঞ্চিন্মাত্র ধারণা করিতে পারি, এবং চিরস্থায়িত্বের অশেষ ক্রম বা অনুসন্ততি (the unending succession of the Everlasting) ও অনন্তের যুগপতত্ব (the simultaneity of the Eternal) এই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। অনন্তে অবস্থিতিই দেশকালকে অতিক্রম করিয়া শান্তির অন্তরতম কেন্দ্রে বসতি মাত্র; যে অপূর্ব্ব অবস্থা মায়ার বহুত্বের পরপারে অবস্থিত এবং যদ্দ্বারা পূর্ণ সত্তাব উপলব্ধি হয়, যাতায়াতের পরিবর্ত্তে যাহা সতত 'অস্তিমাত্রের' পূর্ণতা অবলোকন করে। অনন্তের ধর্ম্মযুক্ত আমরা দেশ কালদ্বারা বিভ্রান্ত হইব না, কিম্বা মায়ার ছায়াময় নৃত্যেও (ছায়াবাজীতেও) বিচলিত হইব না। খৃষ্ট এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন ঈশ্বরের জ্ঞানই অনন্ত জীবন; তাঁহার জনৈক শিষ্যও কহিয়াছেন, "তোমাকে (ঈশ্বরকে) জানাই অনন্ত জীবন"। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই, অনন্ত জীবন লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয়ই তুল্যরূপে কালে অবস্থিত; অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইলেই জীব তাহার অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন। ইহা যথা সময়ে বিবর্ত্তনের কথা নহে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষয়। আমাদিগকে কালের পরিণামী নিত্যত্ব অতিক্রম করিয়া গূঢ় বর্ত্তমান (the mystic Now) পাইতে হইবে।

মূল প্রকৃতির বহুত্ব হইতে সেইরূপ একটী তৃতীয় বদ্ধাবস্থা চৈতন্যে অর্পিত হইয়া থাকে—ইহাই অয়ন বা গতি। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন সসীম জীবের স্বীয় অভ্যন্তরে প্রত্যাগাত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব উৎপাদন করিবার চেষ্টাকেই 'গতি' কহা যায়। বদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত জীব সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না, সেই জন্য গতিদ্বারা তিনি সদাই ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব আপনাতে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া

থাকেন। অবিদ্যার বন্ধনের মধ্য হইতে অসীম ব্রহ্মের উপলব্ধি করণের যত্নই 'গতি'। নির্ব্বাণিক স্তরে প্রতি অণু অসীম বিস্তৃতির ক্ষমতা ধারণ করে এবং বিন্দুমাত্রে সঙ্কুচিতও হইতে পারে, যেন তাহারাও প্রত্যেকে সেই অসীম, অনন্ত ও নিশ্চল কূটস্থ চৈতন্যের একটী মূর্ত্তি উপলব্ধির জন্য ব্যগ্র।

"As above, so below" উপরে যেমত নিম্নেও সেইমত, (Hermes) হারমিসের ঐ বচন স্মরণ করিয়া আমরাও আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জটিলতা ও আশ্চর্য্যতা সম্যক্ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের জীবন সেই অনন্ত, কালাতীত ব্রহ্মের এক একটী কণামাত্র, এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জড় প্রকৃতির এক একটী অংশে জড়িত। আবার, প্রকৃতির ঐ অংশ সকল আমরাই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ত্যাগও করি। প্রকৃতির সহিত আমাদের ঐরূপ সম্বন্ধ হইতে বিশ্ববিজ্ঞান বুঝিবার একটী উপায় বা পথ আমরা পাইতে পারি—অর্থাৎ চরম দ্বন্দ্বটীর, প্রত্যগাত্মা ও মূলপ্রকৃতির, পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা অবগত হইবার উপায় সামান্য পরিমাণে দেখিতে পাইতে পারি।

দেশ, কাল ও গতি হইতে বিবিধ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও আমরা তাহাদেরই মধ্য দিয়া অসীম, অনন্ত ও নিশ্চল ব্রহ্মে উপনীত হইতে পারি।

এখন আমরা 'আরম্ভ' ও 'শেষ' সম্বন্ধে আলোচনা করিব—যে দুইটী শব্দ সকল বিশ্বকে ও সকল বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার ঘটনাবলিকেই স্পর্শ করিতেছে। 'গতি' সততই দেশ ও কালে 'আরম্ভ'কে উৎপন্ন করিতেছে, এবং 'শেষ'কে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতেছে। বিশ্ব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্ষয় হইতেছে ও পরিশেষে লয় প্রাপ্ত হইতেছে! বিজ্ঞানও 'আরম্ভ' ও "পরিণামের" ঈষৎ দৃষ্টি পাইয়াছে; কিছুই স্থায়ী নহে, কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। বিশ্বমধ্যে মূর্ত্তি সম্বন্ধে ইহা সমভাবে সর্ব্বত্র সত্য: "প্রতি মুহূর্ত্তে একটী জন্মাইতেছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে একটী মরিতেছে"। এবং মূর্ত্তির মধ্যেও অগণ্য আরম্ভ ও পরিণাম রহিয়াছে—পরমাণু সকল আসিতেছে, আসিয়া একটী আকৃতিতে সংলগ্ন হইতেছে, পরমাণু সকল চলিয়া যাইতেছে, বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই আকৃতি হইতে দূরে যাইতেছে। কোন একটী পদার্থ যেরূপ স্থায়ী হউক না কেন, যে পরমাণু সমূহ দ্বারা উহা গঠিত, সেইগুলি প্রতি নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জলের চাপে কোন নল হইতে অতিবেগে নিঃসৃত জলরাশি একটী কঠিন যষ্টি বা

দণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এবং যথার্থই এরূপ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া থাকে যে একটী লৌহ-অর্গল তাহার বিরুদ্ধে ধরিলে ঐ লৌহদণ্ডটী ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু উক্ত জলস্তম্ভটী প্রভূত বেগে সঞ্চালিত দ্রুতগতি বিশিষ্ট জলকণার অনুপতনমাত্র; আমাদের শরীর সম্বন্ধেও সেইরূপ, মূর্ত্তিটী থাকে বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু দ্বারা উহা গঠিত সেইগুলি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—সকল আকৃতিই মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল।

এই বিষয়টী অনেককে কতকগুলি ভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছে,—'সদা সর্ব্বত্র নির্দ্ধারিত সমতা বা সমগুরুতা রক্ষা হইতে হইবে'—ইহা তন্মধ্যে একটী। কিন্তু মূর্ত্তি সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজন নাই। কেহ কহেন "এক স্থানে কাহারও জন্ম হইলে, অপর এক স্থলে কাহারও মৃত্যু হইতে হইবে, এক স্থানে সুখ হইলে অপর স্থানে দুঃখ চাহি. একদিকে বৃদ্ধি হইলে অপর কোন দিকে হ্রাস হইতেই হইবে।" * সমষ্টি সম্বন্ধে ইহা সত্য বটে, কিন্তু কোন ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র নহে, এবং অপর অংশ সকলের সহিত ও সমুদায় সমষ্টির সহিত সম্বন্ধহীন নহে। † সমষ্টি সম্বন্ধে নিশ্চল নিয়ম স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সমষ্টিসম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহা সকল অংশ সম্বন্ধে সে একইরূপে সত্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এবং জন্ম মৃত্যু, সুখদুঃখ, হ্রাসবৃদ্ধি, এ সকলই অংশ সম্বন্ধীয়। যদিও কোন ব্রহ্মাণ্ড তাহার ব্রহ্মার দিবসে ও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে যথার্থই স্বতন্ত্র হয়, তথাপি সেই ব্রহ্মা স্বয়ং সদাই প্রণালী স্বরূপ অবস্থিত থাকিবেন, এবং তাঁহার ভিতর দিয়া অসীম জীবনী স্রোত তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবাহিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিঞ্চিৎ গুরুত্ব সাধনও করিতে পারে। পুনশ্চ, যাহা শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধীয় নিয়মরূপে খ্যাত,—যে নিয়ম দ্বারা একজাতি অপর জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে,—পদার্থ বিজ্ঞানের এই প্রসিদ্ধ নিয়মটীতে মনোবিজ্ঞান বড় মনোনিবেশ করেন নাই।

---

* Prof. Haeckel এইরূপ কহিয়াছেন।

† Sir Oliver Lodge এই Conservation of energy সম্বন্ধে কহেন:—"We are not yet sure of having fully and finally exhausted the whole category of energy."

"The serious mistake which people are apt to make concerning this law of energy is to imagine that it denies the possibility of guidance, control or directory agency."

যদিও কোন শক্তির পরিমাণকে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে ধরিয়া পাওয়া যায়, তথাপি ইহা বহুসংখ্যক রূপ ধারণ করে, এবং একটী রূপ অপররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উত্তাপ ও তাড়িতের পরিমাণ নিত্য নহে, কারণ একটী অপরটীতে পরিণত হইতে পারে—দর্শনশাস্ত্র ইহা অনুমোদন করিবে।

আত্মা ও অনাত্মার মৌলিক সম্বন্ধটী কি? স্পষ্টই দেখা যায় যে আত্মা সততই মূলপ্রকৃতিকে 'আমি' বলিয়া পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতেছেন, তেমনই পুনঃ পুনঃ তাহাকে 'আমি ইহা নহি' বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন। জীবের জীবনের এই একমাত্র ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে—একবার প্রকৃতিকে গ্রহণ ও তৎপরেই তাহাকে ত্যাগ; বিশ্ব সম্বন্ধেও এইরূপ। যদ্যপি মানবের জীবন আলোচনা করিয়া দেখি,—আমাদের স্ব স্ব জীবন এবং তদ্রূপ অপরেরও জীবন,—আমরা দেখিতে পাই যে, নিয়ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করাতেই প্রকৃত পক্ষে আমাদের জ্ঞানোদয় হইতেছে। যাহা এক সময়ে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম, অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা তাহাকে অনাত্মাবোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। অতি সামান্যমাত্র বিবর্ত্তিত মানব তাহার বিবিধ প্রবল ইচ্ছাদি সহিত স্থূলদেহকেই 'আমি' বলিয়া অনুভব করে। আমাদের চিন্তা বা বোধের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেই তাহাদিগকে 'আমি' না কহিয়া 'আমার' কহিয়া থাকি—অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দেহাদিকে 'আমি' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ অজ্ঞানের নাশে সেই দেহাদিকে জড়াংশ বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে; 'আমি' কথঞ্চিৎ অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্থূলশরীরকে 'আমি ইহা নহি', "অহমেতৎ ন" বিবেচনা করিয়া দূরে স্থাপন করি। সাধনায় অগ্রসর হইয়া জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ক্রমে বিবিধ ইচ্ছার আধার কামময় শরীরকেও 'ইহা আমি নহি' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। ধ্যানপরায়ণ জীব সাধনমার্গে আরও অগ্রসর হইয়া, তৎপরে সর্ব্বপ্রকার চিন্তার যন্ত্র (lower mind) মনকেও অনাত্মা বোধে পরিত্যাগ করেন। এই ক্রিয়া তখনও চলিতে থাকে। জীব যেমন একটী শরীরকে অনাত্মা বোধে পরিত্যাগ করেন, তেমনই তদুপরিস্থ শরীরে স্বীয় চৈতন্য আকৃষ্ট করিয়া তাহার সহিত তাদাত্ম্যভাব স্থাপন করেন—যে পরিমাণে জীবচৈতন্য স্বীয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন, সেই পরিমাণে একের পর এক, তাহার পর অন্যটী,—যাহাদের পূর্ব্বে 'আমি' বলিয়া স্বীকার

করিয়াছিলেন, সকলকেই এইরূপে পরিত্যাগ করত অনাত্মাতে নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ নিয়মটী পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হই। অবনয়ন প্রণালীতে জীব প্রকৃতির বিবিধ অংশ ক্রমে ক্রমে আপনার করিয়া লইয়া, বিবিধ স্তর দিয়া অবতরণ করেন ; এবং উন্নয়ন প্রণালীতে ক্রমে ক্রমে পুনরায় সেই সকল অংশকে পরিত্যাগ করত স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

[অবতরণকালে জীব ক্রমশঃ প্রকৃতির আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায়, শেষে যখন কঠিনতম স্তরে উপনীত হয়েন, তখন তিনি জড় প্রকৃতির সম্পূর্ণ বশীভূত। সেই কঠিন খনিজ রাজ্যে জড় প্রকৃতির সহিত তাঁহার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরে জড় প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিয়া, তাহাকে স্বীয় উপাধিরূপে পরিণত করত, ধীরে ধীরে উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকেন।]

সৃষ্টিপ্রকরণ ইহা হইতে অপর কিছুই নহে। অনাত্মাকে আপন করিয়া লইয়া, তাহার সহিত প্রথমে তাদাত্ম্যভাব স্থাপন, যথা—'আমিই ইহা' "অহমেতদস্মি" ; এবং তৎপরে সেই অনাত্মাকে 'আমি ইহা নহি' "অহমেতৎ ন" বলিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করা—প্রথমে গ্রহণ, পরে পরিত্যাগ। আপনাকে জানিতে পারিলেই বিশ্বকে জানা হইয়া থাকে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

এই শোক-দুঃখ-জ্বালাময় সংসার-নদীর তপ্তসৈকতে বারিবিন্দুসম স্নিগ্ধকর স্থান যদি কিছু থাকে তবে তাহা তীর্থ-স্থান। মোহান্ধ হৃদয়ে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে, পাপ কুজ্ঝটিকার অস্পষ্ট অন্ধকারে শুভ্রালোক বিস্তার করিতে, বিষয়াসক্ত মলিন প্রাণে পুণ্যের পীযূষধারা প্রবাহিত করিতে যদি কিছু থাকে তবে তাহা দেবস্থান। প্রখরবাহিনী মায়ানদীর দুস্তর পারাবারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া, জীবকুল হাবুডুবু খাইতেছে, তদুপরি আবার চারিদিক হইতে কামনা-বাতাস প্রবলবেগে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, এই তরঙ্গাঘাতে আশ্রয়ের যদি কিছু থাকে তবে তাহা দেবস্থান। কাম-ক্রোধাদির তীব্র কষাঘাতে, লোভ-মোহাদির অসহ্য তাড়নায় হৃদয় যতই বিচূর্ণ হউক না কেন, তীর্থ-

স্থানের পুণ্য-রেণুকাস্পর্শে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে আবার নবভাব সঞ্চারিত হয়, মৃতকল্প প্রাণ অমৃতসিঞ্চনে মুহূর্ত্তের জন্যও পুনরুজ্জীবিত হয়। মানব যখন বহুদিনের সঞ্চিত আশা বুকে করিয়া, তদ্গতচিত্তে ভাবময় প্রাণে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রী কি এক অব্যক্তসুরে বাজিয়া উঠে, বিশ্বযন্ত্রের একতানময় ওঁকারাত্মক সুরের সহিত তাহার প্রাণ নৃত্য করিতে থাকে। সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্বিভূতি সন্দর্শন মানসে ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তৎপ্রতি নেত্রযুগল ন্যস্ত করিলে, কি এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমের উৎস হৃদয়ক্ষেত্রে বহিতে থাকে, ভাষা তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

তীর্থস্থানের এমনি অদ্ভুতশক্তি যে, আমাদের ন্যায় কলুষিত চিত্তকেও ক্ষণ-কালের জন্য ভেদভাব ভুলাইয়া, জাতিধর্ম্মের অভিমান বিস্মরণ করাইয়া সকলের সহিত এক সমতাসূত্রে গাঁথিয়া দেয়। সুদুরাচার ব্যক্তির প্রাণ হইতে কিয়ৎ-কালের জন্য সংসারের কালিমাময় ছায়া বিদূরিত হয়।

তীর্থস্থানে হৃদয়ে যে, এইরূপ মহাভাবের উদয় হয়, ইহা অনেকেরই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, কিন্তু ইহার মূল কারণ কি? সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের শক্তিই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্মরূপে অভিব্যক্ত, তবে স্থানে স্থানে এই-রূপ অনায়াসে এই পরমভাবের ছায়া কেন প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি ত সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।

এই বিশ্বও তাঁহারই অভিব্যক্তি, জগৎ তাঁহারই রূপ, দ্যুলোক ভূলোক সকলি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, সকলি তিনি। তাঁহার সত্তাতেই সকলের সত্তা। কারণাত্মক, কার্য্যাত্মক সকলরূপ প্রকাশভাবই এক ব্রহ্ম-সত্তা। শিবপুরাণ এই কথা প্রতিধ্বনিত করিতেছে,—

সর্ব্বা লিঙ্গময়ী ভূমিঃ সর্ব্বং লিঙ্গময়ং জগৎ।
লিঙ্গময়ানি তীর্থানি সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতং॥
সংখ্যা ন বিদ্যতে তেষাং কিঞ্চিত্তদ্প্রব্রবীমীহ॥
যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যতে দৃশ্যং বর্ণ্যতে স্মর্য্যতে চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং শিবরূপঞ্চ নান্যদস্তীতি কিঞ্চন॥

এই কথার পর আবার স্থান-বিশেষকে বিশিষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া কেন বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি অদ্ভুতশক্তি, কি আশ্চর্য্য তেজ, কিংবা অসাধারণ স্মৃতি ইহার সঙ্গে জড়িত যে, এত সহজে হৃদয়ে ভক্তির প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। কাশীখণ্ড বলেন—

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসঃ।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

এই সকল অদ্ভুত বিভূতি দর্শন ও তচ্চিন্তা সর্ব্বাশয়-স্থিত ভগবানের উপলব্ধির সোপান মাত্র। আদি-অন্তহীন অদ্বয়জ্ঞান সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত, এভাব আমাদের ন্যায় ভেদভাবাপন্ন জীবের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না বলিয়া, ধারণা-সৌকার্য্যার্থে ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির উপসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার উপযুক্ত অধিকারী "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়" এই ভাব ধারণায় সক্ষম হন নাই বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্॥
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥

(গীতা ১০।১৭)

অনন্ত বিভূতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে না বলিয়া ভগবান কয়েকটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহার বিস্তার বর্ণনা অসম্ভব, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে,—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মমতেজোঽংশসম্ভবং॥

(গীতা—১০।৪১)

ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীযুক্ত উৎসাহযুক্ত যাহা কিছু তাহাই ভগবদ্বিভূতি। তাহাই তাঁহার অংশ-সম্ভূত। 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই দুরূহতত্ত্ব পুরাণে প্রচ্ছন্নভাবে উপদিষ্ট বিভূতির অন্তরালে লুকায়িত। তাই সর্ব্বজগৎ লিঙ্গময় বলিয়াও আবার দ্বাদশ-জ্যোতির্লিঙ্গের নির্দ্দেশ।—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনং।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওঁকার-পরমেশ্বরং॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে॥

বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাননে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে॥
শিবপুরাণ জ্ঞান-সংহিতা—৩৮।১৭-১৯।

এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত। যদি কেহ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বনে শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রণালীমতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেন, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই তদ্গতচিত্ত হইয়া ভগবৎপ্রেম-পূরিত গদ্গদভাবে অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই; নিশ্চয়ই তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি অটলভাবে ভগবানের অস্তিত্বের আভাস দিবে।

প্রায় এক বৎসর হইল জনৈক বন্ধুর অনুগ্রহে এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গান্তর্গত সুদূর সেতু বন্ধ রামেশ্বরের পবিত্র রেণু স্পর্শে আমার জীবন পবিত্র হইয়াছিল। সে পুণ্যক্ষেত্রের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ভাষায় বর্ণনা করিতে সাধ্য আমার নাই, তবে যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম। ভ্রাতৃগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

রামেশ্বর ভারতবর্ষের প্রায় একান্ত দক্ষিণে অবস্থিত। আমরা কাঞ্চীপুর হইতে রামেশ্বর গমন করি। কাঞ্চীপুরে প্রাতে ট্রেণে উঠিয়া চিংলীপুট জংসনে গিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। প্রায় বেলা দশটার সময় express ট্রেণে উঠিয়া, রাত্রি প্রায় চারিটার সময় মাদুরায় অবতরণ করি। তথায় রামেশ্বর যাইবার ট্রেণ অন্য প্লাটফরমে দণ্ডায়মান ছিল। সেই ট্রেণে উঠিয়া মণ্ডপং নামক ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হয়। পাম্বাম নামক এই খাদটী পার হইয়াই আবার ট্রেণ। আমরা প্রায় বেলা ৪॥টার সময় রামেশ্বরে পৌঁছছাই।

রামেশ্বর এখন একটী দ্বীপে অবস্থিত। পুরাকালের পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে রামেশ্বর এরূপ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছিল না। এখন এই দ্বীপটী পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১৪মাইল দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ৫মাইল প্রস্থ। পাম্বাম মূলদেশ হইতে রামেশ্বরকে বিভক্ত করিয়াছে। সাহেবদিগের মতেও ইহা পূর্ব্বে সংযুক্ত ছিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে অচ্যুদপ্প নামক রাজার রাজত্ব কালে ভয়ানক ঝড়ে এইরূপ খাদ উৎপন্ন হয়, তখন ইহা নিতান্ত অপ্রশস্ত ছিল। Duch এরা এবং অবশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সুবিধার জন্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। ইহা পূর্ব্বে বক্রাকার ছিল বলিয়াই পাম্বাম "সর্পাকৃতি" নামে অবিহিত।

রামেশ্বরের মন্দির এক বিশাল ব্যাপার প্রায় ২০ বিঘা জমির উপর ইহা স্থাপিত। চারিদিকে চারিটী কারুকার্য্যময় অত্যুন্নত গোপুর বা প্রবেশ-দ্বার। ভিতরে চারিদিকেই প্রশস্ত পথ, দুই পার্শ্বে নানাবিধ মূর্ত্তি-সম্বলিত উচ্চস্তম্ভ। স্তম্ভের উপর ছাদেও নানাবিধ দেবলীলা অঙ্কিত। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তের লোক ছোট দেখায়। মূলমন্দির কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এবং নানাবিধ বর্ণ চিত্রিত। নাট মন্দির বহু অর্থব্যয়ে নাটকোটী সম্প্রদায়ের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সংস্কার করিতেছেন।

এই অসংখ্য স্তম্ভ, অত্যুন্নত গোপুর এবং সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত কক্ষাবলী শিবস্থাপনের অনেক পরে গঠিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে বহু কূপ ও বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, সমস্ত সহরের লোক এই সকল কূপের জল পান করিয়া থাকে। কারণ পানোপযোগী জল বাহিরে পাওয়া যায় না। শিব-স্থাপনের পরে বহুকাল এই স্থান বালুকাচ্ছাদিত উপলখণ্ড এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত বৃক্ষরাজি-সমাকীর্ণ ছিল। রামনাদের রাজা ভৈহয় তুল, তাঁহার গুরুর আদেশে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকেরা যখন সিংহলে গমন করেন, তখন এখানে একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়াছিলেন, খুব সম্ভব তাঁহারা এই মন্দির দেখিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান মন্দির তাহার অনেক পরে গঠিত হইয়াছে। রামনাদের একজন নায়ক-রাজ মন্দিরের ভিতর অংশ নির্ম্মাণ করেন, বাহিরের অংশ ও গোপুরাদি রাজা সেতুপতি প্রস্তুত করেন। সেতুপতি তখন স্বাধীন ও মহাতেজস্বী। এ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইহার কার্য্য শেষ হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং মুসলমানেরা আক্রমণ করিলে মন্দির-কার্য্য স্থগিত হয়।

এই স্থানে রামতীর্থ, লক্ষ্মণকুণ্ড প্রভৃতি বহুতীর্থ সেতু-মাহাত্ম্য মতে পুণ্যপ্রদ। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। "রাম ঝরকা" নামক একটী স্থান মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত, ইহা উচ্চ বালুকাস্তূপের উপর একটী দ্বিতল মন্দির। শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্কিত একটী প্রস্তর এখানে দ্রষ্টব্য। এখান হইতে সমস্ত দ্বীপটীর দৃশ্য দেখা যায়।

আমরা যখন এই মন্দিরের দ্বিতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম তখন সায়াহ্নকাল সমাগত প্রায়। পশ্চিম গগনে দিনমণি যেন অনন্ত সাগরের মধ্য

দিয়া অস্তাচলে গমনোন্মুখ। ম্লান কিরণে কাঞ্চনাভা-মিশ্রিত নীলাম্বর-ছায়া অনন্তনীলাম্বুরাশিকে যেন একটু গভীর নীলাব্জে শোভিত করিয়াছে। সেই অনন্তনীলিমাময় নিবাত নিষ্কম্প প্রশান্ত সমুদ্রের মধ্যে হরিদ্বর্ণের সুপ্রশস্ত মনোহারিণী শোভা অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। বৃক্ষরাজিকে ঈষৎ দোলাইয়া স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ সমীরণ আমাদের শান্তি শীঘ্রই অপহরণ করিয়া ফেলিল। কৃতির সেই অদ্ভুত লীলাক্ষেত্রে বসিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে মন্দিরের বিশা ় জাগিয়া উঠিল, মনে পড়িল—পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের মহীয়সী কীর্ত্তি, অ মনে পড়িল—তাঁহাদের হৃদয়ের উদার অনন্ত মহাভাব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য াহা দেখিলাম চিরজীবনেও তাহা ভুলিতে পারিব না। যাঁহাদের মূর্ত্তিতে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্র বাক্যে আস্থা নাই, তাঁহারাও এই মধুর দৃশ্য দর্শন করিলে উদার ভাবে উদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই প্রকৃতিই ভগবানের দেহ, সেই জন্যই ভাগবতে সমস্তই হরির শরীররূপে বর্ণনা দেখা যায়—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

[ক্রমশঃ]

অমানিশা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"তাই বটে, মানুষ পরের ঘাড়ে ঝুঁকি দিতে পারিলে ছাড়ে না। আমি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলাম, সত্য। কিন্তু আমি কি তোমার মনে পাপ প্রবৃত্তি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম?"

"কিন্তু আপনি শয়তান বলিয়া পরিচিত হইলেন কেন? কেন বলিলেন যে, মস্তকের একগাছি কেশ দান করিলে সমস্ত মস্তকটি দান করা হইল?"

"আমি কি ভুল বলিয়াছি? তুমি প্রথম পাপ প্রবৃত্তি যদি দমন করিতে পারিতে, সেই সময়ে যদি ঈশ্বরের সাহায্য চাহিতে, তাহা হইলে কি এতদূর

ঘটিত? তুমি নিজে ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া গর্ব্ব করিতে—জানিতে না যে, পাপের অঙ্কুর তোমার অন্তর্নিহিত আছে, সুবিধা পাইলেই বর্দ্ধিত হইবে।”

“আমি সমস্ত স্বীকার করি। আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। এক এক মুহূর্ত্ত এখন কত মূল্যবান, এইবার আমায় রক্ষা করুন। আমি আর পাপ করিব না।”

“তোমাকে রক্ষা করিব, সে বিষয়ে তুমিও আমাকে সাহায্য করিবে। এখন বুঝিলে আমি কে? তোমার নিকট আমার কি প্রয়োজন।”

“আপনি আমার জীবনদাতা—আমার রক্ষক।”

“বাগানে তোমার সহিত দেখা করিয়াছিলাম কেন? তোমাকে যে সব কথা বলিয়াছিলাম, তাহার একবর্ণও বৃথা নহে। স্থির হও, যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার সব আছে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।”

(১০)

ইহার পর আমি অচৈতন্য হইলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—কেবল একপ্রকার অব্যক্ত কোলাহল আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আবার আমার জ্ঞান লোপ হইল। আমি সেই অচৈতন্য অবস্থাতে শুনিলাম, “তুমি রক্ষা পাইয়াছ—ভয় নাই; তুমি দুর্ব্বল-হৃদয়। তোমার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই। তুমি মনুষ্য, ইহা মনে রাখিবে,—আরও মনে রাখিও, মানবকে আমি একেবারে অধিক রক্ষা করি না।”

আমার ওষ্ঠে একটী উত্তপ্ত চুম্বন আমার অচৈতন্য দূর করিল—আমি উঠিলাম। দেখি, উদ্যানমধ্যে সেই উপলখণ্ডোপরি নিদ্রিত। নীহারে সমস্ত শরীর সিক্ত—পকেটে হাত দিয়া দেখি, মণিব্যাগ আছে। সম্মুখে হেমলতা-শিশুটী আসিয়া মুখে মুখ দিয়া ডাকিতেছে,—“বাবা ওত থান্দায় ছুলে যে অছুখ হবে।”

আমার এইরূপ ভাবে রাত্রি যাপনের জন্য হেমলতা কত তিরস্কার করিল। বাঃ! একি! সব যে স্বপ্ন! উঃ! কি ভীষণ স্বপ্ন! যাহা হউক, আমি এই স্বপ্নে অনেক বিষয় শিক্ষা পাইলাম। অমানিশায় আর এখন একাকী শয়ন করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম।

(১১)

উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছি, এমন সময়ে সেই জগদানন্দ। এখন যেন তাহার আর সে কর্কশ ভাব নাই; মুখখানি অতি সরল অথচ গম্ভীর।

জগদানন্দ বলিলেন, "কেমন, ভাল ত? দেখ আমি ঠিক আসিয়াছি।"

এমন সময়ে হেমলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। জগদানন্দকে দেখিয়া প্রণাম করিল, বলিল,—"দাদা! ভাল আছেন ত?"

জগদানন্দ হেমলতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রিয়নাথ বাবু, আমায় চিনিতে পারেন নাই? না পারিবারই কথা, আমাকে কখন দেখেন নাই। হেমলতার পিতাকে আমরা কাকা বলিয়া ডাকি, দূর সম্পর্কে তিনি আমাদের কাকা হন। আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ হেমলতাকে দেখিতে আসিয়াছেন, বাহিরে গাড়ী আছে।"

হেমলতা ছুটিয়া তাহাদিগকে আনিতে গেল—আমি দেখিলাম—কি বিস্ময়! লবঙ্গ ও তাহার স্বামী! তাহার স্বামী আবার কে? আমার এক শ্যালক নীলরতন বাবু।

নীলরতন বাবু আমাকে নমস্কার করিলেন। লবঙ্গ ও নীলরতন বেশ সুখে আছে। লবঙ্গের সহিত যে নীলরতনের বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না।

আমি তখন জগদানন্দ বাবুকে কলিকাতায় তাঁহার সেইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, যে "মণিব্যাগের মধ্যে হেমলতার চিঠি তোমার নামে দেখিয়াই তোমাকে চিনিলাম, তুমি ভগ্নীপতি, তোমার বাসায় গেলাম। তোমার সহিত একটু বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা হইল। তুমি ক্রমে আমার দিকে অধিকতর বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলে, তোমার ব্যবহার যেন কেমন বোধ হইল; তাই আমার কৌতূহল আরও বাড়িল। তাই তখন তোমায় পরিচয় দিই নাই।"

আমিও স্বপ্নবৃত্তান্ত জগদানন্দকে বলিলাম, জগদানন্দ বলিলেন, "এ স্বপ্ন থেকে বেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। যাহা হউক, ভাগ্যে তুমি রক্ষা পাইয়াছ, তাই ত আমার মান থাকিল, নতুবা আমি সয়তান হইতাম।"

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। আশ্বিন ১৩১৭। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহামায়া-স্তোত্র।

তুমি মা ভুবনেশ্বরী যোগরাধ্যা যোগমায়া।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, ভবানী ভবের জায়া॥
পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয় করেতে ল'য়ে।
অভয় করিতে দান, নাচিছ অভয়া মেয়ে॥
মহেশানী, মহেশ্বরী, মহেশের মহাশক্তি।
দয়া মায়া শান্তি কান্তি তুমি মাগো পরা ভক্তি॥
বিশ্বমাতা হইয়াছ এ বিশ্ব প্রসব করি।
প্রণাম প্রণাম দেবি তব পদাম্বুজ স্মরি॥

(১)

মহালক্ষ্মী মহামায়া সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা।
শোক দুঃখ বিনাশিনী অপর্ণা অপরাজিতা॥
কমলিনী কমলাক্ষী সর্ব্বেশ্বরী জয়াবতী।
অমিতাপাঙ্গরূপিণী, দক্ষ-কন্যা শিবদূতী॥
শম্ভু নিশম্ভু নাশি, চণ্ড মুণ্ড বিনাশিয়া।
পরিয়াছ রক্তবাস ধূম্রা-রক্তে ছোবাইয়া॥
কৌমারী মা ক্ষেমঙ্করী ঈশ্বরী ঈশ্বর-প্রিয়া।
প্রণাম প্রণাম মাগো প্রণমামি গিরিজায়া॥

(২)

রক্তবীজ মহারক্ত হাস্যমুখে করি পান।
সমরেতে বিহারিছ লইয়া অসুর প্রাণ॥
দশভুজা দশভুজে শোভিতেছে দশ অস্ত্র।
অট্ট-হাস্যময়ী শিবে কেন তোর অস্ত্র শস্ত্র॥
ভ্রূভঙ্গে করিতে পার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাশ।
ধরিত্রীর কাঁপে হৃদি শুনি তোর অট্টহাস॥
সাবিত্রী গায়ত্রী উমা ত্রিশূলী শঙ্করী শিবা।
প্রণাম প্রণাম তোর হেরি পাদপদ্ম শোভা॥

(৩)

সুন্দরী যৌবনবতী সর্ব্বস্থান নিবাসিনী।
জগধাত্রী জগদম্বে তম গুণ বিনাশিনী॥
অন্নদে মা অন্নপূর্ণা বিজয়া অজিতা মায়া।
সর্ব্বকাম-অর্থ-দাত্রী হাস্যময়ী বিষ্ণু ছায়া॥
কাত্যায়নী গৌরী রৌদ্রী বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী।
ভৈরবী ভক্তের দাসী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ত্র্যম্বকা দক্ষ-নন্দিনী পতিব্রতা গুণবতী।
সপ্তস্বরাত্মিকা দেবী প্রণমামি সত্যবতী॥

(৪)

গণেশ জননী মাতা অনন্ত মহিমা তোর।
কিরূপে করিব স্তুতি নাহিক শকতি মোর॥
তোমারি শকতি ল'য়ে জুড়িয়া যুগল পাণি॥
করিতেছি স্তুতি দেবি সাধ্যমত যাহা জানি॥
শিখাও বিশুদ্ধ প্রেম, তোমার মা পরাভক্তি।
তুমি না শিখালে দেবি নাহিক আমার শক্তি॥
তবদত্ত ভক্তিবলে ভক্তি অর্ঘ দিই পদে।
প্রণমি লুণ্ঠিত হ'য়ে ও চরণ কোকনদে॥

শ্রীরাধা।

দুর্গাপূজা।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অলঙ্ঘ্যনিয়মে শরৎকাল আবার ফিরিয়া আসিল। ধরণীরাণী দিব্যালোকের উচ্ছ্বাসে সুশোভিত হইয়া কুমুদ-কমল-শেফালিকাদি নানাপ্রকার ফুলভার লইয়া, জগন্মাতার পবিত্র চরণে অঞ্জলিপ্রদানার্থ দণ্ডায়মান। আজ অমরজগতের দিব্যভাবের আভাস যেন মরজগৎ প্লাবিত করিয়াছে। তাই রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া, শোক ও সাংসারিক দুঃখে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, জননী প্রিয়তম পুত্রের শোক হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া মহা-আনন্দে মায়ের আহ্বান করিতেছে। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেই আনন্দকিরণে স্নাত হইয়া পূজাকার্য্যে নিযুক্ত। দিগঙ্গনা-গণ সপ্তমীর বালার্করাগে উদ্ভাসিত হইয়া অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। যাহা এতদিন বালুকাময়ী মরুভূমি ছিল মায়ের পদরেণুস্পর্শে তাহা তৃণপল্লবময় কুসুমসুবাসিত স্বচ্ছকল্লোলিনী-শীকরসিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। গ্রহ চন্দ্র তারকা আজ যেন সসম্ভ্রমে মায়ের আগমনী-গীত জগৎকে শুনাইতেছে— সাধক এই গীতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

এস মা এস মা উমা হরমনোমোহিনী ;
সম্বৎসর পরে তোমা ডাকি ওগো জননী ॥
গজানন ষড়াননে, বাণী কমলার সনে,
ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ নিয়ে এসো ও জননী ॥

জগজ্জননী, দশপ্রহরণী, দিকস্বরূপা দশদিক রক্ষা করিয়া, দক্ষিণে সর্ব্বার্থ প্রদায়িনী মহালক্ষ্মী ও মোক্ষদাতা গণপতি, বামে সর্ব্ববিদ্যাপ্রসবিনী ভারতী ও সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তিরূপ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সঙ্গে লইয়া সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরবধে নিযুক্তা। পূর্ণেন্দুসদৃশাননা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা জটাজূটসমাযুক্তা মায়ের অনিন্দ্যসুন্দরী মূর্ত্তি পূজা করিবার জন্য বঙ্গদেশ আজ কৃতসংকল্প। সপ্তকোটী কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দ্বিসপ্তকোটী ভুজে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য যুক্তকরে ও ভক্তিভরে মায়ের শরণাপন্ন।

আজ বঙ্গে শারদীয়া মহাপূজা। কত যুগযুগান্তর অতীত হইল বিদ্যা-স্বরূপিণী জগদাকর্ষণকারিণী মহামায়া এইরূপ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন বলা যায় না। স্বারোচিষ মন্বন্তরে মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঋগ্বেদোক্ত দেবী-সূক্ত দ্বারা তিনবৎসর মায়ের আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ নষ্টরাজ্যের উদ্ধার করিলেন ও সাবর্ণি নামক মন্বন্তরে অষ্টম মনুরূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং সমাধি-নামক বৈশ্য মোক্ষলাভ করেন। ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি রাবণ সুমধুর বসন্তকালে এই মূর্ত্তিতে মায়ের পূজা করিত। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস-কবল হইতে অযোনিসম্ভূতা মা জানকীর উদ্ধারার্থ মূর্ত্তিমান অহংকাররূপী রাবণকে বধ করিবার জন্য আশ্বিন মাসে এই পূজার প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি শরৎ-কালের এই পূজাই মহাপূজা বলিয়া পরিগণিত। কারণ মহাপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা ৩.২১

সুতরাং কতকাল হইতে মায়ের এই প্রকটমূর্ত্তিতে পূজা হইয়া আসি-তেছে, তাহার নির্দ্ধারণ হয় না। যতদিন হইতে ভারতবাসী আর্য্য নামে পরিচিত, যতদিন হইতে বেদ স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের অস্তিত্ব, ততদিন হইতে মা বা মহাশক্তির পূজা প্রচলিত। ব্রহ্মস্বরূপিণী চৈতন্যরূপিণী পরমা শক্তির প্রকট

মূর্ত্তির পূজা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। দুরূহ অবিশেষ ভগবত্তত্ত্ব বেদ ও শ্রুতিতে অপ্রকটভাবে নিহিত আছে বলিয়া, সহজে হৃদয়ে বোধগম্য হয় না। পুরাণ সেই তত্ত্ব হৃদয়ে পরিস্ফুট ও অঙ্কিত করিবার জন্য এইরূপ পূজা প্রকট করিয়াছেন। অপ্রকটতত্ত্ব প্রকট করে বলিয়াই পুরাণ নামের সার্থকতা।

যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

পুরাণতত্ত্ব বিশাল অনন্ত জ্ঞানের আকর। এক একটী অপ্রকট ভাব প্রকট হইলেই এক একটী আকার ধারণ করে। যেমন "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" এ ভাবটী সহজে মনে ধারণা হয় না। কিন্তু যখন পাণ্ডবসখা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি দ্রৌপদীর পাকস্থালীতে অবশিষ্ট একটীমাত্র অন্নকণিকা ভক্ষণমাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসারও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল, তখন এই অপ্রকট ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি হইতে বিলম্ব হইল না। মূর্ত্তিও সেইরূপ। একটী আধ্যাত্মিক ভাব (spiritual) তত্ত্বের ক্রমপরিণামের সহিত ক্ষিতিতত্ত্ব দ্বারা মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়। ক্ষিতিতত্ত্ব ভিন্ন মূর্ত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং মূর্ত্তিগুলি সেই আধ্যাত্মিক (spiritual) ভাবের ক্ষিতিতত্ত্বে অভিব্যক্তি। সেই ভাবের সত্তায় মূর্ত্তির সত্তা। সেই ভাব যখন সত্য, মূর্ত্তিও তখন সত্য। ইহা কবিকল্পনা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি মানসিকভাবের অভিব্যক্তিরূপে এই মূর্ত্তির কল্পনা করেন নাই। যদি তাহাই হইত, তবে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট মূর্ত্তি বিভিন্ন সাধকের হৃদয়ে একরূপে প্রকটিত হইত না। এখন পর্য্যন্ত অনেকে এই সকল মূর্ত্তি একই রূপে সাধনাকালে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এমন কি শাস্ত্রজ্ঞানহীন নিরক্ষর সংস্কারবিহীন ব্যক্তিও শাস্ত্রবর্ণিত মূর্ত্তি একই ভাবে সন্দর্শন করেন। ঋষিগণ অপ্রকট হইতে প্রকটাবস্থা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই, লোক-হিতার্থে এইরূপ মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। অপ্রকট হইতে প্রকট এই তত্ত্বটী স্থূলদৃষ্টান্তসাপেক্ষ; হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা যাক।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা (Experiment) দ্বারা দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন সুরে লাইকোপোডিয়ামে (Lycopodium) বিভিন্ন আকার দেখা যায়। শব্দাত্মক-সুর লাইকোপোডিয়ামের আকারে পরিণত হয়। এক এক সুরে এক এক রূপ গঠন দেখা যায়। Dr. Baraduc এক একটী বস্তুর চিন্তা করিয়া sensitive প্লেটে এক একটী বিভিন্ন ছবি পতিত হয় দেখিয়াছেন। বিশিষ্ট

চিন্তার বিশিষ্ট আকার যদি সম্ভব হয়, তবে আধ্যাত্মিক ভাবের এইরূপ মূর্ত্তিতে প্রকট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তবে একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ সকল মূর্ত্তির যদি বাস্তব সত্তা থাকে, তবে আমরা অবিকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ করি না কেন ? তদুত্তরে বলা যায় যে, শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে সাধনা করিলে, একই মূর্ত্তি যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্গাপূজা মহাশক্তির পূজা। দুর্গা বিদ্যারূপিণী মহামায়া ; সাধক মহামায়াকে পরব্রহ্মস্বরূপিণী সনাতনী মহাবিদ্যারূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—তিনিই আদ্যাশক্তি। তন্ত্রে এই শক্তির উপাসনা বহুলপরিমাণে উপদিষ্ট আছে। চৈতন্যরূপিণী মহামায়া কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলারূপে অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্মকে জগৎ ভাবে প্রকটিত করেন এবং জগৎকে ব্রহ্মে পরিণত করেন। এই মহামায়াদ্বারাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাব বুঝিতে পারা যায়। মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা-রূপে খেলিতেছেন। যে ভাবে আমাদের সকল বৃত্তি ও সকল কার্য্য এক একটী কর্ত্তৃত্বাভিমানী কেন্দ্র বা centreকে ইঙ্গিত করিতেছে, তাহাই মায়ের অবিদ্যারূপের খেলা। এই কেন্দ্রীভূত ভেদাত্মক জীবভাব লইয়া সূক্ষ্ম-জগতে গমন বা জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাও অবিদ্যার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্ষুদ্র ভেদাত্মক জীবভাব রূপ-প্রবণতার বাহ্যিক প্রকাশ, আমাদিগের বৃত্তি বা Psychic States এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ এই বৃত্তির পরিবর্ত্তনের সহিত এই জীবভাবও পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে যখন বৃত্তিসমষ্টি আর এই সকল বিভিন্ন centre বা বিশিষ্ট ভেদাত্মক জীব-ভাবকে না দেখাইয়া, যাহা হইতে এই সকল বিভিন্ন centres প্রকটিত হয়, তাহাকে বা ব্রহ্মবস্তুকেই ইঙ্গিত করে, তখনই তাহাই বিদ্যা। এই আদ্যা-শক্তিকে কখনও কখনও মায়া বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়া থাকে—

রাম, মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি সা সদা। অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বহির্ম্মুখী বা ভেদাত্মক জীবভাবে খেলার নাম অবিদ্যা. অন্তর্মুখী ভাবে খেলার নাম বিদ্যা। অন্তর্মুখী শক্তিরেব বিদ্যা (নীলকণ্ঠ)। বহির্মুখীভাবের খেলা শেষ হইয়া, শক্তিসকল যাহাতে অন্তর্মুখী হয়, তাহার জন্যই বিদ্যারূপিণী মহামায়ার পূজার ব্যবস্থা। তাঁহার প্রসন্নতাই মুক্তির হেতু।

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥ চণ্ডী।

তাঁহার নির্গুণ অপ্রকট অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হয় না বলিয়া, কোন এক প্রকট মূর্ত্তিতে তাঁহার ধ্যান করিতে ঋষিরা উপদেশ প্রদান করেন। স্বরূপভাবে তিনিই যোগনিদ্রা বা অব্যক্ত অবস্থা চৈতন্যরূপিণী। তাঁহাতে সৃষ্টিলয়াদি নাই। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার তাঁহার আংশিক প্রকাশ শক্তির কার্য্যমাত্র।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

লক্ষ লক্ষ জগৎ সৃষ্টিতেও তাঁহার স্বরূপ ভাবের হানি হয় না। সৃষ্টিরক্ষার্থ দেবশক্তি আসুরশক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু যখন আসুরিক ভাবের প্রাবল্য বা আধিপত্য হয়, তখন মহামায়ার আবির্ভাব ভিন্ন সৃষ্টির সাম্য রক্ষা হয় না। তাই ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরোদ সমুদ্রের তটে গিয়া মহাশক্তিকে যোগনিদ্রা ভাব হইতে জাগ্রত করেন। তখন স্বরূপ অবস্থা হইতে দেবশক্তি-রূপ উপাধিকে আশ্রয় করিয়া, মহামায়া আবির্ভূত হন। সৃষ্টির এই (harmony) নষ্ট হইলে দেবতারা তাকে পুনঃ স্থাপন করিতে পারেন না। অসুরকে ছাড়িলেও সৃষ্টি চলে না; কিন্তু আসুরিক প্রবলতা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে ভেদ ভাব রহিয়া যাইবে। তাই দেবতারা ব্রহ্মাকে শীর্ষস্থানীয় করিয়া, মায়ের নিকট আসুরিক শক্তির মুখপাত্র স্বরূপ মহিষাসুর বধের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই এইরূপ আসুরিক প্রাবল্য তখনই মহামায়া আবির্ভূত হইয়া শান্তিস্থাপন করেন। তিনিই বলিয়াছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

চণ্ডী—উত্তমচরিত ৫৪।৫৫

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮

ভাগবতেও দেখা যায় যে পৃথিবী পাপভারে প্রপীড়িত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মাও দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহদেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥

ব্রহ্মার উপাসনার পর আকাশবাণী হইল, পরম পুরুষ অবতরণ করিবেন। মহামায়ার সম্বন্ধেও ঐরূপ। রাবণবধের জন্য এবং রামচন্দ্রের হিতের জন্য ব্রহ্মার দ্বারা বোধিত হইয়া, যোগনিদ্রাভাব পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায় গমন করিলেন।

রামস্যানুগ্রহার্থং বৈ রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে;
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীৎ রাঘবঃ পুরা॥

কালিকাপুরাণ। ৬০।২৬।২৭

এই নিদ্রাই মহামায়ার অপ্রকট স্বরূপ। প্রকট স্বরূপই মায়ের দশভুজা মূর্ত্তি। এই দশভুজা মূর্ত্তি কালিকা পুরাণের অন্তর্গত।

প্রাদুর্ভূ‌র্তা দশভুজা দেবী দেবহিতায় চ।

চণ্ডীতে দুর্গা সহস্রভুজা বলিয়া বর্ণিত।

দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্‌ব্যাপ্য সংস্থিতাম্। মধ্যম। ৩৯

এই রামচন্দ্র-পূজিত দুর্গা পূজার রামায়ণে উল্লেখ নাই। তবে ব্রহ্মশক্তির আরাধনার কথা দেখা যায়। ব্রহ্মশক্তি অপ্রকটরূপ, অসুরনাশিনী মহিষমর্দ্দিনী তাহাই প্রকট করিয়াছেন। এই অপ্রকট ভাব প্রকট হওয়াই বোধন—

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্॥ বোধনমন্ত্র।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী পূজিত হন। এতদ্ব্যতীত ষোড়শ ও অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তিরও উল্লেখ দেখা যায়। আশ্বিন মাসের পূজায় এই দুই মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা দেখা যায়। প্রথমোক্তমূর্ত্তি ভদ্রকালী নামে পরিচিত।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।

দ্বিতীয় অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তি উগ্রচণ্ডা নামে ধ্যানের ভিতর উল্লিখিত।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।

এই তিন মূর্ত্তিতে মহামায়া মহিষাসুরের বিনাশ করেন।

এই দুর্গামূর্ত্তি কেবল পৌরাণিকগণের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনুমান করিবার কারণ নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রী স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

কাত্যায়নৈ্য বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।

কেনোপনিষদে দুর্গা এই কথাটার উল্লেখ না থাকিলেও হৈমবতী উমার নাম স্পষ্ট দেখা যায়।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ * * * ॥

বেদে উল্লিখিত দুর্গার বা উমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি অপ্রকট ভাব পুরাণে এই মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নির্গুণা ও পরব্রহ্ম স্বরূপিণী, কেবল কার্য্যার্থে এই প্রকট মূর্ত্তি।

কার্য্যার্থে সগুণা ত্বং চ বস্তুতো নির্গুণা স্বয়ম্।
পরব্রহ্ম স্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

এই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা মূর্ত্তি প্রকট করিয়া তন্ত্রে বলিতেছেন—

বামে চ কার্ত্তিকং দেবং দক্ষে গণপতিং তথা ॥
যা নিত্যা প্রকৃতির্লক্ষ্মী র্দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা সরস্বতী নিত্যা বামভাগে সদা স্থিতা ॥

কালীবিলাস তন্ত্র।

মহামায়ার আরাধনার সময়ে তৎসঙ্গে সিংহ ও অসুরের পূজার ব্যবস্থা কেন হইয়াছে ইহার আলোচনা আবশ্যক। সিংহ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বাবু ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের পন্থায় লিখিয়াছিলেন—

"ভগবতী যে সিংহবাহনে দুর্গ নামক অসুরকে দমন করেন, কুথুমি সিংহই সেই সিংহ। ভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি বা দৈবী প্রকৃতির অঙ্গভূত ঋষিরাই ধর্ম্মের রক্ষক। তাঁহারা ব্যতীত ধর্ম্মের রক্ষা হয় না। কালিকা পুরাণ মতে বিষ্ণু সিংহমূর্ত্তিতে দেবীর আধাররূপে বিরাজিত।

হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মনৌজসঃ।

বিষ্ণু ভিন্ন আর ধর্ম্মের রক্ষক কে আছে? বিষ্ণুকে আধাররূপে বর্ণনা করায় বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের লাঘব হয় নাই। বিষ্ণুশক্তি জগতের আধার; তিনি ভিন্ন আর কে আধার হইবেন? আপাত-দৃষ্টিতে কোন বিশিষ্ট বস্তুকে আধার মনে হইতে পারে; কিন্তু মূলতত্ত্ব বিষ্ণুশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি আসন শুদ্ধির মন্ত্রে বলিয়া থাকেন।

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

এই আসন-শুদ্ধির ব্যাপারটী একটু বুঝিলেই বিষ্ণুর আধাররূপ ভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইবে। জগতে কোন বস্তুই বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন নহে। বস্তুর গুণ অর্থেই অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক। একটী উজ্জ্বল পদার্থের উজ্জ্বলতার উপর লক্ষ্য করিতে গিয়া, আমরা তাহার কারণরূপে সূর্য্যেতে গিয়া পড়ি। আসনশুদ্ধি করিতে হইলে,পৃথিবীকে প্রথম আধাররূপে ধরিয়া ক্রমে তৎকারণভূত বিষ্ণুশক্তিতে উপস্থিত হই। যিনি আধাররূপে জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। যিনি আমি তুমি ইত্যাদি বিশিষ্ট ভাবের আধার সেই বিষ্ণুশক্তি ভিন্ন মায়ের আর কে আধার হইবে? অতএব আমরা বিষ্ণুরূপী মহাসিংহকে প্রণাম করি।

এইবার মহিষাসুরের কথা। পৌরাণিক মতে মহিষাসুর মহাদেবের অংশ। এক সময়ে রম্ভাসুরের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহার প্রার্থনা মত পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াছিলেন। আর একটী পৌরাণিক বাক্য মহাদেবের মহিষাসুর-মূর্ত্তি ধারণের সমর্থন করে। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন।—

হরির্হরিস্বরূপেণ ন ত্বাং বোঢ়ুং ক্ষমোঽধুনা।
মমাংশো মাহিষঃ কায়স্তব বোঢ়া ভবিষ্যতি॥

পৌরাণিক এই রহস্যটী খুব অসঙ্গত বোধ হয় না। মহাদেব বিশুদ্ধ অহং-ভাব। মহাদেবের রুদ্রাংশ বা তামসিক তনু, তামসিক অহংকার। এই অহংকার অসুরদের অহংকার। এই অহংকার অসুররূপে অবতীর্ণ হইয়া, সকল দেব-শক্তিকে আপনার স্ববশে আনিবার প্রয়াস করে। তখন তাঁহার সকল কার্য্য এই ভেদাত্মক-বিশিষ্ট অহংকারের পরিপোষণের জন্য। ইহাই অবিদ্যা; মহা-মায়াই এই অহংকারের বিনাশ সাধন করেন, তখন আর বিশিষ্ট ভেদাত্মক

অহংকার থাকে না, তখন ভেদাত্মক অহংকারও মায়ের বিত্তারূপ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় এবং সেই জন্যই আধাররূপ প্রাপ্ত হইয়া, মহিষাসুর মায়ের অঙ্গুষ্ঠ মাত্র বহন করেন।

যে ভাবেই দেখা যাক. এক শক্তিই খেলা করিতেছেন। এই মহামায়ার আশ্রয় ভিন্ন জীবের উপায় নাই। তিনিই ব্রহ্ম ও জগৎ; জীবাত্মা ও পরমাত্মা; ভক্ত ও ভগবানরূপে প্রতীয়মান হইয়া, জগৎকে প্রকট করিয়াছেন; আবার নিদ্রা তন্দ্রা তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে জীব ও জগৎকে ধরিয়া আছেন; আবার তিনি মুক্তিদাত্রীরূপে প্রকট হইয়া, জীব ও শিবকে মিশাইয়া সেই পরম অভেদাত্মক স্বরূপ ভাব প্রকট করেন। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

মা তোমার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়। এস মা, কৃপা করিয়া আমাদের দীন দরিদ্র-কুটীরে আসিয়া মনস্কামনা পূর্ণ কর। মা ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি, তুমি ভিন্ন অন্য গতি নাই, দেখিও যেন তোমার কৃপায় বঞ্চিত না হই। মা, অন্য কামনা নাই; দেখিও যেন তোমার কৃপায় সাধনার ফল তোমার চরণে পৌঁছে। দুর্গতিহারিণি, দেখিও মা, তোমার পূজা করিতে বসিয়াছি; কিন্তু অন্তরস্থিত অহংকার-রূপ রক্তবীজ নানাভাবে নানারূপে নানা ছলে সাধনার ফল খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে; সকল কার্য্যের মধ্যেই এই অসুর দেখা দিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতেছে। অধিক আর কি বলিব, জীবের সেবা করিতে গিয়া, কোথায় তোমার আরাধনা করিব, হঠাৎ দেখি যে, প্রকৃত জীবের হিত ভুলিয়া গিয়া, ব্যক্তিগত অহংভাবকে স্থাপনা করিয়াছি। মা, কৃপা কর, যাহাতে সংসারে ও ধর্ম্ম পথে ক্ষুদ্র ভেদাত্মক-বিশিষ্ট অহংভাব ভুলিয়া, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে জগতের সহিত অভিন্নভাবে কর্ম্ম করিয়া, ক্রমে ক্রমে তোমার সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারি। মা, আজ বঙ্গদেশ তোমার আবাহনে বদ্ধপরিকর, দীন সন্তানের প্রতি একবার করুণা-কটাক্ষে চাও; যাহাতে পরিচ্ছিন্ন ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, সাধনা ও কর্ম্মের মধ্যে ভেদাত্মক 'আমি'কে প্রতিষ্ঠা করিতে বিরত হইতে পারি; যাহাতে তোমার সর্ব্বানুস্যূত এবং বিশ্বাত্মিকা মূর্ত্তির স্থানে নাম-রূপাত্মক-বিশিষ্ট ভাব আসিয়া আশ্রয় না করে। দেখিও মা, যাহাতে

অবোধ সন্তান পূজা করিতে বসিয়া, তোমাকেই ভুলিয়া না যায়; দেখিও মা, যাহাতে তোমার পরম প্রতিভাময়ী মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া, যেন রাক্ষসীমূর্ত্তি গড়িয়া না ফেলে, বিদ্যার স্থানে অবিদ্যার পূজা না করে। তাহা হইলে, তোমার বেদী শূন্য থাকিয়া যাইবে। অভাগ্য সন্তানদের সুশোভিত মন্দিরমধ্যে দুঃখের আর অবধি থাকিবে না। মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা মহামায়া! কাতরকণ্ঠে তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, এই কর, যাহাতে মন বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতিকে তোমার ব্যঞ্জনাকারিণী শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি ও যাহাতে অর্জ্জিত শক্তিগুলি বিশিষ্ট ভেদভাবশীল 'আমি'ত্বের সম্পত্তি না করিয়া, দৈবী সম্পদরূপে বুঝিতে পারি। এস ভাই সকল, সর্ব্বেন্দ্রিয় যাঁহার গুণের আভাস দিতেছে, এমন সুলভ সেই সর্ব্বাত্মিকা মায়ের যথার্থ রূপ দেখিবার চেষ্টা করি; তবেই ভাই, মায়ের পূজা সার্থক হইবে। পরাবিদ্যার্থী ভ্রাতৃগণ, একবার চাহিয়া দেখ, মায়ের পূজার সময় বহিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ ভাই সংসারের সকলকার্য্যে, এমন কি শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্ম পথেও মোহন-মূর্ত্তিতে অসুরের খেলা চলিতেছে। কিন্তু ভাই, এই ভেদাত্মক দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্ত 'আমি'ত্বকে বিনাশ না করিলে, মায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে না। সময় যেন বহিয়া না যায়; এস ভাই, সকলে মিলিয়া মায়ের স্থাপনা করি। বিশিষ্ট-নামাত্মক জীবভাব ভুলিয়া যাই; ভেদাত্মক অহংকার-স্থাপক তথা-কথিত যোগাদির বিশিষ্ট ক্রিয়া বা বিশিষ্ট সভাসমিতির সভ্য হওয়ার ভ্রমের মধ্যে মা'কে না খুঁজিয়া এবং ভেদাত্মক আমির খেলা ভুলিয়া গিয়া, সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বানুগ মহাভাবময়ী সাবিত্রীরূপিণী মহাবিদ্যার উপাসনা করি। দ্বন্দ্ব কলহ ভুলিয়া গিয়া, নিজের বিশিষ্ট মতামতের উপর সত্যতার আরোপ না করিয়া চৈতন্যরূপিণী সত্যস্বরূপিণী মহামায়ার আরাধনা করি। মা দীন-দুঃখ-নাশিনী তোমার করুণা দেখিয়াও ভুলিয়া যাই। মা, যাহাতে ব্যক্তভাবে পরিচ্ছিন্ন আমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একীকৃত হইয়া সেই অদ্বিতীয় অদ্ভুত একাত্মে পরিণত হইতে পারি, সেইজন্য তুমি অদৃষ্ট কর্ম্ম জ্ঞান ও মাতৃকাদেবী প্রভৃতি বিভিন্নভাবের মধ্যে দিয়া আমাকে এক করিতেছ। অথচ তোমাকেই চিনিতে পারিনা। মা, তুমি উপাধিগত ব্যক্তভাব বিনষ্ট করিয়া, আত্মার অব্যক্ততা সাধনে তৎপর। তোমার ন্যায় স্নেহময়ী জননী আর কে আছে মা? তোমাকে নমস্কার করি! মা যোগমায়া, আদ্যাশক্তি, হৃদয়ে আবির্ভূত হও ও কৃপা করিয়া,

স্বপ্রকাশ হও; তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে কর্ম্মজ ভ্রান্তি ও ব্যক্তিত্বের অশান্তি দূর হইবে। জীব-ভ্রান্তি ঘুচিয়া যাইবে; জগৎ তোমারই জয় ঘোষণা করিবে। হে মহিষাসুর-মর্দ্দিনি, তোমাকে নমস্কার।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

মা আনন্দময়ি! যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, জাগ্রত হও। তুমি না জাগিলে, অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইনা। তোমায় বার বার ডাকিতেছি, একবার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। মা গায়িত্রি, ব্রহ্মযোনি, তোমাকে নমস্কার। মা মহিষাসুরমর্দ্দিনি, তোমার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই মূর্ত্তি দেখিয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তোমার যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, তোমার করুণা প্রার্থনা করি।

অয়ি! গিরি-নন্দিনি নন্দিত-মেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দিনুতে।
গিরিবর-বিন্ধ্য-শিরোধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণু-নুতে॥
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূতকৃতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥
অয়ি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব-বন-প্রিয়বাস নিবাসিনি হাসরতে।
শিখরশিরোমণি-তুঙ্গ-হিমালয়-শৃঙ্গ-নিজালয়-মধ্যগতে॥
মধু-মধুরে মধুকৈটভ-গঞ্জিনী কৈটভ-ভঞ্জিনি রাসরতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥
সুরবরবর্ষিণি দুর্জ্জয়ধর্ষিণি দুর্ম্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে।
দনুজনিরোধিনি দিতিসুতরোষিণি দুর্ম্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে।
ত্রিভুবন-পোষিণি শঙ্করতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥
অয়ি! শতখণ্ড-বিখণ্ডিত-রুণ্ড-বিতুণ্ডিত-শুণ্ড-গজাধিপতে,
রিপুগজগণ্ড-বিদারণ-চণ্ড-পরাক্রম চণ্ড-মৃগাধিপতে।
নিজভুজদণ্ড-নিপাতিত-চণ্ডনিপাতিত-মুণ্ড-ভটাধিপতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে।

অয়ি সুমনঃসুমনঃসুমনঃ(১) সুমনঃসু(২) মনোরম কান্তিযুতে।
শিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজনীকর-চারুযুতে॥ (৩)
সুনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধিপতে। (৪)
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥
জয় জয় জাপ্যজয়ে জয়শব্দপরিস্তুতিতৎপর বিশ্বনুতে।
ঝিনি ঝিনি ঝিঞ্জিনিঝিঙ্কৃত নূপুর-ঝিঞ্জিত-মোহিত-ভূতযুতে॥
নটিত-নটার্দ্ধনটীনটনায়কনায়ক-নাটিত-নাট্যসুগানরতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

"মা"

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ-নন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২

---

(১) মল্লিকা-পুষ্পেণ আনন্দিতং মনো যস্যাস্তৎসম্বুদ্ধৌ।

(২) সুন্দরমনোবিশিষ্টজনেষু।

(৩) অত্রৈবং পদচ্ছেদাঃ। শিত-রজনীরজনীঃ রজনী রজনীঃ রজনীকর চারুযুতে। অর্থাৎ ক্ষীণরেণু পদ্মহস্তে হরিদ্রারেণুবর্ণধারিণি মুকুটে সুচারুচন্দ্রকলাধৃতে।

(৪) অত্রৈবং পদচ্ছেদাঃ। সুনয়ন-বিভ্রম-রভ্-রম-র-ভ্রম-র-ভ্রমর-ভ্রমরাধিপতে। অর্থাৎ (অরুণাসুর-বধায় তব ভ্রামরীরূপে) সুন্দরনয়নানাং বিভ্রমেণ হর্ষবশাৎ প্রাপ্ত-ক্রীড়াঃ প্রাপ্তভ্রমাশ্চ যে পুষ্পকামুকা ভ্রমরাঃ তৈরধিগতে।

সকলের শরণ্যা, চৈতন্যময়ী, চৈতন্যরূপিণী, মা! তোমায় নমস্কার!

অহংপ্রত্যয়রূপী আত্মপদার্থের প্রকাশই চৈতন্যের ধর্ম্ম। সেই জন্যই গীতায় দেবীকে "জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্যাতে জগৎ" শব্দে লক্ষিত করা হইয়াছে। যেমন পিণ্ডাণ্ডস্থিতস্থ চৈতন্যের বৃত্তি ভেদভাবে অবস্থিত জীবের স্বরূপ-স্থাপনা ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী জগদ্‌ভাব প্রকাশ করে, তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্য ও সৃষ্টি সময়ে শুদ্ধব্রহ্মকে জগদ্‌রূপে প্রকট করেন। চৈতন্যেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আপাততঃ প্রতীয়মান বিরুদ্ধসত্ত্ব বস্তুশক্তি বা কেন্দ্র-নিচয় সত্য বলিয়া মনে হইলেও চৈতন্যক্ষেত্রে চৈতন্যের দ্বারা উজ্জীবিত। তাই মা জগদ্ব্যাপিকা ও বিশ্বাত্মিকা। যদি জীব ও জগৎ "অহং" ও "ইদম্" এতদুভয়ের মধ্যে সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যশক্তি না থাকিতেন, তাহা হইলে, জ্ঞানাদি ক্রিয়া পর্য্যন্ত কোনও ব্যাপার সাধিত হইতে পারিত না। দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাত্মক পদার্থের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত সম্ভবে না। এই জন্যই আর্য্য ঋষিরা একই অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে সত্ত্ব গুণাত্মক জ্ঞান ও রজোগুণাত্মক ক্রিয়া এবং তমোগুণাত্মক বস্তু বা দ্রব্য শক্তি সকল উদ্ভূত হয় বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। অহঙ্কার তত্ত্বকেও জড় বলা যায় না। কারণ জড় হইতে চৈতন্যের প্রকাশক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনে কর, আমার হস্ত উত্তোলন করিতে ইচ্ছা হইল, ইচ্ছা মাত্রেই হস্ত উত্তোলিত হইল; এক্ষণে দেখ দেখি, এই সামান্য ব্যাপারের ভিতর কাহার খেলা হইতেছে। আমি ত চৈতন্যকেন্দ্র, হাতটী প্রাকৃতিক উপাদানে নির্ম্মিত বস্তু মাত্র। কিরূপে এতদুভয়ের মিলন হইতে পারে? উভয়ের মধ্যে ব্যবস্থিত সামান্য এবং ব্যাপিনী শক্তি না থাকিলে কিছুতেই এই সামান্য ব্যাপারটী সাধিত হয় না। এই শক্তি জগদাত্মিকা, সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দিয়া খেলিতেছে। তাহা সর্ব্ব বস্তুর সহিত আমার কোন না কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারে। তবে কি শক্তিটী ভেদ-ভাবাত্মক আমির নিজস্ব পদার্থ? তাহা হইলেও চলে না। তাহা হইলে, আমার ভেদ ভাবে রঞ্জিত হইয়াই ইহার খেলা হইত। তাহা হইলে মদতিরিক্ত কোন প্রকার জ্ঞানের বিকাশই হইতে পারিত না। আমার আমিতে স্থির ভাব নাই। বৃত্তি-নিচয় লইয়াই আমি আপাততঃ ভাবমান। এমন কি বৃত্তিগুলি পড়িয়া গেলে, আমার আমির পর্য্যন্ত

জ্ঞান থাকে না। আবার জগতেরও সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। আমার দেহটী পর্য্যন্তও ঐ নিয়মের বশীভূত। তবে কি করিয়া এতদুভয়ের সংযোগে "রাম" বা "শ্যাম" আদির ব্যক্ত ভাব স্থির হইল? এইরূপে উৎপন্ন "রাম" "শ্যাম" ভাব এত স্থির যে যোগী ঐ ভাবের সাহায্যে ত্রিলোকের মধ্যে আপনাকে স্থির এবং অপরিণামী "রাম" বা "শ্যাম" বলিয়া জানিতে পারেন। এবম্ ভুবঃ ও স্বর্লোকেও ঐ স্থিরভাবে স্থাপিত হইয়া তথায় ক্রিয়া করিতে পারেন। কাহার শক্তিতে দুইটী পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত অপরিণামী ভাব উৎপন্ন হয়?

সেই জন্যই সামান্য ভাবে অবস্থিত চৈতন্যের স্বীকার করিতে হয়। এই চৈতন্যের গতি একভাবে আমার দিকে এবং সর্ব্ববস্তু বৃত্তির ভিতর দিয়া ইনি এক স্থির অপরিণামী আমিকে ইঙ্গিত বা লক্ষিত করিতেছেন। অপর দিকে এই চৈতন্যই কোন অনম্ভূত বা অনুদ্দিষ্ট উপায়ে বা ভাবে জগদ্বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া আমার স্থূল আমি ভাবে রচিত অপেক্ষাকৃত স্থিরতর আমির দিকে লইয়া যাইতেছেন। শুধু তাহাই নহে, যোগ শক্তিরূপে প্রকাশিত চৈতন্য শক্তির সাহায্যে যখন বাহিরের বস্তুনিচয় প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, যোগীর চৈতন্যশক্তি কোন অপরিজ্ঞাত উপায়ে আপাততঃ প্রতীয়মান অনাত্ম বা বস্তু ভাবকে আমিতে পরিণত করিতে পারে।

এই চৈতন্যশক্তির গতি পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থূল আমি ও স্থূল বস্তুনিচয়কে সামান্য ভাবে পরিণত করিয়া, তাহা হইতে এক উচ্চস্তরের আমি বা আত্মভাব প্রকট করাই এই চৈতন্যের গতি। স্থূল আম্র স্থূল উপাধিযুক্ত আমির রসনায় সংযুক্ত হইয়া, মিষ্টাদি রসজ্ঞান উৎপন্ন করিল। এই প্রকারে কাম বা বাসনার মধ্য দিয়া খেলা করিয়া, চৈতন্যশক্তি স্থূলতর রস বা তৃপ্তিজ্ঞান প্রকট করিয়া, মানবকে প্রতিনিয়ত স্থূল হইতে অপ্ বা বাসনাতত্ত্বে উপনীত করিতেছে। তাই মা চৈতন্যময়ি! তোমাকে নমস্কার।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাংস্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

আবার দেখ বাসনা-প্রসূত চিত্তবৃত্তি হইতে কোন অনির্ব্বচনীয় উপায়ে এক মনোময় আমির প্রকাশ হইল; এইরূপে চৈতন্যের ক্রিয়া বা প্রকাশ লক্ষ্য করিলে, আমরা কয়েকটী মহান্ তথ্যে উপনীত হই। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের আমির বৃত্তিগুলি জ্ঞানরূপে পরিপক্ক হইলে, তাহা হইতে উচ্চস্তরের আমির প্রকাশ হয়। স্থূল সংসারক্ষেত্রে খেলিতে খেলিতে, আমরা বাহিরের বস্তুগুলিকে যে পরিমাণে বুঝিতে বা আমাদের আমির সহিত মিশাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা স্থূল ভাব অতিক্রম করিয়া, উচ্চস্তরের চৈতন্যে উপনীত হই। বিজ্ঞানবিৎ বৈদ্যুতিক শক্তি যে পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার চৈতন্য বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা অভিভূত না হইয়া, অপরন্তু তাহাকে চালাইয়া মানবের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন। তবে তাঁহার জ্ঞান ঐকদেশিক বলিয়া, সম্পূর্ণভাবে সূক্ষ্মতর চৈতন্যে উপনীত করিতে পারে না। জ্ঞানী, যোগী সংসারের কার্য্যগুলি চৈতন্যময়ী সংযোগিনীর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন বলিয়া, তাঁহার ভিতর স্থূলাতীত আমির প্রকাশ হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, চৈতন্যময়ী "মহাযোগিনী জ্ঞানরূপেণ" ভাবে আছেন বলিয়াই তাই যোগী সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন ও তাহার বলে বলীয়ান্ হইয়াই যোগশক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই ইহ জগতের সন্তানের ন্যায় জননীপ্রদত্ত রসে পুষ্ট হইয়া, তাঁহারই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন।

তাঁহারা বুঝেন না যে, চৈতন্যময়ী ক্ষুদ্র ভেদাত্মক আমিত্ব এবং আমিত্বের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিরুদ্ধসত্ত্ব জগতভাব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বুঝেন না যে, যেখানে ও যে পরিমাণে জীব মহাযোগিনী শক্তির জ্ঞানরূপ একীকরণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়—জীব যতটুকু পরিমাণে ভেদাত্মক আমিত্বের মোহে ও তাহার সংস্থাপনের জন্য এই একত্বকারিণী ও উচ্চস্তরের শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশিনী শক্তির পরিণাম বা একীকরণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত দেখে, সেই পরিমাণে জ্ঞানরূপে অভুক্ত বা অজীর্ণীকৃত অবশেষ হইতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া, বিষ উৎপন্ন হয় এবং এই বিষই আপাততঃ প্রিয়-প্রতীয়মান লোক ও জীব সকলে বিরুদ্ধসত্ত্ব বস্তুনিচয়। তাঁহারা বুঝেন না যে, চৈতন্যময়ী দেবী

কে? ক্ষুদ্র আমিত্ব সংস্থাপনে নিয়োজিত করিলে কেবল অমঙ্গল বা অভদ্রই উৎপন্ন হইতে পারে না। ভেদাত্মক বিশিষ্টতায় আবিষ্টচিত্ত জনগণ যোগী ও জ্ঞানীর পোষাক পরিয়া বিশ্বাত্মিকা দেবীর শক্তিকে অহঙ্কারের বশে আনিতে গিয়া, জ্ঞানের বিনিময়ে আরও অন্ধতম অজ্ঞানে প্রবেশ করে—

"অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যাম্ উপাসতে"।

তাঁহারা বুঝেন না।

"অগোত্রাকৃতিত্বাদনৈকান্তিকত্বাদলক্ষ্যাগতত্বাদশেষাকরত্বাৎ।
প্রপঞ্চালসত্বাদনারম্ভকত্বাৎ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
অসাধারণত্বাদসম্বন্ধকত্বাদভিন্নাশ্রয়ত্বাদনাকারণত্বাৎ।
অনাদ্যন্তকত্বাদনাদীনবত্বাৎ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥"

"হে দেবি! আপনি গোত্র ও আকৃতির অতীত আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, আপনার গতি অলক্ষ্য (সাধারণ উপায়ে অজ্ঞাতব্য), আপনি অশেষ পদার্থ ও ভাবের আকর (সুতরাং বিশিষ্ট পদার্থ ও ভাবের অতীত); জগৎপ্রপঞ্চ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আপনার চেষ্টা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, অতএব পরব্রহ্মভাবই আপনার স্বরূপ। আপনি বিশিষ্টভাবের অতীত, অথচ অসাধারণ; আপনি সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধের অতীত অথচ পদার্থ মাত্রের অভিন্ন আশ্রয়; আপনি অকারণ (জ্ঞানের অতীত) আপনার আদি ও অন্ত নাই, অথচ আপনি সর্ব্বদাই নূতন; তজ্জন্যই একমাত্র পরব্রহ্মভাবেই আপনার সংসিদ্ধি (গতি, লক্ষণা বা তৃপ্তি)"। অশীতি লক্ষ যোনির পর মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া, যাঁহারা ভগবানের দিকে না চান, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র যেরূপ ভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তদ্রূপ পরব্রহ্মপ্রতিপাদিকা আনন্দময়ীকে কেবল ধর্ম্মার্থকামে যাঁহারা নিযুক্ত করিতে চেষ্টিত, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। অপরপক্ষে যাঁহারা দেবীকে ধর্ম্মার্থকামের ভিতর দিয়াও প্রকাশিত 'সদানন্দ-নন্দস্বরূপা" বলিয়া চিনিতে না পারেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

বিশ্বজননীর এই পরব্রহ্মভাব তাঁহার স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিলেন। পক্ষান্তরে সাধারণ দৃষ্টিতে কার্য্যে এমন কি আমাদের সাধনাতে পর্য্যন্ত আমরা কিন্তু বিশিষ্টভাব লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছি। এই দুইয়ের সমন্বয় কি প্রকারে

সম্ভব তাহাই চিন্তার বিষয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে সেই সমন্বয়ের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। সাধারণ জ্ঞানেও দেখিতে পাই যে, জ্ঞান যে পরিমাণে সুপরিস্ফুট হয় সেই পরিমাণে বিশিষ্টতা অতিক্রম করিয়া, আমরা উচ্চতর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হই। মাতৃমূর্ত্তির এই স্বরূপাবস্থার দিকেই লক্ষ্য করিয়া, সাধক বলিলেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।"

ইত্যাদি। এখানে কোনও বিশিষ্টভূতের কথা উল্লেখ না করিয়া, সর্ব্বভূতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধনার পন্থা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রেই এই তাদাত্ম্য সাধনকে অতি সহজ ও সুসুখ উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সাধনা গীতা অতি সংক্ষেপে সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের স্রোতে সেই বিশ্বজননীর লীলাদ্বারাই প্রয়োজিত হইতেছেন সত্য, কিন্তু গভীর জলস্রোতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিতাড়িত গলিতপত্র যেমন তাহার গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মানবগণও সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় বিশ্বজননীর কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও তাঁহার অপূর্ব্ব ইঙ্গিত বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভাগবত বলিয়াছেন—

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥"

"অভিনয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অভিনেতার হাবভাব দেখিয়া, নাটকরচয়িতা কি ভাবের প্রকাশ জন্য ঐ সমস্ত হাবভাবের সংযোগ করিয়াছেন তাহা যেমন জানিতে পারেন না পরন্তু ঐ সমস্ত হাবভাবেই মোহিত হইয়া থাকেন; সেইরূপ বিষয়কলুষিত-বুদ্ধি জনগণ জগদ্বিধাতার লীলা কোনও প্রকার তর্কাদি কৌশলের দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, পরন্তু মন ও বাক্য কেবল মাত্র নাম ও রূপের চিন্তাতে নিবিষ্ট করিয়া রাখে।"

এই শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে মায়ার স্বরূপ বোধে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব তাহা আমরা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি। নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রন্থ-কর্ত্তার ভাব-প্রকাশ। কিন্তু সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার

যুদ্ধ-বিগ্রহ-রূপ-বর্ণনা ইত্যাদি বিশিষ্ট ভাবের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিলে নাটকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না, তাহাতে হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদি নানা প্রকার সাময়িক উত্তেজনা হইতে পারে, কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে ঐ প্রত্যেক নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সহিত গ্রন্থকারের মনের ভাবের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা পর্য্যালোচনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাকটদ্বারা অভিব্যক্ত গ্রন্থকারের সহিত সম্মিলন হয় না। সেইরূপ জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরায় যখন জীব মোহিত থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ জীব বিশিষ্টতার পরিমাপে বস্তু, কেন্দ্র ও শক্তি ভাবে পদার্থকে জানিতে চায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিশিষ্টতাতেই নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু যখন সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত ভাবকে সেই ভূমা ব্রহ্মপদার্থের লক্ষণা বা অভিব্যঞ্জক ভাবে দেখে, তখন বিশিষ্টতা বা বন্ধন বিচ্যুত হইয়া যায়, সর্ব্ব ভাবে ও সর্ব্বজ্ঞানে বাসুদেব ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন—

"যত্ত্বেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্ম্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, "কিম্ ইত্যুপরতা ভবেৎ তত্রাহ মতির্বিদ্যা। অয়ম্ ভাবঃ যাবৎ অবিদ্যা আত্মনঃ আবরণ-বিক্ষেপৌ করোতি তাবন্নোপরমতি। যদাতু সৈব বিদ্যারূপেণ পরিণতা তদা সদসদ্রূপম্ জীবোপাধিং দগ্ধ্বা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপরমেৎ ইতি"। ঈশ্বরের সংসার চক্ররূপে ক্রীড়মানা মায়াদেবী কি প্রকারে নিবৃত্ত হইতে পারেন তাহাই শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেবী অবিদ্যা ভাবে ক্রীড়া করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বকীয় আবরণ (স্বরূপ অপ্রকাশ—বেদান্ত যাহাকে সর্পতে রজ্জু ভ্রম ইত্যাদি অভিধান করিয়াছেন) এবং বিক্ষপে-(সংসরণ change নানাত্বের আরোপ) শক্তি ক্রীড়া করিতে থাকে এবং তজ্জন্য সংসার উপরত হয় না। যখন কিন্তু ঐ দেবী বিদ্যারূপে প্রকাশিত হন তখন সদসৎরূপ বিশিষ্টতার বীজ স্বরূপ অহঙ্কার ভাব নিবৃত্ত হওয়ায়, অগ্নি যেরূপ ইন্ধনের অভাবে নিবৃত্ত হয় সেইরূপ ভেদাত্মক জ্ঞানরূপ সংসার-বীজ নিবৃত্ত হওয়ায় সংসার স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই ভাব সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, জীব পরমানন্দস্বরূপে বিরাজিত হয়। এই বিদ্যা ভাবকেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ব্রহ্মস্বরূপ সিদ্ধি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই বলি এস মা "সদানন্দ-নন্দস্বরূপে"! মহাবিদ্যারূপে একবার প্রকাশিত হও, সম্বৎসর ভরিয়া নানাস্থানে নানা খেলায় অবিদ্যারূপে কত নাচাইয়াছ, হাসাইয়াছ, কাঁদাইয়াছ এই মহোৎসবের দিনে স্বল্পকালের জন্যও একবার তোমার বিদ্যাভাব এই অকৃতি সন্তানগণের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দাও, তাহাতে জ্ঞানীর মোক্ষ, বিষয়ীর অর্থ, কামীর কাম, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সুলভ হইবে, আমরাও ভেদজ্ঞানের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বলিতে পারিব "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম" অতএব হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

ভাগবতের উপদেশ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

আপ্ত-বাক্য।

প্রকৃত বেদার্থের পরিপূরক বা প্রতিপাদক শাস্ত্রের নাম পুরাণ। বেদে যাহা ইঙ্গিত মাত্রে লক্ষিত, সেই সকল তত্ত্ব উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিস্তার বা পূরণ করাই পুরাণের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মাও এই মর্ম্মে নারদকে ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক উপদেশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে আদেশ দেন।

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলী কুরু॥

ভাঃ ১।৮।৫১॥

আমরা প্রথমে এই বিস্তারকরণ প্রণালীটী সম্যক্ বুঝিতে চেষ্টা করিব। অঙ্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের কোন বিশিষ্ট প্রক্রিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে গেলে তাহার মূল তথ্যটী সামান্যরূপে বুঝাইয়া দিয়া, তৎপরে ঐ ভাব স্পষ্টরূপে প্রকট করিবার জন্য অনেকগুলি অঙ্ক কসিতে দিতে

হয়। মনে করুন ত্রৈরাশিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান বালকদিগকে উপদেশ করিতে হইবে। এই জ্ঞানটী স্বরূপতঃ এক অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন বিশিষ্ট অঙ্কগুলির মধ্য দিয়া এই একই জ্ঞান প্রকাশ হয়। সুতরাং উহা অবিশেষও বটে এক্ষণে ঐ অবিশেষ ও এক জ্ঞানটিকে স্থূলচিত্ত বালকদের হৃদয়ে প্রকাশ করিতে গেলে বিশিষ্ট অনেক গুলি অঙ্কের অবতারণা করিতে হয়।

সামান্য ভাবে প্রদত্ত মূল তথ্যটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশিষ্ট অঙ্কগুলি কসিতে কসিতে বালকদের হৃদয়ে তাহার জ্ঞান অল্পে অল্পে জন্মিতে থাকে। এই প্রকার জ্ঞান ও সংক্রমণ ব্যাপারটীর দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দুইটী মূল তত্ত্বে উপনীত হই, প্রথম প্রত্যেক বিশিষ্ট জ্ঞানের উপরিভাগে একটী সামান্য অবিশেষ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। সামান্য জ্ঞানটীর দিকে লক্ষ্য না থাকিলে বিশিষ্ট জ্ঞানগুলি পরস্পর মিলিতে পারে না। পুনশ্চ তাহা হইতে অবিশেষ সামান্য জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না। সেই জন্যই অঙ্কশাস্ত্র মাত্রেই প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সামান্য ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া পরে বিশিষ্ট অঙ্কের দ্বারা সেই ভাবটীকে প্রকট করা হয়। দ্বিতীয় মূল তত্ত্বটী এই যে, বিশিষ্ট অঙ্ক গুলির সেই সামান্য ভাবটীকে স্থূল ভাবে প্রকট করিবার জন্যই উপদিষ্ট হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বালকের চিত্ত এই অপূর্ব্ব ইঙ্গিতটী বুঝিতে না পারে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট অঙ্কের বিশিষ্ট ভাবগুলির দ্বারা তাহার চিত্ত মোহিত হইয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূল তথ্যটী তাহার হৃদয়ে প্রকাশ পায় না। বালকের হৃদয়স্থ বিশিষ্ট ভাবের মোহই উপদিষ্ট জ্ঞানটী প্রকাশের প্রধান বিঘ্ন। একটী বালককে তাহার পিতা যোগ, বিয়োগ শিখাইবার জন্য বলিলেন, "মনে কর তোমাকে দুইটী আর তিনটী আম্র দেওয়া গেল" বালক বলিয়া উঠিল, "কই দাওনা," অগত্যা পিতাকে বলিতে হইল "আগে তুমি আমার কথাটী বুঝিয়া জবাব দাও, তৎপরে তোমায় আম্র দিতেছি;" তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া বালক বুঝিতে পারিল যে, দুই এবং তিনে পাঁচ হয়। তৎপরে পিতা বিয়োগ শিখাইবার জন্য তাহাকে বলিলেন, "তোমার ঐ পাঁচটী আম্র হইতে আমি একটী লইব, তাহা হইলে তোমার কয়টী থাকিবে।" শুনিয়াই বালকের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পাঁচটী সুপক্ক আম্রের একটী দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহার মোহ উপস্থিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে

মাতার নিকট গিয়া তাহার পিতা তাহার একটী আম্র লইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। উপরোক্ত সাধারণ গল্পটী হইতে আমাদের মত বয়োবৃদ্ধ বালকগুলিও অনেক বিষয় শিখিতে পারে, বিষয়ে মুহ্যমান-চিত্ত ব্যক্তিগণ এই বিশিষ্ট মায়ার বশেই জগতে সর্ব্বভাবে প্রকটিত তত্ত্বগুলি বুঝিতে পারে না। জীবনের সমস্ত ব্যাপারগুলি শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও সাধনামার্গেও ঐ প্রকার বিশিষ্ট ভাবে ডুবিয়া গিয়া তাহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। পরন্তু সেই সকলের বিশিষ্ট বস্তু, অর্থ, কাম প্রভৃতি লইয়াই খেলা করিতে থাকে।

আপ্ত বা শাস্ত্রবাক্য ঋষি-প্রণীত। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।" ঋষিরা মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাঁহাদের হৃদয়ে মন্ত্র বা শাস্ত্রের মূল বা শুদ্ধার্থই প্রকাশ হয়। এইরূপে দৃষ্ট বা অনুমিত অর্থ (meaning of things) যে আমাদের অর্থ নহে তাহা অল্প চিন্তা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা আমাদের মত বিশিষ্ট বস্তু, শক্তি বা কেন্দ্রের মোহে মুগ্ধ নন। হৃদয়স্থ অহঙ্কারের উপরে উঠিয়াছেন বলিয়াই কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াত্মক বা জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়াত্মক ভেদভাব তাঁহাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য ভাগবত বলিয়াছেন,—

অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং।
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥

ভাঃ ১০।৮৭।১৫॥

শ্রীধর-স্বামী টীকায় বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিভিস্তথা প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ ঋষয়ো মন্ত্রাস্তদ্‌দ্রষ্টারো বা ত্বয্যেব মনোবচনাচরিতং দধুঃ মনসা আচরিতং তাৎপর্য্যং বচনাচরিতং অভিধানঞ্চ ধৃতবন্তঃ। ন পৃথগ্‌বিকারেষিত্যর্থঃ। অত্র নিদর্শনম্। কথমযথেতি, নৃণাং ভূচরাণাং যত্র কুত্রাপি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি ভুবি কথমযথা ভবন্তি অদত্তানি ভবন্তি। অতো যথা মৃৎপাষাণেষ্টকাদিষু দত্তানি পদানি ভুবং ন ব্যভিচরন্তি তথা যৎ কিমপি বিকারজাতং বদন্তো বেদাস্ত্বামেব সর্ব্বকারণং পরমার্থভূতং প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ।

"সমস্তই ব্রহ্ম। বিকার বাস্তবিক নাই। এইজন্য মন্ত্রবর্ণ বা ঋষিরা

ভগবানের মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য্য এবং বচনাচরিত অর্থাৎ অভিধান ধারণ করেন। যেমন মনুষ্যগণ যেখানেই পদ নিক্ষিপ্ত করুক না কেন, তাহা মৃত্তিকাই হউক, পাষাণই হউক, অট্টালিকাই হউক, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী। তদ্রূপ ঋষিরা বিকারজাত যে কোন পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি বা জীবের কথাই বলুন না কেন, তাহার তাৎপর্য্য এবং এমন কি প্রত্যেক শব্দই ভগবানের প্রতিপাদক মাত্র।"

উপরোক্ত শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিশিষ্ট-প্রণীত শাস্ত্র-বাক্যই বস্তুতঃ সেই অব্যয় জ্ঞানরূপ পরম-তত্ত্ব ভগবানের ব্যঞ্জক। ইহা যে কেবল তাৎপর্য্যার্থে সত্য তাহা নহে। অভিধান নাম বা সংজ্ঞাগুলিও ভগবদর্থ-প্রতিপাদক। এইটী যে আমাদের মত তাহা নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও শাস্ত্র-বাক্যের এই যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ভাগবতের প্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়াছেন। পাঠক চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ঐ বিবরণটী পাঠে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

পাতঞ্জল-সূত্রে সমাধিপদের প্রত্যক্ষাদি ও প্রমাণের কথায় ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থং বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ।" উহার ভাবার্থ এই যে, আপ্ত বা ঋষিগণ স্বীয় দৃষ্ট বা অর্থ অন্যের হৃদয়ে তৎসম্বন্ধীভূত স্বীয় বোধ সংক্রমণের জন্য শব্দের দ্বারা উপদেশ দেন। ঐ শব্দ হইতে শ্রোতার তদ্বিষয়ে বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সংস্কৃত বা দেব-ভাষার শব্দ-প্রয়োগের মধ্যেও গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে ব্যবহৃত অর্থ শব্দটী এইরূপ সুকৌশলে প্রয়োজিত যে উহা হইতে একদিকে বিষয় অপরদিকে তাৎপর্য্য এই দুইটী ভাবই ফুটিয়া উঠে। সাধারণ স্থূলে আবিষ্ট-চিত্ত আমাদের মত ব্যক্তিগণের নিকট কোন বস্তুর বস্তুত্ব ও তাহার তাৎপর্য্য এই দুইটীকে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম সকল স্তরেই এক অখণ্ডরস চৈতন্যের প্রতিপাদক বলিয়া শাস্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট কোন বস্তুর বিশেষত্ব ও তাৎপর্য্য এতদুভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। শাস্ত্রাভ্যাসকালে এই তথ্যটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। বিশেষতঃ আজি কালি যুগধর্ম্মের বশে মানবের ভেদভাব

এতই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, শিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের চিত্তেও বিষয়, তাৎপর্য্য এই দুই ভাবের ভগবদ্-ব্যঞ্জিকাশক্তির অভাব দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, ভাষা পাঠে ইহা বুঝা যায়, যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির চিত্তে এই ভেদভাব নাই। তাঁহাদের উপদেশ কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন প্রকার ভেদভাব বা ভগবদতিরিক্ত বিভিন্ন সত্তা বা শক্তির প্রতিপাদক নহে। তাঁহারা শব্দ ব্যবহার করেন সত্য, কিন্তু তাহার শ্রোতাকে ভেদাত্মক নাম রূপের সাগরে ফেলিয়া তাহাতে ঘূর্ণায়মান করেন না। তাঁহাদের উপদেশ কেবলমাত্র পর-চিত্তে স্বীয় বোধ সংক্রমণের জন্য। তাঁহাদের চিত্তে বোধ-মাত্রই আছে; সেখানে নাম ও রূপ নাই; শব্দ ও তাৎপর্য্য নাই; কেবল আছে মাত্র অখণ্ড একরস-বোধ বা ভাব। এই বোধ বা ভাব স্বতঃই ভগবান্ বা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। এই জন্যই তাঁহারা ঋষি। কিন্তু ঐ বোধ এত সূক্ষ্মতম যে, ভেদভাবদর্শী জীবের হৃদয়ে উহা স্বরূপতঃ প্রকাশ হইতে পারে না। সেই জন্যই শব্দরূপ কৌশলের সাহায্যে তাঁহারা ঐ ভাব জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করেন। বিষয়-তৃষ্ণায় নিমজ্জিত ভেদভাবের মোহে মুগ্ধ জীব ঐ শুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই ঋষিরা কৌশলপূর্ণ বাক্যে ও তাহাদের সমাবেশের দ্বারা মূল তথ্য প্রকট করিতে চেষ্টা করেন।

বোধ হয়, দুই একটী দৃষ্টান্ত লইলে এই রহস্যটী আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিব। সুনিপুণ চিত্রকর তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত একটি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঐ ভাবটীর চৈতন্যাতিরিক্ত বাহ্য সত্তা নাই, অথচ উহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইবে। মনে করুন, তিনি দয়া-নামক দৈবী বৃত্তিটীকে আঁকিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাকে বহুতর রেখা বিন্দু প্রভৃতির সাহায্যে মানবমূর্ত্তি প্রকট করিয়া, ঐ মূর্ত্তিগুলিকে এরূপভাবে সমাবেশ করিতে হইল যে, তদ্দর্শনে দর্শকের চিত্তে অল্পে অল্পে দয়ার ভাবটী ফুটিয়া উঠে। ঐ চিত্রে সমাবিষ্ট ব্যক্তিগুলির মধ্যে একজন দাতা সাজিলেন, অপর একজন বিপন্ন সাজিলেন, এবং অপর কতকগুলিকে ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে উপদ্রব করিতে সাজান হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখিতে গেলে কতকগুলি রেখার সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু ঐ সমাবেশটী এরূপ সুকৌশলে সাধিত যে, তদ্দ্বারা আমরা রেখা না দেখিয়া, এক একটী ব্যক্তি ও

তাহার মানসিক ভাব বা বাহ্যিক অবস্থা বুঝিতে পারি। এইরূপে চিত্রপটে প্রকটিত বস্তু ও ব্যক্তিগুলি এরূপভাবে সমাবিষ্ট যে, তাহাদের মধ্য দিয়া দয়ার অসীম মহিমা ও দৈবী সম্পৎ দর্শকের হৃদয়ে প্রকট হয়। চিত্রকরের কি আশ্চর্য্য নিপুণতা যে, তিনি বিশিষ্ট রেখা, বস্তু ও ব্যক্তিগুলির সমাবেশের দ্বারা হৃদয়স্থ অপ্রকট দৈবী ভাবটীকে স্থূল ব্যক্তিরও চক্ষুর্গোচর করিলেন।

শাস্ত্রও ঠিক এইরূপভাবে লিখিত যে, অসংখ্য অক্ষর ও বর্ণের সংযোজনার মধ্য দিয়া বিভিন্ন বস্তুর ক্রিয়া বা ব্যক্তির ভিতর দিয়া ঋষি তাঁহার অপ্রকট বোধকে স্থূল মানবের মঙ্গলার্থে প্রকট করিয়া দেন। তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি-শব্দ এরূপভাবে সংযোজিত যে, তদ্দ্বারা মূল তত্ত্বটীর প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে। এমন কি ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রকৃত ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের শব্দসমাবেশ ও শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রত্যেকে ও একত্র সন্নিবেশে ভগবান্ বা ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রতিপাদনা করিতে পারে। ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুত্যধ্যায়ান্তগত ভাগবতের শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম। এই উদ্দেশেই ভাগবত বলেন,—

"স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মা কর্ম্মকঃ পরঃ॥"

ভাঃ ২।১০।৩৫॥

উহার ভাবার্থ এই বেদরূপধারী ভগবান্ বাচক অর্থাৎ নাম ভাবে, বাচ্য অর্থাৎ রূপভাবে সমস্ত ক্রিয়া বা প্রকাশের আধার। এই জন্যই আরও স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে।

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরব্রহ্মন্ নচান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ।

ভাঃ ২।৫।১০।

কি "দ্রব্য" বা মহাভূত কি "কর্ম্ম" বা জন্মাদির নিমিত্ত কারণ, কি "কাল," কি পরিণামের হেতু "স্বভাব" কি জীব সকলই সেই ভগবানেরই ব্যঞ্জক। বাস্তবিক বাসুদেব বা ভগবানের অতিরিক্ত কোন অর্থ (বস্তু বা তাৎপর্য্য) নাই।

"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

যেমন জগদ্বস্তু মাত্রই সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশিত, যেমন সকল বর্ণই সেই সর্ব্ব-

প্রকাশক সূর্য্যেরই লক্ষণা করে, তদ্রূপ সর্ব্ব জগদ্বস্তুই সেই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ একই তত্ত্বের দ্বারা উদ্ভাসিত ও তাঁহারই পরিজ্ঞাপনা করিতেছে। বিভিন্ন শব্দ ও তাৎপর্য্য-সমন্বিত শাস্ত্রই একই ভগবানের প্রতিপাদক বলিয়া বেদান্তে "শব্দ-যোনিত্বাৎ" সূত্রে এই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা শক্তির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই মূল তথ্যটী ভুলিয়া গেলে, শাস্ত্র পাঠ, অহঙ্কারের উৎপাদক ক্ষুদ্র ভেদ ভাবের মোহের পরিবর্দ্ধক শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন মানব শাস্ত্রের এই লক্ষণা বৃত্তিটি বুঝিতে পারেন তখনই তিনি শাস্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উপদেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। পাণ্ডিত্য অভিমানে মোহিত হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ কখনও প্রকটিত হয় না।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, আমরা কিরূপ ভাবে ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভাবেও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইব। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি বিশিষ্ট শ্লোকের অবতারণা করিয়া শাস্ত্রপাঠ উপদিষ্ট হয়। শ্লোকটি সকলেই জানেন, কিন্তু শ্লোকটির মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত না হওয়ায় আমাদের পাঠ তত ফলপ্রদ হয় না। শ্লোকটি একটি মঙ্গলাচরণ "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥" পাঠক মহাশয় যেন শ্লোকটি শুনিয়াই উহা সামান্য গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া ঘৃণা না করেন। গৌরচন্দ্রিকা শব্দটিও যে কত উন্নত ভাবের পরিচায়ক, তাহা আমরা অনেকেই এ সময়ে ভুলিয়া গিয়াছি। সে যাহাই হউক, শাস্ত্রার্থপ্রকাশ বা এমন কি, যে কোন জ্ঞানের প্রকাশের মূলে যে, কতগুলি গভীর মনস্তত্ত্ব আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বিশ্লেষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্র মাত্রই প্রমাণ ও অনুমানের দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় সকল অতিক্রম করিয়া, সাধারণের অপরিজ্ঞাত বিষয় বা তত্ত্ব প্রকট করিতে চেষ্টা করে। কোন অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে গেলে, আমাদের কি করা আবশ্যক। অপরিজ্ঞাত বিষয়টি আমাদের ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত, সুতরাং বিষয়টি বুঝিবার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সংযমিত না হয়, তাহা হইলে কখনই সেই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। সেই জন্য নমস্কারের আবশ্যকতা। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু কেবল মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; অপিচ অভেদাত্মক ভাবগুলি গ্রহণ করিতে গেলে ক্ষণিকের

জন্যও ভেদাত্মক অহঙ্কার, দুষ্ট মনন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সংযমিত করা চাই। কিন্তু যতক্ষণ মানব আপনার অভ্যস্ত বৃত্তিগুলিকে ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যাভাবে কলুষিত না মনে করে, ততক্ষণ সে গুলিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল বৃত্তিগুলির দোষ দর্শন করিয়া অথচ অপরিস্ফুট ভাবেও তদতিরিক্ত জ্ঞান আছে ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন সেই উচ্চ ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিজের ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিয়া ক্ষুদ্র অহঙ্কার ছাড়িয়া দেওয়ার নাম নমস্কার। নমস্কারের প্রধান অঙ্গ মনোবুদ্ধির অতীত, অথচ অপরিজ্ঞাত উচ্চতর সত্তা ও চৈতন্যের স্বীকার; তৎপরে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের দোষ দর্শন দ্বারা সংপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলি সংযমন। যে পরিমাণে উচ্চতর সত্ত্বার অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়, যে পরিমাণে ভেদাত্মক বৃত্তিগুলিকে প্রশান্ত করিয়া রাখিতে পারা যায়, সেই পরিমাণে নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ সত্তার বিকাশ হয়। নমস্কারই চিত্তবৃত্তি নিরোধের মূল। নমস্কারভাবে স্থিত সাধক বিনা আয়াসে ক্ষুদ্র অহঙ্কারাদি অতিক্রম করিয়া ক্ষণিকের জন্যও উচ্চতর সত্তায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারেন। এই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছে "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।——"

এই জন্যই গীতা প্রকাশের পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলিতে হইয়াছিল,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

ক্ষুদ্র ভেদাত্মক অহংভাবকে না ছাড়িলে, বিশুদ্ধ অহংস্বরূপ আত্মা প্রকাশ হইতে পারে না। তাই পূজনীয় ব্ল্যাভাটস্কি বলিয়াছেন:—"The Self of matter and the Self of Spirit can ne'er both remain, one of the two in must die." সাধক! ভেদভাবে স্থিত অহঙ্কার ও অভেদাত্মক অহং বা আত্মা কখনই একত্র থাকিতে পারে না; দুইটির মধ্যে একটিকে মরিতে হইবেই হইবে। নমস্কারই তাহার উপায়।

যে শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহার দিকে যদি চিত্তের গতি না থাকে, তাহা হইলে, কখনই সে শাস্ত্র মানব অধিকার করিতে পারে না। যাহার অঙ্ক শাস্ত্রের দিকে গতি বা প্রবণতা নাই তাহাকে কখনও অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত করা যায় না। পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে ভগবত্তত্ত্বের দিকে যদি চিত্তের প্রবণতা না থাকে, তাহা হইলে সেই চিত্তে কখনই শাস্ত্রের মর্ম্ম ফুটিতে পারে না; এই

জন্যই শুকদেব সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বাসুদেব বা নারায়ণকে প্রথমেই নমস্কার করিলেন। যে শাস্ত্রের দ্বারা ভগবান্ স্বরূপতঃ জীবচিত্তে প্রকাশ হন, সেই শাস্ত্রকেই ভাগবত বলে। এই জন্যই ভাগবতে ব্যাস-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিকৃক্ষয়াঃ॥
যদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

ভাঃ ১।৫।১০-১১

অতি বিচিত্র পদবিন্যাস সত্ত্বেও যে বাক্যের কোন স্থানে শ্রীহরির জগৎ-পাবন যশঃ কীর্ত্তিত হয় নাই, সুধীগণ তাহাকে কাকতীর্থ বলিয়া মনে করেন। তথায় সত্ত্বপ্রধানচিত্ত পরমহংসগণ কদাপি রত হয়েন না। পক্ষান্তরে যে বাক্য প্রয়োগের প্রতি শ্লোকেই ভগবানের যশঃ কীর্ত্তিত, তাহা অজ্ঞ প্রভৃতি শব্দযুক্ত হইলেও জনসমূহের পাপ নাশ করে; কারণ সাধুগণ ঐ পবিত্র নাম শ্রবণ, গান, কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই ভগবানের প্রতি কার না অনুরাগ হইবে। ভগবানের প্রতি চিত্তের এই গতি আনয়ন জন্য বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই সর্ব্বপ্রথমে শুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেবের নমস্কার করিতে হয়।

তৎপরে শাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসদেবের নমস্কার বিধি আছে। এ নমস্কারের তাৎপর্য্য কি? প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অতীত বস্তুর জ্ঞান চিত্তে সঞ্চারিত করিতে গেলে, মানব প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা রঞ্জিত ভেদভাবদুষ্ট মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি যতই পরিষ্কৃত হউক না কেন, পুণ্যাদি অর্জ্জনের দ্বারা মন যতই নির্ম্মল হউক না কেন, তাহারা অহঙ্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং তদ্দ্বারা অভেদাত্মক সত্তা প্রকাশ হয় না।

ভাগবত বলেন:—

"ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্ দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ কাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥"

ভাঃ ১।৫।১৪

পৃথগ্দর্শী ব্যক্তি ভগবানের ইন্দ্রিয় স্বরূপ ঋষিগণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া

অন্য প্রকারে যে কোন বিষয় বর্ণন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছা ভেদভাবে অবস্থিত বুদ্ধি দ্বারা প্রকটিত নাম ও রূপের খেলায় ডুবিয়া যায়, এবং এই প্রকারের অব্যবস্থিত বুদ্ধি দোষে তাহার চিত্ত কোনকালে বা কোন বিষয়েই স্থিরতা লাভ করিতে পারে না; পরন্তু বায়ুবলে ঘূর্ণায়িত নৌকার ন্যায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু বা উপদেষ্টার আবশ্যকতা আছে, সেই জন্যই সংসারে ঋষিকুলের প্রয়োজন আছে। ঋষিরা দ্বৈভাষিকের ন্যায়; তাঁহারা পরব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়াই সে দেশের ভাষা জানেন, আবার নরদেহে অবস্থিত হইয়াছিলেন ও থাকেন, সেই জন্য ব্যক্ত জগতের সমস্ত পদার্থ যে বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপ-ব্যঞ্জক, ইহাও জানেন। তাঁহারা জানেন যে, বস্তুর যে বিশেষ ভাব ভেদভাবশীল জীবকে আকর্ষিত করিয়া মোহিত করে, সেই বিশিষ্ট ভাবগুলিও ভগবানের অদ্বিতীয় ভাবের ব্যঞ্জনা। তাঁহারা জানেন যে, এই অদ্বিতীয় ভাবও সর্ব্বতোভাবে একতারই ভাব। বিচক্ষণ চিকিৎসক যেরূপ রোগের লক্ষণগুলিকে রোগীর জীবনী শক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া জানেন এবং তদনুযায়িক ভাবে সেই জীবনী শক্তির একীকরণ ভাবকে উদ্রিক্ত করিয়া রোগের উপশম করেন, তদ্রূপ ঋষিগণ ভেদভাবগুলিতেও অভেদভাবের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়া, তাহাদেরই সাহায্যে অদ্বয়-তত্ত্ব শিষ্যের হৃদয়ে প্রকট করেন। সুতরাং তাঁহারা পর ও অপর এই দুই ভাবের ভাষাই জানেন বলিয়াই জীবকে ভগবানে উপনীত করিতে পারেন। এইটিই তাঁহাদের অপূর্ব্ব কৌশল। ঋষি বিশিষ্ট একখণ্ড লবণ বিশিষ্ট জলপাত্রে ফেলিয়া দিলেন এবং শিষ্যকে সেই জল উপর মধ্য ও নিম্ন হইতে তুলিয়া লইয়া খাইতে বলিলেন; শিষ্যও তাহা হইতে ব্রহ্মকে চিনিতে পারিলেন। শিষ্যের চিত্ত যদি লবণখণ্ডে আকৃষ্ট থাকিত, তাহার চিত্ত যদি প্রশান্ত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভাবে ব্রহ্মের প্রতি গতিপ্রাপ্ত না হইত, যদি তাহার চিত্তে গুরুর প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে, ঐ সামান্য ব্যাপারটি হইতে গুরুর চিত্তের বোধ বা ভগবদ্ভাব তাঁহার চিত্তে সংক্রামিত হইতে পারিত না। পূর্ব্বোক্ত বালকের ন্যায় বিশিষ্ট ভাবে মুগ্ধ হইয়া সে পিতার উপদিষ্ট অঙ্কটি না বুঝিয়া বিশিষ্ট আম্র লইয়াই ডুবিয়া যাইত। গুরুর বোধ সংক্রামিত হইতে গেলে শিষ্যকে ভেদভাব ছাড়িতে হইবে অথচ উপদিষ্ট জ্ঞানটি যে, জীবেরই হিতার্থে উক্ত, তাহাও বুঝিতে হইবে। গুরুর ন্যায়

তাহারও কতকটা ব্যক্ত ও অব্যক্তের ভাষায় বর্ণপরিচয়ও হওয়া আবশ্যক। ভেদ-ভাবে অবস্থিত জগদ্বস্তুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত প্রেম সংসারাশ্রম ও স্বধর্ম্ম পালনের দ্বার প্রকাশিত হয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া গুরুর উপদিষ্ট ভগবৎ-প্রেমকে আধুনিক স্থাড়ানেড়ির দলের উৎকট প্রেমরূপে পরিণত করে। বিশ্ব-প্রেমকে পাপ-কলুষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আরাধনায় নিয়োজিত করে। গুরুর উপদিষ্ট ভাব যথাযথ গ্রহণ করিতে হইলে, স্বধর্ম্ম দ্বারা পরিষ্কৃত চিত্ত হওয়া চাই; এই জন্যই কিরূপে মানবের ভগবৎ-রুচি জন্মে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান গীতায় যথাযথ ভাবে ভগবানের উদ্দেশে স্বধর্ম্ম পালনই প্রথম সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে পরিষ্কৃত চিত্তে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে এবং গুরুতে জীববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমময় প্রাণেশ্বর ভগবানেরই অভিব্যক্তি বলিয়া জানিতে তখনই গুরুর চিত্তের বোধ শিষ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। এই জন্যই এস ভাই সকলে আমরা এই পুরুষোত্তম ব্যাসদেব ও ঋষিকুলকে নমস্কার করি।

শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গেলে, শব্দশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ভগবানের দিকে চিত্তের গতি থাকা আবশ্যক এবং পর ও অবর এই দুইভাবে ব্যবস্থিত ঋষিগণের অনন্যশ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকা আবশ্যক। ঋষিগণ ভগবৎ-পরায়ণ, তাঁহাদের স্বার্থাভিসন্ধি বা অহঙ্কার-প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা কেবল জীবসকলের মঙ্গলের জন্যই অবস্থিত থাকেন;—

"শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ ॥"

ভাঃ—১।৪।১২ ॥

ঋষিরা যে বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাহা সকলেরই প্রতিপাদ্য ভগবান; কিন্তু তাঁহাদের চিত্তের সহিত আমাদের চিত্ত সংলগ্ন না হইলে, আমরা তাঁহাদের উপদেশ প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারিব না। সর্ব্বদা একত্বে বিরাজমান ঋষি বলিলেন "প্রকৃতি" আমরা বুঝিলাম, চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী কিম্ভুত কিমাকার জড়বিশেষ। ঋষি বলিলেন, "জীব" আমরা বুঝিলাম, ভেদভাবাত্মক আমি। এরূপভাবে শাস্ত্রার্থ বুঝিলে কখনই ঋষি বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না। সেই জন্যই তাঁহাদের বাক্য যথোক্তভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদের চিত্ত ও

আমাদের চিত্তে সম্মিলন হওয়া চাই ; এবং সর্ব্ব ব্যাপারেই তাঁহাদের মত ভগবৎ-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

এইরূপে প্রেম ও অভেদ জ্ঞানে অবস্থিত চিত্তে মুক্ত পুরুষগণের বোধ সংক্রামিত হয় ; কিন্তু তাঁহাদের অপূর্ব্ব কৌশল অবগত না হইলে আমরা সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকট জগতে প্রকাশ করিতে পারি না। তাঁহারা যে আশ্চর্য্য কৌশল ও নিপুণতার সহিত আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদাত্মক বস্তু, শক্তি বা কেন্দ্রবাচক শব্দের সমাবেশের দ্বারা অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে পারেন, সেই কৌশলটীও আমাদিগকে জানিতে হইবে।

তাঁহারা যে নিপুণতার সাহায্যে মনোবুদ্ধি ও অহঙ্কারের অতীত ভগবৎ-তত্ত্বকে প্রতি শ্লোকে ও প্রতি শব্দের সাহায্যে অঙ্কিত করেন, যে চাতুর্য্যবলে অব্যক্তকে ব্যক্তের ভাষায় এবং ব্যক্ত পদার্থের দ্বারাই অব্যক্তের ভাষা শিষ্য-হৃদয়ে ইঙ্গিত করেন, তাহা বুঝিবার জন্য বিদ্যার আরাধনা আবশ্যক।

মহাবিদ্যা চৈতন্যরূপিণী ধর্ম্মার্থকামরূপে প্রকট হন। যে বিদ্যা দ্বারা জীব স্বধর্ম্মকে বুঝিতে পারে, তিনি মহাবিদ্যা ধর্ম্মসম্বন্ধিনী বিদ্যা বা সরস্বতী। তিনি আছেন বলিয়াই স্থূল শব্দ হইতে বস্তু ও তাহা হইতে ভাব প্রকট হয়। তিনিই বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া ভেদের মধ্য দিয়া জীবকে অভেদাত্মক ভাষার ইঙ্গিত করেন। তাঁহারই কৃপায় Sir Oliver Lodge প্রভৃতি মনীষিগণ আপাততঃ প্রতীয়মান জড়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়া চৈতন্যকে দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারই কৃপায় প্রথমে বিশিষ্ট বোধে শাস্ত্রপাঠ করিতে গিয়া জীব-হিতে রত ব্যক্তিগণ অবিশেষ পরমাত্মাকে অস্ফুটভাবেও দেখিতে পান। তিনি অপরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই এক মহামায়া মহাবিদ্যা-প্রতিষ্ঠা এবং তৎপ্রসূতা। জীব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমে অপরা বিদ্যার অন্তর্গত কোনও এক বিদ্যার সম্যক্ আলোচনার দ্বারা পরিস্ফুট-চিত্ত হয়। সমস্ত জীবন-ব্যাপারকে তুচ্ছ বোধ করিয়া মনীষী Newton জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ বা আকর্ষণ বুঝিতে গেলেন, এবং যখনই তাঁহার চিত্ত ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের বিশিষ্টতা অতিক্রম করিল, তখনই একটি সামান্য আপেল ফলের ভূমি-পতন মধ্য দিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বোধ ফুটিয়া উঠিল। Proffessor (Myers) জীবের স্বরূপ বুঝিবার জন্য ভূত প্রেতাদির আবেশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলির অনুশীলন করিতে

গেলেন; এবং কোথা হইতে তাঁহার চিত্তে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি মূল তথ্য বিভিন্ন ভাষার পোষাক পরিয়া প্রকটিত হইল। যে শক্তির সাহায্যে জীব বস্তু লইয়া খেলিতে গিয়া বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধবাচক, সুতরাং উচ্চস্তরের একত্ব জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হয়, তিনিই দেবী সরস্বতী বলিয়া সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে পূজিতা। জীব যে কোন বিশিষ্টবস্তুর ভাষা বা ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলে তদ্দ্বারাই সেই ভাষার সাহায্যেই ঋষিগণ অল্পে অল্পে তাহার অভেদাত্মক চিত্তে ভগবানের ভাষা প্রকট করেন। সুতরাং এই "পর" ও "অপর" উভয় ভাষার সমন্বয়কারিণী বিদ্যা-শক্তিকে স্বীকার না করিলে কখনই শাস্ত্র বুঝিতে পারা যায় না। যে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ও জীব-হিতের জন্য কোন অপরা বিদ্যার চর্চ্চা করেন, তিনিই ঋষিদিগের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হন। জীবে দয়াই আমাদের চিত্তকে অভেদ বা সামান্য ভাবের দিকে লইয়া যায়। এবং এই ভাবে প্রণোদিত ব্যক্তিকে ব্যক্তভাবের মধ্য দিয়া অল্পে অল্পে একত্বের দিকে চালিত করে। তখনই চিত্ত ও একত্ব-ভাবের সাহায্যে উচ্চস্তরের বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞানশূন্য অপূর্ব্ব একত্বের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন,—

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

ভূতে দয়া না হইলে সরস্বতী দেবীকে বুঝিতে পারিব না। ভূতে দয়া করিতে গেলে, কি স্বতঃ কি পরতঃ ভেদভাবশীল ব্যক্তিত্বের স্থাপনা ত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যাপারের মধ্যেই সকল জ্ঞান ও সাধনার মধ্যেই অহংভাব উৎপাদন ত্যাগ করিয়া লোকের মঙ্গলই উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। জীবে দয়া দ্বারা কর্ম্মোচিত লোকের অভেদ জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে পরিষ্কৃত চিত্তে অভেদজ্ঞানের পিপাসা সঞ্চারিত হয়, এবং তদ্দ্বারা জীবের অজ্ঞাতসারে অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানের দিকে তাহার চিত্তের গতি হয়। এই গতির নাম রুচি। রুচি জন্মিলে মানব নামরূপাতীত ভগবানকে নমস্কার করিতে শিখে। ভগবানের দিকে চিত্ত নমস্কারের দ্বারা প্রধাবিত হইলে, তাঁহার ইন্দ্রিয়স্থানীয় সুতরাং স্বরূপ প্রকাশের আশা ঋষিগণের প্রতি ফলাভিসন্ধিশূন্য প্রেম সঞ্জাত হয়। এই প্রেমের সাহায্যে জীব পূর্ব্বজগণের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হয়। শব্দ-ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ও তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত তল্লিঙ্গ পরব্রহ্মভাবে অবস্থিত ঋষিগণের চিত্তের সহিত অকপট প্রেমে আমাদের চিত্ত সংলগ্ন হইলে, তখনই

তাঁহাদের প্রকটিত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারি এবং সর্ব্ব বেদার্থের প্রতিপাদক যে একমাত্র ভগবান তাহা বুঝিতে পারিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাহায্যে ভগবান যে কে, কতটুকু ও কি পরিমাণে তাঁহার প্রকাশ ইহা বুঝিতে পারি এইরূপে প্রেমের দ্বারা নির্জিত রাগশূন্য চিত্তে ভগবানের স্ফুরণ হয়, এবং জীব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়। এই জন্যই গীতা বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীতা।

ভগবানকে বুঝাইয়া কিরূপে তাহাতে অবস্থিতি হয়, ইহাই নিখিল বেদার্থের প্রকৃত অর্থ। এই অর্থ আমাদের চিত্তে ফুটিতে গেলে, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ যথাযথ ভাবে হৃদয়ে উদ্ভাসিত করিতে গেলে, চিত্তে ভগবৎ বণতা বা নাম-রূপাতীত একত্বের দিকে গতি, ঋষিকুলের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস ও সরস্বতীদেবীর আবাহনার্থ জীবকুলের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রপাঠ ও কর্ম্ম করা আবশ্যক। এই জন্যই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ভাবে জীবের ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ;—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।
এই তিন ধর্ম্ম কহি শুন সনাতন॥"

এস ভাই সকল আজ মহাবিদ্যার আবির্ভাব সময়ে ঐ তিনভাবে চিত্ত স্থাপিত করিয়া তাঁহার আবাহন করি ; তাহা হইলে, দেবী নিশ্চয়ই তাঁহার অবিদ্যাভাব উপরত করিয়া আমাদিগের চিত্তে ভগবানের বিমল জ্যোতিঃ প্রকট করিবেন। সকলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রীক্ষেত্রনাথ শিরোমণি।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়ী মহাতীর্থের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কত কাল অতীত হইল, কত পর্ব্বত সাগরগর্ভে লীন হইল, কত দ্বীপ সাগরোপরি ভাসিয়া উঠিল, যুগ যুগান্তর অতীত হইল কিন্তু এখনও এই স্থান পূর্ব্ববৎ রামচন্দ্রের মহীয়সী কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখানে আসিলেই মনে শ্রীরামচন্দ্রের সজীব চিত্র জাগিয়া উঠে। মনে পড়ে সেই অতীত কালে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদি বানরগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, অর্দ্ধাঙ্গিনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সতী সাধ্বী-শিরোমণি জনক-দুহিতার উদ্ধার সঙ্কল্পে অতলস্পর্শী এই সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া সেতু বন্ধনার্থ মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হইতে মহেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥"

মহাদেবের আবির্ভাব শিবপুরাণ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন।

"তদা চ শঙ্করো দেবোজ্যোতীরূপো মহেশ্বরঃ।
সাঙ্গঃ সপরিবারশ্চ যথোক্তং রূপমুত্তমম্।
ধৃত্বা চ প্রকটীভূয় শিবমস্তু তদাব্রবীৎ॥"

রামচন্দ্র লোকহিতার্থ জগতে অবতীর্ণ। জগতের হিতের জন্য তিনি শিবের তত্রাবস্থিতি প্রার্থনা করিলেন। মহাদেবও তৎকালাবধি তথায় রামেশ্বর নামে পূজিত হইতেছেন।

"পুনশ্চ প্রার্থয়ামাস ইহাস্থেয়ং ত্বয়া প্রভো।
লোকানামুপকারার্থং পাবনায় শিব ত্বয়া॥
ইত্যুক্তস্তু শিবস্তত্র লিঙ্গরূপোঽভবৎ তদা।
রামেশ্বরশ্চ নাম্না বৈ প্রসিদ্ধো জগতীতলে॥"

জ্ঞানসংহিতা ৫৭। ২১—২২।

এস্থান যে অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র এ সম্বন্ধে অন্য পুরাণও একমত। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক একখানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নল পর্ব্বতসদৃশ চার

বানর সেনাগণের সহিত এক যোগে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত ও বনস্পতি নিকর দ্বারা দৃঢ়তর সেতু প্রস্তুত করিতে লাগিল—

"ততোঽতিহৃষ্টৈঃ প্লবগেন্দ্রযূথপৈ
র্মহানগেন্দ্রপ্রতিমৈর্যুতো নলঃ।
ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং
সুবিস্তৃতং পর্ব্বতপাদপৈর্দৃঢ়ম্॥"

লঙ্কাকাণ্ড ৩য় অধ্যায়।

উক্ত গ্রন্থেই দেখা যায় যে, রামচন্দ্র সেতু আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়া লোক-হিতার্থ তথায় রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেতুমারভমাণস্তু তত্র রামেশ্বরং শিবম্।
সংস্থাপ্য পূজয়ামাস রামো লোকহিতায় চ॥

গরুড় পুরাণ ইহার উল্লেখ করিয়াছে—

"কাঞ্চীপুরী তুঙ্গভদ্রা শ্রীশৈলং সেতুবন্ধনম্
রামেশ্বরং পরং তীর্থং কালসর্পিশ্চ কামদম্॥"

৮১ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাদিনে সেতুবন্ধে রামেশ্বর দর্শনে আর জন্ম হয় না।

"রামেশ্বরং সেতুবন্ধে আষাঢ়ী-পূর্ণিমাদিনে।
উপোষ্য দৃষ্ট্বা সংপূজ্য করোতি জন্মসংক্ষয়ম্॥" ৭৬।৩৮

এই সকল পুরাণাপেক্ষাও বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অতিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে দেখা যায় যে, যখন রামচন্দ্র রাবণবধের পর অযোধ্যাগমনার্থ বিমানারোহণ করেন তখন কথা-প্রসঙ্গে তিনি সীতাকে তাঁহার অদর্শনকালের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"এষ সেতুর্ম্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে।
তবহেতোর্বিশালাক্ষি নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ॥ ১৬
পশ্যসাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্॥ ১৭

* * * *

অত্র কুক্ষৌ সমুদ্রস্য স্কন্ধাবারনিবেশনম্॥ ১৯

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।
এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥ ২০
সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্।
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনম্॥" ২১

লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ অধ্যায়।

এই মহাপাতক-নাশক ক্ষেত্র গমনে এখন বিশেষ কষ্ট নাই। যে কালে রেল, ষ্টিমার ছিল না তখনও কতলোকে আকুলচিত্তে জগৎ ভুলিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই তীর্থে আসিয়াছিলেন।

"তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধ স্নান রামেশ্বর সন্দর্শন॥"

এই সেতুবন্ধ সম্বন্ধে অনেকে একটী গল্প মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধনুষ্কোটী-নামক স্থানে গেলেই সেতুর একটা আভাস মনে আসে। ভূভাগ যেন ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে সাহেবেরা বলেন যে, এখানে গুপ্ত পর্ব্বত লুক্কায়িত আছে। এই গুপ্ত পর্ব্বত যে সেতুর অংশ নহে তাহা কে বলিল। ইহাকে ইংরাজেরা Adams Bridge বলে। ইহার একদিকে Gulf of Manar অপর দিকে Palk Strait. সেতু-মাহাত্ম্য মতে এই ধনুষ্কোটী পুণ্যপ্রদ বলিয়া খ্যাত—

"ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি ধনুষ্কোট্যাবলোকিনঃ॥"

রামেশ্বর-মন্দিরে পাণ্ডাদিগের কোন উৎপাত নাই। পূজার বন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক নিযুক্ত আছে। শতনাম অর্চ্চনার জন্য ।/০ আনা, সহস্র নামার্চ্চনার জন্য ১৲ টাকা, মহাভিষেকের জন্য ৫।০ টাকা দিতে হয়। দুঃখের বিষয় কাশী বা বৈদ্যনাথের ন্যায় শিবকে স্পর্শ করিতে দেয় না। অনেক দূর হইতে দর্শন করিতে হয়। আর একটী কুনিয়ম যে গঙ্গাজল শিবের মস্তকে দিতে হইলে ১৸০ দক্ষিণা দিতে হয়। গঙ্গাজল মন্দিরের মধ্যে ১৲ টাকায় এক শিশি পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ কুণ্ডে পাণ্ডাদের কিঞ্চিৎ দৌরাত্ম্য আছে। মন্দিরের এ সকল আয় ব্যতীত জমিদারীর আয় তিন লক্ষ টাকা। জানিনা গঙ্গাজলের উপর এমন "জিজিয়া" কেন হইল।

আমরা যে কয়দিন ছিলাম প্রত্যহই মহাদেব-দর্শনে আনন্দ অনুভব

করিতাম। সংস্কার হউক বা ইহাকে যে সংস্কারে অভিহিত করা যাউক, আমরা হৃদয়ে একটী শান্তির ছায়া অনুভব করিতাম। বাহ্যরূপের এরূপ মহিমা, জানিনা আন্তর রূপের কি শক্তি। বাহ্যরূপ বলিলাম তাহার একটু কারণ আছে। মন্দিরে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে তাহাতে লিখিত আছে।

"বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরোহ্যয়ম্।
কৈলাসে জ্যোতিরূপেণ পার্ব্বতী প্রাণবল্লভঃ ॥

* * * * * *

রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ ॥"

বাস্তবিক জগতের সকল বস্তুরই দুইটী অংশ আছে একটী বাহ্যাংশ একটী অন্তরাংশ। অন্তরাংশ চৈতন্যশক্তি ইহা অমৃত, বাহ্যাংশটী ক্ষয়বৃদ্ধিশীল। এই বাহ্যাংশ অন্তরাংশ দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন, আবার এই বাহ্যাংশও অন্তরাংশের অভিব্যক্তি। এই ভাবে দেখিলে বিশ্বে এক শক্তি দেখা যাইবে, সেই শক্তিই সংকল্পাত্মক ইহাই নির্গুণ শিবের প্রথম অভিব্যক্তি মহেশ্বর।

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

ইনি সগুণ ব্রহ্ম ইঁহার নির্গুণ অবস্থাই শিব অবস্থা। ইহাই—

"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" মাণ্ডুক্য।

এই শিব অবস্থা না হইলেও নিরুপাধিক। এই অবস্থায় সৃষ্টি-প্রলয়ের সংঘাত নাই। আবির্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি দ্বৈতাদির অস্তিত্ব নাই

"তত্র ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।"

শ্বেতাশ্বেতর ৪। ১৮

এই অবস্থাই শিবের অলিঙ্গাবস্থা। এই নাম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য-পরমতত্ত্ব লিঙ্গরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন।

"অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যান মার্গেঽপ্যগোচরম্ ॥"

জ্ঞানসংহিতা। ৩। ৬

"অলিঙ্গং একং অব্যক্তং লিঙ্গং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ ॥"

কূর্ম্মপুরাণ।

এই লিঙ্গরূপী মহাদেব আমাদের সর্ব্বস্ব, বিশ্ব ইঁহা হইতেই জাত, ইঁহাতেই

স্থিত এবং ইহাতেই লীন হয়। ইনিই ঈশ্বর। অবিদ্যামোহিত জীবকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া ইনিই উদ্ধার করেন। এই শিবসম্বন্ধি জ্ঞানই পরাবিদ্যা, তাহাই Theosophy। হে মহাদেব কৈলাসপতি! আমাদের প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষে চাও, তোমার কৃপাতেই রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিয়া অযোনিসম্ভূতা সীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যা রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে শম্ভো! আমাদেরও বেদমাতা গায়ত্রী কলুষিত জগৎ হইতে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিয়াছেন; জীব তাই অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন, তাই এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত কাম-প্রবণতা, এত পরিচ্ছিন্ন অহংভাবের পূজা। হে বিভূতিভূষণ মহাযোগেশ্বর! আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ কর, যেন আমরা দৈবী সম্পৎরূপ সেতু বন্ধন করিয়া হৃদয়-রাজ্যে মা উমার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, মায়ের বিশ্বাত্মিকা রূপ দেখিয়া জীবন সফল করিতে পারি। হে শঙ্কর, তোমাকে প্রণাম করি। এই পরা বিদ্যা লাভ করিলে জীব আপনাকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে পায়। তোমায় প্রণাম করি।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগলাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং
ত্রিদিবেশ-শিরোমণি-ঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ-ত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

বেদান্তাভাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১)

এই মিনতি ওহে হরি করি তব রাঙ্গা পায়।
তোমার রূপ-সাগরে ডুবে যেন প্রাণ যায়॥
চাইনে যোগৈশ্বর্য্য তব,
নব নিধি যোগ-বিভব,
লোকালোক চাইনে আমি,
আলোকের ভিখারী হায়!

(২)

যে তেজে বিশ্ব-সংসার,
নেহারি রূপ তোমার,
চিত্ত মন অহঙ্কার,
যেন সেই তেজে মিশায়।

(৩)

জ্ঞানে হ'য়ে অবশেষ,
সমাধির সমাবেশ,
হয় যেন হে হৃষীকেশ,
ভবলীলা করি সায়।

(৪)

মুনীন্দ্র যোগীন্দ্রগণ,
যে পদ করে চিন্তন,
সেই পদ—পরম পদ—
দুর্মতির দুরাশা তায়।

শ্রীমতিলাল রায়।

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। কার্ত্তিক ১৩১৭। ৭ম সংখ্যা।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৬)

যখন হইবে মনে,

সব মিথ্যা,

স্বপনের মত,—

এদেহ ইন্দ্রিয়গণ,— যা'দের লইয়া মন

"আমার" "আমার" রবে,

অন্ধ হয়ে

ছুটিছে সতত ;

দেহের অস্তিত্ব নাই, শুধু বাষ্প শুধু ছাই,
অসত্য দেহের মন
ধীরে ধীরে
সত্য ছবি আঁকে;
মোহন মূরতি ধরে যাদুকর খেলা করে
মায়ার গভীর নীরে,
টেনে আনি
ডুবাইয়া রাখে।

(৭)

যখন শ্রবণ আর শুনিতে পাবে না,
বাহিরের নানা ধ্বনি
স্তব্ধ হয়ে যাবে;
তখন উঠিবে ধ্বনি, মহান্ সঙ্গীত,—
আমি তুমি ঘুচে গিয়া
এক মনে হবে।

(৮)

অসৎ রাজত্ব হতে মুক্ত হবে তবে।
তবে সেই সত্যময়
রাজত্বের পথে
পদার্পণ করিবার শক্তিটুকু পাবে।
যেতে না পারিবে সেথা
অন্য কোন মতে।

(৯)

তরঙ্গ বিহীন স্থির, হবে যবে মন ধীর,
বাহিরের আঁখি খেলা
শান্ত যবে হবে;
তবে আত্মা আঁখি মেলি হরষে করিবে কেলি
সেই এক পূর্ণ জ্যোতিঃ
নিরখিয়া সবে।

(১০)

বাহিরের নানাবিধ নাদ
　　যখন না শুনিবে শ্রবণ ;—
ভ্রমরের গুণ গুণ গান,
　　করিণীর জীমূত বৃংহণ ;
প্রণয়ের অস্ফুট আরব,
　　সংসারের সু-উচ্চ গর্জ্জন,
সব শব্দ যাইবে মিশিয়া
　　সেই এক সঙ্গীতে যখন ;
যিনি আত্মা পরমাত্ম-ছায়া,
　　সর্ব্বভূত যাঁহাতে বিহরে,
শুনিবারে পাবেন তখন
　　যাঁর বাস অন্তর মাঝারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধা।

তন্ত্র।

১। তান্ত্রিকতা।

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

ব্রহ্মবিদ্যাবাদিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে তন্ত্র সম্বন্ধে কেমন একটু খট্‌কা বাধিয়া গিয়াছে। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা বলিলে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝেন ও সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে তান্ত্রিকতা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহাদের মনে যেন কেমন একটী ব্যাকুলতার ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে।

এই শ্রেণীর ব্রহ্মবিদ্যাবাদিগণ তন্ত্রোক্ত সমস্ত সাধন-প্রণালীকে তান্ত্রিকতা (Tantrikism) আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে তন্ত্রোক্ত সমস্ত

সাধন-প্রণালীই দোষদুষ্ট ; অতএব হেয়—প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যাকে তান্ত্রিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ইহা একটী বিষম ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি কথঞ্চিৎরূপে দূর করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বেদের 'উপনিষৎ' অংশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গ ও ভোগসাধন অনুষ্ঠানাবলীর উপদেশ আছে ; বেদের অথর্ব্বাণাংশে শান্তিকাদি কর্ম্মের উপদেশ আছে ; তন্ত্রেও সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা, স্বর্গ ও ভোগসাধন সাধনা-প্রণালী ও শান্তিকাদি কর্ম্মের উপদেশ আছে। ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অন্য সাধনার উপদেশ আছে বলিয়া, বেদ যেমন হেয় হয় না, ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অন্য সাধনার উপদেশ আছে বলিয়া, তন্ত্রও সেইরূপ হেয় হইবার যোগ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে তন্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যা। তন্ত্রকে হেয় হইতে হইলে, প্রকারান্তরে বেদকেও হেয় হইতে হয়।

তন্ত্র-গুরু শ্রীসদাশিব তন্ত্রকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন—"তামসিক তন্ত্র নরকের জন্য, রাজসিক তন্ত্র ভোগের জন্য ও সাত্ত্বিক তন্ত্র মোক্ষের জন্য ; যিনি বুদ্ধিমান্ ও ব্রহ্মজ্ঞানার্থী, তিনি এই ত্রিবিধ তন্ত্রের মধ্যে সাত্ত্বিক তন্ত্রই অবলম্বন করিবেন ; কেননা তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।*

(গন্ধর্ব্ব তন্ত্র দেখ)

---

* Mrs. Besant তাঁহার Introduction to Yoga নামক গ্রন্থে কহিয়াছেন—"These books (the Tantras) have an evil significance in the ordinary English ear, but not quite rightly. The Tantras are very useful books, very valuable and instructive ; all occult science is to be found in them. But they are divisible into three classes : those that deal with white magic, those that deal with black magic and three that deal with what we may call black magic, a mixture of the two.

Introduction to Yoga page 22.

প্রবন্ধটী লিখিবার পর আগষ্ট মাসের Theosophy পত্রিকায় শ্রীমান্ লেডবিটার সাহেব ৺কালীপূজা ও তন্ত্রোক্ত বীজসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"It (ceremonies) may well have been the seed from which Kali worship has since arisen, for it consisted mainly of gloomy rites to a blood-thirsty female diety. অর্থাৎ তাহার বর্ণিত অবশ্য ক্রিয়াগুলি হইতে বীজ হইতে উৎপন্ন ও বৃক্ষের ন্যায় কালীপূজার পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া

ব্রহ্মবিদ্যার্থীর পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অন্য সাধন যে ভাবে হেয়, তাহা বেদ ও তন্ত্র উভয়ের পক্ষেই সমান—ব্রহ্মবিদ্যা এক বই দুই নহে ও হইতে পারে না। যাহা ব্রহ্মজ্ঞান তাহা বেদেও যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্ত্রেও সেইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্র বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া বরং তন্ত্রে তাহা সাধকের বোধগম্য করিবার জন্য যেন আরও একটু সহজ ও সরলভাবে বলা হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, সাধকের সমগ্র জীবনকে ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ করিবার জন্য তন্ত্রে যেন একটু বিশেষভাবে প্ররোচনা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই, শিশুর যখন উপনয়ন হইতেছে, তন্ত্র তখন সাবিত্রী মন্ত্রের কি সুন্দর ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিতেছেন। বেদোক্ত সাবিত্রীমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা ও বিনিয়োগ প্রাণায়ামে ও জপে। তন্ত্রে সেই একই সাবিত্রী মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, দেবতা সাবিত্রী (ব্রহ্মশক্তি) ও বিনিয়োগ মোক্ষার্থে। তন্ত্রে সাবিত্রী-মন্ত্রের নাম ব্রহ্মবিদ্যা। এই সাবিত্রী-মন্ত্রের কি সুন্দর ব্যাখ্যা! পড়িলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়! তন্ত্র বলিতেছেন :—

ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ॥

বোধ করা যায়; কারণ বর্ণিত ক্রিয়াগুলিও প্রধানতঃ রক্তপিপাসু স্ত্রী-দেবতা-বিশেষের উদ্দেশে ভীষণ ক্রিয়া ও বিধিসংবলিত। তন্ত্রের বীজ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"One of their characteristics was the use of certain cacophonous combinations of consonants into which all the vowels were inserted in turn. The syllable "hoim" was used in this way, as also the interjection "kshrang". In the midst of these uncouth outbursts of spite occurred what appears to be an evil wish in unmistakable Sanskrit. "Yushmabhih mohanam bhavatu," and the whole utterance concluded with some peculiarly explosive curses which it seems imposible to express in any ordinary system of letters."

নবীন মন্ত্রদ্রষ্টা লেড্‌বিটার সাহেবের উক্তিতে হিন্দু মাত্রেই বিষম সমস্যায় পড়িবেন। সকলেরই বিষয়টীকে ভাবিয়া রাখা আবশ্যক। এই বিষয়ে বারান্তরে লিখিতে চেষ্টা করিব।

তার-ব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ।
জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্॥
যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিয়োজয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র নবমোল্লাস।

"ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা সেই পরম দেবতাই প্রতিপাদিত হইতেছেন, যে দেবতা প্রকৃতির পর (প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র) হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য্য সমাধা করিতেছেন। সেই দেবতা ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের আত্মা হইয়া ও তিন গুণকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সাবিত্রীর তিন ব্যাহৃতি দ্বারা সেই বিশ্বময় ব্রহ্মই বাচ্য হইতেছেন। প্রণব ও ব্যাহৃতি দ্বারা যাঁহাকে বুঝাইতেছে, সাবিত্রী-মন্ত্র দ্বারাও তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। সেই বিভু ক্রীড়ার ন্যায়* যাঁহা হইতে জগৎ প্রসূত হইতেছে, তাঁহার অন্তর্গত যে মহৎ বর্চ্চঃ তাহা যতাত্মা ব্যক্তিগণের বরণীয়, সেই পর, সত্য, সর্ব্বব্যাপী সনাতন বর্চ্চঃ (ভর্গ)-কে ধ্যান করি, যে বর্চ্চঃ সর্ব্ব সাক্ষীশ হইয়াও আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে প্রেরিত (নিয়োজিত) করিতেছেন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তন্ত্রে সাবিত্রীকে ব্রহ্মবিদ্যা অভিধা দেওয়া হইয়াছে ও গুরু এই ব্রহ্মবিদ্যা শব্দ উচ্চারণ করিয়া উপনীত শিষ্যকে বলিতেছেন,—বৎস, তুমি এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে, তোমার দেহ এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ দ্বারা পবিত্র হইল—"ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্"—এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও—"জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব"—মহানির্ব্বাণ—৯ম উল্লাস।

যে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেছে, প্রবেশের দ্বার-পথে তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে "বৎস, ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও।" ব্রহ্মবিদ্যার এত গৌরব কোন্

* দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া ও ক্রীড়া করা দুইই বুঝায়, এইজন্য দীব্যতঃ শব্দের অর্থ ক্রীড়তঃ ও দ্যুতিমতঃ এই দুই অর্থই হয়।

শাস্ত্রে আছে! সমস্ত গার্হস্থ্য-জীবন ব্রহ্মময় করিবার জন্য এরূপ কোমল ও করুণাপূর্ণ উপদেশ কোন্ শাস্ত্রে আছে?

যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা শব্দে ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান বুঝেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য গার্হস্থ্যাশ্রম-প্রবেশেচ্ছু শিষ্যকে কি অনুশাসন করিতেছেন—

সত্যং বদ ধর্ম্মঞ্চর, স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ।

* * * মাতৃদেশে ভব, পিতৃদেশে ভব, আচার্য্যদেশে ভব, অতিথি-দেশে ভব ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—১১শ অনুবাক।

এই অনুশাসন বাক্যের মধ্যে কিন্তু "ব্রহ্মজ্ঞানপরোভব" এইরূপ কোন উপদেশ নাই। বস্তুতঃ বৈদিক যুগে গৃহস্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবপিতৃ-কার্য্যাদি ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইত—গার্হস্থ্য জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন অতি বিরল ছিল।

কিন্তু তন্ত্রে গার্হস্থ্য জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার বিশেষ উপদেশ আছে—সাধনা দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনকে ব্রহ্মময় করিতে চেষ্টা করাই তন্ত্রের বিশেষত্ব। এই জন্য তন্ত্রে ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মমন্ত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্র, ব্রহ্মকবচাদি দ্বারা ব্রহ্ম-সাধন প্রণালীর বিস্তৃত উপদেশ আছে এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া, রাজা রামমোহন রায় একটী নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে ব্রহ্মসাধন না করিয়া, সগুণ ব্রহ্মের (ঈশ্বর) সাধনা করেন তাঁহাদেরও বাহ্য পূজাতে পর্য্যন্ত ব্রহ্মভাব জাগরূক রাখিবার জন্য তন্ত্রে মন্ত্রাবলী সেইরূপ কৌশলে সজ্জিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে কয়েকটী মন্ত্রের উল্লেখ করা হইতেছে। বাহ্য পূজায় সাধক ইষ্টদেবকে স্নানার্থ জল দিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতেছেন :—

যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে॥

যাঁহার তেজে জগৎ ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহা হইতে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে ও জগৎ আধার-স্বরূপ যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে, সেই তোমার স্নানের জন্য এই তোয় অর্পণ করিতেছি (যেন স্নানীয় প্রদানরূপ অতি

সাহসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতেছে)। সাধক তাঁহাকে বস্ত্র প্রদান করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন :—

সর্ব্বাবরণ-হীনায় মায়া-প্রচ্ছন্ন-তেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার আবরণ হীন, যিনি নিজ মায়া দ্বারা প্রচ্ছন্নতেজাঃ হইয়া আছেন, সেই তোমার পরিধানের জন্য আমি বাসযুগল কল্পনা করিতেছি— তোমাকে নমস্কার (যেন এই বস্ত্র প্রদানরূপ অপরাধ হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতেছে)। সাধক তাঁহাকে ভূষণ পরাইবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতেছেন :—

বিশ্বাভরণ-ভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহ-ভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে॥

যিনি সমস্ত বিশ্বের আভরণ স্বরূপ ও বিশ্বের সমস্ত শোভার যিনি একমাত্র উৎপত্তি স্থল, সেই তোমার মায়া-কল্পিত দেহের শোভার জন্য এই ভূষণগুলি সমর্পণ করিতেছি। সাধক তাঁহাকে গন্ধ প্রদান করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন :—

গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধপরা ধরা।
তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে॥

যিনি গন্ধতন্মাত্র দ্বারা এই গন্ধ প্রধান পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই গন্ধতত্ত্বের অতীত তোমাকে আমি এই দিব্য গন্ধ অর্পণ করিতেছি।

এইরূপ আরও অন্যান্য মন্ত্র বাহ্য পূজা কালেও সাধকের মনে ব্রহ্মভাব জাগাইয়া দিতেছে।

তন্ত্রে যে মানস-পূজা আছে তাহা অতীব মনোহারিণী—তাহার অক্ষরে অক্ষরে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সকল প্রস্ফুটিত—তাহাতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও মন্ত্রযোগের কেমন সমবায়!

ফলতঃ যাঁহারা সাত্ত্বিক সাধক, তন্ত্র তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান-পথে আরোহণ করাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ও যাঁহারা সাত্ত্বিক সাধক নহেন, তাঁহাদিগকেও সাত্ত্বিক সাধকের পথে আনয়ন করিবার জন্য তন্ত্রে বিবিধরূপে চেষ্টা করা হইয়াছে। তন্ত্র বলিতেছেন—মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই কামাভিলাষী ও স্বভাবতঃই তাহাদের কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-

গণের পক্ষে তাহাদের প্রবৃত্তির জন্যও তাহাদিগকে দুশ্চেষ্টিত হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সাধনান্বিত বহুতর কর্ম্ম কথিত হইয়াছে। জগদ্‌গুরু কহিতে-ছেন :—ধ্যান, অর্চ্চনা, জপ, সাধন সমস্তই কেবল চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত। চিত্ত-শুদ্ধির জন্যই আমি বহুবিধ কার্য্যের বিধান করিয়াছি—চিত্তশুদ্ধির জন্যই আমি নানাবিধ নাম ও নানাবিধ রূপের কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু হে দেবি, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ও কর্ম্মসন্ন্যাস বিনা শতকল্প কার্য্য করিয়াও কোন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্ত-শুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্ম-সংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেৎ মুক্তিভাগ্ জনঃ॥

মহানির্ব্বাণ—৮। ২৮৪—৮৭।

জগদ্‌গুরু অন্যত্র বলিতেছেন—অশুভকর্ম্মও বন্ধহেতু, শুভকর্ম্মও বন্ধহেতু; একটি লৌহময় পাশ, অপরটি স্বর্ণময় পাশ কিন্তু উভয়েই পাশ বটেই। অতএব শত কষ্ট করিয়া কর্ম্ম করিলেও বন্ধন এড়াইতে পারা যায় না। যে পর্য্যন্ত আত্ম-জ্ঞান লাভ না হইবে সে পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ কখনও সম্ভবপর হইবে না। সেই আত্মজ্ঞান কিসে হইবে?—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ও তত্ত্ববিচার দ্বারা। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়াদ্বারা পরিকল্পিত—পর ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। যিনি নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শত জপ ও শত হোমের দ্বারা মুক্তি হয় না, শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হয় না। আমিই ব্রহ্ম—সোঽহম্—এই জ্ঞানের দ্বারাই দেহী মুক্ত হয়।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণ-তমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ব্রহ্মাদি-তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈব সুখী ভবেৎ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্ম-বন্ধনাৎ॥

ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥

মহানির্ব্বাণ—১৪শ উল্লাস।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে বলিয়া আমরা তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার না করিয়া, সংক্ষেপে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তন্ত্রের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তন্ত্র বলিতেছেন—আত্মা সাক্ষী, বিভু, পূর্ণ-সত্য, অদ্বৈত ও পরাৎপর। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহস্থ নহেন। বালকের ক্রীড়ার ন্যায় তাঁহাহইতে নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে। মনের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তি যদি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হইত তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্ন-লব্ধ রাজ্য দ্বারা রাজা হইতে পারিত। মৃৎ, শিলা, ধাতু. কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া তপস্যা দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে মোক্ষলাভ করা যায় না, পরন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে। বায়ু, পত্র, কণা, বারি ভোজনপূর্ব্বক ব্রতধারণ করিলে যদি মোক্ষ হইত, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী ও বনচরগণ সহজেই মুক্ত হইতে পারিত। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারাই উত্তম ভাব, ধ্যানপরায়ণ হওয়া মধ্যম ভাব, স্তুতি ও জপ-পরায়ণ হওয়া অধম ভাব ও বাহ্যপূজাপরায়ণ হওয়া অধমাধম ভাব। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা সম্পাদনই যোগ, সেবক ও তাহার ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদনই পূজা, কিন্তু যিনি 'সমস্তই ব্রহ্ম' ইহা জানেন, তাঁহার যোগও নাই, পূজাও নাই। যাঁহার চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত আছে, তাঁহার জপ, হোম, তপস্যা, নিয়ম, ব্রত কিছুরই প্রয়োজন নাই। যিনি সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দেখিতে পান, তিনি স্বভাবতঃই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আর পূজা, ধ্যান-ধারণার কি প্রয়োজন? যিনি 'সমস্তই ব্রহ্ম' ইহা জানেন তাঁহার পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, তাঁহার ধ্যান নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতা নাই। আত্মা সত্তমুক্ত—আত্মা কোন বস্তুতে লিপ্ত নহেন, তাঁহার বন্ধন কোথায় যে, সেই বন্ধন হইতে তাঁহাকে মুক্ত হইতে হইবে? আত্মা নিজের মায়া দ্বারা রচিত, দেবতাগণেরও দুর্জ্জ্ঞেয় এই বিশ্বে অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও প্রবিষ্টবৎ লক্ষিত হয়েন। যেমন আকাশ সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে আছে, সেইরূপ সেই স্বরূপতঃ সাক্ষী ও সৎ স্বরূপ আত্মা

বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে লক্ষিত হয়েন। আত্মা সৎ-স্বরূপ ও চিৎ-স্বরূপ, তাঁহার কোন বিকার নাই। তাঁহার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কিছুই নাই, জরা, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেহের, আত্মার নহে। যেমন শরাব-তোয়ের প্রতিবিম্ব দ্বারা সূর্য্যকে বহু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মায়া দ্বারা দেহে দেহে আত্মাকে বহু বলিয়া বোধ হয়। যেমন হীন-বুদ্ধি ব্যক্তি চন্দ্র-প্রতিবিম্বিত জলের চাঞ্চল্য চন্দ্রে আরোপ করে, সেইরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি বুদ্ধির চাঞ্চল্যকে আত্মায় আরোপ করে। ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ ঘট থাকিলেও যেরূপ ঘট ভাঙ্গিলেও সেইরূপ; সেইরূপ দেহ থাকুক আর নাই থাকুক আত্মা সমভাবেই অবস্থান করেন। মানব আত্মার এই প্রকৃত স্বরূপ জানিয়াই মুক্ত হয়। মানব কর্ম্মের দ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান দ্বারা মুক্ত হয় না, ধনের দ্বারা মুক্ত হয় না, আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিয়াই মুক্ত হয়। আত্মাই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—আর যাহা প্রিয়, তাহা আত্মার শক্তি সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রিয়—নতুবা নহে। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয়ের ভেদ কেবল মায়া দ্বারাই হয়—বিচার করিয়া দেখিলে কেবল এক আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। যাহা জ্ঞান তাহা বিদ্রূপ আত্মা, যাহা জ্ঞেয় তাহাও বিন্ময় আত্মা ও যে জ্ঞাতা সেত স্বয়ংই আত্মা। যিনি ইহা জানেন তিনি আত্মচিৎ। মহানির্ব্বাণ —১৪শ উল্লাস।

ফলতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর নূতন কিছু লাভ হয় না—যাহা আছে তাহাই থাকে—"লব্ধমেব হি লভ্যতে"—গান্ধর্ব্ব তন্ত্র।

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপদেশ—বেদান্ত ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ অপেক্ষা কোন অংশেই পৃথক্ নহে। যিনি জগতের গুরু তিনিই তন্ত্রের বক্তা, এখনও গুরু-সঙ্ঘ যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইতেছেন ও যিনিই গুরু-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা তিনিই তন্ত্রের বক্তা। অতএব, তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীকে 'তান্ত্রিকতা' বলিয়া কটাক্ষ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রত্যগাত্মা বা "আমি"।

II. The Self or The "I."

এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমরা প্রশ্ন সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। যাহা মীমাংসা করিতে হইবে তাহার বিবিধ অঙ্গ সম্যক্ অবগত হওয়াই প্রথমে প্রয়োজন। যে কয়েক প্রকার মীমাংসায় মন ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তন্মধ্যে প্রতিলোমক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা চরম দ্বৈতভাবে সৃষ্টিপ্রকরণ স্থাপনটীই প্রধান। চরম দ্বন্দ্বের দুই অঙ্গ, পুরুষ ও প্রকৃতি, চিৎ ও জড় প্রভৃতি নানা তুল্যার্থসূচক বচন দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ শ্রেণীর মীমাংসকেরা কহেন যে, দ্বন্দ্বভাবের পশ্চাতে আর অপর কারণ আমরা পাইতে পারি না—ঐ দুইটিই শেষ অর্থাৎ নিত্য মূল কারণ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, মানবের চিত্ত ইহাতে অস্থির ও অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায়,—এবং মানবপ্রকৃতি তাহার ভিতর ও বাহিরে একটি চরম একত্ব পাইবার জন্য সদাই ব্যস্ত থাকে। স্বতই তাহার অনুভব হয় যেন মূলকারণ একটী মাত্র। তর্কসমূহ যতই বলবান হউক না কেন, তিনি নিজের অভ্যন্তরে একত্ব অনুভব করেন—যদিও প্রথমে উক্তভাব অস্পষ্টরূপে উত্থিত হয়, ক্রমে প্রতিভার উদয়ে ঐ বিশ্বাস বলবৎ হইতে থাকে এবং বিশ্ব মধ্যে এক ভিন্ন দুই বা বহু নাই, এইরূপ ধারণা দৃঢ় হইয়া আইসে। ঐ প্রতিভার ইঙ্গিত বা চেষ্টা যে অভ্রান্ত, তাহা কিরূপে বুঝিব? মন যেস্থানে প্রবেশ করিতে অক্ষম, ঐ আলোক কি তথা হইতে আসিতেছে?

কিন্তু এই বিশ্বমধ্যে দ্বন্দ্বভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; এবং ইহাদের একত্বে পরিণতি বোধগম্য হইবার পূর্ব্বে ইহাদের দুইটীকেই চরম কারণস্বরূপ জানিতে হইবে। তজ্জন্য এই দ্বন্দ্বের বা বিরোধী যুগ্মের এক একটির জন্য এরূপ সাধারণ দুইটি শব্দ প্রয়োজন যে, যাহা ব্যবহৃত হইলে অপর যতই মিথুন উপস্থিত

হউক না কেন, তাহারা সেই যুগ্মের অন্তর্ভূত হইবে—ইহার একের অন্যতরটি অপর সকল যুগ্মের একের বা অন্যতরটির শীর্ষকরূপে পরিগণিত হইবে। "আত্মা" ও "অনাত্মা" শব্দ গ্রহণে আমরা ঐরূপ সর্ব্বথা সমন্বয়কারী একটি মিথুন পাইতে পারি, যে দুইটি শব্দ পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং প্রতিদ্বন্দ্বের উভয় পার্শ্বকেই পূর্ণরূপে ধারণ করে। 'আত্ম'-শীর্ষকস্থানীয় শব্দগুলি দ্বারা যাহাতে চিৎ বিরাজিত তাহাই বুঝাইবে, এবং 'অনাত্মা'-শীর্ষক শব্দগুলি যাহা অচিৎ বা জড় তাহাই বুঝাইবে। সর্ব্বথা সমন্বয়কারী অথচ সুস্পষ্ট, এরূপ, অপর মিথুন দুর্লভ। প্রাচ্য, একসম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈত-দর্শন এই বিশাল বিশ্বকে আত্মার বিকাশরূপে গণনা করেন, এবং আত্মাতেই সমস্ত লয় করেন। এইরূপে আত্মাকে, অনবছিন্ন, কলাতীত, নির্গুণ ব্রহ্মকে, সকলের সমষ্টিরূপে বর্ণনা করিয়া, পরে বিকাশ সময়ে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্মরূপে, ষোড়শকল পুরুষরূপে, বা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত সুতরাং সসীম ঈশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা 'আত্মা' সৎস্বরূপ ও 'অনাত্মা' অসৎ এই দ্বিঅর্থ জনিত বিভ্রম হইতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'আত্মা' শব্দ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকাশ পায়, তাহা সম্যক্ বুঝিবার জন্য আমি মনে মনে বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, 'আমি' পৃথক্ হইলাম এবং আমার বাহিরে যাহা কিছু বর্ত্তমান সে সমুদায়কে অপর পার্শ্বে স্থাপন করিলাম। আমি একটি পদার্থ জানিতেছি, ঐ পদার্থ আমি নহি—তখন আমি কহি 'আত্মা' অর্থাৎ 'আমি' জ্ঞাতা, এবং আমার সম্মুখে বর্ত্তমান পদার্থসমূহ জ্ঞেয়বস্তু। আমার বাহিরে স্থিত কোন দ্রব্য আমার লইতে ইচ্ছা হইলে, আমি কহি—'আত্মা' অর্থাৎ 'আমি' ইষ্ট দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছাকর্ত্তা। আমি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে উক্তক্রিয়ার উদ্যোগ আমার বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি, এবং তাহাতে আমি কহি—'আত্মা' কর্ত্তা ও যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 'আত্মার' কৃতবস্তু-কার্য্যমাত্র। কিম্বা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি* জ্ঞানের তিনটি অবস্থা বা প্রকার-বিশেষমাত্র জানিয়া আমি কহি—আত্মাই এই সকল জ্ঞেয় জড় বিষয়ের জ্ঞাতা। ইহা সর্ব্বত্র বিশেষ লক্ষ্য করিবেন যে, সমুদায় যুগ্মের প্রথমটিতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেছে, অথচ সর্ব্বত্রই প্রথমের বিকাশ দ্বিতীয় বর্ত্তমান হইলে হইয়া থাকে। জ্ঞেয়ের জন্য জ্ঞাতার অস্তিত্ব হইতে পারে না, কারণ জ্ঞাতার অস্তিত্ব দ্বারাই জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাত হইতেছে। অভিলষিত দ্রব্যের

জন্য ইচ্ছাকর্ত্তার অস্তিত্ব নহে, কারণ ইচ্ছাকর্ত্তার বিদ্যমানতাকর্তৃক অভিলষিত দ্রব্য বাঞ্ছিত হইয়া থাকে। কর্ত্তার অস্তিত্ব তাঁহার কার্য্যের অস্তিত্ব সাপেক্ষ নহে, কিন্তু কর্ত্তার অস্তিত্ব বশতঃই কার্য্য কৃত হইয়া থাকে। তথাপি জ্ঞাতা ইচ্ছাকর্ত্তা ও কার্য্যকর্ত্তা একটী গুপ্তনিধি-সদৃশ, এবং যাবৎ মহাকাশে তাঁহার প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ না করেন, এবং জ্ঞাতবস্তু, বাঞ্ছিত বস্তু ও কৃত বস্তু কার্য্য স্বরূপে পরিণত না হয়েন, তাবৎ সর্ব্বশক্তির তাঁহাতে লুপ্তভাবে অবস্থিতি সত্ত্বেও তিনি অক্ষমের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন।

আত্মাকে কি কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়? না—ইহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ যাহা অনিশ্চিত বা সামান্য নিশ্চিত তাহাকেই প্রমাণ প্রদর্শনে অধিকতর নিশ্চিত করা যায়—সন্দেহ প্রমাণ কর্ত্তৃক দূর হইতে পারে। কিন্তু আত্মাকে কিছুতেই অধিকতর ধ্রুব করিতে পারা যায় না—ইহা স্বতই যেরূপ প্রকৃত তদপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারে না। কারণ আত্মা আদি সত্য ও চরম সত্য। সকল প্রমাণের বল ইহারই উপর নির্ভর করে, ইহা কাহারও উপর নির্ভর করে না। সকল বিচার বা তর্কের স্থলে আত্মার অস্তিত্ব প্রথমে স্বীকার্য্যরূপে গ্রহণ করা হয়; সকল তর্ক, সকল বিচার শেষ মীমাংসার জন্য আত্মারই আশ্রয় অবলম্বন করে। আমি কখনও আমার 'আমিত্ব'কে ছাড়িয়া যাইতে পারি না—কখনও আত্মা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে পারি না। "নহি কশ্চিৎ সংদিগ্ধে অহং বা নাহং বেতি॥" 'আমি আছি' ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রকৃত আমার নিকট আর নাই। 'আমি নাই' ইহা একবার চিন্তা করিতেও পারা যায় না, কারণ দ্বিতীয় শব্দটীর দ্বারা যাহা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছি, প্রথম শব্দ দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে কহিতেছি। আবার, কোন প্রমাণই আমার মনে 'আমি নাই' এ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না, কারণ আমার অভাব বা নাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে, প্রথমেই আমাকে উল্লেখ করিয়া, 'আমাকে' প্রথমে স্বীকার করিয়া বা সম্বোধন করিয়া কহিতে হইবে।

'আত্মা,' 'আমি', তাহা হইলে একটি মূল সত্য হইতেছে। আত্মা স্বকীয় আলোকে দীপ্তিমান্; এবং যিনি বিশ্বমধ্যে আপনাকে একমাত্র ধ্রুব বলিয়া জানিতেছেন, তিনি সেই স্বীয় শাশ্বতভাব-প্রভাবে আপনাকে সমস্ততঃ প্রচার

করিতেছেন। অপর সমস্ত অনুমান-সিদ্ধ। আমি ইহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি বলিয়া, ইহা হইতে আস্বাদন পাইতেছি ও আঘ্রাণ লইতেছি বলিয়া, ইহার অস্তিত্ব অনুমিত হইল। কিন্তু 'আমি আছি' "I am" এই আদি সত্য ঐরূপ অনুমান-সিদ্ধ নহে, উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানসিদ্ধ। অনুমান-সমূহ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই সকলই আত্মার আশ্রয় অপেক্ষা করে। জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মা জ্ঞাত হইলেই জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব। আত্মার চৈতন্য মধ্যেই এই জগতের বিদ্যমানতা; আত্মাতেই এবং আত্মাদ্বারাই পরিদৃশ্যমান সকলই বিদ্যমান।

বৃদ্ধের 'আমি' তাহার বাল্যকালের 'আমি' হইতে ভিন্ন নহে, যদিও বৃদ্ধ এবং বালক অপর সকল লক্ষণেই পৃথক্। 'আমিই' আমার বাল্যাবস্থায় সমুদ্রতটে খেলা করিতাম, বালিকা অবস্থায় 'আমিই' অশ্বারোহণে মাঠে দৌড়াইয়া বেড়াইতাম, 'আমিই' আমার যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় কত চিন্তা করিয়াছি, আনন্দ অনুভব করিয়াছি, ক্রন্দন করিয়াছি এবং বহুল উদ্যম করিয়াছি; সেই 'আমিই' এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় শান্তভাবে বাস করিতেছি। শৈশবাবস্থা, বালিকাবস্থা, যৌবনাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থা সকলই আমার, সকলই ক্ষণিক, ও পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু 'আমি ক্রমে সকল অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াও, পূর্ব্বে যে 'আমি' ছিলাম এক্ষণেও সেই 'আমি' আমাতে অনুভব করিতেছি। খেল্না-পরিবেষ্টিত শৈশবের সেই 'আমি' এক্ষণে চিতাশয্যাভিমুখে অগ্রসর 'আমি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেই 'আমি' জ্ঞানের প্রবাহ কোথাও ভঙ্গ হয় নাই। সেই আমি অতীত সমস্ত স্মরণ করিয়া অচলভাবে এখনও বিদ্যমান, তাহার আমিত্বের উপলব্ধি সমভাবে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রিয়া, চিন্তা, ইচ্ছা—এসকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু 'আমি' যিনি সমস্ত পরিবর্ত্তন দৃষ্টি ও অনুভব করিতেছি, তিনি সর্ব্বদাই সেই স্থানে স্থিরভাবে বর্ত্তমান, পরিণামী ঐ সকল অপরিণামী ও অপরিবর্ত্তনশীল আত্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সকল অনিত্যের মধ্যে ইহাই এক 'আমি'ই নিত্য।

সকল বিশেষ বিষয়ই তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে পারেন, কারণ কোন একটী পদার্থ সদাই তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে পারে না। তাঁহার অপরি-

ণামিত্ব এবং একত্ব প্রমাণ করিবার জন্য 'নেতি' 'নেতি' করিয়া ক্রমশঃ তাঁহা হইতে গুণের পর গুণ, অবস্থার পর অবস্থা পৃথক করিতে থাকুন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পর পর ত্যাগ করিতে করিতে পরিশেষে বিশ্ব লুপ্ত হইবে, কিন্তু সেই 'আমি' অর্থাৎ প্রত্যক্ স্বরূপ চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত তখন সকলই অপসৃত হইবে। কেবলমাত্র এক নিত্যজ্ঞান অবশিষ্ট থাকিবে—আমি-ত্বের ধ্রুবত্বমাত্র রহিয়া যাইবে। ইহা কোনও একটী নির্দিষ্ট জীব নহে—ইহা সর্ব্বব্যাপী ভূমা—পরিবর্ত্তনশীল সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র নিশ্চল প্রত্যগাত্মা।

আরও যেমন আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তেমনই আমরা দেখি যে, ইঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বে তাঁহার অনন্তের চিহ্নও রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সমুদায় ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এবং ঐ বিশ্লিষ্ট পদার্থ সমূহ কখনও একটীতে কখনও অন্যটীতে যাইয়া সংলগ্ন হয় (বিবিধ তত্ত্ব-সমূহ যে যাহার সে তাহাতে গিয়া মিশে)। কিন্তু সেই নিত্য ভূমা, সত্তাসামান্য, অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত।

(Heume) হিউম সাহেব, তাঁহার অন্তর্দর্শনে, চৈতন্যের কতকগুলি অবস্থা-মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থা কহিলেই কোন একটী বস্তু বুঝায়, যাহাতে সেই অবস্থা সংলগ্ন। তরঙ্গ-সমূহ সদাই পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তরঙ্গ কহিলেই, সমুদ্র বা মহাসমুদ্র যুগপৎ স্মৃতিপথে উদিত হইবে, যে সমুদ্রের তাহারা ক্ষণিক বা আংশিক বিকাশমাত্র—হিউম সাহেবের উক্ত বিবিধ অবস্থার মধ্যে, চৈতন্য এবং চৈতন্যের বিবিধ অবস্থামাত্র দেখা যায়—চৈতন্য নিত্যবস্তু, এবং তাহার বিকাশের জন্য নানা ক্ষণিক অবস্থা হইয়া থাকে।

তৎপরে, আমরা অবগত হইতেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার 'আমি' বা জীবাত্মা সম্বন্ধে একটী দর্শন বা জ্ঞান আছে—যাহা উপরে বর্ণিত 'আমি'র জ্ঞানের সহিত তুল্য। আমার 'আমি' আমার নিকট যেরূপ, অপর সক-লেরও 'আমি' তাহাদের প্রত্যেকের নিকট সেইরূপ নিশ্চিত ও অভ্রান্ত। তজ্জন্য কোন বাহ্যপ্রমাণ তাঁহাদের আবশ্যক হয় না; তৎসম্বন্ধে আমার নিশ্চয়তার ন্যায় তাঁহাদেরও নিশ্চয়তা। প্রত্যেকের নিকটই তাঁহার জীবাত্মার বিদ্যমানতা ধ্রুব; কিন্তু অপর জীবাত্মাসমূহ অনুমানসিদ্ধ। সক-লেই চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রত্যেকের জীবাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ স্পষ্ট সাক্ষ্য ও প্রবল প্রমাণ পাওয়াতে, আমরা একটি বৃহত্তর আত্মার বিদ্যমানতা সিদ্ধান্ত

করিতেছি—যে মহান্ আত্মায় অপর সকল আত্মাই গ্রথিত। কেবল তাহাই নহে—সেই মহান্ আত্মাই প্রত্যেক জীবাত্মা, এবং প্রত্যেক জীবই তাঁহার ন্যায় পূর্ণ, অসীম ও অনন্ত—তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেই এক বহুরূপে দৃষ্ট হয়, ও বহু একরূপে দৃষ্ট হয়। সেই মহান্ 'আমি', প্রত্যগাত্মা, অশেষ পৃথক্ জীবের সমষ্টি মাত্র। সমভাবে যিনি সকলের মধ্যে অবস্থিত, সকল জীবেই তিনি একস্বরূপ; কূটস্থনিত্য সেই বিশুদ্ধ মহানাত্মায় "সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা" উপনীত হইতে পারিলে, আমরা যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ পদার্থকে অনাত্মাতে নিক্ষেপ করি। যে সমস্ত মিশ্র, যাহা বিশেষ, যাহা 'আমি' নহে, সে সকলই অনাত্মাভুক্ত।

এই আত্মা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মতেরই এক্ষণে একবার আলোচনা করা যাউক। কারণ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শিক্ষা করিবার আছে এবং পশ্চিম হইতেও আমাদের অনেক শিখিবার আছে।

ক্লেশের অত্যন্ত নিবৃত্তিই প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র সমূহের প্রধান লক্ষ্য—উহাই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে তাঁহাদের নিকট পরিগণিত। ব্রহ্ম আনন্দময়; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে সর্ব্বপ্রকার তাপের বিনাশ হইয়া থাকে—সকল শাস্ত্রকারগণই প্রায় একবাক্যে ইহাই কহিয়া থাকেন। ক্লেশ-ক্ষয়ের নামই মোক্ষ; কারণ যতকাল পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম না হয়, ততদিন সে অবিদ্যার বশীভূত থাকায় তাহার বদ্ধাবস্থা—জ্ঞানোদয়ে সেই বন্ধন ছিন্ন হয়। যখন অজ্ঞানের নাশ হয়, যখন মানবের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়, তখনই মানব মুক্ত ও সুখী। সকল জ্ঞানই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কারণ যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহাই ব্রহ্মমায়াজড়িত; বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়—সকলই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিদ্যা, কিন্তু এগুলি অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরা বিদ্যা—উভয় বিদ্যারই উদ্দেশ্য 'ক্লেশের নাশ'। অনাত্মার মধ্যে, বহির্জ্জগতের মধ্যে আত্মানুসন্ধান, অপরা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ; কিন্তু আত্মার মধ্যে আত্মানুসন্ধানই পরা বিদ্যা:—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয় তদক্ষরমধিগম্যতে॥" কিন্তু উভয় পথেই আত্মার অন্বেষণ হয়, এবং উভয় পথেই আত্মাকে পাওয়া যায়।

প্রাচ্যদেশে এই আত্মাকে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। এই তিনটি ঈশ্বরের, প্রত্যগাত্মার ভাবমাত্র—তিনি অবিভাজ্য। পূর্ণ তিনিই জ্ঞাত হয়েন, পূর্ণ তিনিই ইচ্ছা করেন, এবং পূর্ণ তিনিই ক্রিয়া করিয়া থাকেন—ইহাতে আংশিকভাব কিছুমাত্র নাই। দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র, পবিত্র বা অপবিত্র, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লিখিত হয় নাই।

প্রতীচ্য প্রদেশে দর্শনশাস্ত্র ক্রিয়ার সহিত সংস্রব নাই—ইহা চৈতন্য অথবা মনকে বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ক্রিয়াকে ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে নিহিত করিয়াছে। সে অঞ্চলের মনীষীরা আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শাসন, উপদেশ বা পথপ্রদর্শনের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকেই যথার্থ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। জ্ঞাতার দিক্ হইতে অবলোকন করিয়া বিশ্বকে অবগত হওনই পাশ্চাত্য দর্শনের মূলচেষ্টা। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকার্য্য পশ্চাৎ ভূমিতে পড়িয়া থাকে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উক্ত দর্শনে প্রধানতঃ আত্মা ও অনাত্মার স্থান অধিকার করিয়াছে।

বার্কলি (Berkely) ও হিউম্ (Heume) দুইটী বিপরীত প্রান্ত হইতে সৃষ্টিকে অবলোকন করেন। বার্কিলি সমস্ত জড় পদার্থকে অনুভূতির মধ্যে আনিয়াছেন। তিনি কহেন,—মন জড় পদার্থ অনুভব করে বলিয়া, জড় পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার মত :—"Without is within."

হিউম্ সেই মতের সম্পূর্ণ বিপরীতভাব পোষণ করেন—তিনি কহেন, জড় পদার্থ হইতেই সমস্ত, মন তাহা হইতে উৎপন্ন—তাঁহার মত :—"Within is without."

আসুন আমরা প্রতীচ্য অঞ্চলে যেস্থানে এই প্রশ্ন যথাতথ গৃহীত ও আয়ত্ত হইয়াছে, সেই জার্ম্মনিদেশে যাইয়া সেখানকার মনীষিগণ কি প্রণালীতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহা একবার দেখি।

(Kant) ক্যাণ্ট, আরও কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া, মন ও জড়পদার্থের পশ্চাতে গমন করিয়া দুইটী মূলকারণ স্থির করিয়াছেন, ঐ দুইটীকে তিনি "Thing-in-itself" নাম দিয়াছেন—তাঁহার মতে মনের পশ্চাতে একটী ও জড়পদার্থের পশ্চাতে অপরটী অবস্থিত। (এখানে আমরা

'আত্মা' 'অনাত্মা' পরিত্যাগ করিয়া, তদপেক্ষা অল্পতর সন্তোষজনক দুইটী শব্দ 'মন' ও "'জড়পদার্থ' লইতে বাধ্য হইয়াছি।) মনের পশ্চাতে যে মূল কারণ অবস্থিত, তাহা হইতে নিয়ম ও রূপসমূহ প্রসূত হয়, এবং জড়পদার্থের পশ্চাতে যে অপরটী বিদ্যমান, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ বাহির হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মূলকারণটী হইতে প্রবাহরূপে জড়পদার্থ চালিত হইয়া প্রথম মূলকারণটী কর্তৃক নির্ম্মিত আদর্শ-অবয়বগুলিতে পতিত হয়; এবং তাহাদের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে মন ও দৃশ্যমান পদার্থসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্যাণ্টের জীবনের শেষ দশায় তাঁহার মনে একটী অস্পষ্ট ভাবের উদয় হইয়াছিল—তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, মনের পশ্চাতে যে মূলকারণ ব্যবস্থিত তাহাই (Ego) আত্মা, সকল নিয়মের নিয়মস্বরূপ; এবং যদি সেই আত্মা হইতে সকল নিয়ম প্রসূত হয়, তাহা হইলে তিনিই একমাত্র মূলকারণ হইতে পারেন। কিন্তু ক্যাণ্ট এই সম্বন্ধে চরম মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

(Hegel) হেগেল এই বিশ্বকে একটী দ্বন্দ্বে পরিণত করেন—"Being and Nothing—better Not-Being."—সৎ ও অসৎ। * তিনি দেখেন যে দ্বন্দ্বের প্রতি পার্শ্বের ভিতর তাহার অপর পার্শ্বটি বর্ত্তমান; এবং তাহারা উভয়ই পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়া একত্র মিশিলে, একীভূত হইলে, দ্বন্দ্বাতীত এক পূর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অসতে সতের পতন অর্থাৎ অসতের সহিত সতের সংযোগ, এবং তাহাদের পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতেই প্রবাহরূপ সৃষ্টি-প্রকরণ চলিতেছে। ইহাতে তিনি (Schelling's) শেলীংএর দ্বন্দ্ব-নিয়ম (Law of Relitivity) অবলম্বন করেন—যাহাতে প্রকাশ আছে যে, কেহ এক বস্তুর বিরোধী বস্তুটী না ভাবিয়া সেই বস্তুটী চিন্তা করিতে পারে না; যদ্যপি 'পশ্চাৎ' বলা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'সম্মুখ'এর ভাবও মনে উদয় হইয়া থাকে—একটী পরিত্যাগ করিয়া অপরটী কেহ ভাবিতে পারে না—উভয়ই একত্রে মনে উদিত হইবে।

---

* ইহার অর্থ শূন্য করিলে গোলযোগ বাধে তজ্জন্য 'অসৎ' দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম-সদসতের পর শূন্য implies change এই একরূপ আছে, পরক্ষণেই তাহা নাই, সুতরাং ঐ পরিবর্ত্তন অসতেই বর্ত্তে।

কান্ত তিনি সর্ব্বদ্বন্দ্ব একত্রে মিশ্রিত করিয়া (Hamilton বা Mausel এর ন্যায়) পূর্ণব্রহ্মের অপরপার্শ্বরূপে—বিরোধী অঙ্গরূপে—তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, নূতন কোন বিরোধিযুগ্ম প্রস্তুত করেন নাই—হেগেলের এই ভ্রম হয় নাই। তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, ব্রহ্ম (absolute) সৃষ্টির অতিরিক্ত কোন বস্তু নহেন, কিন্তু সকলেরই মধ্যে প্রবিষ্ট, এবং সকল দ্বন্দ্ব পরস্পর বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া, মিশিয়া একীভাবাপন্ন হইলে সে সকলের সমষ্টিভূত যিনি অবশিষ্ট মাত্র থাকেন, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম।

(Fichte) ফিকটে যদিও হেগেলের কিছুপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ভাবসমূহ হেগেল অপেক্ষা উচ্চতর ছিল, কারণ তিনি চলিত মত ও বিশ্বাসের বন্ধন অতিক্রম করিয়া আত্মাই (Ego) মূল সত্য, এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন—যাহা দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচ্য-দৃঢ়ভূমি। যিনি এক এবং সর্ব্বময়, তিনিই আত্মা (The Ego); অনাত্মা (The Non-Ego) নানা বিশেষের সমষ্টি। তাঁহার Ego and Non-Ego স্পষ্টই আমাদের আত্মা ও অনাত্মা বা Self and Not-self। তিনি তিনটি পদে সৃষ্টিরচনা বিন্যস্ত করিয়াছেন,—

১। Ego=Ego. আত্মা তাঁহার নিজেরই সমান—আত্মার সহিত আত্মারই অভেদতা ও অনন্যতা।

২। Non-Ego is not=Ego. অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে, তাহাই অনাত্মা।

৩। Ego in part=Non-Ego—আত্মা আংশিকরূপে অনাত্মা হয়েন। Non-Ego in part=Ego—অনাত্মাও কিয়ৎপরিমাণে আত্মবৎ হইয়া থাকেন।

এই তৃতীয় পদ বা বাক্য দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, যখন আত্মা অনাত্মার কিয়দংশ গ্রহণ করেন, এবং অনাত্মাও আত্মার অংশ কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করে, তখনই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে—তখনই হেগেলের উক্ত 'Becoming' সৃষ্টিপ্রকরণ আরম্ভ হয়। ফিকটে দেখেন যে, আত্মা অনাত্মার ধর্ম্ম সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করায়, এবং অনাত্মাও সামান্য পরিমাণে আত্মার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায় এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। বিশেষ সমূহ এই মিশ্রণ হইতে

উৎপন্ন—বিশ্বচরাচর উহাদের উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ামাত্র। ফিক্‌টে আরও অল্প অগ্রসর হইয়া উক্ত দুইটীর সহিত বিশ্বোদ্ভবের আর একটি তৃতীয় কারণ যোগ করিলেই তাঁহার মত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিত—তাঁহার মতে একটী অভাব রহিয়া গিয়াছে—বিশ্ব দ্বন্দ্ব-সম্ভূত নহে, কিন্তু ত্রিতয় হইতে হইয়াছে। আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর সংযোগকারীর নিতান্ত প্রয়োজন—আত্মা একক কিছুই করেন না, এবং অনাত্মাও আপনা হইতে কিছু করিতে অক্ষম। তৃতীয় অপর একটী উভয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিলেই বিশ্বরচনা সম্ভবে। ঐ শক্তির সাহায্যে আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে যে, ফিক্‌টের (Ego) মহান্‌ আত্মা (বাস্তবিক প্রত্যগাত্মা) জীবাত্মার সহিত তুল্য ও এক। এই উপলব্ধি হইলেই লোকে মানবের অনন্তের প্রত্যয়স্বরূপ "সোঽহং" এই মহাবাক্য দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচনা-কাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত আধুনিক লেখকগণ আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের রচনাকাল নির্ণয় করিতেছেন। এই সমস্ত লেখকগণের সিদ্ধান্ত দ্বারা অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থই আধুনিক কালে রচিত বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, আমরা ঐতিহাসিক-সময়-নির্ণয়বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত কোনও কথা আছে কি না, তাহা চিন্তা করিয়াও দেখি না।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা" নামক ইংরাজীগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন, "শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ রচিত হওয়ার বহুশত বর্ষ পরে রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বোপদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী বোপদেবের আবির্ভাবকাল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লইয়া বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের মধ্যে অনেক কলহ হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের যেমন ভাগবত পুরাণ আছে,

শাক্তদিগের তেমনি দেবী-ভাগবত পুরাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই-বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থখানিই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী জানিতেন যে, এই ভাগবত পুরাণ লইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ আছে, এই জন্য তিনি প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, 'এই ভাগবত পুরাণ ব্যতীত অন্য ভাগবত পুরাণ আছে, এরূপ সন্দেহ যেন কেহ না করেন।' শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যৎকালে এইরূপ ধর্ম্মকলহ চলিতেছিল, তৎকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ অনেক গ্রন্থ উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রমাণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের রচনা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য পুরাণ হইতে গৃহীত।"

পূর্ব্বোক্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, লেখক নিম্নলিখিত কারণ-সমূহ হইতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বলিত ভাগবত পুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা।

প্রথমতঃ অনেকে বলেন বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা। ইতিহাস অনুসারে বোপদেব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় শাক্তদিগেরও উক্তরূপ পুরাণ রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, এই পুরাণ ব্যতীত অন্য ভাগবত পুরাণ আছে, এরূপ সন্দেহ যেন কেহ না করেন। চতুর্থতঃ শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকালে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল সেই বিরোধের সময় রচিত আরও অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথম কথা এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বোপদেব ভাগবতের রচয়িতা নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একজন টীকাকার মাত্র। দেবগিরির রাজা মহাদেব ১২৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র ১২৭১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। হেমাদ্রি এই উভয় নৃপতির সচিব ছিলেন। বোপদেব হেমাদ্রির বন্ধু। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রণীত দাক্ষিণাত্যের

ইতিহাসে এই বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাদিগের নাম (১) হরিলীলামৃত (২) মুক্তিফল, (৩) পরমহংস-প্রিয়। গুজরাটি নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইচ্ছারাম সূর্য্যরাম তৎপ্রকাশিত গুজরাটি ভাগবত গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী এই হরিলীলামৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকায় তিনি হরিলীলামৃত গ্রন্থকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হরিলীলামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি-হেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥

অর্থাৎ মন্ত্রী হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য পণ্ডিত বোপদেব কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্কন্ধ ও অধ্যায় সমূহের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা নহেন।

বোপদেব-প্রণীত হরিলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন ইহাও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বিদ্যমান ও বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় একরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে, পদ্মপুরাণ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে, শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণ এক সময়েই রচিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, মহারাজ পরীক্ষিত ইহার শ্রোতা, শুকদেব ইহার বক্তা। মহাভারতের বীর অর্জ্জুন; ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, মহারাজ পরীক্ষিত তাঁহার পৌত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা শেষ করেন, সেই সময় হইতেই কল্যব্দের গণনা আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতিও এই সময়ে পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। পরীক্ষিত সিংহাসনারোহণ করিয়া, যুধিষ্ঠিরাব্দ নামক এক অব্দ প্রচলন করেন। যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কল্যব্দের প্রচলন সমকালীন। কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রাগৈতিহাসিক অতীত কাল হইতেই হিন্দুদিগের পঞ্জিকা সমূহে লিখিত হইয়া আসিতেছে।

প্রত্যেক বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু-পঞ্জিকা লিখিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত গুলিতেই কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ আছে। এই প্রমাণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথায় উপেক্ষা করা যুক্তিপ্রধান সুস্থচিত্ততার পরিচায়ক নহে। একথা কেহই কখন সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, কোনও সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সকলে পরামর্শ করিয়া এই কল্যব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দে একহাজার বৎসর বা বারশত বৎসর যোগ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং পঞ্জিকায় উল্লিখিত কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ যে, যথার্থ তাহা স্বীকার করাই সঙ্গত। এই কথায় অবশ্য অনেকেই আস্থা প্রকাশ করিবেন না, পাশ্চাত্য মনীষিগণের গবেষণা দ্বারা মুগ্ধ অনেক সুধীই হয়ত উপেক্ষা ও উপহাস করিবেন, কিন্তু সত্যই সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয় বলিয়া একথা আমাদিগকে একেবারে অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, ভারতবর্ষেয় ইতিহাস রচনায় এই কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের উপর আমাদের সর্ব্বথা আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। রাজাদিগের বা আচার্য্যদিগের বংশাবলী বা গুরুপ্রণালীর নামোল্লেখে হয়ত অনেক নাম কাল-প্রভাবে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, হয়ত বা কোন কোন স্থলে ভুলক্রমে দুএকটি নূতন নাম যোজিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই উপরোক্ত অব্দ দুইটির গণনায় এ প্রকারের দোষ প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। এখন কল্যব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ ৫০১০ চলিতেছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিশ বৎসর কাল প্রজাপালন করেন। পরীক্ষিত ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সিংহাসনারোহণ করেন, ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে ভাগবতপুরাণের অস্তিত্ব অসংশয়িত। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক যে, ৪৯০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা, এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোনই প্রমাণ নাই।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন যে, মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। আমরা এ মতকেও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় খৃষ্ট জন্মের তিন

হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারত গ্রন্থ যে, জন্মেজয়কে শ্রবণ করান হইয়াছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এই মহাভারত গ্রন্থও যে, ৪৯০০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকালের আধুনিকত্ব প্রমাণে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, "শাক্তদিগেরও অনুরূপ পুরাণ রহিয়াছে।" কিন্তু শাক্ত-সম্প্রদায়ের অনুরূপ গ্রন্থ আছে বলিয়া, ভাগবতরচনার আধুনিকত্ব কিরূপে প্রমাণীকৃত হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

শ্রীযুক্ত ইচ্ছারাম তৎপ্রকাশিত ভাগবতগ্রন্থের ভূমিকায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দেবীভাগবত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের রচনা।

গুজরাটের সম্রাট্ সিদ্ধরাজ সিদ্ধপুরে রুদ্রমেলা-নামক এক মেলা স্থাপন করেন। তাঁহার মাতা মেনাল দেবীর এই সময়ে শ্রাদ্ধ হয়। তিনি তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ১০৮ খানি হস্তলিখিত ভাগবতগ্রন্থ দান করেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে একখানি সংগৃহীত হইয়া, পুণানগরীর সরকারী পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। এই পুঁথিখানি ১১৫০ সম্বতে লিখিত হয়।

সে সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যদ্যপি আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইত, ঐ গ্রন্থ যদি তৎকালে সর্ব্বজনমান্য না হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ উহা দান-স্বরূপে কদাচ গ্রহণ করিতেন না। এই পুঁথিখানি ১১৫০ সম্বৎ অর্থাৎ ১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়; ইহা হইতে অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বোপদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত বিরচিত হইয়াছিল।

ভাগবতের আধুনিকত্ব প্রমাণের তৃতীয় যুক্তি এই যে, টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—"এই পুরাণ ব্যতীত ভাগবত নামক অন্য পুরাণ আছে, ইহা যেন কেহ সন্দেহ না করেন।" এ যুক্তিও বেশ সমীচীন বোধ হইতেছে না। আমরা এরূপ সন্দেহও করিতে পারি যে, শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বোক্ত উক্তির লেখক আদ্যন্ত অর্থবিচার করেন নাই।

শ্রীধরস্বামী প্রথমে বলিতেছেন যে, এই ভাগবত পুরাণ গায়ত্রীর অর্থ লইয়া আরব্ধ বলিয়া, ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা যাইতে পারে। তদনন্তর তিনি

মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত ভাগবতের সংজ্ঞা প্রদান করিতেছেন। তাহা এই "যে গ্রন্থ গায়ত্রী লইয়া আরব্ধ, যাহাতে ধর্ম্ম বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যান আছে, তাহাই ভাগবত।" গরুড় পুরাণে ভাগবতের যে সংজ্ঞা আছে, শ্রীধরস্বামী তাহাও প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই; "যে গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত, যাহাতে ১৮০০০ শ্লোক আছে, যাহাতে বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যান, ও হয়গ্রীব-প্রচারিত ব্রহ্মবিদ্যা আছে এবং যাহার আরম্ভে গায়ত্রী, তাহাই পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভাগবত নামে অভিহিত।"

পদ্মপুরাণে গৌতম অম্বরীষকে বলিতেছেন "শুকদেব-বর্ণিত ভাগবত শ্রবণ কর, যদি তুমি সংসার হইতে অব্যাহতি চাও, তবে এই ভাগবতশাস্ত্র কীর্ত্তন কর।"

শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণনা প্রদান করার পর বলিতেছেন যে, তিনি যে শাস্ত্রের টীকা রচনা করিতেছেন, তাহাই ভাগবত শাস্ত্র, এই শাস্ত্র ব্যতীত অন্য ভাগবত শাস্ত্র আছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। "ভাগবত" শব্দের অর্থ "ভগবানবিষয়ক" ভগবান বলিতে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঋষিদিগকেও বুঝায়। শ্রীধর স্বামী যৎকালে ভাগবতের টীকা রচনা করেন, তখন শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে কোনরূপ ধর্ম্ম কলহ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীধর স্বামীর উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সময়ে 'ভাগবত' নামে অভিহিত আরও গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় না যে, ভাগবতের রচনা আধুনিক। শাক্তগণ তাঁহাদের পুরাণকে ভাগবত বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, শুকদেব-কথিত এই পুরাণ আধুনিক কালের রচনা।

শ্রীধর স্বামীর সময়ে প্রচলিত শাক্ত বৈষ্ণবদিগের কলহের প্রমাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় উইলসন, সাহেবের মতানুবর্ত্তনে যে তিন খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীধর স্বামীর সময় সেগুলি বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। এই গ্রন্থত্রয় একশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবকাল শ্রীযুক্ত ইচ্ছারামের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী; আমরা মনে করি শ্রীধর স্বামী সহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোক। দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীধর স্বামীর টীকা শ্রীমচ্চৈতন্যদেবের সময় ভারতে

সর্ব্বজন-স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। টীকার এই ভারতব্যাপী খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বোক্ত শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধমূলক গ্রন্থত্রয়ের শ্রীধর স্বামীর সময়ে অস্তিত্ব যখন ঈদৃশ সংশয়বিশিষ্ট, তখন শ্রীধর স্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য যে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের সহিত শ্রীধর স্বামীর কোনই সম্বন্ধ নাই। 'ভগবান' শব্দের বিবিধ অর্থ আছে, একটি বিশিষ্ট অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই শ্রীধর স্বামী পূর্ব্বোক্ত রূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি ভাগবত গ্রন্থের যে সমস্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রাচীন।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ নহে, অথচ শ্রীধর স্বামী ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধর স্বামীর সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য বিশেষ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন।

শ্রীমদ্ভাগবত শুদ্ধাদ্বৈত মতের গ্রন্থ। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বামী এই মতের প্রবর্ত্তক। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য এই মত বিশেষভাবে প্রচার করেন।

শ্রীধর স্বামী অদ্বৈত মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহার হৃদয় যে, ভক্তিপ্রবণ ছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই ভক্তিপ্রবণতা নিবন্ধনই তিনি বিশাল ভাগবত শাস্ত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামীর মত বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্যের মত হইতে পৃথক্, এই জন্য শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বীদিগের নিকট শ্রীধর স্বামীর টীকা তত মূল্যবান্ নহে। বল্লভ কর্ত্তৃক লিখিত 'সুবোধিনী' নামক টীকা এবং রামানুজ ও কৃষ্ণচৈতন্যের মতাবলম্বী অন্যান্য টীকাকারগণের টীকাই শুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্বিগণের নিকট বিশেষ মূল্যবান। শ্রীধর স্বামীর নিকট যখন শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, অথচ তিনি যখন তাহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন এই ভাগবতের প্রাচীনত্ব এবং ইহাই যে, শুকদেব কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট কথিত হইয়াছিল, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তনে অনেক দেশীয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক কালের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সেই সমস্ত প্রমাণ মোটেই শ্রদ্ধেয় নহে।

অমর সিংহ কালিদাসের সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। অমরসিংহ যখন পুরাণের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তখন ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে অমরসিংহের সময়ে একাধিক পুরাণ প্রচলিত ছিল। এক প্রকারের অনেক বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে, সাধারণ সংজ্ঞা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না। অমর সিংহ পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) স্বর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, (৪) মন্বন্তর, (৫) সংস্থান। শ্রীমদ্ভাগবতের দশটি লক্ষণ এইরূপ (১) সর্গ, (২) বিসর্গ, (৩) স্থান, (৪) পোষণ, (৫) উতি, (৬) মন্বন্তর, (৭) ঈশানুকথা, (৮) নিরোধ, (৯) মুক্তি, (১০) আশ্রয়। বিসর্গ ও প্রতিসর্গ এবং সংস্থান ও স্থান একই কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অমরসিংহ কর্ত্তৃক উল্লিখিত সমুদয় লক্ষণই শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে।

আর এক কথা, অমরসিংহ পুরাণের সংজ্ঞা দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় মহাপুরাণের সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই।

এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। অমর সিংহ জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের আদেশে তাঁহার রচিত এক কোষ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয়। এই কোষ গ্রন্থের টীকা বা শেষ অংশ যে নষ্ট হয় নাই এবং আমরা এই কোষ গ্রন্থ যে, অবিকৃত অবস্থায় পাইয়াছি, তাহার প্রমাণ কি ?

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল লিখিতেছেন যে, ধারোয়ারে ইবল্লি-নামক এক শিবমন্দিরে ৫১৪ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, ৩৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়।

এই যুদ্ধ, কোন, যুদ্ধ ? সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠির যে সময়ে রাজসূয় যজ্ঞ, করেন, সেই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা সেই যুদ্ধের কথা। যজ্ঞের কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির বনগমন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতীত হয়। তাহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তাহার পর যুধিষ্ঠিরের রাজ-

সিংহাসনারোহণ ও ৩০ বৎসর রাজত্ব। তাহার পর যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ এবং সেই সময়ে কল্যব্দের ও যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ। পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিখানি ১৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ১৩২৫ এর স'হত ৩৭৩০ যোগ করিয়া যোগফল হইতে ৪৫ বাদ দিলে বর্ত্তমান কলিযুগের পরিমাণ অর্থাৎ ৫০১০ পাওয়া যাইতেছে।

এই সমস্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে ভাগবত গ্রন্থ পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয় তাহা ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় তাঁহার ভূমিকার আর এক স্থলে লি'খতেছেন—"পাণিনির ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় যে, কৃষ্ণ তখন ভারতবর্ষে উপাস্যরূপে গৃহীত এবং মহাভারতও তখন সুপরিচিত, সুতরাং পাণিনি-রচনার এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল অথবা মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে অনুমান করা যাইতে পারে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দী পাণিনির আবির্ভাব কাল। সে সময়ে মহাভারত ভারতের গৃহে গৃহে পঠিত ও শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন, এতদুভয়ের যখন ঈদৃশ বিস্তার, প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে তখন পাণিনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেড় শত বৎসর মাত্র পিছাইয়া মহাভারতের রচনাকাল অথবা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নিরূপণ করা কি সঙ্গত? যখন কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতির নাম মেঘদূত, মৃচ্ছকটিক, পাতঞ্জলির পাণিনি-ভাষ্য, গৃহ্যসূত্র, কাত্যায়নের বার্ত্তিক, মেগেস্থিনিসের বিবরণ, ললিত বিস্তার, ছান্দোগ্য উপনিষদ, বেদের আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন কি মহাভারত, কি ভাগবত যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা এরূপ যুক্তিযুক্ত নহে।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া যশোদা তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন, এরূপ উপাখ্যান এক ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন পুরাণে দৃষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই ঘটনা অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুতরাং এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে, শঙ্করাচার্য্যের সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল এক স্থলে বলিতেছেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি আর একস্থলে বলিতেছেন যে, এই যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে সংঘটিত হয়। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, লেখক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের দ্বারা এরূপ অন্ধভাবে কেন পরিচালিত হইতেছেন। তিনি ধারোয়ারে প্রাপ্ত শিলালিপি ও হিন্দু পঞ্জিকা সমূহের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারিতেন যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সমস্ত ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কথা বলাই সঙ্গত।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাভারতের সময়ের গ্রহ সমূহের অবস্থিতি-বিষয়ক কয়েকটি সন্দেহজনক শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিতেছেন, এরূপ করার কোনই কারণ নাই।

ইউরোপীয়দিগের অতি প্রাচীন সাহিত্য একেবারেই নাই। সেই জন্য তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কল্পনাও করিতে পারেন না যে, ভারতবর্ষে এত প্রাচীনকালে সাহিত্য ছিল, এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রসমূহকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা বলিয়া প্রতিপাদন করিতে তাঁহাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা। অন্ধ ভক্তির সহিত সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তন না করিয়া, আমাদের যাহা চিরকালের বিশ্বাস এবং আমাদের নিকট যাহা সত্য ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, সাহস পূর্ব্বক তাহা বলিয়া ফেলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আর এক কথা; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেকবি সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং হিন্দু গ্রন্থগুলি যে অতি প্রাচীন, তাঁহারা প্রথমে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রাচীন, তাঁহারা ক্রমশঃই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। গোবিন্দাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনেক পুরাণ ও ইতিহাস খুব সম্ভবতঃ বেদের সহিত এক সময়েই বিদ্যমান ছিল। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থের অবধারণ করিবে, নতুবা বেদার্থের উপলব্ধি হইবে না। শ্রীযুক্ত গোবিন্দাচার্য্য

তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে. পুরাণে বিশ্বজগতের যে সমস্ত ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় বেদের ন্যায় প্রাচীন।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বিরুনি ভারতবর্ষের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আঠারখানি পুরাণের উল্লেখ আছে। এই সকলের মধ্যে তিনখানি পুরাণ আল্‌বিরুনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; সে সময়েও লোকে বিশ্বাস করিত যে, এই সমস্ত পুরাণ স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট ৬২০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েন, তিনিও অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং পুরাণ সমূহের প্রসিদ্ধি আরও চারি শতাব্দী অতীতের দিকে চলিয়া যাইতেছে। বাণভট্ট বায়ুপুরাণ পাঠ শুনিয়াছিলেন। ডাক্তার বুলার বলেন যে, বাণভট্ট অগ্নি, ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত পরিচিত ছিলেন ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গুপ্ত রাজগণের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পুরাণ সমূহ তাহাদিগের বর্ত্তমান আকারে সর্ব্বপ্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য যে সমস্ত পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা একটী অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করেন নাই। যিনি বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা এই সমস্ত শাস্ত্র অতি উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অপ্রত্যক্ষ সত্য সম্বন্ধে তাঁহার একটা বিশেষরূপ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। গত ৫ হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার নিকট দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ উভয়েই তুল্যরূপে স্পষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যে সমস্ত অধ্যাত্মরত্ন নিহিত আছে, তাহার তুলনা, এরূপ যোগশক্তি-সম্পন্না অন্তর্দৃষ্টি, অত্যন্ত বিরল। ভারতবর্ষে তাহার পর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভ, প্রভৃতি দার্শনিক, কালিদাসের ন্যায় কবি, পাণিনির ন্যায় বৈয়াকরণ ও পতঞ্জলির ন্যায় যোগীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ইহারা কেহই শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতার সহিত তুলনার যোগ্য নহেন। একটু সূক্ষ্মভাবে এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে

যে, এই গ্রন্থ রত্ন ত্রিকালজ্ঞ ব্যাস ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নহে এবং ইহা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ইচ্ছারাম তৎসম্পাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই ভাগবত শাস্ত্রের ষাট প্রকারেরও অধিক টীকা প্রচলিত আছে। তিনি এই সকলের মধ্যে ৩৯ প্রকার টীকার নাম করিয়াছেন। বৃন্দাবন ধাম হইতে যে ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আট প্রকারের টীকা আছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত টীকাগুলি উল্লেখ যোগ্য।

১। টীকাকার হনুমানজি, টীকার নাম হনুমতি।

২। টীকাকার শঙ্করাচার্য্য টীকার নাম শঙ্করী।

৩। টীকাকার চিৎসুখাচার্য্য ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার প্রণীত টীকার নাম চিৎসুখী।

৪। টীকাকার মাধবাচার্য্য টীকার নাম ভাগবত-তাৎপর্য্য।

৫। টীকাকার নিম্বারক—টীকার নাম নিম্বারকীয়।

৬। টীকাকার মধুসূদন—টীকার নাম মধুসূদনী।

এই সমস্ত প্রাচীন টীকা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, এই ভাগবত শাস্ত্র কত প্রাচীন। পক্ষান্তরে দেবী ভাগবতের কেবল মাত্র একখানি টীকা আছে। এই টীকাকারের নাম নীলকণ্ঠ, তিনি ষাইট বৎসর পূর্ব্বের লোক।

উইল্‌সন্ সাহেব প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহের যে রচনাকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। অধ্যাপক উইল্‌সন্, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কেবল কয়েকখানি মাত্র স্বয়ং তাড়াতাড়ি দেখিয়াছেন। দুই স্থান হইতে তিনি তাঁহার রচনার উপকরণ সমূহ পাইয়াছিলেন।

তিনি যে দুইখানি গ্রন্থ হইতে উপকরণ লইয়াছিলেন, সেই দুইখানি গ্রন্থ পারস্য ভাষায় রচিত; তবে গ্রন্থকারগণ হিন্দু। প্রথমখানি কাশীর রাজার মুন্সি শীতল সিং কর্ত্তৃক লিখিত। দ্বিতীয়খানি কাশী-হিন্দু-কলেজের ভূতপূর্ব্ব

গ্রন্থরক্ষক মথুরানাথ কর্ত্তৃক লিখিত। এই দুইজন লেখকের কৃতিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ উপকরণ হইতে যে মত গঠিত, তাহা অবিসম্বাদে কথনই গ্রহণীয় নহে।

এই কারণে ভাগবত পুরাণ যে, আধুনিক যুগে বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, অথবা ইহা যে অন্য কোন আধুনিক লেখকের হস্ত হইতে নিস্সৃত নহে তাহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ রত্ন, এই 'নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল' 'শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রব-সংযুক্ত' এই সাত্বত-সংহিতা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের রচনা এবং পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবই ইহার রচয়িতা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ,।

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক।

একদিন প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ ও রামরায়, শ্রবণ কর, কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনই পরম উপায়। কলিকালে যিনি সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"
"নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্——

"চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

যাহা মানস-মুকুরের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসার-রূপ দাবানলের নিবারক, যাহা পরম-শ্রেয়ঃ-সাধনস্বরূপ কুমুদদলের সম্বন্ধে জ্যোৎস্না-সদৃশ, যাহা পরম-বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহার শ্রবণে সুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহা পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে, যাহা আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্নান করাইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে, সেই শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপসংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্——

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার ঈদৃশী করুণা যে, তুমি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন বাঞ্ছা অনুসারে বহু নামের প্রচার করিয়াছ, আর ঐ সকল নামে তোমার নিজের সকল শক্তিই নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার সেই সকল নামের স্মরণে কাল নিয়মও কর নাই। সকল সময়েই নাম লইতে পারা যায়। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে, সেই নামে অনুরাগ জন্মিল না।

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ হইয়া, সদা শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবের সম্মান দিবে জানি অধিষ্ঠান॥
এই মতে হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করিনা, কেবল জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করি।

"ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌——

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥"

হে নন্দনন্দন, আমি তোমার কিঙ্কর, বিষম ভাব-সাগরে নিমগ্ন; আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থ ধূলিকণার ন্যায় ভাবিয়া নিজ দাস্যে অঙ্গীকার কর।

তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌——

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

প্রভো! কবে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, মুখে বাক্যরুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলক-কদম্বে বিভূষিত হইবে?

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোর দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিরহ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করি প্রলাপন॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

হায় হায়! গোবিন্দ বিরহে নিমেষ কালও আমার পক্ষে যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে; নেত্র দিয়া বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি।

"দিবস না যায় ক্ষণে হৈল যুগ সম।
বর্ষামেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য দেখি ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈয়া করে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেম ভাবে করিল উদয়॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঁঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে শ্রীরাধার মন স্থির হৈল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥
সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তৈছে আপনি হইল॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

হে সখি, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চরণরতা কিঙ্করীই করুন, বা মহাকষ্টে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, কিম্বা তিনি স্বয়ং বহু নারীবল্লভ হইয়া যেখানে সেখানে যে কোন রমণীর সহিতই বিহার করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ আমার প্রাণনাথ নহে। যথারাগ—

আমি কৃষ্ণ-পদ দাসী, তেঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কি বা না দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে, শুন মোর নিশ্চয়।
কিবা অনুরূপ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ ধ্রু
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তেঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোর দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
নাগণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।—
মোরে যদি দিলে দুখ, তাঁর হইল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপেতে সতৃষ্ণ
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি লঞা যাঙ হাতে ধরি
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী।
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ'
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথা যোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥

সেই নারী জীয়ে কেনে,　　　　কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি জানে,
　　তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে লাভ,　　　　পড়ুক তার শিরে বাজ,
　　কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে,　　　　কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
　　কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা,　　　　তার সেবাদাসী হঞা
　　তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী,　　　　পতিব্রতা শিরোমণি,
　　পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি　　　　জীয়াইয়ে মৃতপতি,
　　তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেশ।
কৃষ্ণ মোর জীবন　　　　কৃষ্ণ মোর প্রাণ-ধন,
　　কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ,　　　　সেবা করি সুখী করোঁ,
　　এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে　　　　কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
　　অতএব দেহ দেহদান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি,　　　　কহে মোরে প্রাণেশ্বরী,
　　মোর হয় দাসী অভিমান॥
কান্তা সেবা সুখপূর　　　　সঙ্গম হইতে সুমধুর,
　　তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি,　　　　তবু পদ-সেবায় মতি,
　　সেবাকরে দাসী অভিমানী॥
এই রাধার বচন　　　　শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ
　　আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায়।
ভাবে মন নহে স্থির,　　　　সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
　　মন দেহ ধারয় না যায়॥

ব্রজেশ্বর শুদ্ধি প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।
স্বপ্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥"

অতঃপর একদিন রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পদনখে আঘাত লাগিল, উক্ত আঘাতকে ছল করিয়া, প্রভু লোকলীলা সংবরণের অভিলাষ করিলেন। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ জ্বরভাব প্রকাশ পাইল। প্রভু প্রাতঃকালে জগন্নাথকে দর্শন করিতে গেলেন; আর ফিরিলেন না। কেহ বলেন, আকাশপথে প্রয়াণ করিলেন। কেহ বলেন, প্রভু জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহেই, নিজ বিগ্রহকে অন্তর্ধাপিত করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহে অন্তর্হিত হইলেন।



ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। ৮ম সংখ্যা।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১

নাদ অনাহত, তুমি
করিবে শ্রবণ ?
স্মৃতিতে রাখিবে তারে
করিয়া ধারণ ?
অন্তরের আত্মা যিনি,
গুহাহিত তোমার অন্তরে,
যেই ভাষা ধ্বনি-হীন
নিশি দিন কহেন তোমারে,—

সাধ যদি হয় তব,
তার মর্ম্ম করিতে গ্রহণ,
আত্মারে তোমার, শিষ্য,
তাঁর সনে করাও মিলন ;
যেমন মিশিয়া থাকে
গঠনের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে,
পুত্তলিকা অবয়ব,
তার সেই গঠকের মনে।

১২

তখন সে জীবাত্মা তোমার,
পাইবে শুনিতে সেই
মধুময় স্বর ;
বুঝিয়া সে ভাব রাশি যত,
রাখিতে পারিবে ধরি'
স্মৃতির ভিতর।

১৩

শুনিবেন সাধক তখন,
তবে সেই অন্তর মাঝারে,
ব্রহ্মময় অনাহত নাদ,
কহিছেন এই মত তাঁরে।

১৪

নাদরূপী পরমাত্মা কহিছেন ডাকি,—
"শুন শিষ্য, শুন শুন্, ধীর ভাবে থাকি,—
যবে প্রাণ—রবির কিরণে,
অবগাহি আমিত্ব তোমার,
ক্রীড়া করি প্রফুল্লিত মনে,
হাসিবেক তুলিয়া লহর ;

যবে তব জড়-মাংস-পিঞ্জর মাঝারে,
জীবরূপী পাখী, বন্দি ভাবে থাকি,
পুলকে গাহিবে গান সুমধুর স্বরে;
প্রকৃতির মায়া দুর্গে আবদ্ধ থাকিয়া
সে আত্মা তোমার,
যবে শোকে করিবেক অশ্রু বরিষণ;
মোর সনে স্বর্গ-সূত্রে অপূর্ব্ব বন্ধন
আছে যাহা তার,
(আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-মোহে মোর প্রীতি ভুলে,)
নানা চেষ্টা করিবেক ছিঁড়িতে যখন;
তখন জানিও শিষ্য তব মন-ভূমি,
পৃথিবীতে মিশে আছে, পৃথিবীরি তুমি।

১৫

'জগতের বহুভাসে সত্ত্ব জাগরিত তোমার আত্মার
যদি তালে বেজে উঠে প্রাণ;
মহামায়া-মায়ায় মোহিত, বৈখরীর অতি ভীমনাদ,
তব মনে পায় যদি স্থান;
যন্ত্রণার তপ্ত অশ্রুধারা, তাপিতের ভীষণ ক্রন্দন,
সেই চিত্র করিয়া দর্শন,
মহা ভয়ে জড় সড় হ'য়ে　ভুলে গিয়া আধার তাহার,—
শান্ত নিত্য জীবের আলয়,—
নিজ শান্তি খুঁজিবারে মন,　অহংভাবে হয় নিমগন;
তা'হলে জানিও শিষ্য তুমি,　পীঠ তব বড়ই মলিন,
হয় নাই আধার এখন,
মোর ভাব করিতে গ্রহণ।

১৬

"যখন জীবাত্মা তব
বলবৃদ্ধ হ'য়ে,

দেহ-আত্ম-ভাব ত্যজি,
    দেহ-দুর্গ হ'তে,
ছুটিয়া বাহির হবে
    প্রকৃতি-কাননে ;
প্রসারিয়া আমি-জ্ঞান
    নামরূপ মাঝে,
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি,
    এই "আমি" বলি',
সে কাননে কুড়াইবে
    যত প্রেয় ফুল ;
"এই আমি, এরা মোর,"
    বলিয়া সঘনে,
নামরূপ সন্নিবেশে
    আমিকে দেখিয়া,
"আমি" ও "আমার" রবে
    সব করি ভুল,
সম্পন্ন সুসিদ্ধ বলি
    আপনি, ভাবিবে ;
তখনি জানিবে জীব
    জীবাত্মা তোমার,
বিজড়িত রহিয়াছে
    ভীষণ মায়ায়।
যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা,
    তাঁরে ভুলে গিয়া,
তৃপ্ত হ'য়ে রহিয়াছে,
    মায়ার খেলায়।" (ক্রম

শ্রীরাধা।

ব্রহ্ম-আনন্দ।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃ। ৩.৯.২৮

'ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।'

আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ—তৈ। ৩।৬।১

'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন।'

ব্রহ্মকে কেন আনন্দস্বরূপ বলা হয়? ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিলে কি বুঝায়?

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্ম "আনন্দী" নহেন, ব্রহ্ম= আনন্দ।

প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম—ছা। ৪।১০।৫

কং=সুখম্।

'ব্রহ্ম প্রাণ, ব্রহ্ম আকাশ, ব্রহ্ম সুখ।'

স এষ প্রাণ, এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ। কৌষীতকী। ৩।৮

'তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই আনন্দ—অজর অমর।'

যদ্ অস্য অগ্রং তৎ শান্তং অশব্দং অভয়ং
অশোকং আনন্দং স্থিরমচলমমৃতমচ্যুতং
ধ্রুবং বিষ্ণুসজ্ঞিতং——মৈত্রী। ৬।২৩

তৎশান্তম্ অশব্দং অভয়ং অশোকং আনন্দং
তৃপ্তং স্থিরং অচলম্ অমৃতং অচ্যুতং ধ্রুবং
বিষ্ণুসজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম—মৈত্রী। ৭।৩

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শান্ত, আনন্দ, অভয়, অশোক, আনন্দ, তৃপ্ত, স্থির, অচল, অমৃত, অচ্যুত ও ধ্রুব। তাঁহার নাম বিষ্ণু। তিনি পরম ধাম।'

আনন্দ স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বোপনিষৎ বলিতেছেন—

আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপো অপরিমিতানন্দসমুদ্রঃ অবিশিষ্ট সুখরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে॥

ইহার দীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন—নতু জ্ঞানাদ্ ভিন্নং সুখমস্তি। দৃষ্টিসুখং শ্রুতিসুখম্ ইতিবৎ বিশেষোঽত্র নাস্তি।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে তিনি সুখ স্বরূপ অথচ চিৎ-স্বরূপ। তিনি অপরিমিত আনন্দ-সমুদ্র। তিনি নির্ব্বিশেষ সুখ।

উপনিষদের মতে জীব = ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন আনন্দস্বরূপ তখন জীবও তাহাই। এজন্য জীবকে আনন্দ-বিগ্রহ বলা হয়।

নানাত্বভেদহীনোঽস্মি হৃখণ্ডানন্দবিগ্রহঃ।

—মৈত্রী। ৩।৮

বলা বাহুল্য যে এ আনন্দ বিষয়-সুখ নহে। ইহা সাধারণ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা। সেই জন্য তেজোবিন্দু উপনিষদ্ বলিয়াছেন।

আনন্দং নন্দনাতীতম্।

'সেই আনন্দ সুখের অতীত অবস্থা'।

মৈত্রী উপনিষদ্ জীবের তুরীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন।

ততো নিরাত্মকত্বমেতি নিরাত্মকত্বাৎ ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বং লভতে।—মৈত্রী। ৬।২১

ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ জীব তাহার কণিকা মাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃ। ৪।৩।৩২

জীব যে, বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে তাহার কারণ এই যে বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন।

রসো বৈ সঃ। রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।—তৈত্তিরীয়। ২।৭

'তিনিই রস। রস আস্বাদন করিয়া জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দ স্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন তবে কে প্রাণন করিতে পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন।

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয় ভবতি ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥—বৃ। ২।৪।৫

অর্থাৎ—'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় লোক প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। ভূতের কামনায় ভূত প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ভূত প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়। অতএব —আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য। আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্তই বিদিত হয়।'

এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, জগতে যে কিছু বিষয় আছে (যাহার সম্পর্কে

জীব সুখ অনুভব করে এবং যাহাতে সুখার্থী হইয়া জীব তাহার কামনা করে), সে সমস্ত বিষয় জীবকে যে সুখ দিতে পারে, তাহার কারণ এই যে, সুখ-স্বরূপ আত্মা সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। যখন জীব বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ অনুভব করে তখন বস্তুত পক্ষে সে ব্রহ্মের ভূমানন্দ-কণিকা মাত্র আস্বাদন করে। অতএব জীব যখন সুখ লোভে বিষয়ের কামনা করে, তখন সে বাস্তবিক সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই কামনা করে।

ব্রহ্ম কেন আনন্দ স্বরূপ? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি দুই ভাবে ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মে দুঃখের অত্যন্ত অভাব, অতএব তিনি সুখস্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ভূমা, ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্মে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, বিষয়ীর ও বিষয়ের একাকার অবস্থা অতএব তিনি আনন্দ।

প্রথমত আমরা অভাব নির্দ্দেশের (Negative aspect এর) আলোচনা করি।

উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, জগৎ আর্ত্ত, দুঃখময়।

অতোঽন্যদ্ আর্ত্তম্—বৃ। ৩।৪।২

ব্রহ্ম ইহার বিপরীত। ব্রহ্ম তিনি, যিনি—যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি।—বৃ। ৩।৫।১

'ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ, জরা, মৃত্যুর অতীত।'

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসো অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। ছা। ৮।১।৫, ৮।৭।১

'এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।'

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিচিকিৎসোঽপিপাসঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকাম এষ পরমেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষ হি খল্বাত্মেশানঃ শংভুর্ভবো রুদ্রঃ প্রজাপতির্বিশ্বসৃগ্ধিরণ্যগর্ভঃ সত্যং প্রাণো হংসঃ শাস্তাঽচ্যুতো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ।—মৈত্রী।

'এই আত্মা পাপহীন, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্য-সংকল্প, সত্যকাম। ইনি পরমেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল। ইনি ধারণের সেতু,

আত্মার ঈশ্বর, শম্ভু, ভব, রুদ্র, প্রজাপতি, বিশ্বস্রষ্টা, হিরণ্যগর্ভ, সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, হংস, শাস্তা, অচ্যুত, বিষ্ণু নারায়ণ।

ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এক স্থলে বলিয়াছেন,—

তস্য উৎ ইতি নাম। স এষ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্য উদিতঃ—ছা। ১৬।৭

'তাঁহার নাম উৎ, কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত'।

ইহা গেল ব্রহ্মের দুঃখাভাব বর্ণনা। অতএব তাঁহার অভাব-সুখ। অতঃপর তাঁহার ভাবসুখের বিবরণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে ভূমা বলিয়াছেন।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। ন হল্পে সুখম্-অস্তি। ভূমৈব সুখং। ছান্দোগ্য। ৭।২৩.১।

'যিনি ভূমা তিনিই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ।'

ব্রহ্ম ভূমা। তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি অনন্ত। অর্থাৎ, তিনি ভূমা। ভূমা কি? ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি—অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতং। অথ যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যং।—ছা, ৭।২৪।১

"যেখানে অন্যকে দেখে না, অন্যকে শুনে না, অন্যকে জানেনা, সেই ভূমা। আর যেখানে অন্যকে দেখে অন্যকে শুনে অন্যকে জানে সেই অল্প। যিনি হন ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।"

অর্থাৎ তাঁহাতে বিষয় বিষয়ীর (subject, object), দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড, ভেদরহিত, অজর, অমর, একাকার বস্তু। জীব যখন তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তখন সে ভয়ের অতীত হয়। কারণ, যাহা অল্প তাহাই ভয়ের আস্পদ, যাহা ভূমা তাহা অ-ভয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন:—*

---

* ব্রহ্মের এই nagative aspect সূচক বর্ণনা সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডয়েসন লিখিয়াছেন:—

All these frequently recurring descriptions are summed up in the designation of Brahman as *Ananda*, "bliss,"—Philosophy of the Upanishads—P. 141.

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্মেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।—তৈ ২।৭

"যখন এই জীব সেই অদৃশ্য অনাত্ম্য অবাচ্য, অনাশ্র্য বস্তুতে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে ভয়ের অতীত হয়। যখন পর্য্যন্ত জীব তাঁহাতে অত্যল্পও ভেদ করে, তখন তাহার ভয় হয়।"

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ না বিভেতি কুতশ্চন।—তৈত্তি। ২।৯

"ব্রহ্মানন্দ জানিলে কোথাও কিছুতে ভয় থাকে না।" সেই জন্য যাজ্ঞ্য-বল্ক্য রাজর্ষি জনককে এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া অবসানে বলিয়াছিলেন—

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ॥—বৃ। ৪।৪।২৫

"সেই এই মহান্ অজ আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অভয়। যে জীব এরূপ জানে, সে অভয় ব্রহ্ম হয়।"

সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের এইরূপ একাকার অবস্থা হয়। সে অবস্থায় জীবের বিষয় বিষয়ী জ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং সে সাময়িক ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। বৃহদারণ্যক এই সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি তদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে। স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নী মানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈব-মেবৈষ এতচ্ছেতে॥ বৃ ২।১।১৯

'যখন জীব সুষুপ্ত হয় তখন সে কিছুই জানে না। হৃদয় হইতে "পুরীতৎ" নাড়ীর অভিমুখে ৭২০০০ "হিতা" নাম নাড়ী প্রসৃত আছে সেই সকল নাড়ীর পথে অপসর্পণ করিয়া জীব পুরীতৎ নাড়ীতে শয়ন করে। যেমন কুমার বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের 'অতিঘ্নী' (আতিশয্য) অনুভব করিয়া শয়ন করে।' ইহা

হইতে বুঝা যায় যে এই সুষুপ্তির অবস্থায় জীব আনন্দের 'অতিঘ্নী' (ব্রহ্মানন্দ) অনুভব করে। অন্যত্র, বৃহদারণ্যক সুষুপ্তি অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো

যত্র দেব ইব রাজেবাহ মেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাথ ভয়ং রূপং তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদনান্তরং তদ্বা অস্যৈ তদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমাসম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ ॥—বৃ। ৪।৩।১৯, ২০,২১, ২২, ৩২

'সেই সুষুপ্তি অবস্থা—যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইয়া কোন কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না। তখন জীব 'হিতা' নামক নাড়ীতে অবস্থান করে। তখন সেদেবের ন্যায় রাজার ন্যায় মনে করে 'এ সমস্তই আমি', সেই তাহার পরম লোক। এই তাহার অতিচ্ছন্দ অভয় রূপ। যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, মানুষ অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না, এইরূপ জীব প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক পরিষ্বক্ত হইয়া অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না। এই তাহার আপ্তকাম আত্মকাম অকামরূপ—যাহা শোকের অতীত। সে অবস্থায় পিতা পিতা থাকেন না, মাতা মাতা থাকেন না, লোক লোক থাকে না, বেদ বেদ থাকে না, দেব দেব থাকে না, চোর চোর থাকে না, ভ্রূণঘ্ন ভ্রূণঘ্ন থাকে না, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌল্কস অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয়, তাপস অতাপস হয়। তখন জীব পাপ পুণ্যের অতীত হয়। এবং হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হয়।"

এই 'অতিন্নীমানন্দস্য' এই পরম আনন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি উপমার সাহায্য লইয়াছেন।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্ম্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজান দেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ॥—বৃ। ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, সেই মনুষ্যের পরম আনন্দ। এই মনুষ্য আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ। পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধর্ব্ব লোকের আনন্দ। গন্ধর্ব্ব লোকের আনন্দের শতগুণ কর্ম্ম-দেবগণের আনন্দ। (কর্ম্মদেব তাঁহারা, যাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন)। কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ আজান দেবগণের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ প্রজাপতি লোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। প্রজাপতি লোকের আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ব্রহ্মলোক।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু-যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্য গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বা-

ণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকালোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকালোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবনামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপি যন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।—তৈত্তিরীয়। ২৮

অর্থাৎ 'আনন্দের এইরূপ মীমাংসা। যুবা যদি সাধু যুবা হন, অধ্যায়ক, আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্ত-পূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার আয়ত্ত হয়, তবে সেই মনুষ্য আনন্দের পরিমাণ। মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ এই মনুষ্য আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। দেব গন্ধর্ব্বের আনন্দ এই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দ এই দেব গন্ধর্ব্ব আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। আজান দেবগণের আনন্দ এই চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। কর্ম্মদেবগণের আনন্দ এই আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। দেবগণের আনন্দ এই কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ইন্দ্রের আনন্দ এই দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। প্রজাপতির আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ব্রহ্মের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই।'

কিন্তু যাহা ভূমানন্দ, যাহা বাক্য মনের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

'যাহার লাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকেনা'।

সুষুপ্তি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা স্থায়ী নহে। নিদ্রা ভঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তখন জীবকে ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া আবার দুঃখ-সঙ্কুল জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সুষুপ্তি কালের একাকার অবস্থার নিশ্চলতা সম্পাদন করা যায়। এই সাধনার নাম যোগ। উপনিষদের অনেকস্থলে এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ আছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নহে। তবে সেই যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে তুরীয় অবস্থা হয় সেই অবস্থার সূচক কয়েকটী শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই অবস্থার বিশেষত্ব স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ লাভ।

ততো নিরাত্মকত্বমেতি নিরাত্মকত্বাং ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বং লভতে।

—মৈত্রী। ৬।২১

'ইহা হইতে জীব নিরাত্মক হয়, নিরাত্মক হইয়া সুখ দুঃখের অতীত হয়, কৈবল্য লাভ করে।'

মানসে চ বিলীনে তু যৎ সুখং চাত্মসংস্থিতং।
তৎ ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতি র্লোক এব সঃ।

—মৈত্রী। ৬।২৪

অর্থাৎ 'মনের লয় হইলে যে আত্মসংস্থ সুখলাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই শুদ্ধ। তাহাই (পরমা) গতি, তাহাই (পরম) লোক।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুর্ব্যূহ।

হিন্দুদিগের উপাসনার মূলতত্ত্ব আত্মজ্ঞানের প্রসার। সাম্প্রদায়িকভাবে উপাসনা-পদ্ধতিবিশেষের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য সকলেরই এক। সকল প্রকার উপাসনাতেই আমাদিগের ভেদভাবাপন্ন বিশিষ্ট "আমি"কে অভেদাত্মক "আমি"তে পরিণত করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই অবিশেষ পরমভাব সহসা জাগ্রত হয় না বলিয়া, ঋষিগণ অধিকারীভেদে দুর্ভেদ্য ভেদাত্মকগণ্ডীকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিয়া স্বাভাবিক (universal) ভাবে এবং স্বাভাবিক উপায়ে আমিত্বকে প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনাপদ্ধতির উদ্দেশ্য এইরূপ। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণেও এই চারিটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকো বৈষ্ণবঃ ক্ষিতিপাবনঃ॥

এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবানের অবতারস্বরূপ এক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই সম্প্রদায় (বা সাধনার পদ্ধতিমূলক বিভাগ) তাঁহাদিগের স্বনামে পরিচিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই চারি সম্প্রদায়ান্তর্গত মধ্বাচার্য্যের প্রতিধ্বনি হইলেও তৎপ্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ মধ্বাচার্য্যের প্রচারিত দ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যূহ উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। রামানুজ সম্প্রদায়ই ইহা বিশেষভাবে সাধনা করেন। এদেশীয় বৈষ্ণবদিগের প্রামাণ্য চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চতুর্ব্যূহের উল্লেখ আছে।

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নামক গ্রন্থেও ব্যূহ উপাসনার কথা দেখা যায়—

অর্চ্চোপাসনাক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাৎ ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরং॥

প্রথমে প্রতিমাপূজাদ্বারা ক্ষীণ-কল্মষ হইলে অবতারাদির ধ্যানে অধিকার জন্মে, তৎপরে ব্রাহ্ম উপাসনার ব্যবস্থা। প্রতিমা পূজা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধনা। নারায়ণের অংশাবতার কপিলদেব নির্গুণ ভক্তিযোগের উল্লেখকালে বলিয়াছেন—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

ভাগবতপুরাণ ৩।২৯।২২

সকল ভূতে অবস্থিত ভগবানকে ঈশ্বরজ্ঞান না করিয়া, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। তবে কি প্রতিমাপূজা নিরর্থক? তাহা নহে ভগবান স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥ ভাগবত ৩।২৯।২৫

যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতাত্মক আমাকে না জানিতে পার, ততদিন প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিবে। প্রতিমাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি হইলে সকল বস্তুতে ভগবদ্‌বুদ্ধির সুবিধা হয়। সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌বুদ্ধি পাতঞ্জলে লিখিত সমাধি।

সাধনার দ্বিতীয় উপদেশ অবতারাদির ধ্যান। অবতারাদির ধ্যানে এবং তাঁহাদের জন্মকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ে প্রভূত সত্বস্রোত প্রবাহিত হয়। ক্রমে তদালোচনায় একত্ববুদ্ধি স্ফুরণে জীব তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান্ অবতার-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

গীতা ৪।৯

এবং তাহা দেখিতে গিয়া ঐরূপ ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া অর্জিত ভগবৎতত্ত্বের অবতারাদির নিষ্কাম কর্ম্মজীবন আলোচনায় অন্তঃকরণ বিষয়বাসনাদি-বৰ্জ্জিত হইলে ত্বংরূপ জীব তৎরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। কারণ যে ব্যক্তি চিরদিন তীব্র অনুরাগের সহিত কোন ভগবদ্ভাবের ভাবনায় নিযুক্ত থাকে তাহার অন্তঃকরণও সেই ভাবের ভাবানুরূপ হইয়া পড়ে এবং গ্রহণাত্মক অহং ভাব ত্যাগ করিয়া গ্রাহ্য ভগবদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাণেও দেখা যায়, নন্দিকেশ্বর

সর্ব্বদা সদাশিবের ধ্যান করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া এবং বিশিষ্ট স্মৃতি এবং জ্ঞান পরিশুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার ভাবে কার্য্য করিলে জীব তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে ভগবানের বাণী জীবের আশ্বাস।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ গীতা ৮.৭

তৎপরে ব্যূহোপাসনা। ইহারও উদ্দেশ্য একত্ব জ্ঞান। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ চৈতন্যের একটী প্রকার মাত্র এবং জীব স্বরূপতঃ এক অবিভক্ত অপরিণামী নিত্য পদার্থ ইহাই চতুর্ব্যূহের শিক্ষা। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইলে সর্ব্ব বস্তুতে কেবল নাম রূপের খেলা আর দেখা যাইবে না। জীবাত্মা পরমাত্মা, জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্ম ও জগৎ, ভগবান্ ও ভক্ত এই সকল আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদভাব ঘুচিয়া গিয়া তাহার ভিতর পরম একত্ব জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। তখন সর্ব্ববস্তুর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে দিব্য-চক্ষে দর্শন করিতে জীব সক্ষম হইবে।

এই চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আদিতত্ত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বের বিষয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত এবং আলোচনা ব্যতীত সে সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি অগ্রসর হইতে পারে না। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎরূপী ভগবানই ছিলেন। আত্মার মায়াশক্তি তখন তাঁহাতে লীন ছিল। একমাত্র ভগবানই ছিলেন, কারণ তাঁহার ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনি তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকাশ ছিল না। তখন অন্য কিছু দৃশ্য না থাকায় তিনি আপনাকেও যেন নাই মনে করিয়াছিলেন। মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন সুপ্ত থাকিলেও তিনি বস্তুত অসুপ্তদৃক্ বা অসুপ্তচিৎশক্তি। তাই ভাগবত বলেন—

ভগবানেক আসেদমগ্রমাত্মাত্মনাং বিভুঃ
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ ভাগবত ৩।৫।২৩—২৪

এই স্বয়ং ভগবানই বৈষ্ণবদিগের পরমারাধ্য পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ; উপনিষদে তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। ২৩-২৪।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥

গীতাতে ইহাই "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে অদ্বয় জ্ঞান বলিয়া অভিহিত।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

মনুসংহিতা এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই বিশ্ব তখন তমঃস্বরূপ অপ্রজ্ঞাত অবস্থায় লীন ছিল। কোন লক্ষণ দ্বারা সে অবস্থা নির্দ্দেশ করা যায় না; যেন সমুদায় প্রসুপ্ত ছিল—

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

এ অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়, এ ত্রিপুটী নাই। তাই বলিয়া এই অবস্থাকে শূন্য বা অব্যক্ত বলা যায় না। সেই জন্যই গীতা পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাকে "জ্ঞেয়ং যত্তং" বা পরম বেদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু সেই সদা অপ্রকাশিত পরতত্ত্ব লৌকিক জ্ঞানের বিষয় নহে। কারণ আমাদের জ্ঞান বলিতে বহিঃস্থিত কোন বস্তুর জ্ঞান বুঝি। তিনি স্বতঃ জ্ঞানস্বরূপ; তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং স্বরাট্। এই স্বয়ং-প্রকাশ অপ্রকৃত শ্যামসুন্দর প্রাকৃত বস্তু বা ইন্দ্রিয় বা ভেদমূলক জ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হন না। এই পরম ভাবে জীব নাই, জগৎ নাই, শক্তি নাই, বিদ্যা নাই, আমি নাই, তুমি নাই, আছে সেই পরম অব্যক্ত অদ্বিতীয় বিরজ নদীর পারস্থিত অপ্রাকৃত মদনমোহন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও উক্ত আছে "বিরজঃ পর আকাশামুদ্দ আত্মা মহান্ ধ্রুবম্।"

চতুর্ব্যূহ এই শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতা। লঘু ভাগবতামৃতে দেখা যায় যে, স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান বিধান স্থলে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ক্রমদীপিকাতেও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের পদ্ধতিতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহকে গোকুলনাথের আবরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই জগতের অতীত (Transcendent)। এই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বাসুদেব। বাসুদেবই প্রথমব্যূহ। এই বাসুদেবতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তত্ত্ব নহে। যে আত্মায় সকল শক্তি একাকার হইয়া অবস্থিত ছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম-সংকল্প বশতঃ সেই আত্মস্থিত শক্তিরই একটু স্বপ্রকাশ-প্রবণতা আরম্ভ হইল। তাই বলিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র কোন কিছু নহেন। এই বাসুদেবও পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শক্তির একটা অবস্থান্তর বা রূপান্তর উপস্থিত হইলে যেমন উহা একটী স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না, নির্গুণ ব্রহ্মে আত্মগত শক্তি স্বপ্রকাশ ভাব জাগিয়া উঠিলেও ব্রহ্মের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

একত্ব আপনাকে প্রকাশ করিতে গেলে যেরূপ দ্বিত্ব (১+১) ত্রিত্ব (১+১+১) রূপে আপনাকেই অবলম্বন করিয়া কেবল কাল সহকারে বহুরূপে প্রকাশ হন, সেইরূপ এক এই তত্ত্বে পরম তত্ত্ব আপনাকেই অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া থাকেন।

বাসুদেবের এই স্বপ্রকাশপ্রবণতা পূর্ব্বকল্পের অবিশেষ একত্ব বাচক স্মৃতি-মূলক। স্মৃতি, চিত্ত (Pre cosmic ideation) বলিয়া ভাগবতে বর্ণিত আছে। সেই জন্যই বাসুদেব চিত্তের উপাস্য। পূর্ব্বে যে চৈতন্য "আমি যেন নাই" মনে করিয়া অপ্রকট ছিলেন, এখন সেই চৈতন্য বাসুদেবভাবে পূর্ব্বকল্পের স্মৃতির ভিতর দিয়া স্থিত একত্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। এখন ইনি দ্রষ্টা হইলেন কিন্তু এই স্মৃতির প্রতি তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই। এই বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ একই, কেবল প্রকাশভেদে নামের পার্থক্য মাত্র। তিনি একত্ব-মূলক প্রকাশভাবে অসদ্ভাবরূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া বিশ্বের মূল চিত্তের অধিষ্ঠানে প্রকট হইলেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বাসুদেবকেই পরম ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন এবং প্রমাণ-স্বরূপ শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব। তাঁহারা বলেন—

বাসুদেবঃ পরব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানাং উপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

অর্থাৎ কল্যাণগুণান্বিত বাসুদেবই পরম ব্রহ্ম। তিনি ভুবন সকলের উপাদান-

কর্ত্তা ও অন্তর্যামী। ভাগবত এই বাসুদেবের অতীতও একটী অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

ধাম অর্থে জ্যোতিঃ। এই অবস্থায় সৃষ্টি বা সৃষ্টির সংকল্পও নাই। কেবল সংকল্প বা ঈক্ষণ বা স্বপ্রকাশপ্রবণতাকে লক্ষ্য করিয়া বাসুদেব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই সংকল্প শক্তিদ্বারা বাসুদেব পরে আপনাকে বিশিষ্ট একতায় পরিণত করেন। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" সংকর্ষণরূপ প্রথমপুরুষে প্রকাশিত হইলেন। অবিশেষ আত্মমূলক স্মৃতি বিশেষ প্রকট ও কেন্দ্রমূলক স্মৃতিতে পরিণত হইল। এই প্রথম পুরুষের বিশিষ্ট স্মৃতিই অব্যাকৃত জগদাত্মক মূলপ্রকৃতি। এই মূলপ্রকৃতি তাঁহার শরীর, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার শরীরকেও বুঝিতে হইবে। সেই শরীরেই অব্যাকৃতভাবে জগৎ নিহিত———

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। ছান্দোগ্য ৬।২।১

এই এক অদ্বিতীয় প্রথম পুরুষ প্রথম জ্ঞাতা, এই শরীর বা মূলপ্রকৃতি জ্ঞেয়। এই উভয়ের সংযোগকারিণী শক্তিই জ্ঞান। উপনিষদের ভাষায় এই পুরুষ রথচক্রের রথনাভি মূলপ্রকৃতি চক্র এবং এই উভয়ের সংযোগকারিণী শক্তি 'অর' নামে পরিচিত। এই মহান্ বিশিষ্ট একত্ব হইতে বিশ্বের প্রকাশ। আবার অদ্বয়জ্ঞানই বাসুদেব ও বাসুদেবই সংকর্ষণরূপে প্রকটিত হইলেন। বাসুদেব ও সংকর্ষণতত্ত্ব Dreamer তাঁহার The Third Life-wave নামক পুস্তিকায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন !—

The pure I-am-ness-consciousness of the Vasudeva Principle which envelops everything becomes with the intervention of the Upadhi of abstract memory, the centralised life welling up as. H. P. B puts it as the I-am-I. The I-am-ness-consciousness becomes the I-am-I consciousness of a cosmos the Sankarshana principle, the Primordeal Triangle— The centralised I the neucleus, the seed of manifestation. (বিশ্ববীজং বিশ্বাঙ্গং নিখিলভয়হরং)।

সংকর্ষণনামা এই প্রথম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের আদ্য অবতার। ভাগবত বলেন———

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য। ২।৬।৪০

শ্রীধরস্বামী এই পুরুষকে প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক বলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন———ভগবত আদ্যঃ প্রথমোঽবতারঃ পুরুষপ্রকৃতি-বীক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী। ইনি এক এবং অদ্বিতীয়। লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড ইঁহার দেহ হইতে আবির্ভূত হইলে বা তাহাতে লয় হইলেও ইঁহার একত্বের বা অদ্বিতীয়তার হানি হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এই পুরুষের বীক্ষণে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্বে এবং অহংকারতত্ত্ব সর্ব্বদাই তিন ভাবে ব্যবস্থিত থাকে। সত্ত্বাংশে আমি বা দেবতা, রজ অংশে ইন্দ্রিয়, তমঅংশে বিষয় বা বস্তু। যেমন আমি তেমনি ইন্দ্রিয় ও বস্তু, যেমন বস্তু তেমনি ইন্দ্রিয় ও আমি, যেমন ইন্দ্রিয় তেমনি বস্তুও আমি। এই সকল তত্ত্বের আত্মা প্রথম পুরুষ বা সংকর্ষণ ইনি মহাবিষ্ণু নামেও পরিচিত। ইনিই ভগবান্ শঙ্কর নামে অভিহিত হন।

চৈতন্য চরিতামৃতও এই পুরুষকে কারণার্ণবশায়ী আখ্যা দিয়াছেন। ইনি তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকারণ, সেইজন্য ইনি কারণার্ণবশায়ী।

সেই পুরুষ (প্রথম) বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগতকারণ॥
এতো মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপ ধাম॥

সংকর্ষণ অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সাগরলহরীর অথবা পৃথিবীস্থ ধূলিকণার সংখ্যা সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।

দেবীভাগবত।

কারণ-জলে ভাসমান সঙ্কর্ষণনামা আদি পুরুষের লোমকূপে নিখিল জগতের

বীজস্বরূপ চিৎপরমাণুপুঞ্জ বিলীন থাকে। তিনি সেই সকল বীর্য্য প্রকৃতিতে আধান করিয়া মহাভূতাদি দ্বারা আবৃত হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডাবলী সৃষ্টি করেন।

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জলে॥
তদ্‌রোম-বিলজালেষু বীজং সংকর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু॥

এই সকল তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া মিলিত হইয়া বিভিন্ন লোক কিংবা দেহ রচনায় সমর্থ হয় না দেখিয়া, প্রথম পুরুষ সংকর্ষণ দ্বিতীয় পুরুষ বা প্রদ্যুম্নরূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

সেই পুরুষ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একেক মূর্ত্তে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥

এই প্রদ্যুম্ন-গর্ভোদকশায়ী এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Logos of a Solar System)। এই প্রদ্যুম্ন নারায়ণ বা বিষ্ণু নামে ভাগবতে বর্ণিত হন।

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচি॥
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃপুরুষোদ্ভবাঃ॥

ভাগবত ২।১০।১০—১১

শ্রীধরস্বামী আপ অর্থে গর্ভোদক (Vis Vae) লিখিয়াছেন। এই গর্ভোদকে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন বলিয়া গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ নামে পরিচিত।

এই সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন বস্তুতঃ অভেদ, কারণ সংকর্ষণই আপনাকে প্রদ্যুম্নরূপে প্রকাশিত করিলেন।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥

শ্রীভাগবত ১১।৪।৩

এই শ্লোকের টীকায় দেখা যায়——

আত্মনা সংকর্ষণেন সৃষ্টৈঃ উৎপাদিতৈঃ পঞ্চভির্ভূতৈঃ বিরজং জগদন্তরূপং পুরং নির্ম্মায় তস্মিন্ প্রদ্যুম্নবপুষা প্রবিষ্টঃ তদা পুরুষাভিধানমবাপ॥

এই দ্বিতীয় পুরুষ জীবকুলে স্বতন্ত্রভাবে প্রাদুর্ভূত হইলে তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যষ্টি এবং বিরাট দেহের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ পুরুষসূক্তের সহস্রশীর্ষ পুরুষ।

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্ত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

সেই সহস্রাক্ষ পুরুষ বিরাট মূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত ভুবনকে ব্যাপৃত করিয়া তাহা অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলপরিমাণ হৃদয়প্রদেশে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পুরুষই ভূত এবং ভব্য তিনিই অমৃতত্বের নিয়ন্তা। এই পুরুষ সূক্ষ্মভূতত্রয়-রচিত লিঙ্গদেহে অভিমান-বিশিষ্ট জীবের সহিত স্বাংশভূত অনিরুদ্ধাখ্য পরমাত্মা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিলেন। এই তিন রূপই ভগবানের রূপ স্বাংশ বা বিলাসমাত্র।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতো স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

ইহার টীকায় দেখা যায়—প্রকৃতেরন্তর্যামী সংকর্ষণরূপং প্রথমং চতুর্ম্মুখস্য অন্তর্যামী প্রদ্যুম্নরূপং দ্বিতীয়ং সর্ব্বজীবান্তর্যামী অনিরুদ্ধরূপং তৃতীয়ং॥

এইভাবে দেখিলে সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সংকর্ষণ বা বাসুদেবের বিলাস; প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণের এবং অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি।

ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া একবার জীবদেহের কথা দেখা যাক্।

মনুষ্যদেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ত্রিলোকের ঈশ্বর অনিরুদ্ধ। মনুষ্যদেহে "ভূ ভূর্ব্বস্ব" এই তিন লোকের অনুরূপ অন্নময় প্রাণময় মনোময় তিনটী কোষ আছে। এই মনোময় কোষের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ।

যোঽনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্বে মনীষিভিঃ উপাসতে।

লঘুভাগবতামৃত।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্লোকের (mental plane) পর বুদ্ধিক্ষেত্র (Buddhic

plane.) জীবেরও মনের পর বুদ্ধির স্থান। "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ" এই বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন।

যো প্রদ্যুম্ন বুদ্ধিতত্ত্বেবুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে।

লঘুভাগবতামৃত।

এই বুদ্ধির পর আত্মা "বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ" এই তত্ত্বই সংকর্ষণ। এই অভেদাত্মক সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মনুষ্যদেহে "আত্মা বুদ্ধি মন" রূপে প্রতিবিম্বিত। বুদ্ধি ও মন অর্থে চৈতন্য-আভাসিত বুদ্ধি মন বুঝিতে হইবে। মনুষ্য শরীরে এই আত্মাবুদ্ধি-মন জ্ঞাতা ভোক্তা দ্রষ্টা।

এই অবিশেষের প্রতিবিম্ব বলিয়াই মনুষ্য-দেহে "আমি" বিশিষ্ট কার্য্য দ্বারা আংশিক প্রকাশিত হইলেও তাহার স্বরূপ ভাব সর্ব্বদাই রহস্য-জালে আবৃত। সেই জন্যই "আমি" এক এবং অদ্বিতীয়; সাধারণতঃ ইহা কেন্দ্রীভুত "আমি"। এই আমি সংকর্ষণ বা কারণব্রহ্মের ছায়া বলিয়াই এক এবং অদ্বিতীয়।

এই সংকর্ষণই ঈশ্বরের সুষুপ্তির ভাব, ইহার অতীত অবস্থাই তুরীয় ও তুরীয়াতীত। সেই ভাবে আত্মা শুধু এক নহেন, সর্ব্বব্যাপী। সেই সর্ব্বব্যাপী আমি ভগবদ্ভাব। সেভাবে আত্মা, অনাত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, "আমি" "তুমি" সকল বিশিষ্ট ভাবই তাঁহাতে লীন। সে যেন এক প্রশান্ত মহাসমুদ্র; তরঙ্গমালার ব্যক্তভাব যেন অব্যক্তে লীন হইয়া গিয়াছে। এই ভাব গীতার "সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তিভাজন ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি লখিয়াছেন।

The Self is neither the bare emptiness nor "conditioned" fulness which though incapable of being exhausted by the senses the mind and the intellect and their activities and by the opposite poles of spirit and matter is yet the One Substratum wherein the I and the Non-I and their life relation are exquisitely blended and wherein they merge when the time for indrawal comes as ripplets called forth by passing winds merge in the stillness and absolute calm of the Mighty ocean.

এই পরম ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সাধক এক দিন বলিয়াছেন :—

ক স্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাঽসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রপরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবমজং বিভুং ॥

এই তত্ত্বই চতুর্ব্যূহের আদি তত্ত্ব। চতুর্ব্যূহের শিক্ষা অতি উদার, অতি মহান্; সমস্ত জগত তাঁহার প্রকাশ। এক ভগবানই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশিত। এস তাঁহাকে প্রণাম করি।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ওঁ

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রং।

ওঁ। নির্ব্বিকল্পে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে।
যা ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈর্নিরীক্ষ্যসে ॥ ১

ওঁ নমো বুদ্ধায়। ওঁ নমো মহাগুরবে। ওঁ নমো তথাগতায়।

হে প্রজ্ঞাপারমিতে, অর্থাৎ হে নিরুপাধিক সাক্ষিচৈতন্য, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি নির্ব্বিকল্প (অর্থাৎ তুমি স্বরূপভাবে অবস্থিত এবং তোমাতে বিকল্প বা দ্বৈতের ভানমাত্র নাই; তোমার দর্শন, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে

মহাযোগী প্রাপ্ত হন); তুমি অমিত, (অর্থাৎ তোমার মান বা পরিমাণ নাই, তুমি সর্ব্বব্যাপক); তোমার সকল অঙ্গ, (এমন কি তোমার সর্ব্বপ্রকাশভূমি), অনবদ্য (নির্দ্দোষ); অতএব যাঁহারা নিরবদ্য, (নির্দ্দোষ), কেবল তাঁহারাই তোমার দেখিতে সক্ষম হ'ন। ১

নির্ব্বিকল্প :—চিত্তের ভূমি, অর্থাৎ অবস্থা পাঁচ প্রকার,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তাহাদিগের মধ্যে ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ অসম্ভব। একাগ্রচিত্তে যোগ সম্ভব। তখন সদ্ভূত অর্থ চিত্তে প্রকাশ পায়, সমুদয় ক্লেশ ক্ষীণ হয়, কর্ম্মরূপ বন্ধন শ্লথ হয়, এবং পরে নিরোধ বা নির্ব্বিকল্প অবস্থার দিকে সাধককে লইয়া যায়। একাগ্রচিত্তে এই যে সমাধি হয়, তাহা ছয় প্রকার; সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। এই ছয় প্রকার সমাধির মধ্যে চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় কোনও না কোন একটী অবলম্বন থাকে; কিন্তু, নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কোনও বিশেষ আলম্বন থাকে না।

অমিত :—তুমি নামরূপের অতীত এবং তুমি পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন ও জ্ঞাত হওনা। তোমার পরিমাণ কি দ্রব্যের দ্বারা হইবে? তুমি যে সর্ব্বপদার্থেই সদ্ভাবে ব্যাপ্ত আছ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ঈশবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

(পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা অন্তর্ব্বহিঃ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।)

সমষ্টিভূত সৃষ্টীপদার্থও তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, কারণ তুমি সকলের অন্তরে এবং সকলের বাহিরে একভাবে অবস্থিত;—"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" অতএব তুমি পরিচ্ছিন্নও নহ। আবার কাহার দ্বারা তুমি জ্ঞাত হইবে? "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।"—কেন—৩

(তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য বলিতে পারে না এবং মন চিন্তা করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানিনা এবং যেরূপে শিষ্যগণের নিকট ঐ ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয়, তাহাও অবগত নহি। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল বস্তুরই অতীত।)

প্রজ্ঞা পারমিতে :—সর্ব্বজ্ঞতে। সেই অদ্বিতীয় চৈতন্য বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১

ইনিই তন্ত্রের ঈশানী, মহাবিদ্যা বা দুর্গা। ইঁহার অপর নাম ব্রহ্মযোনি।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

(দেবি, তুমি এস, ধারার মত বরদান করিতে করিতে এস। তুমি ত্রি-অক্ষর সমন্বিত অর্থাৎ তোমাতেই অ, উ, ম্, রূপী ঈশ্বরের তিনটী প্রকাশ ভাব পর্য্যবসিত। তুমি ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মকে জানাইয়া দাও! তুমি গায়ত্রী, ছন্দের মাতৃস্বরূপিণী এবং বেদ তোমা হইতেই আসিয়াছে! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।)

তাঁহার কৃপা না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না; তাই শাস্ত্রে আছে,—

নানা তন্ত্রমতং দেবি নানা যন্ত্রং প্রকাশিতং।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে॥
নানা মার্গা প্রধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যান্তি রসাতলং॥
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি পথ্যং বচ্মি পুনঃ পুনঃ।
ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গানিষেবণাৎ॥

শ্রী ভগবান্ যে পরমধামের কথা বলিয়াছেন, ইনি সেই ধাম (আলয় ও জ্যোতিঃ)। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—ইনিই বিষ্ণুর পরম পদ। ইনিই জগৎ স্রষ্টার বরেণ্য ভর্গ বা জ্যোতিঃ;—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যংভর্গঃ।" ইনি জ্ঞান-সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ;—বিশ্বে বিভিন্ন শক্তিরূপে চেতনে নানারূপ সম্বিত-রূপে, জীবে বিভিন্ন জীবনরূপে বিরাজ করিতেছেন। বিভিন্ন ভাবে দৃষ্টতঃ বিরাজ করিয়াও মূলতঃ এক। যখন ভগবান মানবের কল্যাণার্থে মানবরূপে আবির্ভূত হ'ন, তখন তিনি তাঁহার মাতৃস্বরূপিণী হইয়া প্রকাশ পান। আবার যখন সাধক, হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ভক্ত-

হৃদয়ে আবির্ভূত ভগবানের মাতৃরূপিণী হইয়া শোভা পান। তিনি নষ্টিক-দিগের শোফিয়া।

বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহার কথা আমরা কি পাই? গুণকারণ্ডব্যূহ গ্রন্থে লিখিত আছে,—"যখন কিছুই ছিলনা শম্ভু ছিলেন; শম্ভু স্বয়ম্ভু। তিনি সকলের পূর্ব্বে তাই তাহার অপর নাম আদিবুদ্ধ। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন; সেই ইচ্ছাই প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া প্রজ্ঞা-উপায় হইলেন,—শিব-শক্তি বা ব্রহ্ম-মায়া।

এই পুস্তক প্রজ্ঞাদেবীর স্তোত্র গীতা। তাঁহার মহিমার কথা বুদ্ধগ্রন্থময় পরিব্যাপ্ত। আমরা তাহার কতকগুলি এখানে সন্নিবেশিত করিলাম।

১। প্রজ্ঞাপারমিতে, আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বজ্ঞানের আধারভূতা; তোমারই কৃপায় মুক্তিপিপাসু শ্রাবক তোমাতে লয় প্রাপ্ত হন। তুমি সর্ব্বকর্ম্ম-জ্ঞানবতী, তাই কে কোন পথে যাইলে মুক্তি পাইবে, তুমি তাহাকে সেই পথে লইয়া যাও। যে বুদ্ধচরণে শ্রাবকেরা ও বোধিসত্ত্বেরা নিত্যভক্তিযুক্ত, তুমি সেই বুদ্ধের মাতৃস্বরূপিনী। (পঞ্চবিংশতি সাহস্রিক)।

২। প্রথমে বায়ু, তাহার পর অগ্নি, তাহার পর জল, তাহার পর ক্ষিতি। ক্ষিতির মধ্যদেশে সুমেরু; সুমেরুর চারিপার্শ্বে ৩৩ কোটি দেবতার বাস। তাহার উপরে হীরকাদি খচিত পদ্মের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পীঠের মধ্যভাগে ললিত আসনে প্রজ্ঞাপারমিতা উপবিষ্টা। প্রজ্ঞা, তুমি দেবতাদিগকে প্রসব করিয়াছ এবং তুমি অনাদ্যন্তা। (ভদ্রকল্পবদান।)

৩। প্রজ্ঞাদেবি, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি! তুমিই প্রজ্ঞাপারমিতা, ও জ্ঞানরূপা, নীররূপা এবং বিশ্বের মাতৃস্বরূপিনী। (পূজাখণ্ড।)

৪। যখন সমস্তই শূন্য ছিল, প্রজ্ঞাদেবী "ওঁ"র সহিত আকাশ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত বৌদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের জননী স্বরূপিনা। তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের স্থান। পরসত্যজ্ঞানরূপিনী তিনি, পৃথিবী এবং পার্থিব জ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পরাজ্ঞানদাত্রী ও মূর্ত্তিমতী। তিনি সনাতনী, মানববুদ্ধির অগম্যা এবং বুদ্ধের মাতৃস্বরূপিনী। (পূজাখণ্ড।)

৫। হে প্রজ্ঞাদেবি, তুমি সমস্ত বুদ্ধের জননী, বোধিসত্ত্বের পিতামহী এবং অপরের প্রপিতামহী। তুমিই ঈশানী। (পূজাখণ্ড।)

৬। শ্রীভগবতি প্রজ্ঞাদেবি ! তুমি মা সমস্ত বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপিণী, সমস্ত-বুদ্ধের মাতৃস্বরূপিণী, বোধিজ্ঞানজনয়ত্রী, বিশ্বের মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী। (গুণ-কারণ্ড ব্যূহ।)

৭। তুমি অসুর নমুচি-মারের গর্ব্বখর্ব্বকারিণী, অহঙ্কারীর অহঙ্কার দলনী; সত্যজ্ঞানদাত্রী, সর্ব্ববিজ্ঞানবতী এবং লক্ষ্মী। সর্ব্বজীবের পালন ও রক্ষণ, এই তোমার "ধর্ম্মরত্ন"। (গুণকারণ্ড ব্যূহ।)

ঐতরেয়ারণ্যকে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কি আছে, আমরা এইবার আলোচনা করিব।

জন্মক্লেশবিচারী পরবৈরাগ্যপ্রাপ্ত জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিতেছেন,—

"কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা, ইতি।"

দ্বিতীয়ারণ্যক ষষ্ঠ অধ্যায়।

(কে সেই আত্মা যাঁহাকে আমরা উপাসনা করি? সে আত্মা কিরূপ?)

"যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎসংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি, ইতি।"

(যদ্দ্বারা রূপ দর্শন করা হয়, যদ্দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা হয়, যদ্দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করা হয়, যদ্দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করা হয়, অথবা যদ্দ্বারা স্বাদু বা অস্বাদু বোধ করা হয়, এই সকল বাহ্য কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই কি আত্মা? অথবা যাহা প্রত্যেক বহিরিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান লাভ করিতেছে, সেই একমাত্র হৃদয় বা অন্তঃ-করণই কি আত্মা? মনের বৃত্তি অনেক;—সংজ্ঞান বা অহংজ্ঞান, আজ্ঞান বা ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান, প্রজ্ঞান বা "গ্রন্থার্থাদাবুন্মেষ" মেধা বা শাস্ত্রার্থ ধারণা, দৃষ্টি বা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, ধৃতি বা ধৈর্য্য, মতি বা মনন, মনীষ বা মননস্বাতন্ত্র্য, জূতি বা রোগাদি জনিত দুঃখ, স্মৃতি বা স্মরণ, সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পন, ক্রতু বা অধ্যবসায়, অসু বা প্রাণন, কাম বা অসংনিহিত বিষয়াকাঙ্ক্ষা, বশ বা স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ ইত্যাদি।)

এই সংশয়ের নির্ণয় হইতেছে।

"সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি, ইতি। ঐ।

(উহারা প্রজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র।)

তাহা কিরূপ ?

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানী-তরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পততি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম, ইতি।"

(এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। এই সকল অগ্ন্যাদি দেবতা, এই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চমহাভূত, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিশ্র ভিন্ন প্রাণী সকল, এই স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিবিধ বীজভূত প্রাণী সকল, এই অণ্ডজ স্বেদজ ঔদ্ভিজ্জ প্রাণী সকল, এই গো, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী সকল, এই জঙ্গম পক্ষ্যাদি ও স্থাবর তরুলতাদি প্রাণী সকল, এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র বা ব্যবহার কারণ।)

তাহাই বা কিরূপ ?

"প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, ইতি। ঐ।

শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—

প্রজ্ঞানে, নিরুপাধিক চৈতন্যে, পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং জগৎপ্রতিষ্ঠিতং রজ্জাং সর্পবদারোপিতং। অনেনোৎপত্তিহেতুত্বমুক্তং। লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসমূহঃ প্রজ্ঞানেত্রঃ। প্রজ্ঞা চৈতন্যমেব নেত্রং (ব্যবহারকারণং) যস্যাসৌ প্রজ্ঞানেত্রঃ। অনেন স্থিতি হেতুত্বমুক্তং। প্রজ্ঞা চৈতন্যং প্রতিষ্ঠালয়স্থানং। প্রতিতিষ্ঠতি বিলীয়তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনেন সংহারহেতুত্বমুক্তং।

(প্রজ্ঞাই লোক সকলের সৃষ্টিহেতু, ইহাই প্রতিষ্ঠা এবং ইহাই লয়স্থান।)

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ইতি।" ঐ

(ইনিই ব্রহ্ম।)

পারমিতা :—শ্রেষ্ঠ আর্য্যধর্ম্মের বা মোক্ষ ধর্ম্মের নাম পারমিতা।* দান, শীল, ক্ষান্তি, বৈরাগ্য, বীর্য্য ও ধ্যান, এই ছয়টীর নাম পারমিতা। ইহাদিগের সাধন হইলে তবে মানব প্রজ্ঞা সাধনে সক্ষম হয়। এখানে, পারমিতার অর্থ "মানের অতীত," ইহাও বুঝাইতেছে। যেমন একদিকে প্রজ্ঞাকে অমিত বা

যাহার মাপ হয় না বলা হইয়াছে, অন্যদিকে তাঁহাকে আবার মানের অতীত বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।

অনবস্থাঙ্গি—ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে "অপাপবিদ্ধ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"এষ আত্মাহপহত পাপ্মা।"

নিরবদ্যৈঃ—অবদ্য (পাপ), যাঁহাদিগের নাই। মোহ, পাপ, অবিদ্যা এই সমস্ত পর্য্যায়শব্দ। পাপের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকে জানিবার আশা নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ঈশ—৬
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঐ ৭

(যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, এবং যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না ; কারণ তাদৃক দর্শন হেতু তাঁহার মোহ ও পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।)

(যখন সর্ব্বভূত আত্মাই, এইরূপ অনুভব হয়, তখন তাদৃশ সর্ব্বাত্মদর্শীর পক্ষে মোহই বা কি, আর শোকই বা কি ?)

বরাহপুরাণে পাপমুক্তের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

য সমঃ সর্ব্বভূতেষু জিতাত্মা শান্তমানসঃ।
স পাপেভ্যো বিমুচ্যেত জ্ঞানবান্ স চ বেদবিৎ॥
গুণাগুণপরিজ্ঞাতাহক্ষয়স্য ক্ষয়স্য চ।
ধ্যানেনৈব হ্যসংমূঢ়ঃ স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥
স্বদেহে পরদেহে চ সুখদুঃখেন নিত্যশঃ।
বিচারজ্ঞো ভবেদ্ যস্তু স মুচ্যেতৈনসো ধ্রুবম্॥
অহিংসঃ সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণাক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
শুভভাসঃ সদা যশ্চ স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥

এক কথায় যাহা কিছু ব্রহ্মজ্ঞানের অবরোধক, তাহাই পাপ, তাহাই অবদ্য ; —তাহা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতাই হউক, অথবা ভক্ত জ্ঞানীর শেষ "সমাধি

প্রতিবন্ধক কর্ম্মাধীন ভোগাবর্গ"ই হউক। তাই ভক্তজ্ঞানী সেই শেষ পাপলেশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশ—১৫

তাই সম্প্রজ্ঞাত যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত বৈষ্ণব বা শৈব্ শেষ অবস্থায় যখন স্বতঃ উদ্বেলিত ব্রহ্মভাবে অস্থির হইয়া উঠেন, যখন তিনি বুঝিতে পারেন,—শিব বা হরি ভিন্ন নহেন,—তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মেরই লিঙ্গ, তখন তিনি গাহিয়া উঠেন,——

"পাপং মে হরতাম্ সদা হরিহরৌ
শ্রীবৎস গঙ্গাধরৌ।"

আবার অপরদিকে যখন কাম্যাদি বস্তু কামাদি না দেখাইয়া বা কাম্যাদি বস্তু না দেখাইয়া ব্রহ্মকে দেখায়, ইন্দ্রিয়গণ যখন তাহাদিগের অধিকারী ও তাহাদিগের ভোগ্য বস্তুকে না দেখাইয়া ব্রহ্মকেই ইঙ্গিত করে, তখন আর তাহারা আমাদিগের পাপের কারণ না হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের নিদান হয়।

স্বয়ং অপাপবিদ্ধ না হইলে, কি করিয়া "স পর্য্যগচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ব্রহ্মকে জ্ঞান হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ওঁ

The Spirit—জীবাত্মা।

লেখকের বা বক্তার মন কোন প্রকারে সন্দেহপূর্ণ বা কোন বিষয়ে অনিশ্চিত থাকিলে, তিনি সেই সময়ে যাহা লিখেন বা কহেন, সে সকল নির্ম্মল ভাব বহন না করিয়া এক প্রকার তমোভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য নানা অনিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত ইংরাজি "Spirit" কথাটীর যথার্থ অর্থ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া Mrs. Besant প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ১৫ অধ্যায় ৭ম শ্লোকে উক্ত "Spirit" কথাটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সগুণব্রহ্মরূপে তিনি তথায় কহিতেছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" আমারই অংশ সংসারে সদাকালস্থায়ী জীবরূপে খ্যাত। প্রত্যগাত্মার সেই এক একটী বিম্ব বা কণামাত্র এক একটী জীবাত্মা বা "Spirit"। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অংশ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া অতি সূক্ষ্ম উপাধি দ্বারা, এক একটী অণুদ্বারা জড়িত হওয়ায় পরস্পর সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে জগতে বর্ত্তমান দেখা যায়। পরমাত্মার অমূর্ত্ত ব্যক্তভাব প্রত্যগাত্মা বা সগুণব্রহ্মরূপে, মায়াধীশ ঈশ্বররূপে, আমাদের মধ্যে আখ্যাত হয়েন; বিবিধ কোষাবৃত তাঁহার বিম্বই জীবাত্মা (Spirit) বলিয়া জগতে বিদিত। সর্ব্বোত্তম, বিশ্বব্যাপী, ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত "Spirit"। কহিলে আমরা প্রত্যগাত্মাকেই বুঝিব; এবং ব্রহ্মা হইতে সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত শরীরী সমস্তই জীব "Spirit" তাহা হইলে এক অখণ্ড প্রাণের জড়াবৃত সকল অংশই spirit জীব বা প্রাণী। অথবা আমরা তাহাকে এক একটী অনাত্মা জড়িত আত্মা বা জীবাণু কহিতে পারি। সেই জন্য জীবাত্মা সদাই দ্বৈত; একটী চিদাংশ একটী জড়াণু সহিত মিশ্রিত। বিশুদ্ধ (Spirit) চিৎ ভাবমাত্র, উপাধিযুক্ত প্রাণী নহে। ব্যক্তাবস্থায় (Spirit) চিৎ কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু যে উপাধিতে সংযুক্ত হওয়ায় ইহার বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে, সেই উপাধিকে মনে মনে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নির্ম্মল চিন্মাত্ররূপে চিন্তা করা যাইতে পারে।

চিদংশই প্রাণী মাত্রেরই মূল। সামান্য কীটাণু হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল প্রকার প্রাণীতেই চিদংশ অণুপ্রবিষ্ট। কেবল মনুষ্যই জীব এমত নহে; মানব অবস্থাব্যতীত তাহার নিম্নোপর সকল রাজ্যেই জীব বর্ত্তমান। শরীরী মাত্রেই প্রাণী বা জীব। একটী জীবাত্মা কহিলে একটী পৃথক্ প্রাণীই বুঝায়, এবং তাহার আমিত্বের মূল তাহার চিদংশেই অবস্থিত—হইতে পারে তাহার বিবিধ উপাধিতে তখনও আত্মজ্ঞান বিকসিত হয় নাই, এবং তখনও সে সুপ্ত বা অজ্ঞানবৎ নিম্ন খনিজ প্রভৃতি রাজ্য মধ্যে অবস্থিত। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ব্যষ্টি, সমষ্টি নানা প্রকার শরীরানুযায়ী জীবকে আমরা সামান্যতঃও মহৎ নানা ভাবে গণনা করিয়া থাকি। Secret Doctrine মধ্যে উচ্চ, মধ্যম

নিম্নশ্রেণীভুক্ত বিবিধ পর্য্যায়ের প্রত্যেক দেবমণ্ডলীও জীবরূপে আখ্যাত হইয়াছেন ও তাঁহাদের প্রত্যেক পর্য্যায় নিম্নস্থ অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর জীবকে তাঁহাদের দেহে ধারণ করিতেছেন। আধুনিক Physiology দেহতত্ত্ব বিজ্ঞান মধ্যেও আমরা প্রাণী সম্বন্ধে অবিকল সেইরূপ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বহু পর্য্যায় দেখিতে পাই ; যথা,—

প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রাণীগণকে (Cells) দ্ব্যণুক, এসরেণু কহে (দুইটী অণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, তিনটী দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটী এসরেণু হইয়া থাকে)

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণিগণ, উক্ত দ্ব্যণুক, এসরেণু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া সূত্রপুঞ্জ Tissucs বা তন্তুরূপে পরিণত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণিগণ, ২য় শ্রেণীর প্রাণিগণ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় ও তাহাদিগকে (Organs) বিবিধ অঙ্গ কহে।

৪র্থ শ্রেণীর প্রাণিগণ ৩য় শ্রেণীর প্রাণিগণ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে Persons দেহ কহে।

৫ম শ্রেণীর প্রাণিগণ, ৪র্থ শ্রেণীর প্রাণিগণ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে (Communities) সমাজ কহে।

উত্তরোত্তর আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানব জাতিতে, এবং ক্রমশঃ তাহাদের সমষ্টি সমগ্র মানব রাজ্যে উপনীত হইতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব একত্রিত হইয়া একটী বৃহত্তর জীব নির্ম্মাণ করে। পৃথিবী একটী জীব—এতদ্দ্বারা মনুষ্যের জীবত্ব কোনরূপে অস্বীকার করা হইতেছে না। এক এক জাতিতে একই মাত্র প্রাণ ধাবিত হইয়া থাকে, এবং সকল জাতির মধ্যে সে প্রাণ বাহিত হইতেছে। সেই প্রাণ অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চতর বিবর্ত্তিত। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এক এক প্রকারের ইচ্ছা, চিন্তা ও ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাকেই আমরা সেই সেই জাতির বিশেষ ধর্ম্ম বা লক্ষণ কহিয়া থাকি। ম্যাদাম ব্লাভাটস্কী দেব, পিতৃ, মুক্ত মানব প্রভৃতি বিবিধ মণ্ডলীর বিবিধ পর্য্যায়কে এক এক জীব (Individual) কহিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। অবশ্য অনেকে এখনও তাহা বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। "The Heavenly Man" ব্রহ্মা বা তৃতীয় পুরুষ কহিলে কেবলমাত্র বাক্যের অলঙ্কারের ছটা

বুঝায় না। "Planetary Logoi" সপ্ত গ্রহাধিষ্ঠাতৃ দেবতারা যথার্থতঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের (Solar Logos) দেহে অবস্থিত কয়েকটি চক্র মাত্র।

যদ্যপি কেহ এই মত এখনও ভ্রমাত্মক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্ব স্ব দেহ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর হইতে পারে। জীবিত ব্যক্তির সজীব রক্ত অণুবীক্ষণ দ্বারা জীবন্ত রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন কিরূপে পৃথক পৃথক জীবাণুসমূহ তন্মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, কেহ বা অপরকে বলে আক্রমণ করিতেছে এবং কখনও তাহাকে পরাজয় করিতেছে, কখনও বা নিজেই পরাস্ত হইতেছে। কিন্তু তাহারা সে দেহের উপাদান স্বরূপ ও যাহার পুষ্টির জন্য অবস্থিত, সেই দেহ যে বৃহত্তর জীবের যন্ত্রস্বরূপ, সেই বৃহত্তর জীবকে তাহারা একবার চিন্তাও করে না। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে সর্ব্বোচ্চতম জীবের বিবিধ ক্রম, বিবিধ শ্রেণী চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সহস্র সহস্র অচিন্তিত সম্ভাবনার বিশাল চক্রবাড় (Horizen) আমাদের চিন্তাকাশে উদিত হইতে থাকে এবং বিশাল বিশ্বে আবৃত হইয়া, নানারূপে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম কিরূপে বহুধা প্রকাশিত হইয়াছেন, সে ভাবটীও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই একটী চিৎকণা একটী জড়োপাধিতে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সকলে উচ্চতর অনেক জীবের বিবিধ অংশ মাত্র, এবং যে পরিমাণে আমরা সকলে উচ্চবিবর্ত্তিত হইব, যে যে বৃহত্তর জীবের আমরা বিবিধ অংশ, তাহাদের সেই পরিমাণে উজ্জ্বলতর করিব ও তাহাদের উন্নত উদ্দেশ্য সফল করিব।

এইবার আমরা জীবের ত্রিভাবের আলোচনা করত তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অঞ্চলে উক্ত ত্রিভাবের নাম করণে সামান্য বিভিন্নতা আছে, কিন্তু উভয় স্থানেই উহা তুল্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, তিন হইল কেন? কেহ কেহ এই মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হয়েন যে, ঈশ্বরে ত্রিভাব বর্ত্তমান, এবং আমরা তাঁহার অংশ মাত্র, সেই জন্য ঐশ্বরিক ত্রিভাবের প্রতিবিম্ব মানবেও বর্ত্তমান আছে। তাহা সত্য বটে; কিন্তু ঈশ্বরে ত্রিভাব কেন বর্ত্তমান? অনেকে কহিয়া থাকেন যে, যাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, সেই গুহ্যতম বিষয় অন্বেষণ করা

আমাদের উচিত হয় না বা অনাবশ্যক। কিন্তু যদ্যপি ঐ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর অন্বেষণ করিতেই হইবে। কেবলমাত্র গুহ্যরহস্য উদ্‌ঘাটন দ্বারা, বিবিধ জটিল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ দ্বারাই এক্ষণে বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, মানবে সেই জ্ঞানের সংযোজনা হওয়ায় তাহার জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ জ্ঞানের সীমা মধ্যে আনয়ন করায়, গুহ্যরহস্য ব্যক্তাবস্থায় পরিণত করায়, আমাদের মনের পরিপুষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। কাহার এরূপ ক্ষমতা এবং কোথায় বা এরূপ লোক আছেন, যিনি কহিতে পারেন যে এই পর্য্যন্ত তোমরা অগ্রসর হইবে, ইহার বাহিরে কেহই যাইতে পারিবে না "Thus far shalt thou come and no further"? মানব বুদ্ধির হীনপ্রভা ও তাহার দুর্ব্বলতাই মানবের উন্নতির পক্ষে শত্রুবৎ বিদ্যমান। যাহা তিনি করিতে সক্ষম, তাহা তিনি করিতে পারেন।

আমাদের চৈতন্য বা জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই, জীবের ত্রিভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এবং জীব ঈশ্বরাংশ, ইহা সত্য হইলে, ঈশ্বরেও সচ্চিদানন্দ ত্রিভাব প্রমাণিত হয়; বিচার এই প্রমাণ দিয়া থাকে।

আমাদের চৈতন্যে জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে আমরা পৃথক্ অপর বস্তুর অস্তিত্ব (জড় প্রকৃতির) অনুভব করিয়া থাকি। ঐ অনুভূতি ইচ্ছাশক্তিকে প্রকাশ করে—তদ্দ্বারা আমরা বাহিরের পদার্থসমূহ গ্রহণ করিতে ধাবিত হই, কিম্বা ঐ সকলে বিরক্ত হই বা তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাই; অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। ইচ্ছাশক্তি পুনরায় ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে—যদ্দ্বারা জীব ইষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করে, কিম্বা কোন দ্রব্যে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে। জড় প্রকৃতির সম্মুখে বা বিপরীতে উক্ত ত্রিশক্তিই একত্র মিলিত হইয়া 'আমি আছি' (অহমস্মি) এই বাক্য কহিতেছে; 'আমি ইহা নহি' (অহং এতৎ ন) এই বাক্যেও উক্ত ত্রিশক্তি একত্র মিলিত; এবং আমি ইহা (অহমেতদস্মি) এই বলিয়া ইহাকে গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া ইহার নিকট অগ্রসর হওয়া ও জড় প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং 'আমি ইহা নহি' বলিয়া পরে ইহাকে পরিত্যাগ করত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করাতেও উক্ত ত্রিশক্তি একত্র মিলিত। (সদা সকল

ত্রিশক্তি একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করে—একের প্রাধান্য অবস্থায় অপর দুইটী তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করে)। আমাদিগের বাহিরে অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব, এবং আমাদের তাহার সহিত সম্বন্ধ, এ সকলই মূল প্রকৃতির বিদ্যমানে প্রকাশ পাইয়া থাকে—এতদ্দ্বারাও আমরা আমাদের ত্রিভাব জানিতে পারি।

বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের 'আমির' এই ত্রিভাব সূচন আমাদের মূল স্বভাব হওয়ায়, যে বিভুর আমরা অংশমাত্র, তাঁহারই উহা একটী সসীম অথচ যথার্থ প্রতিবিম্ব হইবে; এবং এই ত্রিভাবের কারণ অবগত হইবার জন্য আমাদের স্বভাবকে পরম উৎকর্ষ পর্য্যন্ত প্রসার করত বিশ্বব্যাপী করিতে হয়।

১। প্রত্যগাত্মাই ব্যক্ত ভাবাপন্ন পরম 'অহমস্মি' (I am)।

২। আত্মার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী অনাত্মা (মূলপ্রকৃতি) বর্ত্তমান।

৩। আত্মা ও মূলপ্রকৃতি পরস্পর পৃথক ও পরস্পর বিপরীতে অবস্থিত থাকলে উভয়েই নিষ্ফল ও বন্ধ্যাবৎ। কারণ সৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকরণ জন্য কেবল প্রত্যগাত্মা ও মূলপ্রকৃতি দুই দিকে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত থাকিলেই হইবে না, কিন্তু আত্মার অনাত্মাকে অনুভব করা চাহি, তাহার নিকট যাইবার ইচ্ছা হওয়া চাহি, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়া চাহি; অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রয়োজন।

আত্মা, অনাত্মা ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, এই তিনই চিরন্তন তিন। ইহার অধিক আর কিছু হইতে পারে না, কারণ সকলই ইহার অন্তর্গত। ইহা হইতে কিছু ন্যূনও হইতে পারে না, কারণ এই তিনের একটীর অভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্ত ঈশ্বর ত্রিভাব সম্পন্ন। এবং তজ্জন্য মানবেও ত্রিভাব বর্ত্তমান। প্রত্যগাত্মার মূল প্রকৃতিকে স্বীকার করণ, মনুষ্য পক্ষে অর্থাৎ তাঁহার চিদাভাস সম্বন্ধে বোধ বা অনুভূতি; ঈশ্বরের সঙ্কল্প অর্থাৎ বহু হইবার ইচ্ছায় মূল প্রকৃতি অভিমুখে অগ্রসর হওন, মনুষ্যের পক্ষে ইচ্ছা; মূল প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ, যদ্দ্বারা প্রকৃতি কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে, মনুষ্য সম্বন্ধে উহা ক্রিয়া।

সান্নিধ্য হেতু পুরুষের ছায়া প্রকৃতিতে পতিত হওয়াতে পুরুষের উপর

প্রকৃতির ক্রিয়া হইতেই বোধ বা অনুজ্ঞান উদয় হয়। চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, এই নিমিত্ত পুরুষের (অবিদ্যার বশীভূত জীবের) আর একটী নাম "দর্শিত বিষয় হইয়াছে। পাতঞ্জলি কহিতেছেন ; "দর্শিত বিষয়ত্বাৎ বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র।" ইতরত্র অর্থাৎ বুত্থানকালে—যোগাবস্থা হইতে বিভিন্ন অবস্থায়—পুরুষ ঐরূপে বিষয়ের ছায়া প্রাপ্ত হইয়া 'ইহাই আমি' বিবেচনা করেন, অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি জড় স্বভাব না হইয়াও পুরুষ তদাত্মক হয়, সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম বিশিষ্টের ন্যায় জ্ঞাত হয়।" প্রকৃত পক্ষে বিষয়াকারে পরিণত চিত্তেরই ঐ কার্য্য। পঞ্চ শিখাচার্য্য বলিয়াছেন ; নদী হ্রদ প্রভৃতির কম্পিত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িলে, চন্দ্র কাঁপিতেছে বোধ হয়, জলের কম্পন যেরূপ চন্দ্রে আরোপিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষের ছায়া বিশিষ্ট বুদ্ধিও বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পুরুষকে স্বীয় ভাবাপন্ন করিয়া থাকে। "বাচস্পতিমিশ্র ত কেবল বুদ্ধিতেই পুরুষের ছায়া স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে উভয়ের ছায়াই উভয়ে পতিত হয়। যেরূপেই হউক, বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি হইলে উহা পুরুষের স্বকীয় বলিয়া বলিয়া বোধ হয়, চিত্তে ও পুরুষে বিকাশ থাকে না বলিয়াই প্রতীতি হয়। "ভোক্তৃ (শক্তি পুরুষের পরিণাম নাই, উহার প্রতিসংক্রম অর্থাৎ প্রতিসঞ্চার হয় না, বুদ্ধি নামক পদার্থ বিষয়াকারে পরিণত হইলে তাহাতে প্রতি সংক্রান্তের ন্যায় হইয়া (ছায়া পড়িয়া যেন তদ্রূপই হইয়া) বুদ্ধির বৃত্তি প্রকাশ করে, অর্থাৎ আপনার বলিয়া অভিমান করে। চৈতন্যের উপগ্রহ (উপরাগ) বা ছায়া প্রাপ্ত বুদ্ধির অনুকরণ করে বলিয়া জ্ঞানবৃত্তি পুরুষকে বুদ্ধিবৃত্তির অপৃথক্ বৃত্তি বা সমানধর্ম্মক বলিয়া ব্যবহার হয়, বুদ্ধির বৃত্তিকেই যেন পুরুষের বৃত্তি বলিয়া ভান হয়।" আমাদের বোধ বা অনুভূতি এইরূপেই হইয়া থাকে। চিত্তের সূক্ষ্ম প্রবেশের ও সূক্ষ্মাকার ধারণার এরূপ বিস্তৃত ক্ষমতা যে, উহা স্থূল পদার্থেও স্বীয় অধিকার প্রসারিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সূক্ষ্মরূপান্তরিত অবস্থা, এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি স্থূল অঙ্গ বা দ্বার দিয়া বাহিরের যে সমস্ত বিষয় ভিতরে প্রবেশ করে, সেই বিষয় গুলি উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব অভ্যন্তরে গ্রহণ করত চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকে—চিত্ত সেই সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়।

এক্ষণে চিত্ত সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক। পাতঞ্জলি কহিতেছেন : "দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা।" "নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম, মস্তকস্থজ্যোতিঃ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য দেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা।" "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" "বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যে কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, সেই বিষয়াকারে বারম্বার চিত্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলে। ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইয়া ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়।" চিত্তের অবিরাম পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন বিষয়াকারে নিয়ত পরিণতি উপরোক্ত প্রণালীদ্বারা স্থির হইয়া থাকে। অর্থাৎ উত্তমরূপে চিন্তা করত কোন একটী উন্নত গুণ, ক্ষমতা বা কোন একটী ইষ্ট দেবমূর্ত্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতেই একান্ত মনোনিবেশ করিয়া চিত্তকে তদাকারে পরিণত করিতে পারিলে চিত্তস্থির ক্রমশঃ হইয়া থাকে। যেমন, একটি মহৎ গুণ ধ্যান করিতে করিতে উক্ত গুণ চিত্তে প্রতিফলিত হয় এবং জীব তাদাত্মভাব ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ দেবকে ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে আমরা কৃষ্ণময় বা বুদ্ধময় দেখিতে থাকিব ও শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেবেই পরিণত হইব বা মিশাইব। ইহার উপরে প্রাচ্য "সোঽহং" মহাবাক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে এক্ষণে উহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তোতাপাখীর ন্যায় কেবল বারবার উচ্চারণ করিলেই সেই অনন্ত জীবনের জ্ঞান হইবে না ; আমরা ধ্যান দ্বারাই কেবল এই বদ্ধাবস্থা অতিক্রম করত মুক্ত হইতে পারি—বাক্যদ্বারা তাহা সাধিত হয় না। চিন্তাদ্বারা মানব জ্ঞানলাভ করে, এবং চিন্তাদ্বারাই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি ঈশ্বরকে আদর্শ করত ধারাবাহিক ধ্যান দ্বারা আপনাকে আদর্শতুল্য করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর হইয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তির চিত্ত তদাকারে (আদর্শ ঈশ্বরের আকারে) পরিণত হয়, এবং এইরূপে তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, তখন "দিব্যে ব্রহ্মপুরে প্রতিষ্ঠিত" প্রত্যগাত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়েন এবং তিনিও তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। তজ্জন্য S. Anslem কহিয়াছেন "Become That which you are." তুমি যে ব্রহ্ম তাহাই হও।

এইরূপে যথার্থ পর বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ অভ্যাস পরস্পর অতি ঘন সংযুক্ত। যথার্থ পরবিজ্ঞানের উপর যাহার ভিত্তি স্থাপিত নহে, সে অভ্যাস বা ক্রিয়া যোগ

বিশুদ্ধ নহে। এবং কোন বিজ্ঞানই যথার্থ ও জীবন্ত হইতে পারে না, যাহা হইতে পবিত্র নিরাময় অভ্যাস বিকসিত না হয়। আমাদের ঐশিক ভাব প্রস্ফুটিত করিতে উভয়ই নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

চৈতন্য (Conciousness) ও আত্মজ্ঞান ("Self-Consiousness) কাহাকে কহে উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। "Am" "আছি মাত্রের" জ্ঞানই চৈতন্য বা Conciousness প্রাণের অন্তর্মুখী অবস্থা। (প্রাণ, চৈতন্য, আত্মা এই সকল গুলিই সমপর্য্যায়ের শব্দ) কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান (Self-Conciousness) কহে—যথা, "I am" আমি আছি বা অহমস্মি—এখানে প্রাণ বহির্মুখী এবং আপনাকে বাহিরে অবস্থিত অপর সকল হইতে পৃথক বোধ করা হয়। যখন কোন জীব জীবাণু স্বীয় অভ্যন্তরে ঈষৎ স্ফুরণ অনুভব করে, তখন তাহার চৈতন্য জাগরিত হইতে আরম্ভ হয়—"আছিমাত্র" তখন ইহার অস্তিত্বের জ্ঞান। যখন বাহির হইতে অনেক সংঘাত ক্রমশঃ আসিতে থাকে, এবং প্রত্যেক সংযোগ জীবের অন্তরে ঈষৎ স্পন্দন উৎপন্ন করে, উপর্য্যুপরি এইরূপ হইতে থাকিলে একবার স্পর্শে একটু সামান্য গতি, আবার স্পর্শে পুনরায় অল্প গতি—তখন কার্য্যকারণের ভাবটী অল্প অল্প দেখা দিতে থাকে। একটী সংযোগ হইতে জীবের অভ্যন্তরে একটী গতি উৎপন্ন হয়—স্থূলশরীরে বাহ্য স্থূলবস্তুর আঘাত জীবচৈতন্যের উক্ত গতির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। বহুকাল ঐরূপ ঘাত, প্রতিঘাত চলিতে চলিতে, যে আঘাত করে এবং সেই আঘাত দ্বারা যাহাতে গতি বা স্ফুরণ উৎপন্ন হয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর পার্থক্যজ্ঞান ধীরে ধীরে জীবে উদিত হইতে থাকে। সে মুহূর্ত্তে পার্থক্য জ্ঞানের উদয় হইল, তখনই 'আমি' ও 'অপর' জ্ঞান জন্মিল এবং 'অহমস্মি' 'আমি আছি' বোধও হইতে আরম্ভ হইল—(সেই সময় হইতেই আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল)। চিদ্বিম্ব অবতরণকালে একটী অণুগ্রহণ করিয়া জীবরূপে (Spirit) পরিণত হন—তিনিই Monad জীবাত্মা। সেই চিৎকণাতে (acceness) 'আছি মাত্র' জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। আপনাকে নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট করিবার জন্য জীব শরীর গ্রহণে ধাবিত হয়। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

ওঁ
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ । পৌষ ১৩১৭ । ৯ম সংখ্যা ।

বিশ্বরূপ ।

(গীতোক্ত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন ।)

১

ওহে দেব ! তব দেহ মাঝে হেরি একি অপরূপ দৃশ্য !
নাভি উৎপল—আসন উপর
চতুর-আনন লোক-ঈশ্বর,
দিব্য উরগ ঋষি ভাস্বর
সর্ব্ব অমর জঙ্গমাচর
বিরাজে বিরাট শরীরে তোমার নিখিল বিপুল বিশ্ব !

২

বিশ্বের ওহে ঈশ্বর, তুমি ধ'রেছ বিশ্ব-রূপ,
বহু সহস্র হেরি বাহূদর
বক্ত্র-বিসর নেত্র-নিকর,
অন্তমধ্য আদি অগোচর
সপ্তভুবন তোমারি ভিতর
লুটিছে টুটিছে উঠিছে পড়িছে, একি অনন্তরূপ!

৩

তোমারি দত্ত দিব্যনেত্র তুলি' হেরি কোন মতে :—
সর্ব্বতঃ রবি-বহ্নি-দীপন
অনন্ত জ্যোতিঃ ঝরিছে কেমন,
ভেদিতা আলোক-পুঞ্জ-গঠন
চক্র কিরীট-গদা-সুশোভন
অপূর্ব্ব তব মুরতি মোহন ফুটিছে নয়ন পথে।

৪

হেরি ও বিরাট তেজ-কলেবর হয় হেন অনুমান :—
তুমি অক্ষর পুরুষ প্রবর,
তোমাকেই চাহে মুমুক্ষু নর
তুমি সনাতন অজর অমর
নিত্য ধরম রক্ষণ-পর
বিশ্ব তোমাতে ওহে শাশ্বত করয়ে অধিষ্ঠান।

৫

না পাই অন্ত মধ্য বা আদি বিশ্বরূপের তব;
অসীম বীর্য্য, অনন্ত কর,
রবি শশী দুটি নেত্রবিবর,
ঝলকে কিরণ চির ভাস্বর
বদনে দীপ্ত অনল নির্ঝর,
আপন কিরণে করিছ তপ্ত ভূলোক দ্যুলোক সব।

ভূতল হইতে স্বরগ অবধি অসীম শূন্যাকাশ
—একি বিচিত্র!—তুমি অব্যয়
রহিয়াছ সদা ব্যাপী দিক্-চয়
হে মহান্! তব মহা তেজোময়
ঘোররূপ হেরি ভুবনত্রয়
স্তম্ভিত রহে বিস্ময় ভরে, কম্পিত করে ত্রাস।

৭

ও বিরাট বপু হেরিয়া তোমার ভূভার হরণকামী
সুরবীরগণ লইছে শরণ,
স্তুতি করে কেহ অতি ভীতমন
অঞ্জলি বাঁধি, করিছে পঠন
র'চি বহুতর স্বস্তি-বচন
যতেক সিদ্ধ-মহর্ষিগণ ভক্তির অনুগামী।

৮

ও বিপুলকায় দর্শন করে অতি বিস্ময়ভরে
আদিত্য, বসু, রুদ্র, পবন,
পূর্ব্ব পুরুষ উষ্ণ অশন,
অশ্বিনি-যুগ, দিতি-নন্দন,
কিন্নর-দল, বিশ্বাদি-গণ,
সাধ্য, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ, রণ অঙ্গন-পরে।

৯

ওহে মহাভুজ নেহারি নেত্রে অতিকায় অতিঘোর,
অসংখ্য তব বিপুল বদন
অগণন তব দীপ্ত নয়ন
বহুবাহু উরু উদর চরণ
ভীষণ দশন করি দর্শন
ত্রিলোকের লোক শঙ্কিত অতি, কম্পিত চিত মোর।

বিস্তৃত তব মুখ-গহ্বর গগন করিছে গ্রাস,
স্রস্ত ভীষণ বর্ণ সকল,
দীপ্ত বিশাল-নেত্র অনল,
নেহারি চিত্ত হ'তেছে বিকল,
ধৈর্য্য ধরিতে নাহি আর বল,
অশান্ত মম অন্তর হ'তে প্রবোধ হরিছে ত্রাস।

১১

ওহো কি ভীষণ বদন-নিকর, ভীষণ দর্শন ধরি
উগরে দীপ্তি যেন কালানল,
তাহে দিশাহারা হ'তেছি, বিকল,
অন্ধ ধন্ধ নয়নে কেবল
নাহি সুখ-কণা অন্তর-তল
ওহে দেবদেব! জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও হরি!

১২

ওহো বিচিত্র ওহো! ভয়ানক একি অদ্ভুত দৃশ্য!
ধার্ত্তরাষ্ট্র পুত্র-নিকর
সহ সপক্ষ ভূপতি-বিসর
ও তব করাল বদন বিবর,
পশিতেছে অতি ভীত অন্তর,—
নির্ভয় ঘোর প্রতাপে যাদের কম্পিত হ'ত বিশ্ব।

১৩

ভীষ্ম ভীষণ সূতজ কর্ণ দ্রোণ রণ-গুরু, তূর্ণ
আমাদের পূর্ণ সুযোদ্ধৃগণ—
পশিতেছে তব ভয়াল বদন;
দলিত পিশিত পিণ্ড মতন
ভক্ষিত কেহ রয়েছে লগন
করাল দন্ত-অন্তর মাঝে, পিষ্ট শিরস চূর্ণ।

১৪

বিপুল প্রসর বদনে তোমার পশে নর, নরবীর,—
পতঙ্গ দল দীপ্ত কিরণ
বহ্নির মুখে লভিতে মরণ
চঞ্চল পদে পশয়ে যেমন
অথবা যেমতি নদনদীগণ
অধীর আবেগে সিন্ধুর মুখে নিশায় আপন নীর :

১৫

বিশ্বব্যাপক! বিরাট পুরুষ! জ্বলন্ত মুখে তব
দিশি দিশি দিশি সর্ব্বভুবন
রসনার বসে করিছ লেহন,
কিরণ পুঞ্জে করি আপূরণ
সকল জগত, উগ্র ভীষণ
ভাস্বর তব দীপ্তি নিকর করিতেছে অভিভব।

১৬

নম নম ওহে দেববর। প্রসন্ন হও মোরে ;
করুণা করিয়ে কহ দীনজনে ;
কে আপনি বট ? কিসের কারণে
উগ্র মূরতি। আছ কি সাধনে ?
জানিতে বাসনা জাগিতেছে মনে,
জানিনা তোমারে হে আদি পুরুষ! আছি অজ্ঞান ঘোরে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

প্রেম বা প্রাণের বিকাশ।

(প্রথমানুবৃত্তি)

আকর্ষণ সর্ব্ব জাগতিক ধর্ম্ম। অতি নগণ্য ক্ষুদ্রতম হইতে মহত্তম পর্য্যন্ত, স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধকারের নিবিড়তম আবরণ হইতে জ্ঞান ভাস্করের দিব্য জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত এই আকর্ষণের চিরন্তনী খেলা নানাবিধ বৈচিত্র্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিতেছে। জড় ও চৈতন্যের রাজ্যে এই আকর্ষণ সমভাবে বিরাজমান। বিজ্ঞানের আণবিক কম্পন (vibration) এই আকর্ষণের ফল; সুতরাং এই আকর্ষণকেই প্রকৃতির একমাত্র আদি, মধ্য ও শেষ বলা যাইতে পারে। জগতের যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, এই মহা আকর্ষণের খেলা—সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গ্রহরাজি আকর্ষণধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত, অগণ্য নক্ষত্ররাজি অসীম শূন্যে এই আকর্ষণধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সঞ্চালিত। জগতে এই আকর্ষণ-যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্যেই প্রকৃতির বৃহদায়োজন—পুষ্প ও মধুমক্ষিকা, ছাত্র ও পুস্তক, চিত্রকর ও তুলিকা, জননী ও সন্তান, ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা—এই উভয়ের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণই বর্ত্তমান; আকর্ষণই এই দুইকে একের দিকে মিলনের দিকে আকর্ষণ-যজ্ঞে অগ্রসর করিবার জন্য ব্যস্ত। এই আকর্ষণ-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতেই যেন সমগ্র জগৎ ব্যস্ত। চৈতন্যশক্তি, আকর্ষণের পরিপোষক ও জড়ত্ব আকর্ষণের বাধক। একটি পরমাণু যে আর একটি পরমাণুকে আকর্ষণ করে, সে তাহাদের আভ্যন্তরীণ অনুস্যূত চৈতন্যশক্তি-বলে। অথচ জড় ও চৈতন্য প্রকাশ ভাবে নিত্যগ্রথিত। জড়ের সত্তা চৈতন্য ব্যতীত অসম্ভব, এবং চৈতন্যশক্তির প্রকাশভূমিই জড়। এই দুইটীকে বিভিন্ন করা বা বিভিন্নভাবে ধারণা করা সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত। আকৃতিগত বাহ্যিক বৈষম্যের ভিতর দিয়া আভ্যন্তরীণ চৈতন্যশক্তির সাম্যভাবের উপলব্ধি করানই এই আকর্ষণের উদ্দেশ্য। দুইটী বস্তু মিলিতে চায়; কারণ দুইয়ের মধ্যে একই চৈতন্যশক্তি বিরাজমান, কিন্তু তাহারা মূলতঃ এক হইলেও তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্য তাহাদিগকে দুই করিয়া রাখিয়াছে এবং দ্বৈতভাব আছে বলিয়াই মিলন আছে; নচেৎ দুই না থাকিয়া এক থাকিলে আর মিলন

কোথায়? স্থাবর ও জঙ্গম উভয় জগতেই এই আকর্ষণ সমভাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে জঙ্গমজগতে চৈতন্যশক্তি প্রকাশবহুলা হওয়ায় জঙ্গম জগতেই এই আকর্ষণের লীলা সমধিক অনুভবনীয়া। মানবজগতে এই আকর্ষণের তীব্রতা প্রতিনিয়ত অনুভূত হইতেছে। এই আকর্ষণের জন্যই সৃষ্টিপ্রবাহ বর্ত্তমান। মানবের এই আকর্ষণ, কোথাও কাম, কোথাও লালসা, কোথাও দ্বেষ, কোথাও ক্রোধরূপে বর্ত্তমান। মানবকে প্রতিমুহূর্ত্তে এই আকর্ষণের তীব্রতা অসীমত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। মানব যখন নিজের প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারে না, তখনই ছুটাছুটি করিয়া প্রাণের আবেগে লালসার উন্মাদ মূর্চ্ছনার ঝঙ্কারে প্রাণের তন্ত্রী নাচাইয়া আকুলতার স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তখন সে নিজের আভ্যন্তরীণ অসীমত্বে ভুলিয়া গিয়া বাহিরে প্রতিফলিত ছায়ায় নিজের স্বভাবের তৃপ্তি খুজিয়া বেড়ায়। কিন্তু বস্তুতঃ এই তৃপ্তি বাহিরের বস্তুতে নাই, এই তৃপ্তি নিজের অসীমত্বের স্বভাবের বাহ্যিক বিকাশে নাই। ইহা নিজের আভ্যন্তরীণ আত্মস্বভাবের পূর্ণ বিকাশে। মানুষ বিশ্বে যত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যদর্শনে মোহিত হয়, সে সমস্ত বাহ্যিক জগতের মাধুর্য্য নহে, সে তাহার নিজের অসীম মাধুর্য্যের বিকাশ। সমস্ত বিশ্বে তাহার নিজের ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া—আত্মার অনন্ত মাধুর্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাই সে নিজের মাধুর্য্য বাহিরে দেখিয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আকুল হইয়া পড়ে। যাঁহার নিজের মাধুর্য্যের যত বিকাশ হইয়াছে, তিনি বাহ্যজগতে তত সুন্দর, তত মধুর, তত তৃপ্তিজনক বলিয়া মনে করেন। একজন কবি একটি পত্রে একপ্রকার মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া মোহিত হইয়া বিশ্বপিতার স্তুতি গীতে হৃদয় নিনাদিত করেন; একজন উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ ঐ একই পত্রে আর একপ্রকার মাধুর্য্য দর্শন করেন। অপর একজন বিজ্ঞানবিৎ ঐ পত্রে অন্যপ্রকার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন এবং একজন আত্মতত্ত্ববিৎ বা ব্রহ্মবিৎ ঐ পত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মভাব অনুভব করেন। বাস্তবিক জাগতিক জিনিষের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের নিজের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেরই পরিচয় পান; কিন্তু মানব যতদিন আত্মস্থ না হয়, ততদিন এই সৌন্দর্য্যকে সে বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করে। সেই জন্য সাধক কবীর বলিয়াছেন :—

"নাভিকে সুগন্ধি মৃগ নাহি জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই"

অর্থাৎ কস্তুরী মৃগ যেমন নাভিস্থ সুগন্ধ বাহ্যজগত হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে করিয়া অন্ধ হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি মানুষও নিজের মধ্যের অসীমত্বের মাধুর্য্য ভুলিয়া বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করে, কবিকুল-তিলক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
কস্তুরী মৃগ সম
আপন গন্ধে মম"

এক্ষণে এই মহাবলশালী অসীমত্বব্যঞ্জক আকর্ষণের স্বরূপ ও কার্য্যসম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এই আকর্ষণকে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

জগতের প্রত্যেক জিনিষই ব্রহ্মের অংশ; অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষেই পরিপূর্ণ চৈতন্যশক্তি অপ্রকট অবস্থায় থাকিলেও প্রকট অবস্থায় তাহার আংশিক অনুভূতি হয়। সকলই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মশক্তি সাগরের দিকে যেন স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে, স্থাবরজগত হইতে এই ক্রমোন্নতি স্রোত আরম্ভ হইয়া জঙ্গমজগতের চরমসীমায় অতীত স্থানে অবিশ্রান্ত গতিতে নিয়ত বহিতেছে। ইহার আদি ও অন্ত মানবধারণার অতীত, কেবল মধ্যাবস্থা মাত্র ক্ষণিকের জন্য নয়নসমক্ষে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টিশক্তিকে ঝলসাইয়া ফেলিয়া কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতের পরিপূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া যায়। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন——

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত !
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

অর্থাৎ "হে ভারত! তুমি ভাবিয়া দেখ, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই সকল শরীর অব্যক্ত ছিল, উৎপত্তির পরে এবং মরণের পূর্ব্বে অর্থাৎ জন্ম মরণের মধ্যসময়ে কিছুদিন অভিব্যক্ত ছিল, নিধনে অব্যক্ত হইবে। শরীরের স্বভাবই এইরূপ; অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা অব্যক্তরূপ নিধনেও অব্যক্ত, মধ্যে কিছুদিন মাত্র ব্যক্তরূপ, অতএব এরূপ শরীরের জন্য পরিদেবনা কি?"

বাস্তবিক প্রাকৃত মানব এই মধ্যাবস্থাটুকু ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে না। তবে এস্থলে তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধারণ লোকের মধ্যে

প্রভেদ এই যে, জ্ঞানিগণ এই জীবনকে চৈতন্যের সাময়িক বিকাশ বলিয়া দর্শন করেন এবং জন্মমৃত্যুর মিথ্যামোহে মোহিত হন না; কিন্তু সাধারণ লোকে এই জীবনকেই বাস্তব সত্য মনে করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এক অখণ্ড ক্রমবিবর্ত্তনের সূত্র জীবনীশক্তি ও শরীরকে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সংযোগভাবই সৃষ্টি। স্বীয় বিকাশের তারতম্য অনুসারে এই বাহ্য আকৃতির ক্রমোন্নতিই চৈতন্যশক্তির কার্য্য। জীবনীশক্তির এই পূর্ণ বিকাশের আভ্যন্তরীণ চেষ্টাতেই এই ক্রমবিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়ী ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা। রঙ্গালয়ে ঘন ঘন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রকৃতিদেবী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের নয়নসমক্ষে নানারূপ লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তনের অভিনয় করিতেছেন। দেশ কাল ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা পরিচ্ছিন্না সগুণা প্রকৃতির অংশীভূত প্রত্যেক দ্রব্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যেখানে সমুদ্র, দুই সহস্র বৎসর পরে হয় ত সেখানে মরুভূমি। আজি যেখানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর, যুগযুগান্তর পরে হয় ত সে স্থলে বারিনিধির ক্রীড়াক্ষেত্র। আজি যে শিশু, কয়েক বৎসর পরে সে যুবা। আজি যে পাপী, কাল হয়ত সে পুণ্যবান্। আজি যে ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত, কাল তাহা বিশুষ্ক এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিত্য স্বভাব। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা একটী সার্ব্বভৌম নিয়ম দেখিতে পাই। প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে একটী ক্রমোন্নতি স্রোত বর্ত্তমান, এই স্রোতে জড়ত্বকে উদ্ভিদ রাজ্যের দিকে, উদ্ভিদ রাজ্যকে জীবত্বের দিকে, জীবত্বকে মানবত্বের দিকে এবং মানবত্বকে দেবত্বের দিকে ছুটাইয়াছে। এই বড় হইবার জন্য—নিজের স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে অনন্ত আকুলতা, ইহাই চৈতন্য শক্তির ক্রিয়া। যতদিন পূর্ণতাকে অবলম্বন করিতে না পারে, ততদিন কেহ কোনও অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। এই অসন্তুষ্টি, এই অস্থিরতা, এই অনন্ত আকুলতা আছে বলিয়াই সকলেই সুখের জন্য, পূর্ণ শান্তি লাভের জন্য অনন্ত আনন্দের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমান হইতে অধিকতর শান্তিপূর্ণ অবস্থার দিকে সকলেরই লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই এই পরিবর্ত্তন। জীবনীশক্তির এই ক্রিয়াই আকর্ষণ রূপে বর্ত্তমান। জীবনী শক্তিই এই আকর্ষণের মূল কারণ। জড়জগতে এই আকর্ষণ বা প্রেম অজ্ঞানতার মধ্য দিয়া অনুস্যূত। সেখানে স্বাভাবিক ধর্ম্মানু-

সারে দুইটী জিনিষ পরস্পর মিলিতে চায়; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার আকুলতা সেখানে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং এই আকর্ষণে দুইয়ের পৃথকীভূত স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি বিদ্যমান নাই। এখানে এই অজ্ঞানের মধ্য দিয়া কার্য্য হয় বলিয়া ক্রিয়াশক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না। অগ্নির শক্তি সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, সে অগ্নি দ্বারা আপনার স্বেচ্ছাগত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়া লইতে পারে; কিন্তু যে ইহার দাহিকাশক্তির বিষয় জ্ঞাত নহে, সেও অগ্নিস্পর্শ করিলে তাহার অর্দ্ধদাহন অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে জড়জগতে এই আকর্ষণের জ্ঞান বর্ত্তমান না থাকায় বস্তুসমূহ ইহার সম্পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারে না; কিন্তু প্রাকৃতিক সাধারণ শক্তি অজ্ঞানেও আপনার কার্য্য সম্পন্ন করে। তাই এই জড়জগতে আকর্ষণের বিদ্যমানতায় জড়ত্ব পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

যে বস্তুতে যত জীবনের বিকাশ প্রেম বা অনুভূতিমূলক আকর্ষণের প্রাবল্য, তাহাতেই তত অধিকরূপে অনুভূত হয়। প্রেমের ধর্ম্ম আত্মবিস্তৃতি। প্রথমে দ্বৈতভাবের মধ্য দিয়া প্রেম কোন বিশেষ কৈন্দ্রিক শক্তি অবলম্বন করে। ক্রমে সেই কেন্দ্র হইতে প্রেমশক্তির যতই বিস্তৃতি হইতে থাকে, ততই এক অদ্ভুত প্রাণারাম আকর্ষণ আবির্ভূত হইয়া প্রেমের ক্ষেত্রকে লইয়া একত্বের দিকে ছুটিতে থাকে। যে সকল বস্তু যতই জীবনী-শক্তি-উদ্ভাসিত, সেই সমস্ত বস্তুই তত বিশিষ্টভাবে প্রেমের প্রকাশক্ষেত্র। আমরা মনুষ্যজগতে আত্মবিসর্জ্জনের প্রারম্ভে দেখিয়া প্রেমের উচ্চতর প্রকাশ নির্ণয়ে সমর্থ হই। তাই মনস্বী সাধক Folston বলিয়াছেন "Love is love only when it is the sacrifice of self' "যে প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন বিদ্যমান, সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম"। প্রেমের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তির ক্রম বিকাশে এই সত্য ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। একটী উদাহরণ দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা জীবন বলি, উদ্ভিদ্-জগতেই যেন তাহার প্রথম বিকাশ হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি স্বপ্রয়োজনানুরূপ রস ও বায়ু আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ জীবনীশক্তির পরিস্ফুরণ করিতেছে, এবং তাহার অভাব ঘটিলেই মৃত্যুর কবলে গা ঢালিয়া দিতেছে। কিন্তু এখানে একটী বৃক্ষ আর একটী বৃক্ষের সহিত এমন বন্ধনে আবদ্ধ নহে, যাহাতে

একের অস্তিত্বের সাময়িক অনুভূতি অন্যের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু তবুও

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" মনু।

"ইহারা আভ্যন্তরীণ চৈতন্যশক্তিসম্পন্ন এবং সুখ দুঃখের অনুভূতিসমন্বিত।"

উহারা জীবনীশক্তির অনুরূপ বিকাশের অভাবে অসাড়তা বা তামসিকতা স্রোতে নিমগ্ন। এই কারণে এখানে আমরা প্রেমমূলক আকর্ষণের ক্রীড়া স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটু উন্নততর জগতে—অর্থাৎ যেখানে জীবনীশক্তির আরও অধিকতর বিকাশ হইয়াছে,—সেই পশুজগতের নিয়ম লক্ষ্য করুন। সেখানে দেখিতে পাই—প্রেমের নিম্নতম অবস্থা কামের বিকাশ সেখানে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে প্রেমের স্থূলতম ভাব অর্থাৎ আত্মবিসর্জ্জন-ইচ্ছা-বর্জ্জিত প্রাকৃতিক আকর্ষণ বর্ত্তমান। ইহাকেই সাধারণতঃ আমরা কাম নামে অভিহিত করি। এই প্রবৃত্তির সাময়িক উচ্ছ্বাসে হিংস্র প্রাণীদিগের অগ্রগণ্য একটি ব্যাঘ্র অন্য একটী ব্যাঘ্রীর দিকে লালসার তীব্রতা লইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে। সে সময়ে সে নিজের প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ মনে করিতেছে। লালসার পরিতৃপ্তিই তাহার তাৎকালিক-লক্ষ্যে পরিণত হইয়া তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত জগদ্ব্যাপারে অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে। যখন সেই বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদিত হইল, তখন সকলই শান্ত—যে প্রবল অগ্নিকুণ্ড সহসা অগাধ বারিবর্ষণে একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। আবার সেই ব্যাঘ্র ক্ষুধিত হইল, তখন সেই কামপ্রবৃত্তির আস্পদীভূতা ব্যাঘ্রীর আমমাংসশোণিতে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতেছে না। এখানে আকর্ষণের নিতান্ত স্থূলতম ভাব কেবল আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কামের সহিত আত্মবিসর্জ্জনের ভাব এখনও মিশ্রিত হইতে পারে নাই। তার পর আমরা পশুজগৎ ছাড়িয়া আদিম অসভ্য মানবজাতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, সেখানেও কামের এইরূপ সাময়িক তীব্রতার সহিত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার ভাব—সাময়িক সুখলালসা পরিতৃপ্তির ভাব বিশেষরূপে জড়িত। এখানে এ ভাবটি একটু সূক্ষ্মতর। এখানে প্রেমিক প্রেমাস্পদ (অথবা কামুক কামাস্পদের জন্য) কিছু কিছু ত্যাগ করিতে শিখিতেছে। কিন্তু সে অতি সামান্য। তারপর সেখানে তমোগুণের সহিত রজোগুণ মিশ্রিত হইয়াছে—সেই আধুনিক শিক্ষিত সমাজে নিতান্ত স্বার্থপর

লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এখানে আত্মবিসর্জ্জনের ভাব আর একটু জাগিয়াছে। এখানে আকর্ষণের তীব্রতা দমিত হইয়া সামাজিক বন্ধন বা বিবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এইখানেই প্রথম বিবাহের সৃষ্টি। দেখিতে পাই, মানব বিবাহ করিয়া পত্নীকে আদর যত্ন করিতেছে—তাহার সুখের জন্য অম্লানচিত্তে নিজের সুখের আশা ত্যাগ করিতেছে। তারপর এই মিলনের ফলে উৎপন্ন পুত্রকন্যার জন্য সে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখিতেছে—এমন কি সন্তানের প্রাণের জন্য, সন্তানের মঙ্গলের জন্য পিতামাতা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না। মানব যে আমিকে লইয়া একাই ব্যস্ত ছিল, তাহা পত্নী পুত্র কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের উপর অল্পাধিক পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ক্রমেই আমিত্বের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। এইরূপে প্রেমের স্থূলীভূত ভাব ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইতেছে ও জীবনীশক্তির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিকাশ বা আমিত্বের প্রসার ঘটিতেছে। এখানে ইহা অনুভূতি মূলক,'তাই মানুষ ভালবাসিয়া পরের জন্য আপনাকে অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে শিখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে। আরও দেখিলাম, লালসার আকর্ষণ যত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, প্রেমের স্থায়িত্ব ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং জীব ততই অল্পে অল্পে স্থায়ী আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

একই প্রেমস্রোত বিভিন্ন অবস্থাবশে কোথাও কাম, কোথাও প্রেম নামে অভিহিত হইতেছে। ইহাদিগের বাস্তবিক স্বরূপ কি তাহাই দেখা যাউক।

সাধারণতঃ আমরা সুখেচ্ছাবিহীন সহজ আকর্ষণকে প্রেম বলি ও লালসাবিশিষ্ট সুখাত্মক আকর্ষণকে কাম বলি। "কাম বহির্ম্মুখ, শুধু বাহিরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্মাকে বাহিরে প্রতিবিম্বিত করিয়া বাহ্যজগৎ লইয়া থাকিতে চায়। প্রেম অন্তর্ম্মুখ, জীবকে বাহির হইতে ফিরাইয়া ঘরে লইয়া যাইয়া আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করে। কামের গতি স্থূলে, প্রেমের গতি সূক্ষ্মে। একজন বহিরঙ্গের মত আসিয়া দুদণ্ড আদর যত্ন করে, তারপর ফেলিয়া চলিয়া যায়, আর একজন অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য ভুলাইয়া ক্রমশঃ বিমল হইতে বিমলতর প্রাণারাম আনন্দদানে প্রতিনিয়ত আত্মপুষ্টি সাধিত করে। একজন সংকীর্ণতার গতির মধ্যে অনন্তস্বভাব জীবকে পদে পদে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, আর একজন তাহার স্বভাব উপলব্ধি করাইয়া তাহাকে জীবনের

অনন্ত বিস্তৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেয়। প্রেম জীবকে হস্তাবলম্বন দিয়া ক্রমে ক্রমে আরোহণ মার্গের চরমসীমায় লইয়া যায়, কাম তাহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া অবরোহণ মার্গ অবলম্বনে নরকের অন্তঃস্থলে উপস্থিত করে। কাম নিবিড়তম অমাবস্থায় অন্ধকার—সমস্ত জগৎকে আবৃত করে এবং প্রেম জ্ঞানভাস্করের দিব্য জ্যোতিঃ, নিজে আলোকস্বরূপ এবং নিজেই লোক চক্ষু হইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করে। কিন্তু দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত ; যেহেতু দুইই এক আকর্ষণ ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা।

প্রকৃতপক্ষে এই কামতত্ত্বের মধ্যে ভগবানের একটি অপূর্ব্ব খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কামের মূল আকর্ষণ। দুইটী জিনিষের মধ্যে একটি একত্বসূচক ; অর্থাৎ সাধারণধর্ম্মী বস্তু না থাকিলে আকর্ষণ অসম্ভব। ভগবানই দুইটী জিনিষে যুগপৎ একত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আছেন বলিয়া কাম ও কামভোগ সম্ভব হইতেছে।

একই প্রেমের অবস্থাভেদে ইহাকে স্নেহ, ভক্তি প্রেম বা প্রণয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই নামকরণ লৌকিক। প্রেমের আর এক প্রকার নামকরণ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক। এই প্রেম যখন অধ্যাত্ম রাজ্যের বরেণ্য সহচর হইয়া সাধককে ভগবদেকশরণ করে, তখনও ইহার নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ আমরা ইহাকে ভক্তি নামে অভিহিত করি ; কিন্তু ইহার সূক্ষ্মতা ও নির্ম্মল মধুর উজ্জ্বল ভাব যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই ইহাকে প্রেম, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ আখ্যায় অভিহিত করি। যে অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রেম বিভিন্ন প্রকারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে রস বলে। প্রধানতঃ ইহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত। এ সমস্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের স্বরূপ জানিয়া যাঁহারা সূক্ষ্ম বিচারানুসন্ধানে তৃপ্তিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা উপযুক্ত আচার্য্যাবলম্বনে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিবেন।

যে পর্য্যন্ত "আমি" বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত আমিত্বের সম্পূর্ণ সত্তার সহিত প্রেমাস্পদের সত্তা না মিলিয়া যায়, ততক্ষণ যেন অতি সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্মতম অহঙ্কারের রজ্জু অবলম্বন করিয়া কাম বর্ত্তমান

থাকে। সেখানেও পরোক্ষভাবে সারথির অন্তরালে রথীর ন্যায় "আমি" কর্ত্তা থাকিয়া যায়। তবে এই যে কাম, ইহা প্রেমের আভাস। এই কাম যাহার আছে, তিনি ধন্য। এই সূক্ষ্মতম কামের ভিতর ও প্রেমের ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করা বড় শক্ত—এখানে বুদ্ধি প্রতিহতা ও ধারণা গতিশূন্যা। এই কামকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"কামোকার্ষীন্নমোনমঃ॥ কামোকার্ষীৎকামঃ করোতি নাহং করোমি কামঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা কামঃ কারয়িতা নাহং কারয়িতা॥ এষ তে কামকামায় স্বাহা।

—নারায়ণোপনিষৎ ৬১।

"কামই আকর্ষক ; অতএব ইহাকে নমস্কার করি। কামই আকর্ষণ করেন। কামই কর্ম্মাচরণ করেন, আমি করি না, কামই কর্ত্তা আমি কর্ত্তা নহি। কামই কর্ম্মের প্রেরককর্ত্তা আমি প্রেরককর্ত্তা নহি। এই কারণ ও কার্য্যরূপী কাম তোমারই প্রকাশ অতএব তোমাকে নমস্কার।" তবে সাধারণতঃ কাম ও প্রেমের পার্থক্যের জন্য ইহাই বলা যাইতে পারে যে যেখানে যেরূপ ভাবেই হউক "আমি"কে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি, সেখানেই কাম প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বর্ত্তমান ; কিন্তু যেখানে ত্যাগ বা যজ্ঞের ভিত্তির উপর ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বান্তর্যামী চিদানন্দরস ভগবানের স্থাপনা হইতেছে, সেইখানে প্রেম বর্ত্তমান। তমো ও রজোগুণে এমন কি রজোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণেও প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে ইহার উদ্ভব ও ইহার স্থিতি ইহার শেষ কোথায় তাহা কে জানিবে? তবে বোধ হয় যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, নানাত্বের ভেদের—দ্বৈতভাবের এমন কি অদ্বৈতভাবেরও যেখানে অবকাশ নাই, যেখানে জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ ভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানে প্রেমের উদ্দীপনা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "রসোবৈ সঃ।" তিনিই প্রেমের জীবন। সুতরাং যেখানেই যে ভাবেই হউক, কাম বা প্রেমের বিচার প্রয়োজন, সেখানেই নিম্নলিখিত মহাবাক্যটীকে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করিয়া আমরা প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি।

"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যেখানেই স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বা আমিত্বের স্থাপনার জন্য ইচ্ছা সংজাত হইতেছে, সেখানেই কাম ধীরে ধীরে আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু যখনই জগন্মঙ্গল, সর্ব্বস্বরূপ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তু যাঁহার ব্যঞ্জনা করিতেছে—তাঁহার সেবার জন্য—তাঁহার স্থাপনার জন্য কর্ত্তৃত্ববিহীন স্বাভাবিক ইচ্ছার উদয় হইতেছে, তখনই কোন লোকাতীত লোকেশ্বরের প্রেমবাঁশরীর ধ্বনি ধীরে ধীরে আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া "মরমে পশিয়া" আত্মাভি-মুখিনী হইতেছে।

কাম ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধপ্রেমে পরিণত হইয়া জীবকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের শেষ সীমায় উপনীত করিবে। যত দিন আমরা কামের মধ্যে ভগবদ্ভাব বা আত্মভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিব, তত দিন কাম কিছুতেই প্রেমে পরিণত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে কাম এই আত্মভাবের ব্যঞ্জক। তাই শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়াপ্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি * * * * ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি * * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মস্তু কামায় সর্ব্ব প্রিয়ং ভবতি।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪র্থ অঃ ৫ম ব্রাঃ।

ইহার ভাবার্থ এই যে—

"জগতের সমস্ত বস্তুই বিশেষ বিশেষ কোষাভিমানী আত্মার প্রিয়সাধন করে বলিয়াই প্রিয় হয়। কেবলমাত্র পতির প্রতি অভিলাষ আছে বলিয়া পতি প্রিয় হন না। আত্মা প্রিয় এবং তাঁহার সাধনের জন্যই পতি প্রিয় হন। জায়ার প্রতি অভিলাষ আছে বলিয়া জায়া প্রিয়া হন না কিন্তু আত্মা প্রিয় এবং তাহার প্রীতি সাধন করেন বলিয়া জায়া প্রিয়া। * * * * দেবতাদিগের কামনা সাধনের জন্য দেবতারা প্রিয় হন না কিন্তু আত্মা প্রিয় এবং প্রীতি সাধনের হেতু বলিয়া দেবতারা প্রিয়। এইরূপ সমস্ত বস্তুই আত্মার জন্যই প্রিয় বলিয়া কল্পিত হয়।"

কামের সহিত ত্যাগের ভাব যতই মিশিতে থাকে, ততই পূতা ভাগিরথী

ধারারূপা নিঃস্বার্থ প্রেমধারা কামের মলিনাংশ ধৌত করিয়া দেয়। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন জীব কামের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ ভগবস্তাব উপলব্ধি করিতে গিয়াও পারিতেছেন না, যেন কোথায় একটু বাধা বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে কখনও কখনও সেই কাম নিতান্ত নিকৃষ্টবৃত্তিরূপে পরিণত বলিয়া বোধ হইলেও তাহার ভিতর প্রেমের ভাব—সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের ভাব লুক্কায়িত থাকে। একটু সামান্য যে বাধা থাকে, তাহা দূরীভূত হইলেই এই সমস্ত সাধক—জগতের লোকে যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে অতীব ঘৃণিত চরিত্র বলিয়া জানিত, তাঁহারা অত্যল্প সময়েই প্রেমরাজ্যের মধুময় নিকেতনে—আধ্যাত্মিক রাজ্যের শান্তির বিমল ক্রোড়ে উপস্থিত হন। বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই প্রেমিকশ্রেষ্ঠ লীলাশুকে পরিণত হইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলের বেশ্যাসক্তিতে "আমিত্ব" প্রায় অবসিত হইয়াছিল। সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পর্য্যন্ত তন্ময়ী হইয়া গিয়াছিল—তুচ্ছ মৃত্যুভয় ত' দূরের কথা। এখানে প্রেমের উচ্চতম ভাব ঈষৎ অসম্পূর্ণতার অর্গলে বদ্ধ থাকিয়া কামের অভিনয় করিতেছিল। যাই সেই অর্গল খুলিয়া গেল, অমনি তাহার স্বাভাবিক গতি একেবারে চরম লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত হইল।

সাধনারাজ্যে ভগবৎসেবা জীবের চরম লক্ষ্য। ব্রহ্মলাভ বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ তাহার সোপান। ইহার জন্য নানারূপ পন্থা আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ প্রেম দুইরূপে সাধকের নিকট উপস্থিত হন। প্রথম এক প্রকারে, প্রেম বা চৈতন্যশক্তি আত্মাভিমুখী হইয়া আমার ভিতর দিয়া জগৎকে দেখায়। এইটি প্রথম আমিকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয়। ইহাকে "সোঽহং" ভাব বলে। দ্বিতীয় প্রকার ইহা হৃদয়ের একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া অহংকার অবলম্বনে জগতে সেবার ভাব লইয়া ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে সমস্ত বস্তুতে আত্মসত্তা দেখিয়া প্রকৃত আত্মানুভূতি করিতে সমর্থ হয়। এই শেষোক্ত ভাবটীর উৎপত্তি কোন কোন স্থলে ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা কাম হইতেই হইয়া থাকে। বুদ্ধের যশোধারার প্রতি ভালবাসা হইতেই বিশ্বপ্রেমের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় *। এ সম্বন্ধে ভাবুকশ্রেষ্ঠ Emerson বলিয়াছেন :—

"It is a fire that, kindling its first embers in the narrow

* Edwin Arnoldএর Light of Asia দেখুন।

nook of a private bosom, caught from a wandering spark out of another private heart, glows and enlarges until it warms and beams upon the universal heart of all, and so lights up the whole world and all nature with its generous flames."

"এই প্রেম অগ্নিস্বরূপ। প্রথমতঃ ইহা অপর একটী সুগুপ্ত হৃদয়ের প্রেমাগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ কোণে ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সার্ব্বজনীন হৃদয়কে উত্তপ্ত এবং আলোকিত করে এবং ইহার উদার মধুময় জ্যোতিঃ দ্বারা অবশেষে সকল জগতে এবং সমগ্র প্রকৃতির অন্ধকার দূরীভূত করে।

বাস্তবিক এই প্রকারে যখন কাম সকল সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে, তখনই কামের নির্ব্বাণ ও প্রেমের উদ্‌যাপন হয়—কামের চিতাভস্মের উপর তখন প্রেমের ভিত্তি অটলরূপে নিরঞ্জন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সাধককে দেখা যায়, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-পীড়নের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায়ে জড় কামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

গীতা ৩। ৬

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করে না; অথচ চিত্তের অশুদ্ধতা হেতু মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে কপটাচার বলিয়া জানিবে।"

আর এক প্রকারের সাধক নানারূপ কৌশলে কামকে দমিত রাখিয়া যোগ অবলম্বনে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন। ইহারা কামকে ঘৃণা করিয়া বা নিজ স্বার্থসাধনের প্রতিকূল ভাবিয়া, ভেদভাবের নিবৃত্তি না করিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। ইহারা ভগবল্লাভার্থী হইয়াও কামকে ভগবদ্বর্জ্জিত বলিয়া মনে করেন; সুতরাং ইঁহারা কামের ভিতর দিয়া কখনও ভগবদ্ভাব অনুভব করেন নাই। এই জন্য ইঁহাদের কাম স্থূলত্ব বা

স্থূলরূপাসক্তিতে নিবিষ্ট হইয়াই বীজভাবে অবস্থান করে। যখন ইঁহারা সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মলোকে উপস্থিত হন, তখন ইঁহারা সেখানে কামাসক্তি দ্বারা অধঃপতিত হন। পুরাণে আমরা অপ্সরা-প্রলোভনে অনেক তপস্বীদিগের তপোভঙ্গের বিবরণ প্রাপ্ত হই ; এই প্রকার সাধকদিগের ক্ষণিকমোহ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকমার্গে উপনীত করাইবার জন্য দেবরাজের এই অপ্সরা প্রেরণ। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে আসক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারা শক্তিসম্পন্ন হইলে নিজের ও অপরের নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করে, এই জন্য এই প্রকার সাধকদিগের মঙ্গলের জন্য বিশ্বহিতার্থী দেবতারা তাঁহাদের আশু পতনের "নিমিত্ত" হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, যতদিন দ্বৈত-ভাবের নিবৃত্তি না হয়, ততদিন কামের বা আসক্তির নিবৃত্তি হয় না। সাধারণ জীবের ধীশক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই জড়জগতের সহিত তাহার পার্থক্য সাধিত হয়। মনে করুন, আমি লেখাপড়া শিখিতেছি। নানাবিধ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, আমি বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিলাম ; অর্থাৎ আমার বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনের দ্বারা, যাহারা বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াছে, তাহাদের সহিত আমার পার্থক্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে নাই, তাহাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে এইরূপে একটি পার্থক্যের দ্বারা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এইরূপে আমার ধীশক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে অপর বহুবিধ লোক হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু প্রকৃতিদেবী নানাত্বের মধ্য দিয়া নানাবিধ পীড়নের দ্বারা সকলকে একত্বের আভাস উপলব্ধি করাইতে চেষ্টমানা। এই জন্য যতই আমি অপর হইতে পৃথক্ হইতে লাগিলাম, ততই তিনি কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ভক্তি, দয়া, ঘৃণা, অসূয়া ইত্যাদি নানাবিধ ভাবের দ্বারা বাহ্য-জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য ইত্যাদি একই কাম বা আসক্তির রূপান্তর মাত্র। এইরূপে যত দিন আমরা বুদ্ধি ও ভাবের (Intellect and heart) সংযোগ-বিধানে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগতের সহিত আমার একতা স্থাপন না করিতে পারিব—যত দিন নিজের মধ্যে এবং অপর সমস্ত বাহ্যজগতের মধ্যে একই ভগবদ্ভাব না দেখিতে পারিব, ততদিন এ কাম বা আসক্তির নিবৃত্তি নাই। বাস্তবিক জগতে যতদিন দুই থাকে, ততদিন দুইয়ের জ্ঞান থাকিয়া যায়। এই

জ্ঞান থাকা অর্থ দুইয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা। অথচ সম্বন্ধ স্থাপন আসক্তি ব্যতীত অসম্ভব।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি * * তদিতরং বিজানাতি।"

বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪।

"অর্থাৎ যেখানে দ্বৈতের ন্যায় বোধ হয়, সেখানেই একের অপরের সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

সুতরাং যত দিন প্রাণে প্রাণে পূর্ণ অদ্বৈতভাবের বিমল অনুভূতিস্রোত মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে চিত্তে, চিত্ত হইতে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার হইতে মহত্তত্ত্বে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন মানব আসক্তির বা দ্বৈতভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না এবং ততদিন মানব পূর্ণতার চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়া আত্মস্থ হইতে পারিবে না।

প্রেমের যেখানেই যে প্রকারেই উদ্ভব হউক না কেন, প্রথমে "আমি" ও "তুমি" লইয়া ইহা জগতে দেখা দেয়। কিন্তু নিত্য পরিবর্ত্তনশীল "আমি" ও "তুমি"র মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব। সুতরাং এই "আমি" ও "তুমি" এই দুইয়ের মধ্যে যে সাধারণ ভাব থাকে—যে সাধারণ ভাব অদ্যতন "আমি"র সহিত অনদ্যতন "আমি"র সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেই একত্বসূত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রেম জীবিত। এই জন্য প্রেম একত্বে সংস্থাপিত, বর্দ্ধিত ও রক্ষিত।

প্রেম দেশ, কাল বা পাত্রের অপেক্ষাবিবর্জ্জিত। অতএব প্রেম অনন্তধর্ম্মা ও একরস। ইহার আরম্ভ কোথায়, তাহা কেহ জানে না; আজিও পর্য্যন্ত ইহা নির্ণীত হয় নাই তবে সৃষ্টি বা প্রকাশভাবের প্রারম্ভেই ইহার প্রকাশ। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, নীচকে উচ্চ, স্বার্থকে পরার্থ করাই ইহার স্বভাব। অতএব ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে সমস্ত বিশ্বজগতের "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত" ইহার উপাসনা করিতেছে; অতএব ইহাই একমাত্র রসস্বরূপ। বিভিন্ন নদীগুলি যেমন স্রোতোবেগে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমগ্র বিশ্বস্থ ভাবাবলীকে প্রেম ঈশ্বরাভিমুখীন ও একত্বাভিমুখীন করে; এই জন্য ইহাই সমস্ত ভেদভাবের একমাত্র বিনাশক।

পরাবিদ্যা-সমিতির মূলস্থাপয়িতৃগণ এই প্রেমের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া সমগ্র জীবজগতে ভ্রাতৃত্বভাব বা প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনের উদ্যোগী। বাস্তবিক

প্রেমের ভিত্তি এই "একমেবাদ্বিতীয়ং" মন্ত্রের উপর। ইহা ব্যতীত এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাব (Universal Brother-hood) কখনও স্থাপিত হইতে পারে না।

এই প্রেমই রসস্বরূপ, এই প্রেমই ব্রহ্ম; ইহাকে জানিলে—

"পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে * * *।"

কঠ ৬।১০।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে। বুদ্ধি কামচেষ্টাবিরহিত হয়।

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়াত্মমিথুনাত্মানন্দ স স্বরাড়্ ভবতি।" (ছান্দোগ্য ৭।২৫। ২)

যিনি এই প্রকারে সম্যক্‌ভাবে ইহাকে দর্শন করেন, মনন করেন ও জানেন, তিনি এইরূপ করিয়া আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এবং স্বরাট হন। ইহাই পরমা গতি। ইহাই একমাত্র প্রেয় ও শ্রেয়ের অনন্ত সঙ্গমস্থল।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

রথযাত্রা।

রথযাত্রার দিন প্রাতঃকালে প্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয়ার্থ রথারোহণ লীলা দর্শন করিতে গেলেন। জগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক রথারোহণ করিতে চলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করাইতে লাগিলেন। বলবন্ত পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে ধরাধরি করিয়া রথস্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী লইয়া পথ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজার উক্ত নীচজনোচিত সেবাকার্য্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। মার্জ্জিত পথে,—চন্দন জল সেচন করা হইল। জগন্নাথ তূলার গদির উপর থাকিয়া থাকিয়া রথে আরোহণ করি-

লেন। পথের উভয় পার্শ্বে বিপণি। মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। প্রভু ভক্তগণকে মাল্যচন্দন দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় হইল। এক এক সম্প্রদায়ে ছয় জন করিয়া গায়ক ও দুইজন করিয়া বাদক দেওয়া হইল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিজন চারি সম্প্রদায় নৃত্যারম্ভ করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর প্রধান গায়ক এবং দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচ জন তাহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রধান গায়ক এবং গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান পণ্ডিত, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাঁচ জন তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে মুকুন্দ প্রধান গায়ক এবং বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন।

চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দ ঘোষ প্রধান গায়ক এবং হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত আরও তিনটী সম্প্রদায় গঠিত হইল, একটি কুলীন গ্রামের, একটি শান্তিপুরের ও অপরটি শ্রীখণ্ডের। রথের অগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রথ কখন শীঘ্র কখন মন্দ চলিতে লাগিল; কখন স্থির হইয়া থাকে, টানিলেও চলে না। যখন কোন রূপেই রথ চলে না, তখন মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া মাথা দিয়া রথ ঠেলেন, আবার রথ চলিতে থাকে। প্রভু কখন সাত সম্প্রদায়ে পৃথক্ পৃথক্ নৃত্য করেন, কখন যুগপৎ সাত সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতে থাকেন। স্বয়ং জগন্নাথ প্রভুর নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত রথ স্থগিত রাখেন। প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ঈদৃশ অদ্ভুত কীর্ত্তন দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী কাশী মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর প্রেমমহিমা বলিতে লাগিলেন। কাশী মিশ্রও রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুকে যুগপৎ সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও উহা দেখাইলেন। প্রভুর প্রসাদের অদ্ভুত রীতি, সাক্ষাতে রাজার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে এই প্রকার দয়া প্রকাশ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীমিশ্র রাজার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

প্রভু কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার লীলা করিয়া সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া স্বয়ং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক সকল পাঠ সহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

যিনি ব্রহ্মণ্যগণের পূজ্য, যিনি গোব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের কল্যাণ-দায়ক, যিনি গোগণের পালয়িতা, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

বৃষ্ণিকুল-প্রদীপ, মেঘশ্যামল, কোমলাঙ্গ, ভূভারহারী, মুক্তিদাতা, পূজ্য, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

"জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈ দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"

যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে বাস করিতেছেন, যিনি নন্দভার্য্যা ও বসুদেব ভার্য্যা হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সিদ্ধান্তিক হয়েন, ব্রজবাসী গোপগণ ও পুরবাসী ক্ষত্রিয়গণ যাঁহার সভাসদ, যিনি নিজ ভুজতুল্য অর্জ্জুনাদি দ্বারা অধর্ম্ম নিরসন করেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখহন্তা, যিনি সহাস্য বদন দ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবনিতা সকলের প্রেমরূপ অপ্রাকৃত কামের বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

পরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া পুনশ্চ প্রণাম করিলেন।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি গৃহস্থ নহি, বনবাসী নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃত সমুদ্র স্বরূপ শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসানুদাস।

প্রভু মধ্যে মধ্যে এতাদৃশ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বশরীরে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত স্তম্ভ স্বেদ ও পুলকাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভু ভাবাবেশে কখন ভূমিতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কখন বা নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেশ আরম্ভ হইলে, ভক্তগণ তিনটি মণ্ডল করিয়া লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ, দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর ও গোবিন্দাদি ভক্তগণ এবং তৃতীয় মণ্ডলে পাত্রমিত্রাদি সহিত স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপ-রুদ্র নিজমন্ত্রী হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও ভাবাবিষ্ট হইয়া রাজার অগ্রে থাকিয়া প্রভুর নৃত্যাবেশ দেখিতেছেন। হরিচন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতের গাত্রে হস্ত দিয়া তাঁহাকে রাজার সম্মুখভাগ হইতে একটু পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত হরিচন্দনের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, তুমি ভাগ্যবান্, শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তস্পর্শ লাভ করিয়াছ, আমার ভাগ্যে ঐরূপ হস্তস্পর্শ লাভ হয় না।" হরিচন্দন রাজার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও শান্ত হইলেন। এ দিকে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত বিকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল :

মাংস ব্রণের সহিত রোমবৃন্দ উত্থিত হইতে লাগিল, দন্ত সকল চলিত হইতে লাগিল, রোম কূপ দিয়া রক্তোদ্গম হইতে লাগিল, নয়ন যুগল হইতে প্রস্রবণের ন্যায় বারিধারা ছুটিতে লাগিল। তিনি কখন বা নিষ্পন্দ হইয়া ভূমিতলে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার ভাবাবেশ প্রকাশের পর প্রভু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। তখন স্বরূপ

দামোদরকে গান করিতে আদেশ করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর মন বুঝিয়া নিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন।—

"সেইত পরাণ নাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ ॥"

স্বরূপ গোঁসাই উচ্চকণ্ঠে উক্ত ধুয়া গাহিতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে মধুর মধুর নাচিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নৃত্য করেন, তখন জগন্নাথ রথ থামাইয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। আবার যখন প্রভু রথের অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন, তখন রথও চলিতে থাকে। নাচিতে নাচিতে আবার প্রভুর এক ভাব তরঙ্গ উঠিল। নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥"

রেবাতীরে কৃতক্রিয়া কোন এক নায়িকা ঐ স্থানের প্রতি সমুৎসুক হইয়া নিজ গৃহে সখীকে বলিতেছেন,—যিনি আমার কৌমারসহচর অভিমত পতি ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন; কালও সেই চৈত্ররজনী; সেই প্রফুল্ল মালতী কুসুমের গন্ধহারী কদম্ববনবায়ু বহন করিতেছে; আমিও সেই আছি; তথাপি রেবাতটস্থ বেতস কাননের সুরত ব্যাপার সকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

পূর্ব্বে যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনই আমার মন আকর্ষণ করিতেছে; অতএব সেই স্থানেই নিজ চরণ দর্শন করাও। এখানে লোকারণ্য হাতী ঘোড়া ও রথের ধ্বনি; বৃন্দাবনে পুষ্পারণ্য, ভ্রমর কোকিল ও ময়ূরাদির ধ্বনি। এখানে তোমার রাজবেশ, ক্ষত্রিয় সকল সহচর; বৃন্দাবনে গোপবেশ গোপসকল সহচর। এখানে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; সেখানে মুরলীবদন।

ব্রজে তোমার সঙ্গে যে সুখ আস্বাদন হয়, এখানে তাহার কণামাত্রও হয় না; অতএব পুনশ্চ যদি আমাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাবিহার কর, তাহা হইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। তদ্রূপ প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত শ্লোকটি পাঠ

করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গান করিলেন।

স্বরূপের গীত শেষ হইলে, প্রভু পুনশ্চ নৃত্য করিতে করিতে আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

উক্ত শ্লোক যথা—

"আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত গোপীগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে উহা শ্রবণ করিয়া সেই গোপীগণ বলিতেছেন,—তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরসন বিষয়ে ভাস্করসদৃশ, ইহা আমরা বিদিত আছি। আমরা কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের পাত্র নহি। আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারাই জীবন ধারণ করি। তদুপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরূপ আতপ আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সমুদিত হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা কর। হে নলিননাভ, যোগেশ্বরগণ তোমার চরণারবিন্দ হৃদয়ে চিন্তা করেন, আমরা উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি। যোগেশ্বরগণ অগাধবুদ্ধি, তাঁহারা তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারেন, আমরা বুদ্ধিহীনা অবলা, উহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াই মূর্চ্ছাসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি। তোমার ঐ পাদপদ্ম সংসার-কূপে পতিত লোক সকলকে অবলম্বনরূপে উদ্ধার করিয়া থাকে, ইহাও আমরা জানি; কিন্তু আমরা ত সংসার-কূপে পতিত হই নাই; বিরহসাগরে পতিত হইয়াছি, অতএব তচ্চিন্তন আমাদিগের পক্ষে ব্যর্থই হইতেছে। দ্বারকায় আসিয়া তোমার সহিত বিহারও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব; কারণ আমরা শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় আগমন করিতে অক্ষম। তোমার বৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যই আমাদিগের রুচিকর, দ্বারকৈশ্বর্য্য আমাদিগের রুচিকর হয় না। অতএব শ্রীবৃন্দাবনেই তোমার শ্রীচরণারবিন্দ উদয় কর। আমরা বৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণদর্শনে কৃতার্থ হইব, স্মরণে কৃতার্থ হইতে পারিব না।

প্রভুর ভাব-গতিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বরূপ গোঁসাই পুনশ্চ গান করিতে লাগিলেন। উক্ত গীত যথা—

অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শোন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচার॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটি নাটি,
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহে তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥

না গণি আর দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়া ও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজ ভূমি ছাড়িতে, নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥
শুনিয়া রাধিকা রাণী, ব্রজ প্রেম মনে আনি,
ভাবেতে ব্যাকুল হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ধ্রু ॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ সম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥
তোমা সবার প্রেম রসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল।
প্রিয়া-প্রিয় সঙ্গ-হীনা, প্রিয়-প্রিয়া সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরেতে ॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥
যাদবের প্রতি পক্ষ, দুষ্ট যত কংস পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সবক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মাঝি বৃন্দাবন,
আইলাম জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈঞা।
যে স্ত্রী পুত্র ধন করি, বাহ্য আবরণ ধরি,
যদুগণের সন্তোষ লাগিঞা ॥
তোমার যে প্রেম-গুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলসিব রাত্রি দিবসে ॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩১৭)

দয়াময়! তুমি ফল হ'য়ে গাছে ঝোলো, ঠাকুর হ'য়ে নৈবেদ্য খাও, আবার ছুটিয়া আসিয়া ভক্ত হ'য়ে প্রসাদ লও, ধন্য তোমার লীলা-চাতুরী।

(৩১৮)

শিশু যখন প্রথমে "বাবা" কিম্বা "মা" বলিতে শিখে, তখন তাহার মুখ হইতে "ব" কিম্বা "ম" একটী মাত্র অক্ষর বিনির্গত হয়। এই দুই একাক্ষরী মহামন্ত্রের সুমধুর সংযোগে যে "বম্" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার ভিতর জগজ্জীবের জনকজননীর যুগল মূরতি যে না দেখিতে পায়, তাহার জীবন জনম সকলই বৃথা।

(৩১৯)

হিন্দুর ঘরে বিধবা রমণীগণ আমার মহামায়া মায়ের ধূমাবতী মূর্ত্তি। কেহ কেহ আগুন খাইয়া পতির অনুগমন করেন, আর কেহ কেহ পতিকে পেটে পূরিয়া সর্ব্বদা নাসারন্ধ্রপথে ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। তাঁহাদের পতির চিতা অবিরাম তাঁহাদের হৃদয়ে হু হু প্রজ্বলিত, তাঁহাদের নিজের চিতায় জল ঢালিলে তবে তাঁহাদের যুগলমিলন হয়। সতীর সহমরণ সময়ে দম্পতি-যুগল যে ভাবে মিলিত হয়, ইহাও সেইরূপ মিলন জানিবে।

(৩২০)

কাম ক্রোধাদি মনের বাহ্যে প্রস্রাব অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগ যেমন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কামক্রোধাদির বেগও তদ্রূপ মনের প্রকৃতিসিদ্ধ জানিবে। প্রকৃতিকে অতিক্রম করাই প্রকৃত পুরুষত্ব।

(৩২১)

গুয়ে মাছি মাঝে মাঝে সন্দেশে গিয়াও বসে; কিন্তু মধুমক্ষিকা প্রাণ গেলেও কখন গুয়ে বসিবে না। সেইরূপ ঘোর সাংসারিক ব্যক্তি ক্ষণেকের তরে কখন কখন ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে অনুরাগী হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার

মন সংসারে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়; পরন্তু প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত প্রাণান্তেও কখন সংসারের পুরীষপিপাসু হয়েন না।

(৩২২)

ভিতরে প্রেমাগ্নি হু হু প্রজ্বলিত হইলে বাহির হইতে আর ত্রিতাপের আঁচ গায়ে লাগে না, অথবা লাগিলেও তাহা অনুভব হয় না; কারণ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উত্তাপের তারতম্যেই আমাদের শীত গ্রীষ্ম অনুভব হইয়া থাকে।

(৩২৩)

তুমি যদি ভক্তকে শুনাইবার জন্য ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তাহাদের আনন্দ দিতে পারিবে না; ভগবানকে শুনাইবার জন্য প্রয়াস করিলে সকল ভক্তই যুগপৎ আনন্দিত হইবে।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"।

(৩২৪)

খড় কুটো যাহা উপরে ভাসে, তাহা স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া চলে; কিন্তু অভ্যন্তরচারী মৎস্য চিরদিন উজান ঠেলিয়া অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে বিচরণ করে। সেইরূপ যাহারা লঘু প্রকৃতির লোক, তাহারা এই সংসার সাগরে জোয়ারের ঝাড়ের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়; পরন্তু যাঁহারা ইহার ভিতরে একবার ডুব মারিয়াছেন, তাঁহাদের উল্টা গতি জানিবে।

(৩২৫)

দুগ্ধ জ্বাল দিবার সময় প্রথম তাহাতে উত্তাপ লাগিলে, তাহা উথলিয়া উঠে; কিন্তু যখন তাহা ঘন হইয়া আইসে, তখন তাহা আর উচ্ছ্বসিত হইতে দেখা যায় না। সেইরূপ ভগবৎপ্রেমের প্রথমাবস্থায় অল্পেতেই ভক্তের অশ্রু পুলক স্বেদ কম্পাদি ভাবাবেশ হইয়া থাকে; পরন্তু যখন প্রেম প্রগাঢ় হইয়া আইসে, তখন আর কোনরূপ আবেগ উচ্ছ্বাস হয় না; তখন তাহার প্রাণ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ধীর ও গম্ভীর ভাব ধারণ করে

(৩২৬)

পৃথিবীতে "আমার" বলিবার বস্তুই সব, "আমি" খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যদি বল 'দেহ' তাহাও "আমার", যদি বল 'প্রাণ' তাহাও "আমার", যদি

বল 'আত্মা' তাহাও "আমার", যদি বল "আমি" সেও "আমার"। সকল বস্তুই "আমার" অর্থাৎ "আমির" সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ।

(৩২৭)

শিশু যখন সবে কথা কহিতে শিখে, তখন সে কখনও "বাবা" কে "মা" বলিয়া ডাকে, কখনও বা "মা" কে "বাবা" বলিয়া ডাকে; কিন্তু "বাবা" বলিয়াই ডাকুক, আর "মা" বলিয়াই ডাকুক, যাঁকে ডাকিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন ও ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন। তাই বলি ভাই! তাঁহাকে "বাবা" বলিয়াই ডাক, আর "মা" বলিয়াই ডাক, সরল ব্যাকুল প্রাণে একবার ডাকিতে শিখ, ডাকিবার মত ডাকিতে পারিলে তিনি ছুটিয়া আসিবেনই আসিবেন।

(৩২৮)

কোন ব্যক্তির ফটোগ্রাফের সহিত তাহার যে প্রভেদ, রূপে ও স্বরূপে ততটুকু প্রভেদ জানিবে। ধুতি চাদর পরিয়াই হউক, বা কোট পেণ্টুলেন পরিয়াই হউক, বসিয়াই হউক বা দাঁড়াইয়াই হউক, স্মিতমুখেই হউক বা সরোষনয়নেই হউক, যে কোন ভাবে, বেশে বা অবস্থায়ই তোলা হউক না কেন, ফটোগ্রাফ দেখিলে যেমন যাহার ফটোগ্রাফ; তাহাকে ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্মরণ হয় না, সেইরূপ ভগবানের অসংখ্যকোটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়া তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও মনে হওয়া কখনও সম্ভব নহে। তিনি শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া বাঁধিয়া কটিতটে পীতধড়া পরিয়া, বদনে মুরলী লইয়া মৃদুহাস্যে ত্রিভুবন বিমোহিত করিয়া মদনমোহন রূপেই দাঁড়াইয়া থাকুন, আর রুধিরাক্ত খড়্গ ধারণ করিয়া আলুলায়িতকুন্তলা দিগম্বরী হইয়া রণোন্মাদিনী বেশে অট্টহাস্যে মেদিনী কম্পিত করিয়া ভয়ঙ্করীরূপে তাণ্ডব নৃত্যই করুন। তিনি ছাই ভস্ম মাখিয়া শিরে জটা ধরিয়া বাঘছাল পরিয়া ভাঙ্গড় ভোলারূপে শ্মশানে মশানেই বেড়ান, অথবা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বিশ্ববিমোহনরূপে রাজ-রাজেশ্বর হইয়াই বসুন, তাঁহাকে যে একবার দেখিয়াছে, তাহার আর চিনিবার বাকী থাকে না। স্বরূপ দর্শন না হইলেই রূপভেদে ভাবান্তর বা ভ্রম উপস্থিত হয় জানিবে।

(৩২৯)

সন্দেশের মধুর আস্বাদন যেমন রাজা মহারাজ হইতে পিঁপ্‌ড়ে মাছি পর্য্যন্ত সকলেই সমান উপভোগ করিতে পারে, সেইরূপ হরিনামামৃতে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সাধু, পাষণ্ড সকলেরই সমান অধিকার; এরস যেই আস্বাদন করুক না কেন, সকলেই সমান রস পাইবে। তাই বলি ভাই! পাপী তাপী মূর্খ কাঙ্গাল বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই; সে অমৃত যে একবার আস্বাদন করিয়াছে, সেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার রসনায় জগতের আর কোন দ্রব্যের মধুরতা উপলব্ধি হইবে না, সে অবিরাম সেই অখণ্ড অচ্যুত আনন্দামৃতাস্বাদনের জন্য পিপাসু হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ রাহু একবার সুধার স্বাদ পাইয়াছিল বলিয়া ছিন্নশীর্ষ হইয়াও সুধানিধিকে এখনও ধরিয়া খাইতে যায়।

(৩৩০)

সপ্তর্ষিমণ্ডল আজীবন ধ্রুবের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য কেন্দ্রীকৃত করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আহা! ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের মান এই-রূপেই বাড়াইয়া থাকেন।

(৩৩১)

মানুষকে ভূতে পাইলে সে বক্তা হয়। তাই বলি ভাই! পৃথিবীতে যত বক্তা দেখিবে, সকলকেই ভূতাবিষ্ট বলিয়া জানিও, ভূত ছাড়িলেই নিশ্চয় তাহাদের মুখ বন্ধ হইবে।

(৩৩২)

ঔষধ কটু তিক্ত কষায় হইলে বৈদ্যগণ মধু অনুপান ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাই ভবরোগবৈদ্য বিচক্ষণ ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ দর্শন শাস্ত্রের গভীর গবেষণার সহিত ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও সুমধুর হরিনাম সুধার অনুপান ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

উত্তর ভারত-ভ্রমণ।

প্রথম ভাগ।

শোভার অনন্ত ভাণ্ডার, বিধাতার বিলাস কানন, হিমাচল এবং অপ্সরো নগরী কাশ্মীর বা ভূস্বর্গ দর্শন করিবার বলবতী বাসনা আমার হৃদয়ে অনেক দিন যাবৎ জাগ্রত ছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্বে কখনও সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই; যেহেতু শুভকার্য্যে শত বিঘ্ন ঘটে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এবার সে স্রোতঃ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

আমি বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে একটী যুবক-সমভিব্যাহারে শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। গোয়ালন্দ জগন্নাথগঞ্জ ডেস্ প্যাচ্ সার্ভিস্ আসিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা যমুনার তীরে "সুবর্ণথালি'' ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। * ৫টা ৪০ মিনিটে "হক্" ষ্টিমার আমাদিগকে লইয়া যমুনাবক্ষে ভাসিল এবং মন্থর গতিতে অপরাহ্নে "নগর বাড়ী" ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

নগরবাড়ীর সেটল্‌মেণ্ট্ সবডিপুটী বাবু সুধীরচন্দ্র ঘোষ "আড়ালিয়া" হইতে উঠিয়াছিলেন এবং আমি যে ক্যাবিনে ছিলাম, সেই ক্যাবিনে আসিয়া স্থান লইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল। সুধীর বাবুর বাড়ী চুঁচুড়া। তিনি অল্পদিন হইল পাবনা হইতে নগরবাড়ী বদলি হইয়াছেন। তিনি বেশ ভদ্র এবং বিনয়ী। সচরাচর ডেপুটী বাবুদের মস্তিষ্কে যেরূপ উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়, সুধীর বাবুর ভিতরে তাহা কিছু নাই। অধিক কি, তাঁহার পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমরা ডেপুটী অথবা কোন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।

সুধীর বাবু এবং আমরা অপরাহ্নে একটী বালুচরে অবতরণ করিলাম। সেই চরের সম্মুখে যমুনার একটী ক্ষুদ্র শাখা প্রবাহিত হইতেছে। ষ্টীমার হইতে নামিয়া ঐ শাখা নদী পার হইয়া নগর-বাড়ী পৌঁছিতে হয়। বর্ষাকালে চর ডুবিয়া যায়; সুতরাং ষ্টীমার নগর-বাড়ী লাগিতে কোন অসুবিধা হয় না; কিন্তু

* ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ানুরূপ ধরা হইল।

এ সময় চরে নামিয়া আরোহীদের বড় কষ্ট পাইতে হয়। কারণ পারাপারের সুবিধার জন্য কোনও খেয়া নৌকা নাই; অতএব নৌকা সংগ্রহ করিয়া পার হইতে হয়।

আমরা যমুনা-সৈকতে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছিল, আমরা নামিয়া চরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং ঐ শাখা নদী পার হইবার জন্য সুধীর বাবু অপরপারের মাঝিদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এমন সময় প্রবলবেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চরের উপর কয়েকখানা ভগ্ন নৌকা ছিল, আমরা নিরাশ্রয় তিনটী ব্যক্তি একটী নৌকার পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন সুবিধা হইল না। অন্যূন এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বধ্য ভূমিস্থিত সদ্যস্নাত ছাগশিশুর ন্যায় আমরা কাঁপিতে লাগিলাম।

ভয়ঙ্কর তুফানে এই ক্ষুদ্র তটিনীর ভয়াবহ তরঙ্গ ও উচ্ছ্বাস নৃত্য দেখিয়া আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইলাম এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "করুণাময়, তোমার অকরণীয় কিছু নাই। তুমি নিমেষার্দ্ধে ক্ষুদ্রকে অতি বৃহৎ এবং বৃহৎকে অতি ক্ষুদ্রে পরিণত করিতে পার এবং এই তটিনীর ন্যায় শত শত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বদা বিশ্বদর্পণে দেখাইতেছ; কিন্তু অহংমদে মত্ত হইয়া আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না; বোধ হয়, যেন কোন কালেই বুঝিব না।"

সুধীর বাবু প্রভৃত ক্ষমতা পরিচালন করা স্বত্বেও তরঙ্গের ভিতর কেহ নৌকা দিতে সাহস করিল না।

অনেকক্ষণ পর ঝড় থামিল, প্রকৃতি হাসিল, বৃক্ষশাখে পাখিগণ পাখা ঝাড়িল, পশ্চিম নীল-নভোমণ্ডলে অংশুমালীর রক্তিম-কিরণ-ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল এবং হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্বজন-পরিবেষ্টিতা অবগুণ্ঠনবতী যেমন মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সরমে অবগুণ্ঠন আবৃত করিয়া ঝটিতি কক্ষান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সলজ্জা তটিনীর উর্ম্মিমালা আবেগভরে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল।

"হক্" এতক্ষণ ভয়ে মুহ্যমান হইয়া নোঙ্গর করিয়া যমুনা-সৈকত সমীপে লুকায়িত ছিল, সে সময় বুঝিয়া বাষ্প উদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে গন্তব্য-পথে চলিয়া গেল। আমরাও পরপারে আসিয়া উপনীত হইলাম।

শাখা নদীর তীরে সুধীর বাবুর আফিস। তিনি আমাদিগকে সযত্নে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার বাসায় উপযুক্ত শয়ন-গৃহ না থাকায় তিনি স্থানীয় জমিদার বাবু রজনীকান্ত দাসের পাটের আফিসে আমাদিগকে রাত্রিযাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুধীর বাবুর বাসার অনতিদূরে রজনী বাবুর আফিস্, এবং ঐ আফিসে সুধীর বাবুর কয়েকজন আফিসার আছেন, তিনি আমাদের আতিথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

নগরবাড়ী ধোপাখালির নামান্তর মাত্র। ধোপাখালি একটী উন্নতিশীল গ্রাম। এইগ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। এ গ্রামে ন্যূনাধিক পাঁচশত ঘর লোকের বসতি আছে। বাসিন্দাগণ সকলেই ভদ্র এবং নম্র। গ্রাম্য সুখশান্তির জন্য মোটা-মুটি যাহা কিছু দরকার, তাহা সমস্তই এই গ্রামে আছে। লতা-পুষ্প সুশোভিত তৃণগুল্ম সমাচ্ছাদিত অসংখ্য বৃক্ষরাজি-পরিবৃত নগরবাড়ীর দৃশ্য রমণীয়। এ প্রকার সুশীতল গাঢ়চ্ছায়া-সন্নিবিষ্ট গ্রাম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শাখা নদী কুলু কুলু-নাদে গ্রামের পাদমূল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অলিন্দে, বনপথে, তটিনীবক্ষে রমণীগণের শোভা মনোহারিণী।

আমরা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ উষাকালে সুধীর বাবুর নিকটে বিদায় লইয়া গ্রাম্য-পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বড় আনন্দ বোধ হইল। আশৈশব আমি অসংস্কৃত গ্রাম্য-পথে হাঁটিতে বড় ভালবাসি। যখন আমি কোন অপরিচিত জঙ্গলাকীর্ণ পথে বিচরণ করি, তখনই আমার এ আনন্দ! অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন আমরা "স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যে চিত্রিত চিরবৈচিত্র্যময় প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি এবং গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ আমাদের অশ্বত্থ বহুলা শস্য-শ্যামলা নদী মেখলা নব পল্লী গ্রামও বিশালোদরা যমুনা রাক্ষসীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছে; এখন আমরা বৃক্ষবিহীন এক মরু-গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছি; তাই অনেক দিন যাবৎ এ আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত রহিয়াছি। আজ হঠাৎ সেই বন-পথ পাইয়া এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব করি-

লাম এবং প্রাচ্য, বহুদিন বিস্মৃত কৈশোরের ভ্রমণ-সুখ ক্রমে স্মৃতি-পথে উদিত হইল। আমরা উৎফুল্লনেত্রে চিত্তোন্মাদিনী নৈসর্গিক গ্রাম্য-শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্তর গ্রাম, উপবন, স্রোতস্বিনী, প্রান্তর অতি-ক্রম করিয়া দ্বিযোজন পথ হাঁটিয়া চিরপ্রসিদ্ধা মহা বেগবতী পদ্মা নদীর তীরে থলিনপুর বা পরাণপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলাম।

গ্যাঞ্জেশ ডেস্‌প্যাচ্ সার্ভিস্ পূর্ব্বে "মীরপুর" ষ্টেশনে থামিত, এখন "থলিনপুর" থামিয়া থাকে। মীরপুর হইতে থলিনপুর বেশী দূর নহে। আমরা কিয়ৎকাল ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিয়াও অতি দূরে নদী ও আকাশের সঙ্গমস্থলে, বাষ্প দেখিতে পাইলাম না, এবং পরম্পর অবগত হইলাম। এই লাইনের ষ্টীমার সর্ব্বদা নির্দ্ধারিত সময়ে আসে না ও ঝড় বৃষ্টি হইলে কোন কোন দিন একেবারেই আসে না। ইহা শ্রুত হইয়া আমরা তথায় অনিশ্চিতভাবে বৃথা কাল-বিলম্ব করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৭

জাগ্রত চৈতন্যক্ষেত্র
বৈশ্বানর বৈথারীর স্থানে
ভেদাত্মক অহংকার
পায় দুঃখ কেবল এখানে
যন্ত্রণা-আগার ইহা
পরীক্ষার পথে নিদারুণ
আছে যথা কূটযন্ত্র
পাতা কত অতি অকরুণ
অবোধ পক্ষিণী যথা
মুগ্ধ হ'য়ে নানা প্রলোভনে
নিষাদের জালে পড়ি
বদ্ধ হয় সুদৃঢ় বন্ধনে
ভেদাত্মক অহংজ্ঞান
সেই মত বদ্ধ হ'য়ে যায়
প্রকটিত বিশ্বমাঝে
অবয়বী না দেখিয়া তায়
বিশিষ্ট বস্তুর মোহে
ভুলে গিয়া ভেদের মায়ায়

১৮

শুন শুন অজ্ঞ শিষ্য
কথাটি আমার

এ জগৎ হয় ঘোর
অন্ধকার দ্বার
ইহার ভিতর দিয়া দূরে দেখা যায়
স্বপন চৈতন্য স্থান
আলোক আঁধারে মিশে—কাক জ্যোস্নাময়
দিবসের শেষে যথা
সন্ধ্যার সময়
আলোক আঁধারে পড়ি
নানা ভ্রান্তি হয়
প্রবিবিক্ত ভোক্ত তাহা
অস্ফুট আলোকময়
স্থূলের অভাবে হেথা
হয় মহা বিপর্য্যয়
মধ্যমার ক্ষেত্র এই
যেন শিষ্য তুমি
তার উর্দ্ধে প্রজ্ঞারূপী
পশ্যন্তীর তূণী
অক্ষয় অব্যয় জ্যোতি
নিরীক্ষন সার
নির্ব্বিলাস সদা এক
চৈতন্য আধার।

১৯

বিশ্বেরই একি ভাষা
সর্ব্ব ব্রহ্মময়
আত্মজ্ঞ যে ভাবে থাকি
সোহং বলয়
শান্তচিত্তে এ বিশ্বকে
পূর্ণব্রহ্ম ভাবি

উপাসনা কর শিষ্য
ব্রহ্মজ্ঞানে সবি
যখন দেখিতে পাবে
সর্ব্ব ব্রহ্মময়
হইবে তুমিও সর্ব্ব
এক রসে লয়
ভেদাত্মক আমি ভাব
অলীক ভাবিয়া যবে
প্রকটের মোহ ছাড়ি
অপ্রকটে স্থির হ'বে
বিরজার পর পারে
কালরূপ শ্রীচরণে
প্রকাশের তৃষা চেষ্টা
লীন হবে মন সনে
পাইবে আশ্রয় তবে
প্রণবের হংস পরি
সোহংএ পাইলে স্থান
আসিতে হবে না ফিরি
অকার উকার পাখা
লেজটি মকার ভার
অর্দ্ধমাত্রা শিরদেশ
কি সুন্দর চমৎকার
সে হংসের কিবা জ্যোতি
কিবা মনোহর বেশ
নাহি আদি নাহি মধ্য
নাহি যে তাহার শেষ
সত্য-ঘন সে মূরতি
নাহি জরা নাহি ধ্বংস

অক্ষয় অব্যয় সত্য
সনাতন সেই হংস

২০

কলহংস পক্ষমাঝে
আশ্রয় পাইবে তবে
সেই পরমাত্ম জ্যোতি
তখন দেখিতে পাবে
ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালাভে
পর্শিবে না পাপকণা
একান্তের কোলে আর
কর্ম্মসূত্র বাঁধিবে না
সে হংসে বসিলে পরে
হইবে প্রণব কায়
প্রণবের তত্ত্ব বুঝি
হইবে তাহাতে লয়

(ক) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
তেতো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে মাং তদনন্তরং॥

(খ) প্রকাশের আধার।

শ্রীমতিলাল রায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। মাঘ ১৩১৭। ১০ম সংখ্যা।

গীতা ও ব্রহ্মবিদ্যা।

যে বিদ্যা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইঁহাকে পরাবিদ্যাও বলা হয়। বেদাদির জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ থাকিলেও স্বর্গাদি স্থান-প্রাপ্তিমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বেদকেও অপরা বিদ্যা বলা হয়। মুণ্ডক উপনিষদ তাই বিদ্যার দুইটী বিভাগ করিয়াছেন,

> দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।
> তত্রাপরা ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
> ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ১/৪।৫

পরাবিদ্যা একত্বনির্দ্দেশক। অপরা বিদ্যা বহুত্বপ্রদর্শক। বিদ্যা এই দুই

ভাবে সর্ব্বদা খেলা করিতেছেন। এই বহুত্বের ভিতর দিয়াও একত্ব প্রকটিত হইতে পারেন। তজ্জন্যই অপরা বিদ্যার অনুশীলন আবশ্যক। এই পরাবিদ্যাই মহামায়া আদ্যাশক্তি গায়ত্রী উমা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন। অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই ব্রহ্মাণ্ডে ইনিই ভেদমূলক আমিত্ব স্থাপিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে অবিশেষ আমিত্বে স্থাপিত করেন। চৈতন্যের এই দুই ভাবের ক্রীড়া যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়াছে। গীতায় এই একত্বমূলক জ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলা হয়। রাজবিদ্যা অর্থে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ভগবান গীতার নবম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ৯। ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ৯। ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৯। ৩

'ইদম্' অর্থে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে বিশেষরূপে নির্দ্ধারণের জন্য 'তু'শব্দ ব্যবহৃত। এই সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ "বাসুদেবই সর্ব্ব" এই জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিসাধক। এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত উপদিষ্ট অর্থাৎ অনুভবযুক্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিলে সংসারের বন্ধন মুক্ত হয়। অসূয়ারহিত অর্জ্জুনকে এই গুহ্য জ্ঞানরহস্য কহিয়াছেন। এই জ্ঞানই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সেই জন্যই রাজবিদ্যা। সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য সেই জন্য রাজগুহ্য। পবিত্রতা সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদিসমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাৎ ভস্মী-
করোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং।

যে জ্ঞানোদয়ে অনেক সহস্র জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূল কর্ম্ম ক্ষণমাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহার পবিত্রতা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আত্মজ্ঞান দ্বারা একত্ব দর্শন জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ যজ্ঞাদি দ্বারা বা বহুবর্ষব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনাদি অপেক্ষা অনায়াসসাধ্য; অথচ পুণ্যকর্ম্মাদি যেরূপ স্বর্গসুখভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহা তাদৃশ নহে। আত্মজ্ঞান এইরূপ পবিত্রতম হইলেও শ্রদ্ধাবিরহিত

বা দেহাত্মজ্ঞানীরা দম্ভ দর্পাদি আসুর সম্পদের আপাত মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া পরামাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। সেই জন্য মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে।

রাজবিদ্যার উপদেশ গীতায় বিশেষভাবে উপদিষ্ট আছে। সেইজন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে।—শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে। এই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখনিঃসৃত। যাঁহার বংশীনিঃস্বনে পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব হইয়া বংশীর স্বরে আপনাকে মিশাইতে চায়, তাঁহার শ্রীমুখের বাণী জীবের একান্ত সম্বল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সাধারণ মনুষ্যের কৃত পুস্তকাদির ন্যায় স্মৃতিশক্তির পরিচালনার্থে প্রদত্ত হয় নাই। যাহাতে অন্তর্নিহিত জীবশক্তির প্রকৃত বিকাশ হয়, যাহাতে শব্দসমাবেশে ও শ্লোকের তাৎপর্য্যে ভগবানের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তজ্জন্যই পরব্রহ্মে অবস্থিত ব্যাস ঋষি ভগবৎপ্রতিপাদক গীতাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। গীতোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল অর্জ্জুন নামধেয় কচিৎ ব্যক্তির প্রতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। ইহার তথ্য সার্ব্বভৌম ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। সুধীগণ তাহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এতবার গীতা অধ্যয়ন করিয়াও সেই একত্বকারিণী মহাযোগিনী চৈতন্যময়ীকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতেছি না কেন? সে দোষ উপদেশের নহে। তাহার কারণ আমাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে,

গীতায় রাজবিদ্যা উপদেশের পূর্ব্বে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন শ্লোকের পর শ্লোকে কখনও বা মিনতি বচনে কখনও বা প্রেমজনিত অভিমানে হৃদয়ের সংশয় জানাইয়াছেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়, তাহাই উপদেশ কর। আমি তোমার শিষ্য; তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অর্জ্জুন ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে আপনাকে জগদ্গুরুর চরণে ছাড়িয়া দিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ ওজস্বী ও মধুর ভাবে অমৃত বর্ষণ করিলেন—তবুও সেই প্রকার প্রশ্ন—

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩। ২

যদিও ভগবান্ বুদ্ধির মোহ নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন, তবুও মন্দবুদ্ধিবশতঃ ইহাতে বুদ্ধির মোহ উৎপন্ন হইতেছে। অর্জ্জুন তাই বলিতেছেন যে,জ্ঞান ও কর্ম্মের কর্ত্তা এক পুরুষ হইতে পারে না। এই জন্য তুমি এক পুরুষের দ্বারা এককালে জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব মনে কর। তবে আমার বুদ্ধিশক্তির অবস্থানুরূপ জ্ঞান বা কর্ম্ম একটীর উপদেশ কর—যে জ্ঞান বা কর্ম্মের দ্বারা শ্রেয় প্রাপ্ত হইতে পারি।

ভগবানের পবিত্র বদন হইতে আবার উপদেশ প্রদত্ত হইল,—তবুও সেইরূপ বাণী—যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥

তখনও অর্জ্জুনের ন্যায় উচ্চাধিকারীর হৃদয়ে সে জ্ঞান প্রকটিত হয় নাই। তখনও গ্রহণোপযোগী শক্তি নির্ভিন্ন হয় নাই। তখনও কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব, তাই বিশিষ্ট অহঙ্কারের মোহে মুগ্ধ। সে হৃদয়ে সে অসীমতার অভিব্যক্তি কিরূপে হইবে। যতদিন আমাদের ভেদমূলক বিশিষ্টতার দূরীভূত হইয়া অবিশেষ একতামূলক জ্ঞান প্রকটিত না হয়, যত দিন ভগবানই সর্ব্ব, জীব যতই উচ্চ হউক না কেন, নিমিত্ত বা প্রতিবিম্বমাত্র ততদিন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইবে না। যে ভাবে অর্জ্জুন ভেদভাবাপন্ন আমিত্বকে "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া তাঁহার চরণে ছাড়িয়া দিলেন, সেইরূপ ভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে তবে ক্রমে সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। সেই অভেদাত্মক ভাবে ক্রমে হৃদয় ভরিয়া উঠিলে "গীতা যে ভগবানের শরীর" তাহা বুঝা যাইবে। তখন আমি তুমি প্রত্যয় রহিত হইয়া গীতার সহিত তদাত্মজনিতভাবে সকলি ভগবানের ব্যঞ্জক তাহা বুঝা যাইবে। জীবের প্রত্যেক কার্য্য মানবত্ব বা ঋষিত্ব, আমি বা তুমি 'ইত্যাদি কোন ভাবের সূচনা না করিয়া কেবল এক রস সার্ব্বভৌম পরমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা করিবে, তখনই গীতোক্ত রাজবিদ্যা লাভ হইবে।

এই ভগবৎসম্বন্ধ জ্ঞান বাসুদেবপ্রসূত। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণ স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাব হইলেও লোকানুগ্রহবশতঃ নিজ মায়াবশে অবতাররূপে দেহাভিমানী জীবের

ন্যায় লক্ষিত হইয়া কিংবা ঋষিমুখে প্রচার করিয়া অবিদ্যামুগ্ধ জীবকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেন।

স্বপ্রয়োজনাভাবেও ভূতানুকম্পাবশতঃ ইনিই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ দীর্ঘকালে নষ্ট (বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়) হইয়া পড়িয়াছে। সেই পুরাতন যোগ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম ; কারণ তুমি ভক্ত ও সখা এবং এই জ্ঞানরূপ যোগও উৎকৃষ্ট রহস্য।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪ । ২

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৪ । ৩

এই জ্ঞানযোগ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যে তৎকালীন ভারতবর্ষে ষড়্দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ, আত্মসংযমযোগ একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা বলা যায় না। তাই ভগবান এই সকল মতামতের আলোচনা করিয়া তাহাতে দৈবীপ্রকৃতি ও ভগবত্তত্ত্ব এই দুইটী অপূর্ব্ব বস্তুর সংযোজনা করিয়া সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণত্বে পরিণত করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যালাভে সকলেই চেষ্টা করিতে পারেন ; কারণ তাঁহার সর্ব্বভূতে সমভাব। কেহ দ্বেষ্যও নাই প্রিয়ও নাই।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোস্তিনাপ্রিয়ঃ ॥

সূর্য্যালোক যেমন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের তারতম্যানুসারে আলোক বিকীরণ না করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভাসিত হয়, চক্ষু মিলিলেই সে আলোক প্রাপ্ত হই, ভগবানের অপরিমিত করুণা তদ্রূপ সমভাবে আমাদের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমরা হাত বাড়াইলেই তাঁহাকে ধরিতে পাই। পাপী পুণ্যাত্মা বৈশ্য শূদ্র সকলেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরা গতি লাভ করিতে পারে।

* মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯ । ৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চাধিকারীরা যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে পরম পদ-

লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে ত সন্দেহই নাই; শূদ্রাদি নিম্নাধিকারীরাও পরা গতি লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, 'ক্ষণভঙ্গুর সুখবর্জিত অথচ পুরুষার্থ সাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া শুভ অবসর ত্যাগ করিও না। আমার ভজনা কর। মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হও—

মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯। ৩৪

নমস্কার দ্বারা চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে এবং ভেদাত্মক অহংকার অতিক্রম করিয়া ক্ষণিকের জন্য মনোবুদ্ধ্যাদির অতীত চৈতন্যের অনুভূতি করিলে তবে সেই ক্ষেত্রে পরমানন্দঘন পরমেশ্বর প্রকাশ হইয়া থাকেন। তখন সাধক তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া অভিন্নরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥

যেমন গঙ্গাযমুনাদি নদীকুল নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ নাম রূপ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান।

ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি। নতুবা ভেদভাবশীল অহংকারকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মাদি দেহে উচ্চতর লোকে গমন করিলেও তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অহংকারই ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যরূপিণী হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া যতদিন সমস্ত বস্তু ও সমস্তভাবকে তাঁহারই ব্যঞ্জক বলিয়া আভাস না দিবেন, ততদিন উচ্চতর লোকে গমন করিলেও আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে; সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬

ব্রহ্মলোকাদি সমস্তই ক্ষয়শীল। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ভোগাবসানে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি লাভ হইবে।

মহাত্মা কবিরও সেই কথাই বলিয়াছেন—

কুণ্ডলিনী চড়াওয়ে, ব্রহ্মলোক যাওয়ে
উভি কাচ্চা না গুরুকী বাচ্চা ॥

ক্ষুদ্র ভেদাত্মক অহং ভাবকে না ছাড়িয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও বিশুদ্ধ অহংস্বরূপ পরমপুরুষ প্রকাশ হইবেন না। নাম রূপের প্রতি লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ভেদাত্মক বিশিষ্ট ভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। তবেই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত একই চৈতন্যময়ী মহামায়াকে চিনিতে পারা যাইবে। বহির্মুখী প্রবণতায় সূক্ষ্মাদি লোকের উচ্চজ্ঞান মূর্ত্ত পরিচ্ছিন্ন ও ভেদাত্মক জ্ঞান ভিন্ন অভেদাত্মক একত্ব জ্ঞান নহে। স্থূল জগতে বস্তুর জ্ঞান লাভ করিলেও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা হয় না। উচ্চাদি লোকেও তদ্রূপ; ভগবানের যে অভিব্যক্ত অসীমতা দেশকাল ও নামরূপের মধ্য দিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বহির্মুখীভাবে তাহার ইয়ত্তা হয় না। কেবল অন্তর্মুখী বৃত্তিতে কেবল ভগবৎপ্রবণতায় সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বাসুদেব স্বরূপতঃ জীবচিত্তে প্রকাশিত হইয়া সকল সংশয় দূর করিতে পারেন। সকল বিশিষ্টজ্ঞান পূর্ণ অবিশেষ জ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন। তখন যে দিকে লক্ষ্য করা যাইবে, কেবল একই সত্ত্বার বিকাশ প্রতিভাসিত হইবে।

কেবল উচ্চ লোকে গমন করিলেই যদি আত্মজ্ঞান লাভ হইত, তবে ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিবেন কেন? নাচিতে যমলোকে গিয়া আত্মার স্বরূপই বা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? তাই, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকলব্যক্তির মধ্যে চৈতন্যের প্রতিগতি ফিরাইতে হয়। তিনিই মোক্ষদাত্রী। জীব ও জগৎ আমি তুমি প্রভৃতি বস্তু ও ভাবের মধ্যে তাঁহারই খেলা চলিতেছে, তাঁহার সত্ত্বাতেই জীব কাম প্রণোদিত হইয়া সংসারে ধাবিত হইতেছে, আবার তাঁহার দ্বারাই জীবের বন্ধন মোচন হইতেছে। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে দিব্য চক্ষু প্রদান না করিলে বহুত্বময় জগতের মধ্যে একত্বদর্শন সম্ভব নহে।

এই মাহামায়ার কৃপা কেবল কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম কি আসন মুদ্রার কোন বিশিষ্ট যোগমার্গের অভ্যাস এমন কি বেদোক্ত তপস্যাদি দ্বারা লাভ করা যায় না। ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ১১।৫৩

পুনশ্চ

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং ন লোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ১১।৪৮

কেবল বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায় না। তাই এই ভাবটী দৃঢ় করিয়া ভগবান দুইটী শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও তিনি লিখিয়াছেন—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ১১।৫৫

ইহাই গীতার সারভূতার্থ। সকল কর্ম্মই তাঁহার, এইজ্ঞানে ভৃত্যবৎ স্বামিকর্ম্ম করিতে হইবে। আমাকেই পরমা গতি জানিতে হইবে। মদ্ভক্ত অর্থে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—'মামেব সর্ব্বপ্রকারেণ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ। সঙ্গবর্জ্জিত অর্থে ধন মিত্র পুত্র কলত্র বন্ধু প্রভৃতিতে মমত্বরহিত এবং নির্ব্বৈর অর্থে আপনার প্রতি অত্যন্ত অপকার করিলেও শত্রুভাববিরহিত। এরূপ ব্যক্তি ভগবান্‌কে অভেদভাবে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। সকল কর্ম্ম সকল ভাব মনোবুদ্ধি অহংকারাদি ভগবৎচরণে উৎসর্গ করিয়া একমাত্র ভগবানই পরমা গতি। এই জ্ঞানের নামই অনন্যা ভক্তি। এই অনন্যা ভক্তি দ্বারাই দিব্যচক্ষু লাভ হয়। দিব্যচক্ষু লাভ না করিলে বিশ্বরূপা মহামায়াকে দর্শন করা যায় না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥

তাঁহার শরণাগত হইলে তবে এইরূপ দিব্যচক্ষু লাভ হয়। গীতোক্ত অভয়াদি ষড়্‌বিংশতি দৈবী সম্পৎলাভে অন্তর্নিহিত গ্রহণোপযোগী শক্তি নির্ভিন্ন হইলে মহামায়ার প্রকাশোপাধিস্বরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা কৃপা করিয়া সেইরূপ দর্শাইয়া দেন। সেইরূপই বিশ্বাত্মিক। মহামায়ার উহাই অনন্তকত্বে একত্বে

দর্শন। উহাই ব্রহ্মজ্ঞান—উহাই ব্রহ্মবিদ্যা। যে শক্তি জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে সাধনা দ্বারা অন্তর্নিহিত অভেদভাবকে জাগ্রত করিতে হইবে। কেবল যোগমার্গের কতকগুলি আসন মুদ্রা বা নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনায় হইবে না। তাঁহাকে চিনিলে বিশ্বপ্রাণের সহিত একপ্রাণতা অনুভব করিতে পারা যায়। জীব স্বরূপতঃ ভগবান্ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন বিশিষ্ট বস্তু নহে, এই জ্ঞান প্রকট হয়। তখন কর্ম্মজ ভ্রান্তি কিং ব্যক্তিত্বের অশান্তি কিছুই থাকে না। ইহাই গুহ্যতম ব্রহ্মজ্ঞান।

সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর এই ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যালোক যেমন একটী কাচের (Prism) ভিতর দিয়া সাতটী বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে এই ঈশ্বর সম্বন্ধ জ্ঞানও তদ্রূপ সাতটী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম, বুদ্ধধর্ম্ম, ক্যালডিয়ান ইজিপসিয়ান, ক্রিষ্টীয়ান, জোয়াষ্ট্রানিয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল তথ্যে কোন বিরোধ না থাকিলেও আচার ব্যবহারের পার্থক্যে প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণার ভাব দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুরও আর সে উদারতা দেখা যায় না। সংকীর্ণচিত্ত হইয়া বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের আদর্শ ভুলিয়া কতকগুলি ব্যবহারিক কুসংস্কাররূপ গণ্ডীদ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। এখন প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই কেবল আবরণ লইয়া নাড়াচাড়া। মূল তথ্যে প্রায় কাহারও দৃষ্টি নাই। এইরূপ সময়ে পুনরায় যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য ঋষিরা Theosophical Society নামে একটী সমিতি স্থাপিত করিয়াছেন। এই কথায় এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ এই সমিতির সভ্য হওয়ার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে Theosophy বা ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, তাহাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনটী বিষয় (object) লইয়া এই সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে।

প্রথম—To form a nucleus of universal Brotherhood of humanity without distinction of race, creed, caste or colour.

দ্বিতীয়—To encourage the Study of comparative religion philosophy and science.

তৃতীয়—To investigate unexplained laws of nature and the powers in man.

প্রথম বিষয়টী ইহার ভিত্তি। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ইহার মূল আদর্শ। এই আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিতে প্রয়াস করিলে ক্রমে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের একত্ব হৃদয়ে অনুভূত হইবে, তখন কেবল মানবসম্প্রদায় কেন পশুপক্ষীর ভিতরেও সেই একতত্ত্বের আভাস করিবে। তখনই—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চ শ্বপাকে চৈব পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ॥

পণ্ডিত অর্থে যাঁহার হৃদয়ে বেদোজ্জ্বলা বা একত্বকারিণী বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। তখন নাম রূপ অবস্থা উপাধি এই সকল দ্বৈতের অবসান হইয়া যায়। তাঁহারা তখন বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণু পরমাণু মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি করেন না। এই জ্ঞান অপরাবিদ্যার ভিতর দিয়া যাহাতে প্রকটিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনার ব্যবস্থা। এই বুদ্ধি বিকাশের জন্য সর্ব্বভূতে নিরহঙ্কার হইয়া হৃদয়দ্বার খুলিয়া রাখিলে মা আনন্দময়ী আপনি প্রকাশিত হইবেন। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য ও কতক বাক্যের সমষ্টি। ইহা এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে যে, শাস্ত্রবর্ণিত উপায়ে ভগবানের দিকে চিত্তের গতি ফিরাইয়া তদালোচনা করিলে তদ্দ্বারাই ভগবদ্‌জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। শব্দ সমন্বয়ে ভগবান ব্যতীত বহুত্ব প্রতিপাদিত হইলে তাহা পরাবিদ্যার ব্যঞ্জক নহে। অনেক লোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের (planes) বা বিভিন্ন দেহের জ্ঞানকে theosophy মনে করেন ; বস্তুতঃ তাহা নহে। তবে এই সমিতির অন্তর্গত অনেকের লিখিত পুস্তকাদিতে এই সকল কথা বর্ণিত আছে। উহা সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য অনেক সময়ে প্রয়োজন হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা যদি ব্রহ্মপ্রতি ইঙ্গিত না করিয়া বহুত্বকে ইঙ্গিত করে, তবে উহাকে পরাবিদ্যা বলা যায় না। চিত্তের গতি ভগবানের দিকে রাখিয়া যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা যাইবে, তাহাতেই মা আদ্যাশক্তি প্রকট হইবেন।

তৎপরে তৃতীয় বিষয় মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমোন্নতি সাধন এবং

প্রকৃতির শক্তির অনুসন্ধান। এই বিষয় লইয়া অনেকেই এই সমিতিতে ভূত প্রেতাদির আলোচনা, মেস্‌মেরিজম হিপনটিষ্‌স্‌ ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া থাকেন। অনেকে দূরদৃষ্টি দূরশ্রবণ ইত্যাদি শক্তিসঞ্চয়কে এই উদ্দেশ্যটীর অর্থ মনে করেন। কিন্তু সিদ্ধিমাত্রেই একত্বজ্ঞানের বিরোধী এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া Light on the path বলেন—

To appears nothing in the eyes of man.

পৌরাণিক চিত্রেও শক্তি যাহার অঙ্কে, সেই মহাদেবের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি। তাই মনে হয় যে সিদ্ধিলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। তবে সেই মহামায়া কৃপা করিলে সিদ্ধি তখন আপনি আসিবে; কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্যও হইবে না। যিনি আপনাকে নামরূপাতীত শিবোহং বলিয়া বুঝিবেন, যিনি ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে এক ভগবানের ব্যঞ্জক বলিয়া, বুঝিবেন তাঁহার আপ্রাপ্তব্য কি থাকিবে। তাহাই জীবের উদ্দেশ্য। তখন শুদ্ধ অহংভাব তাহাই প্রকৃত শান্তি তাহাই প্রকৃত আনন্দ। এস আমরা সেই একত্বকারিণী মহামায়াকে প্রণাম করি। ওঁ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

রামানন্দ মিলন।

(শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতে উদ্ধৃত)

প্রভু নৃসিংহ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কয়েকদিন চলিয়া গোদাবরী প্রাপ্ত হইলেন। পবিত্রসলিলা গোদাবরীকে দর্শন করিয়া প্রভুর মনে শ্রীযমুনার এবং তীরবর্ত্তী উপবনসকল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণ হইল। শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীতাদির পর প্রভু গোদাবরী পার হইলেন। পার হইয়া স্নান করিলেন। স্নানের পর ঘাটের অনতিদূরে যাইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন লোক দোলায় চড়িয়া বাজনা-বাদ্য-সহকারে স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্মণও আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বিধিমত স্নান ও তর্পণাদি করিয়া তীরে উঠিলেন। প্রভু

দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ রায়। রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল; কিন্তু উঠিলেন না, ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বসিয়া থাকিলেন।

এদিকে রামানন্দ রায় তীরে উঠিয়াই প্রভুকে দেখিলেন। তিনি সেই শত-সূর্য্যসম-কান্তি, অরুণ-বসন-পরিহিত, সুবলিত-দেহ-সমন্বিত, কমললোচন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর প্রভুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ পতিত দেখিয়া বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। ইচ্ছা হইল, রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। বলিলেন "তুমি কি রামানন্দ রায়?" রামানন্দ রায় বলিলেন, "হাঁ আমি সেই শূদ্রাধম দাস?" শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন মাত্রই প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই অশ্রুকম্পাদি বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। দেখিল, রামানন্দ রায়ের সঙ্গের লোক সকল বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্ন্যাসীকে ত মহা তেজস্বী দেখিতেছি, ইনি কেন শূদ্র বিষয়ীকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন? আর এই মহারাজও ত পরম গম্ভীর ও মহাপণ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত ও অস্থির হইলেন? প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই বিজাতীয় লোক সকল দেখিয়া আপন আপন ভাব সংবরণ করিলেন। সুস্থ হইয়া উভয়েই বসিলেন। বসিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া আমাকে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্তই এই স্থানে আসিয়াছি। অনায়াসেই তোমার দর্শন পাইলাম, ভাল হইল। রাম রায় বলিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া পরোক্ষেও আমার হিত সাধনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপাতেই আপনার চরণ দর্শন লাভ হইল।

আজ আমার মানব জনম সফল হইল। আপনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কৃপা করিয়া তাঁহারই প্রেমের অধীন হইয়া এই অস্পৃশ্য অধমকে স্পর্শ করিলেন। কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর কোথায় আমি রাজসেবক অধম বিষয়ী শূদ্র। আপনি আমাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বা শাস্ত্রের ভয় করিলেন না।

আপনার স্বাভাবিকী করুণার বশে আপনি সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। আপনি স্বীয় করুণার গুণেই নিন্দ্য কর্ম্ম আচরণ করেন। আপনি পরম দয়ালু ও পতিতপাবন বলিয়া আমার নিস্তারার্থ এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। মহতের স্বভাব এই যে, তাঁহারা নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও পরোপকারার্থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নানাজাতীয় লোক সকল রহিয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিয়া সকলেরই মন দ্রবীভূত হইয়াছে। সকলেরই অঙ্গে পুলক ও নেত্রে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে। আপনার আকার প্রকারে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে। জীবে এইরূপ অপ্রাকৃত গুণ সম্ভব হয় না। প্রভু বলিলেন, তুমি মহা ভাগবতোত্তম, তোমার দর্শনেই সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক আমি কঠোর মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তোমার দর্শনে আমারও মন গলিত হইয়াছে, তোমার স্পর্শে আমাতেও কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব বোধ হয়, আমার কঠিন হৃদয় কোমল করিবার নিমিত্তই সার্ব্বভৌম আমাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকার পরস্পর স্তুতিবাদ হইতেছে, এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। পরে হাসিয়া রাম রায়কে বলিলেন, তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আবার দর্শন পাইবার ইচ্ছা করি। রাম রায় বলিলেন, যদি এই পামরকে শোধন করিবার নিমিত্ত আগমন হইল, তবে দিন পাঁচ সাত অবস্থান করিতে অনুমতি হয়; কারণ দর্শনমাত্র এই দুষ্টচিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া রাম রায়, ত্যাগ অসহ্য হইলেও প্রভুকে ছাড়িয়া নিজভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ বিশেষ ভক্তি সহকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই পরম উৎকণ্ঠার সহিত দিবস অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া প্রভু সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া বসিলেন। এই সময়ে রাম রায়ও একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। রাম রায় আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

প্রভু উঠিয়া প্রণত ভৃত্যকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে উভয়েই আসন

গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণের পর প্রভু রাম রায়কে বলিলেন, পুরুষের প্রয়োজন যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, এমন একটি শ্লোক পাঠ কর। রাম রায় পাঠ করিলেন। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেন পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

মনুষ্য যে অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, সেই আচার পালনেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ইহাই বিষ্ণু-সন্তোষের উপায়, এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

প্রভু বলিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা বা বিষ্ণু ভক্তিই সাধ্য বস্তু ইহা ঠিক এবং অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচার পালন করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত মালিন্যকর রজস্তমোগুণের অভিভবের অনন্তর মহৎ সঙ্গাদি দ্বারা ভক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার সাধ্য ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়া বাহ্য বা বহিরঙ্গ সাধনই বলা যায়; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সাধ্যের নির্ণয় না হইয়া সাধনেরই নির্ণয় হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় স্বীকার করিয়া লইলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইতেছে না; কারণ উক্ত বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহিরঙ্গ সাধন মাত্র; অতএব অন্য শ্লোক পাঠ কর। রাম রায় পাঠ করিলেন।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥

কৌন্তেয়, তুমি ভোজন, হবন, দান, তপ ও অপর যে কিছু কর্ম্ম কর, সে সকল আমাতে অর্পণ কর। রাম রায়ের এই গীতার শ্লোকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার পরিপালন সাধ্য ভক্তির বহিরঙ্গ সাধন; কারণ উহা ফলকামনারহিত বলিয়া উক্ত হইলেও ফলের প্রতি দৃষ্টি রহিত—আগ্রহরহিত না হওয়ায় সকামবৎ, অতএব কঠোর; কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ সাধ্য ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন; কারণ উহা ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত আগ্রহ রহিত হওয়ায়. নিষ্কাম, অতএব সুস্থ। উক্ত কর্ম্মের ফল কর্ম্মের সহিত প্রিয় শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় উহা সাধ্য ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন হওয়াই সঙ্গত। প্রভু বলিলেন, উহাও অন্তরঙ্গ

সাধন নহে; পরন্তু বাহ্যই। ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। কৃষ্ণার্পিত কর্ম্ম, কর্ম্মই ভক্তি নহে। কি ভগবদাজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত, ফলের প্রতি দৃষ্টিযুক্ত বর্ণাশ্রমাচার পালনরূপ কঠোর সকাম কর্ম্ম, কি ফলের প্রতি লক্ষ্য রহিত কৃষ্ণার্পিত হৃদ্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ই কর্ম্ম, উভয়ই আরোপসিদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি নহে, উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মই ভক্তির ন্যায় চিত্ত-শুদ্ধিকর হওয়ায় ভক্তির আকারে দৃষ্ট, অতএব ভক্তি নামেই অভিহিত হইয়া হইয়া থাকে। উহারা ভক্তি না হইয়াও ভক্তিরত্নের আরোপ হেতু ভক্তি নামে উক্ত হয় বলিয়াই উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। আরোপসিদ্ধা ভক্তি কথনই পরম পুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। অতএব এই কর্ম্মযোগরূপ বাহ্যসাধনও ত্যাগ করিয়া যাহা অন্তরঙ্গ সাধন তাহাই বল। রাম রায় পাঠ করিলেন—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

সখে, স্বধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া মদুপদিষ্ট স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। রাম রায়ের উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মাচরণ ও আচরিত স্বধর্ম্মের ফলার্পণই কর্ত্তব্য। পরে যখন দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তদুপদিষ্ট কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম সকল আরোপসিদ্ধা, শরণা-পত্তি স্বরূপসিদ্ধা। প্রভু বলিলেন—শরণাপত্তি স্বরূপসিদ্ধা একথা সত্য; কিন্তু শরণাপত্তিতেও দুঃখ নিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, সাধক দুঃখ নিবারণার্থই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েন বলিয়া, শরণাপত্তিও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণরহিত অন্যাভিলাষশূন্য ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়, শরণাপত্তি জ্ঞান কর্ম্মের আবরণরহিত হইতে পারিলেও দুঃখ নিবারণে তাৎপর্য্য থাকায় অন্যাভিলাষ শূন্য হইতে পারে না। অতএব শরণাপত্তিকেও বাহ্য জানিয়া অন্তরঙ্গ সাধন বলে। রাম রায় পাঠ করিলেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

যিনি শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মভূত অতএব প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না; পরন্তু সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাম রায়ের উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—শরণাপত্তির দুঃখ নিবারণে তাৎপর্য্য থাকায় উহা উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইল না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দুঃখ নিবারণেও তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না; কারণ জ্ঞানমার্গে সুখ ও দুঃখ বাস্তব নহে; অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন হউক। প্রভু বলিলেন,—জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিতে দুঃখ নিবারণে তাৎপর্য্য না থাকিলেও, জ্ঞানের আবরণ থাকায়, ইহাও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা স্বরূপসিদ্ধাই নহে; পরন্তু সঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি উহার অঙ্গ মাত্র। অঙ্গী জ্ঞান অঙ্গ ভক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন করিতে পারিলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। অতএব উহাও বাহ্য জানিয়া, উহার পর যাহা তাহাই পাঠ কর। রাম রায় পাঠ করিলেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব।
জীবন্তি সম্মুখরিতা, ভবদীয়বার্ত্তাম্॥
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ।
যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

তিনি তোমার স্বরূপৈশ্বর্য্যের বিচার বিষয়ে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধু নিবাসে অবস্থিতি করিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক উক্ত ও অনায়াসে কর্ণপথপ্রবিষ্ট, তোমার কথাকে কায়মনোবাক্য দ্বারা সৎকার করিয়া জীবন ধারণ করেন, তুমি ত্রিলোকমধ্যে অন্যের অজেয় হইলেও, তিনি তোমাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন। রাম রায় যে অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন, তাই এই—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও যখন উত্তমা ভক্তি বলিয়া গণ্য হইল না, তখন অন্যাভিলাষ বর্জ্জিত ও জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণরহিত শ্রবণ কীর্ত্তিনাদিরূপা সাধনভক্তিই উত্তমা ভক্তি হইতেছেন। প্রভু বলিলেন—হাঁ, ইহাই উত্তমা

ভক্তি ; কিন্তু এই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিও সাধ্যভক্তি নহে, পরন্তু সাধন-ভক্তি। সাধনভক্তি শুনিলাম। অতঃপর সাধ্যভক্তি যাহা তাহাই বল। রাম রায় বলিলেন। "প্রেম ভক্তিই সকল সাধ্যের সার।"

নানোপচার কৃত পূজনমাত্মবন্ধোঃ।
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা।
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

কারণ বিবিধ উপচার দ্বারা করণীয় আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করিয়াও কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখদায়ক হয়। প্রেমের লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের শূন্যতা বশতঃ উপচারকৃত পূজনের যাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে, প্রেমের লাভ হইলে হৃদয়ের পূর্ণতাবশতঃ আর উপচারকৃত পূজনের তাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে না, প্রেমিক ভক্ত প্রেম দ্বারাই কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। ঐ প্রেমও আবার অতীব দুর্লভ বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতিঃ।
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে॥
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং।
জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তি-রসদ্বারা ভাবিত মতি যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাও, তবে উহা যত্ন করিয়া ক্রয় কর, উহার মূল্য একমাত্র লালসা, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও ঐ মতি লাভ করা যায় না।

প্রভু বলিলেন—"প্রেম ভক্তি সাধ্যের সার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে প্রেম বলিলে, উহা মমত্ব-বর্জ্জিত শান্ত প্রেম। ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেম যাহা তাহাই বল। রাম রায় বলিলেন দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে

যাহার নাম শ্রবণমাত্র মনুষ্য নির্ম্মল হয়েন, সেই তীর্থপাদ প্রভুর দাসগণের আর কি অলভ্য থাকে? প্রভু বলিলেন, দাস্য প্রেমে মমতাযুক্ত বলিয়া মমতা রহিত শান্ত প্রেম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে; অতএব উহা হইতে উৎকৃষ্ট যাহা তাহাই বল। রাম রায় বলিলেন, বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার। প্রভু বলিলেন, বিশ্বাসভাবময় সখ্যপ্রেম হইতে অনুগ্রাহ্য ভাবময় বাৎসল্যপ্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে; অতএব তদপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই বল। রাম রায় বলিলেন—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার। অনুগ্রাহ্য ভাবময় বাৎসল্যপ্রেম হইতে স্বসুখ তাৎপর্য্য বর্জ্জিত সম্ভোগ কান্তাপ্রেমের উৎকৃষ্টতা অপরিহার্য্য। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধ, অতএব সাধনানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুবিধ। যাহার যে ভাবে নিষ্ঠা, তাহার সেই ভাবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে, ভাব সকলের তারতম্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তদনুসারে কান্তাপ্রেমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। গুণাধিক্য ও স্বাদাধিক্য বশতঃ কান্তা প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, আকাশ ও বায়ুর গুণ তেজ, আকাশ বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের গুণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শান্তের গুণ দাস্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে ও শান্ত দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ কান্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কান্তাপ্রেমে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা দাস্যের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও সেবা সখ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও অসঙ্কোচ বাৎসল্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অসঙ্কোচ ও মমতাধিক্য, এই সমস্ত গুণই দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু কান্তাপ্রেমে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবারূপ গুণটী অধিক দেখা যায়। গুণাধিক্য হেতু প্রতিরসে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য হয়। মধুর রস সর্ব্বগুণের আকর; অতএব উহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু। মধুর রসে স্থায়িভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ঐ ভাবাবস্থা এক কান্তাপ্রেম ভিন্ন অপর কোন প্রেমেই দেখা যায় না। অতএব সীমান্ত প্রাপ্ত কান্তাপ্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কান্তাপ্রেমেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

যিনি যেরূপ ভজনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেরূপেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ইহা স্থির; কিন্তু ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমের অনুরূপ ভজন আবার অপর

কেহই করিতে পারেন না; অতএব শ্রীভগবান বলিয়াছেন, তিনি ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমের নিকট ঋণী।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজং
স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদবঃ প্রতি যাতু সাধনা॥

তোমরা নিরুপাধি ভজন-পরায়ণা। তোমাদের সাধুকৃত্য অসাধারণ। ঐরূপ অসাধারণ সাধুকৃত্য আমি—সুচির ফলেও সাধন করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ—আমি কিন্তু কেবল তোমাদিগকে ভজন করিতে পারিলাম না। অতএব তোমাদিগকে নিজ সাধুকৃত্যই ঐ সাধুকর্ম্মের প্রতিকার সাধন করুক। আমি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের নিকট ঋণীই রহিলাম জানিও—শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়াও ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবের অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই অধিকতর শোক ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ক্রমশঃ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

জীবাত্মা পরমাত্মা পৃথক কি এক বস্তু, সৃষ্টির উপাদান মায়া কি পরমাণু শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণসঙ্গত এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের সূচনা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষতে যথা, সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। উদ্গীত-মেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম, তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ, অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা, লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।

অনাত্ম দেহের উৎপত্তি স্থিতি লয়রূপ এই ব্রহ্মচক্র, এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড জীব এই ব্রহ্মচক্রে পতিত হইয়া স্বকর্ম্মবশতঃ মনুষ্য, পশুপক্ষী ও অন্যান্য যোনিতে

ভ্রমণ করিতেছে এই অনাত্ম দেহে আত্মবোধ করিয়া যাহারা জীব ও ঈশ্বরকে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ যাতনা ভোগ করিয়া চক্রভ্রমির ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে; যাহারা জীব ও ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মচক্রে পতিত না হইয়া, অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। মায়াগুণযুক্ত ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট্যাদি উদ্গাত হইয়াছে, মায়া ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং অমায়িক ব্রহ্মের আরাধনাই মুক্তিলাভের উপায়। ব্রহ্মধ্যানতৎপর ব্যক্তি জন্ম জরা মরণাদি সংসার মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আর যোনিযাতনা ভোগ করিতে হয় না; স্বরূপ লক্ষণ যাহা আরাধনীয় তাহা দৃষ্টকরণ যথা—ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্তে ত্রিপাদূর্দ্ধে উদৈৎ পুরুষ; নাদোহস্যেহহভবেৎ পুনঃ, ততো বিশ্বং ব্যাক্রমৎসাশনানশনে অভি।

ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রিপাদ উর্দ্ধে সমুদিত এক পাদ দ্বারায় চেতন অচেতন বহুরূপী হইয়া জগদাকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ঐ ত্রিপাদ সত্য, জ্ঞান, আনন্দ; শ্রুতি যথা—সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এই ত্রিপাদকে অমৃত কহে; যথা—শ্রুতি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। অতঃপর একপাদ ব্রহ্মের সৃষ্টিতত্ত্ব জন্য যে সমস্ত শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আলোচ্য যথা—তৈত্তরীয়ে ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৬ অনুবাক, তদৈক্ষত, একোহং বহুস্যাম্, প্রজায়েয়েতি, সততপোতুতপ্যত, সতপস্তপ্তা, ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ তৎসৃষ্টা, তদেবানু প্রাবিশৎ।

তিনি কামনা করিলেন প্রজারূপে বহু হই, এই বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন ও সেই চিন্তাতে অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সৃজিত বিশ্বে আত্মা রূপে প্রবেশ করিলেন। সৃষ্টির প্রাগুৎপত্তিকালে ঈশ্বরমাত্রই দৃষ্ট হওয়া শ্রুতিতে জানা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষতে যথা—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ, পুরুষ বিধঃ, সোনুবীক্ষ্য, নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোহমস্মীত্যগ্রে। শরীরান্তর উৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ প্রকারে নিজেকে নিজে নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিজের অবয়ব ভিন্ন অন্য কিছু অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু দেখিতে পাইলেন না; কেবল নিজেকেই সর্ব্বতোভাবে দেখিয়াছিলেন। আমি সকলের আত্মাস্বরূপ, নিজেকে নিজে অহং শব্দের দ্বারায় অভিহিত হওয়ায় তিনি অহং শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন। এই আত্মার শরীরাদি

গ্রহণের প্রতি উপাদান কারণ শ্রুতি দেখাইতেছেন,—শ্বেতাশ্বতরোপনিষতে যথা —তে,ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্, যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ধ্যানতৎপর হইয়া স্থির করিয়াছেন। যৎকালে পরমেশ্বর সগুণ হইয়া প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন, ঐ প্রকৃতির সঙ্গ হইতেই যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে ; উক্ত ঈশ্বরের ঐ শক্তি অন্যের অলক্ষ্য, তাহা সর্ব্বদা স্বীয় গুণে আচ্ছাদিত মনুষ্য প্রকৃতির কার্য্য পৃথিব্যাদি দেখিতে পায় অর্থাৎ তাহার সৃষ্ট এই আকাশাদি পাঞ্চভৌতিক জগৎ দেখিতে পায় কাল ও আকাশাদি ভূত তাহার অধীনে রহিয়াছে, প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও ঐ শক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচক্র বিবরণ যে ভাবে শ্রুতি দেখাইয়াছেন, প্রশ্ন উপনিষৎ ষষ্ঠ প্রশ্নে যথা—সপ্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপ পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপোমন্ত্রাঃ, কর্ম্মলোকা, লোকেষু চ নাম চ।

তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা ঐ তামসী শ্রদ্ধা তিনি প্রকৃতি তাহা হইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ইন্দ্রিয় মন ও অন্ন ঐ অন্ন হইতে বীর্য্য তপস্যা মন্ত্র কর্ম্ম লোক ও লোকের নাম সৃষ্টি করিলেন। ঐ ৬ প্রশ্নে যথা— স যথেমানদ্যঃ, স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্র প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে, এবমেবাস্য, পরিদ্রষ্টুরিমাঃ, ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ, পুরুষং প্রাপ্য, স্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যতে, তাসাং তদেব শ্লোকঃ। যেমন নদী সকল স্রোতবাহিনী হইয়া সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত হয়, তাহাদিগের নাম রূপ আর থাকে না, কেবল সমুদ্রমাত্রই বলা যায়, তাহার ন্যায় এই পরিদৃষ্টা পুরুষের ঐ প্রাণাদি ষোড়শ কলা ঐ পুরুষকে পাইয়া তাহাতেই অস্ত হয়,তাহার নাম রূপাদি আর কিছুই থাকে না ; কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায় তিনি কলারহিত অমৃত হন। উক্ত ষোড়শ কলা পূর্ণত্ববোধক হয়, তাহা দেখিতে পাইলেন ঐ পূর্ণের সবিকার নির্ব্বিকার শ্রুতিতে বক্ষ্যমাণ ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—বাজসনেয়সংহিতোপনিষতে যথা—শান্তিপাঠ ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মে বাবশিষ্যতে ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

কারণস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, এবং এই নাম-রূপাত্মক কার্য্য সেই পরমাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় তাহাকেই পূর্ণ অভিহিত করা হইয়াছে, এই কার্য্য সকল সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক ষোড়শ কলা যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই দেখিতে পাইয়াছেন। এই সবিকার লক্ষণ গুণযুক্ত ইহাকেই প্রকৃতি বলে। সেই পূর্ণ কার্য্য হইতে কারণ পৃথক হইলে কার্য্যের অসদ্ভাব হেতু নির্ব্বিকারে সেই পূর্ণ মাত্রই অবশেষ হয়। মায়া নিবৃত্তির পরিণাম তাহার চরম ফল ; সুতরাং শ্রুতি বলিলেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্ব পদে প্রপঞ্চময় জগৎ, ইদং ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম এক বচনান্ত করিয়া দেখাইতেছেন। সকল নিয়া এই এক ব্রহ্ম, সত্বাশ্রয় ক্রিয়া উহ্য আছে, ষোড়শ কলার চরম ফল ঐ মহাবাক্য। চতুষ্পাদ লক্ষণে আরও পরিষ্কার ভাবে শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন মাণ্ডুক্যোপনিষতে যথা—সর্ব্বহ্যেতে ব্রহ্মায় মাত্মা, চতুষ্পাৎ, জাগরিত স্থানোবহিঃ প্রজ্ঞঃ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখঃ, স্থূলভুক্ বৈশ্বানর, প্রথম পাদঃ। স্বপ্ন-স্থানোন্তঃ, প্রজ্ঞঃ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ, প্রবিবিক্তভুক, তৈজসো দ্বিতীয় পাদঃ। যত্র সুপ্ত, ন কঞ্চন, কামং কাময়তে, ন কথনে, স্বপ্নং পশ্যতি, তৎসুষুপ্ত-স্থান, একীভূতঃ, প্রজ্ঞান ঘন, এবানন্দ ময়ো, হ্যানন্দভুক্, চেতোমুখঃ, প্রাজ্ঞঃ, তৃতীয় পাদঃ। নান্তঃ প্রজ্ঞঃ, ন বহিঃপ্রজ্ঞঃ নোভয়তঃ প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞা ন ঘনং, প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞ, মদৃষ্ট, মব্যবহার্য্য, মগ্রাহ্য, মলক্ষণ, মচিন্ত, মব্যপদেশ্য, মেকাত্ম-প্রত্যয়, সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা, বিজ্ঞেয়ঃ।

এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম এই আত্মাই ব্রহ্ম এই আত্মা চতুষ্পাদ জাগরিত অবস্থায় আত্মা বাহ্যজ্ঞানবান মস্তকাদি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয়াদি একোনবিংশতি মুখ এবং স্থূল বিষয় ভোক্তা বৈশ্বানর নামে প্রথম পাদ স্বপ্ন অবস্থায় আত্মা অভ্যন্তর জ্ঞানবান্ মস্তকাদি সপ্ত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি একোন-বিংশতিমুখ এবং সূক্ষ্ম বিষয়ভোক্তা তৈজস নামে খ্যাত দ্বিতীয় পাদ। জীব নিদ্রিত হইয়া যে অবস্থায় আর কোন কার্য্য বিষয় কামনা করেন না বা কোন স্বপ্নও দেখেন না সেই অবস্থা সুষুপ্তাবস্থা ঐ অবস্থার একই ভাব প্রজ্ঞান ঘন স্বরূপ আনন্দময় আনন্দভোক্তা চিত্তমুখ প্রাজ্ঞ নামে খ্যাত তৃতীয় পাদ। যে অবস্থায় আন্তরিক জ্ঞান নাই ও বাহ্যজ্ঞান নাই উভয় সন্ধি জ্ঞান নাই যে অবস্থা

প্রজ্ঞানঘন নহে প্রজ্ঞ নহে ও অপ্রজ্ঞ নহে যে অবস্থা অদৃষ্ট অব্যবহার্য্য অগ্রাহ্য ও অলক্ষণ ও অচিন্ত্য ও অব্যপদেশ্য একাত্মগত্য প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গল স্বরূপ অদ্বিতীয় তাহাকেই চতুষ্পাদ বলিয়া জানিবে। সেই এই আত্মাকে জানিবে।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষ যোনিঃসর্ব্বস্য প্রভবপ্যয়ৌহি ভূতানাং। ইনিই সর্ব্বেশ্বর ইনিই সর্ব্বজ্ঞ ইনিই অন্তর্যামী ইনিই সমুদয়ের কারণ এবং ইহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি বিনাশ হয়। উক্ত আত্মা ব্রহ্মেতে লীন হইলে তাহার নাম রূপাদি কিছুই থাকে না, তাহা পুনরায় স্পষ্ট করিয়া দ্বিতীয় মুণ্ডকোপনিষতে দেখাইতেছেন যথা—

স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।

নদী সকল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে তখন নদী নামরূপ কিছুই থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি পরাৎপর পরমেশ্বরে ঐক্য হইলে নামরূপ ক্রিয়াশূন্য হইয়া ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে।

শ্রুতির দ্বারায় আত্মাই ঈশ্বর চৈতন্যই তাহার সত্তা; সুতরাং মায়াকল্পিত দেহাদির উপাদান মায়া, চঞ্চল অবস্থাগ্রস্ত চৈতন্যের উপাদান ঈশ্বর এ অবস্থায় অদ্বৈতবাদ কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইতেছে না।

সংহিতার দ্বারায় কি প্রতিপন্ন হয় তাহাই শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থাপ্য যথা মনু, ১২ অধ্যায়ে সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সমপশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি। কল্লুক টীকায়াং স্বেন রাজতে প্রকাশত ইতি স্বরাট্ ব্রহ্ম, তস্য ভাবঃ স্বরাজ্যং ব্রহ্মত্বং লভতে মোক্ষমাপ্নোতি। আত্মযাজী সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সকল ভূতে অবস্থিতি জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে যথা, তত্রাত্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ করোতি কিঞ্চিদভ্যাসা ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকং। নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধা ব্রহ্মগুণী বশী অজ শরীর গ্রহণাৎ সজাত ইতি কথ্যতে।

প্রত্যেক জীবাত্মা পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম যদৃচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন, তাহাই ভাবি জন্মাদির কারণ। ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ আত্মা কেননাত্মচেতন বস্তু জীবত্বের কারণ হয় না। আত্মা প্রকৃত জন্মরহিত হইলে শরীর ধারণ

বশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হন, অনাদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মা শরীর ধারণ করিতেছে এজন্যই ব্রহ্ম জীব নামে কথিত হন, প্রকৃত জীবাত্মা পরমাত্মা এক ভিন্ন পৃথক কিছু নহে অতঃপর মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়ে সনক সুজাত যোগকথনে যথা শুক্রাত্ব্রহ্ম প্রভবতি ব্রহ্মশুক্রেণ বর্দ্ধতে তচ্ছুক্রং জ্যোতিষামপ্যেহতপ্ত তপতি তাপনং যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনং। পূর্ণাৎ পূর্ণাণ্য ক্ষরন্তি, পূর্ণাৎ পূর্ণানি চক্রিরে হরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি পূর্ণমেবাব শিষ্যতে যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনং।

ব্রহ্ম অব্যাকৃত নিত্য বস্তু হইয়াও জগজ্জন্মাদি কার্য্যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন অর্থাৎ উপাধি যুক্ত জীবভাবে বহুত্ব প্রাপ্ত হন, তিনিও অন্যের দ্বারায় অপ্রকাশিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত স্বীয় তেজে শুক্র সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি ভীষণ বস্তু সমস্তের ভয়প্রদ যোগিরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করেন॥ চিৎপ্রতিবিম্ব ভূত জীব সমুদয় উপাধি যোগে পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে প্রাণাদিতে চিৎ প্রতিবিম্বভূত হইয়া ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া জীব উপাধিগ্রস্ত হন। প্রাণাদি উপাধি দর্পণ হইতে যখন সম্যক্ পর্য্যালোচনা সহকারে পৃথক করা যায়, তখন জীব ব্রহ্ম অভেদ হেতু উপাধির অসদ্ভাব প্রযুক্ত এক মাত্র পূর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, অতঃপর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণগত উত্তরভাগের প্রমাণ দৃষ্ট করুন। নির্ব্বাণ প্রকরণের ৯২ সর্গে এই মহাত্মা বশিষ্ঠ, ইনি একজন সংহিতাকার যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া রামচন্দ্রকে যোগ উপদেশ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতার উক্তি সর্ব্বথা, সংহিতাবৎ প্রামাণ্য দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বকারিণা সর্ব্বাত্মনাপ্যসর্ব্বেণ শূন্যরূপেন সংস্থিতং কিঞ্চিত্বং সদকিঞ্চিত্বং সাকৃতিত্বং নিরাকৃতি, অনুভূতং স জাড্যঞ্চ চেতনত্বমলং ময়া॥ মৈনাকমুগ্ধপীনস্য সাগরস্যাবনীং প্রতি সন্তি স্বর্গ সহস্রানি স্বায়ুভূতান্যথা ময়া॥ জগত্যঙ্গে ময়োঢ়ানি গূঢ়ানি প্রকটান্যপি প্রতিবিম্ব পুরানীব মুকরেণাজড়াত্মনা। এবং জলানিলাগ্নিত্বং ভূমিত্বং থাত্মনা ময়া কৃতং চিদেব স্বপ্নেষু বত্ মায়া বিজৃম্ভিতং আকাশ কোষাবিশদাত্মনি চিৎ স্বরূপে যেয়ং সদা কচতি সর্গ পরম্পরেতি সাস্তুত্তদেবকিলতাপ ইবাম্বুরুমা ভেদোপলব্ধ ইতি নাস্তি সদস্ত্যনন্তং। ৯৪ ধ্যায়ে যথা স্বম পরং ব্যোম সংকল্পাদ্রি যথানভঃ

তথাব্রহ্মজগচ্চৈব খমেবাসুমনাকৃতিঃ কিং চিদাকাশ কোশস্য তব বা মমবানঘ জগতোথাপি জায়েত কিং বা নশ্যতি মেবদ॥

বশিষ্ঠ বলিতেছেন আমি সর্ব্বদিগে সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে সকল কার্য্য করিলেও অসর্ব্ব ও শূন্যরূপে অবস্থিত ছিলাম। আমি কিঞ্চিত্ব অকিঞ্চিত্ব সাকারত্ব নিরাকারত্ব সমস্তই অনুভব করিয়াছি। সাগরের মধ্যে মৈনাকের ন্যায় অন্যান্য পর্ব্বত সকল গিয়া অন্তর্জীর্ণ হইলে সাগর মধ্যবর্ত্তী তত্তৎ স্থান সকল যেমন একটী জগতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ বহু সৃষ্টি জগৎ প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছি, দর্পণ যেমন আপনার মধ্যে প্রতিবিম্ব পুরী ধারণ করে। সেইরূপ আমিও আমার শরীরের প্রকট অপ্রকট অনেক জগৎ ধারণ করিয়াছি স্বপ্ন কালে চৈতন্য যেমন সৃজন করে, সেইরূপ আমি আকাশরূপে অবস্থান করিয়াও আপনাতে এইরূপ বিবিধ বস্তু মায়াবশে জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমির সৃজন করিয়াছি। আকাশগর্ভের ন্যায় স্বচ্ছ চিদাত্মায় এই যে সৃষ্টি পরম্পরা দীপ্যমান হইতেছে, ইহা তাপের অন্তরে উষ্মার ন্যায় পৃথক্ জ্ঞান করিবে,ফলে ইহাতে পার্থক্য কিছুই দেখা যায় না বা নাই, আছে কেবল একমাত্র অনন্ত সৎ। স্বপ্নপুরীও যেমন আকাশ সংকল্প, দৃষ্ট পর্ব্বতও যেমন আকাশ উক্ত ব্রহ্মার কল্পিত জগৎ ও তদ্রূপ নিরাকার স্বচ্ছ আকাশ নির্ম্মল চিদাকাশই এইরূপে জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছে। ফলত এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ ও ভ্রান্তি মাত্র হে অনঘ রাম এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যয়ে যে,এই চিদাকাশ তুমি আমি জগৎ কাহার কিছু জাত বা বিনষ্ট হইতেছে না ; অতএব কি উৎপত্তি বা বিনাশ হইতেছে, তাহা আমাকে বল। কূর্ম্মপুরাণে ঈশ্বরগীতায়াং ২ অধ্যায়ে নিত্য সর্ব্বত্রগ হ্যাত্মা কূটস্থ দোষ বর্জ্জিতঃ একঃ সম্ভিষ্ঠতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ তস্মাদ দ্বৈতমেবাহুর্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ মদোঽব্যক্ত স্বভাবেন সাচ মায়াত্ম সংশ্রয়া যথাহিধূমসম্পর্কান্নাকাশোমলিনো-ভবেৎ। অন্তঃকরণর্জৈতস্মাদাত্মারশুদ্ধো নিত্যঃ সর্ব্বত্রগোঽব্যয়ঃ উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ তৃতীয় অধ্যায়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং সর্ব্বধারং সদানন্দমব্যক্ত দ্বৈত বর্জ্জিতং॥ সর্ব্বোপমানরহিতং প্রমাণাতীত গোচরং নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং সর্ব্ববাসং পরামৃতং অভিন্ন ভিন্ন সংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ং নির্গুণং পরমং জ্যোতিস্তজ্‌জ্ঞানং সুরয়ো বিদুঃ। স আত্মা সর্ব্বভূতানাং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ পরঃ। সোহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তোজ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ॥ ময়াততমিদং

বিশ্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং। মৎ স্থানি সর্ব্বভূতানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। মহদাদ্যং বিশেষান্তং সং প্রসুতেহখিলং জগৎ যা সা প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা মোহিনী সর্ব্ব দেহিনাং। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো বৈ ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রাকৃতান্‌গুণান্। অহংকার বিমুক্তত্বাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ॥

কূটস্থ ও দোষ রহিত আত্মা নিজ শক্তি বশে একাকীই অবস্থান করেন। মায়ার সহিত অবস্থান করেন না সেই জন্য মুনিরা আত্মাকে যথার্থতঃ অদ্বৈত বলেন। অব্যক্তের স্বভাববলে যে মদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আত্ম সংশ্রয়া মায়া-বলে যেরূপ ধুম সংপর্কে আকাশ মলিন হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণ জভাবে আত্মাও লিপ্ত হন না; অতএব অক্ষর শুদ্ধ নিত্য সর্ব্বত্রগ ও অব্যয়; আত্মাই মুমুক্ষুগণের মন্তব্য শ্রোতব্য উপাসিতব্য সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণসকলের আভাস। যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত সমস্ত আধার সদানন্দ দ্বৈত বর্জ্জিত ও অব্যক্ত, যিনি সমস্ত উপমান রহিত প্রমাণাতীত অথচ গোচর নির্ব্বিকল্প আভাস রহিত অথচ সর্ব্বাভাস পরম অমৃত অভিন্ন অথচ ভিন্ন সংস্থান শাশ্বত ধ্রুব অব্যয় নির্গুণ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। পণ্ডিতগণ তাহাকেই জ্ঞানময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা তিনি বাহ্য আভ্যন্তরীণ তিনি প্রধান তিনিই আমি তিনি সর্ব্বত্রগামী তিনি শান্ত জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং সর্ব্বভূত আত্মাতেই অবস্থিত এরূপ জ্ঞান যাহার আছে তিনিই বেদজ্ঞ॥ মহদবধি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ যিনি প্রসব করেন, তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতিই সমস্ত দেহীদিগকে মোহিত করেন পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করেন, অহংকার বিমুক্তত্ব হেতু পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব তাহাকে বলা যায়, অতঃপর বরাহ পুরাণে যথা ৫ম অধ্যায়ে——

ততঃ শ্রুত্বা পুনর্বিপ্রং লুব্ধকঃ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ কৃত্বা লোহময়ং জালং তন্মধ্যে জ্বলনং দধৌ। দত্তবহ্নিং দ্বিজং প্রাহ জ্বাল্যতাং কাষ্ঠসঞ্চয়ং॥ ততো বিপ্র মুখে-নাগ্নিং প্রজ্বাল্য বিররাম হ। জ্বলিতেতু পুনর্ব্বহ্নৌ তং জালং লোহসম্ভবং। গবাক্ষৈ নির্গতজ্বালং বহ্নৌ কাদম্বিগোলবৎ পৃথক পৃথক সহস্রানি নিশ্চেলু জ্বলনার্চ্চিষঃ। এক স্থান গতস্যাপি বহ্নেরায়সজালকৈঃ ততোলুব্ধোহব্রবীদ্বিপ্র মেকাং জ্বালাং মহামুনে। গৃহাণ যেন শেষানাং করিষ্যামীহ নাশনং। এবমুক্ত্বা হুতাশেতু তোয়পূর্ণং

ঘটং ক্রতং। চিক্ষেপ সহসা বহ্নিঃ প্রশশামাথ পূর্ব্ববৎ॥ ততো ব্রবীলুব্ধকস্তু ব্রাহ্মণং তং তপোধনং। ভগবন্ যা ত্বয়া জ্বালা গৃহীতাসীদ্ধুতাশনাৎ প্রযচ্ছ যেন মার্গেণ মাংসাগ্ন্যানার্থ্য ভক্ষয়ে এবমুক্তাস্তদাবিপ্রো যাবদায়াস জ্বালকং। পশ্যত্যেব ন তত্রাগ্নি-মূলনাশে গত ক্ষয়ং॥ ততো বিলক্ষ ভাবেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ তুষ্ণীম্ভূতস্থিত-স্তাবল্লুব্ধকো বাক্যমব্রবীৎ ব্রতেস্মিন জ্বলিতোবহ্নির্ব্বহুশাখাশ্চ সত্তম মূল নাশে ভবেন্নাশ স্তদ্বদেতদপি দ্বিজ আত্মা স প্রকৃতিস্থশ্চ ভূতানাং সংশ্রয়ো ভবেৎ বিকৃতা-দ্ভুত্বস্তস্য এষা বৈ জগতস্থিতিঃ। ধর্ম্মজ্ঞ নিষ্ঠুরক তৎ শ্রবণে একখানি লৌহ জাল প্রস্তুত করিল, এবং তাহার নিম্নভাগে কতকগুলি কাষ্ঠ রাখিয়া সংখমনের হস্তে অগ্নি দিয়া কহিল দ্বিজ আপনি কাষ্ঠগুলিতে অগ্নি সংযোগ করুন। অনন্তর দ্বিজ মুখমারুতের দ্বারায় অগ্নি জ্বালিয়া বিরত হইলেন। এইরূপ জালের নিম্নে অনল প্রজ্বলিত হইলে, সেই জালের প্রত্যেক গবাক্ষ দিয়া কাদম্বি গোলবৎ শত শত বহ্নি শিখা পৃথক্ পৃথক্ বাহির হইতে লাগিল ; বহ্নি একমাত্র হইলেও সেই জালরন্ধ্র দিয়া সহস্ররূপে প্রকাশমান হইল, তখন ব্যাধ বলিল, মুনে,আপনি অগ্নির একটী শিখা গ্রহণ করুন, আমি অবশিষ্ট সমস্ত শিখা নিবাইয়া দিতেছি, এই কথা বলিয়া নিষ্ঠুরক সেই অনলের উপরিভাগে এক কলসী জল ঢালিয়া দিল, অনল তখনই নির্ব্বাণ হইয়া গেল, অনন্তর ব্যাধ বিপ্রকে ববিল, ভগবন্! আপনি অগ্নি শিখাটী রাখিয়াছেন, তাহা আমাকে অর্পণ করুন, আমি তাহা দিয়া মাংস পাক করিয়া খাইব। তচ্ছ্রবণে দ্বিজ জালের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে দর্শনে অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিলেন। লুব্ধক তাহাকে বলিল হে দ্বিজোত্তম! এই জালের নিম্নভাগে অগ্নি জ্বলিয়া ছিল জালের গবাক্ষ দিয়া পৃথক পৃথক রূপে অগ্নিশিখা বহুতর নির্গত হইয়াছিল ; কিন্তু মূলাগ্নি নির্ব্বাণ হওয়ায় যাবদীয় পৃথক পৃথক অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে হে দ্বিজ! আত্মাও এইরূপ আত্মা এক অভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রীপুরুষাকার ধারণ করে তাহাদের পরস্পর সংসর্গে আবার অন্য স্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হয় এইরূপেই জগতে সৃষ্টি। অগ্নি পুরাণে ৩৭৭ অধ্যায়ে যথা—দেহ আত্মা ন ভবতি দৃশ্যত্বাচ্চ ঘটাদিবৎ প্রসুপ্তে মরণে দেহাদাত্মান্যোজ্ঞায়তে ধ্রুবং দেহঃ স চেষ্টাবহারদবিকার্য্যাদি সন্নিভঃ॥ চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়ানি নাত্মা বৈ করণত্বতঃ। প্রাণপ্যাত্মা ন ভবতি সুষুপ্তে চিৎ প্রভাবতঃ॥ জাগ্রৎ স্বপ্নেচ চৈতন্যং সংকীর্ণত্বায়

বুধ্যাতে বিজ্ঞান রহিত প্রাণঃ সুষুপ্তে জ্ঞায়তে যতঃ। অতো নাত্মেন্দ্রিয়ং তস্মাদিন্দ্রিয়াদিকমাত্মনঃ। অহংকারোপি নৈবাত্মা দেহবদ্ব্যভিচারতঃ॥ উক্তেভ্যো ব্যতিরিক্তোহয়মাত্মা সর্ব্বহৃদিস্থিতঃ সর্ব্ব দৃষ্টা চ ভোক্তা চ নক্তমুজ্জ্বল দীপবৎ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, সত্য মানন্দ মদ্বয়ং ব্রহ্মাহ মস্মহং ব্রহ্ম পরংজ্যোতির্বিমুক্ত তুম্ অহং ব্রহ্ম পরংজ্ঞানং সমাধি বর্দ্ধ ঘাতকঃ চির মানন্দকং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকং অয়মাত্মা পরংব্রহ্ম তদ্‌ব্রহ্মত্বমসীতি চ। গুরুণা বোধিত জীবোহহং ব্রহ্মাস্মি বাহ্যতঃ সোহসাবাদিত্য পুরুষ সোহসাবহ মখণ্ডত্তম্ মুচ্যতেহসার সংসারাদ্ ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্ম তদ্ভবেৎ ঘটাদিবৎ দৃশ্যত্ব হেতু দেহ আত্মানয়।

দেহ যদি অবিকারীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তবে সুষুপ্তি ও মরণ হইলে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এইরূপ নিশ্চিৎ জ্ঞান কেন হয়; সুতরাং দেহ আত্মা নয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ করণ হেতু আত্মা নহে॥ দীপ যোগে অন্ধকারের অভাবে যেমন কোন বস্তুর দর্শন হয় সেইরূপ আত্মার সাহায্যে মনও বুদ্ধির করণতায় বস্তু বোধ হয়; সুতরাং মন ও বুদ্ধি করণমাত্র তাহা আত্মা হইতে পারে না জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় সংকীর্ণ হেতু চৈতন্যের অবরোধ হয় না ও সুষুপ্তিতে চৈতন্যের প্রভাব বিদ্যমান থাকে, যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় বিজ্ঞান হীন প্রাণ অবগত হওয়া যায়; সুতরাং প্রাণ বিজ্ঞান হীনতাপ্রযুক্ত আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়াদি মাত্র কিছুই আত্মা নয়। অহংকারও আত্মা নহে যেহেতু ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় ব্যভিচার হয় উক্ত সকল হইতে বিভিন্ন যে সেই আত্মা সকলের হৃদয়ে দীপবৎ বিরাজিত থাকিয়া সকলই দর্শন ও ভোগ করিতেছেন, নিত্য শুদ্ধ বদ্ধ মুক্ত সত্য অদ্বয় আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আমি আমি পরং জ্যোতিঃ বিমুক্ত ব্রহ্ম ওঁ আমি পরব্রহ্ম পরমজ্ঞান সমাধি ও বন্ধঘাতক ব্রহ্ম, চিদানন্দ সত্য জ্ঞান অনন্ত এই আত্মাই পরংব্রহ্ম তুমিও সেই ব্রহ্ম হয়। গুরু দ্বারায় বোধিত হইয়া জীব আমি ব্রহ্ম হই এইরূপে উদ্ভাসিত হয়, সেই আদিত্য পুরুষ সেই ঐ আমি অখণ্ড ওঁ এইরূপ জ্ঞানে সংস্কার হইতে মুক্ত হয় ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই ব্রহ্মই হন। শ্রুতি ইতিহাস সংহিতা ও পুরাণে দ্বৈত সাব্যস্ত হইতেছে, কোথায় আর্য্য ধর্ম্মে দ্বৈতবাদ নাই; সুতরাং তাহা আর্য্য ধর্ম্মের বিপরীত অতঃপর মায়া ও পরমাণুর বিচার দৃষ্ট করুন। ক্রমশঃ

শ্রীবিনোদলাল পাকড়াশী, বেদান্তরত্ন।

উত্তর ভারত ভ্রমণ।

প্রথম ভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পদ্মা পার হইবার খেয়া-নৌকা আছে। আমরা খেয়া-নৌকায় উঠিলাম। নৌকায় উঠিয়া দেখি, নৌকার ভিতর একটী ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত জল উঠিতেছে। নৌকায় ২৫।৩০ জন লোক উঠিল এবং নৌকাটী সম্পূর্ণ বোঝাই হইল। ইত্যবসরে (নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বেই) নৌকার ভিতর চাহিয়া দেখি, নৌকার তলদেশ একেবারে জলপূর্ণ হইয়াছে। একে পদ্মা নদী, তাহাতে আবার জীর্ণ তরী। শ্রীপদের উপর বিষ-ব্রণ। সমস্তই আমাদের প্রতিকুল। আমরা বিপদ-তারণ শ্রীমধুসূদনের নাম স্মরণ করিয়া নৌকা ছাড়িলাম। আমার বিন্দুমাত্রও ভয় হইল না। অপিচ অভিজ্ঞতা আমাকে কতকটা সাহসী করিয়াছে, যেহেতু এ বিপদ আমার নূতন নহে। কতিপয় * বৎসর পূর্ব্বে কলেজে অধ্যয়নকালে সমুদ্র বিহরণেচ্ছু আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া চট্টগ্রাম হইতে সামুদ্রিক ষ্টীমারে "কুতবদিয়া" যাই। বলা বাহুল্য, কুতবদিয়ার বাতি, ঘর ভারত-বিখ্যাত। নাবিকেরা বঙ্গসাগরের যে কোন স্থান হইতে এই বাতি দেখিতে পায়। বঙ্গ-সাগরের পর্ব্বত-প্রমাণ এক একটী তরঙ্গের মধ্য দিয়া ক্রমাগত আট ঘণ্টার রাস্তা অতিক্রম করার পর একটী নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া কুতবদিয়া পৌছিতে হয়। ষ্টীমার নদীর প্রায় মাঝ-খানে থাকে। সেখান হইতে জেলে-ডিঙ্গিতে কুতবদিয়াকূলে যাওয়া যায়। ষ্টীমার থামিলে আমরা জেলে ডিঙ্গিতে উঠিলাম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! উঠিয়া দেখি, নৌকার তলদেশ হইতে তিন চারি স্থান দিয়া ফোয়ারার ন্যায় জল উঠিতেছে। ষ্টীমার আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় আমরা উচ্চৈঃস্বরে কাপ্তেনকে ডাকিতে লাগিলাম। কাপ্তেন আমাদের সমূহ বিপদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জালিবোট, ছাড়িয়া দিলেন।

---

* ১৩০৯ সালের "অতিথি" নামক মাসিক পত্রিকার "সমুদ্র-দর্শন" প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

জালিবোট আসিবার পূর্ব্বেই আমরা তীর-সমীপে পহুঁছিলাম এবং বুক-জলে দাঁড়াইয়া রক্ষা পাইলাম। তখনই নৌকাখানা ডুবিয়া গেল। ঈশ্বরানুগ্রহে সে সময় ভাটা ছিল, তাই আমরা প্রাণে বাঁচিলাম। ইহাও শুনা গেল, যেখানে আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, সেখানে মৎস্যের ন্যায় অসংখ্য হাঙ্গর জলমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং মানুষ জলে নামিলে হিংসা করে। কিন্তু সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশিনী বরাভয়দায়িনীর অসীম অনুকম্পায় আমরা অক্ষত কলেবরে কুতবদিয়ার তীরে উঠিলাম। তাই বলিতেছিলাম, এ বিপদ নূতন নহে। বিখ্যাত পদ্মার তরঙ্গ কাহারও অবিদিত নাই। উর্ম্মিরাশি লোহার মুদ্গরের ন্যায় ধাক্কা মারিতেছে; বেচারা জীর্ণ তরণি কোন প্রকারে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে। আমরা অনেকক্ষণ এ দৃশ্য অবলোকন করিলাম। ক্রমে তরী তীরে পৌঁছিল। এই সময়ের মধ্যে নৌকার অর্দ্ধেক জলমগ্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে এবারও রক্ষা পাইলাম।

আমরা বালুচরে নামিলাম। এখান হইতে গ্রামের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল দিগন্তপ্রসারিত বালুকারাশিভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। দূরে—অতি দূরে—সীমান্তে ক্ষীণ কালরেখা গ্রামের পরিচয় দিতেছে। আমরা বরাবর হাঁটিতে লাগিলাম। জনমানবের চিহ্নও নাই, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ঝাউবন দেখা গেল এবং তাহারই মধ্যে ক্বচিৎ কোন স্থানে দুই চারিটী 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' ভীমকায় ব্যক্তি কাঁচিহস্তে জঙ্গল কাটিতেছে। ইহাদিগকে দেখিলেই পদ্মাতীরের দস্যু বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম, রাত্রে কোন পথিক এখানে নামিলে পিতৃপুরুষের পুণ্যফল এবং পতিব্রতা রমণীর একমাত্র শাঁখা সিন্দূরের বলেই ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। দিবাভাগেও একাকী এস্থান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ আশঙ্কাজনক। সুবিধা পাইলে ইহারা কখনই আমাদিগকে ছাড়িত না। দৈববশাৎ আমরা নিষ্কৃতিলাভ করিলাম এবং পাশাপাশি দুই মাইল হাঁটিয়া চর উত্তীর্ণ হইয়া লোকালয়ে আসিলাম। এখান হইতে রেলওয়ে লাইন দিয়া পুনরায় তিন মাইল হাঁটিয়া ক্লান্তদেহে, অবসন্নমনে বেলা তিন ঘটিকার সময় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের বিখ্যাত গোয়ালন্দ ষ্টেসন হইতে দশ মাইল দূরে বেলগাছি ষ্টেসনে উপনীত হইলাম।

সময় সঙ্কীর্ণবিধায় বেলগাছিতে কিছু জলপান করিয়া রাণাঘাটের টিকেট লইয়া (2, Down Passenger) গাড়িতে উঠিলাম। ভাড়া ১৶৯ পাই। * ৪টা ১৩ মিনিটে গাড়ি ছাড়িল।

পোড়াদহ জংসন হইতে জনৈক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা অষ্টমবর্ষীয় একটী বালক সমভিব্যাহারে আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। দুই ষ্টেসন পর রমণী উদ্বিগ্নচিত্তে আমাকে বলিলেন "বাবা, আমার সঙ্গে একটী আত্মীয় আসিয়াছেন, তিনি কোন্ গাড়িতে আছেন তাঁহার সন্ধান পাইতেছি না, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দাও।" আমি প্রত্যেক ষ্টেসনে নামিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে গাড়ি রাণাঘাট পঁহুছিবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোথায় যাইবেন? তিনি উত্তর করিলেন "বাবা আমি কলিকাতায় যাইব।"

আমাদের গাড়িতে একজন ভদ্রলোক কলিকাতা যাইতেছেন। আমি তাঁহার হস্তে মহিলাকে সমর্পণ করিলাম এবং যাহাতে তিনি কলিকাতা পঁহুছিয়া এই রমণীকে অগ্রে তাঁহার বাসায় রাখিয়া পরে নিজের বাসায় গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম। নিরাশ্রয়া রমণীর জন্য কেনা অগ্রসর হয়? ঐ ভদ্রলোক আমার কথা মত কাজ করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার হস্তে উক্ত মহিলাকে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম; তিনিও অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন।

আমাদের গাড়ি রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে রাণাঘাট আসিলে আমরা মহিলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেসনে নামিলাম। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানি কয়েকমাস হইল গোদাগারি হইতে কাটিহার পর্য্যন্ত এক নূতন লাইন খুলিয়াছে। রাণাঘাট হইতে এ লাইনে কাটিহার যাওয়া মনস্থ করিয়া সিয়ালদহের ট্রেণের প্রতীক্ষায় বিশ্রাম-গৃহে অতিকষ্টে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। গাড়ি আসিলে টিকেট লইয়া (41, up daily mixed) ট্রেণে রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটে রাণাঘাট হইতে রওনা হইলাম। রাণাঘাট হইতে কাটিহার ২১৫ মাইল; ভাড়া ১॥৶০ আনা।

* টাওয়ার্ড সময়ানুরূপ ধরা হইল।

আমরা রাত্রিকালে ক্রমান্বয়ে ১টা ৮ মিনিটে নদীয়া জেলার প্রধাননগর, কৃষ্ণনগর, ৩টা ৮ মিনিটে বিখ্যাত পলাশী ক্ষেত্র, ও ৪টা ৪৬ মিনিটে মুর্শিদাবাদের সদর ষ্টেসন বহরমপুর দেখিতে পাইলাম। এসকল ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া অতীত স্মৃতিতে আমার চিত্ত মথিত। হইল। কোথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং কোথায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা! সর্ব্ববিধ্বংসী কাল মুহূর্ত্তে সকলকে গ্রাস করিয়াছে। গৌড় ও নদীয়া এককালে হিন্দুরাজাদিগের এবং ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ মুসলমান বাদসাহদিগের রাজধানী ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজধানী মুসলমানের হস্তগত হয়।

পলাশীর একটী বিশাল প্রান্তর। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও দুই একটী বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। পলাশী দেখিয়া কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম কাব্য "পলাশী-যুদ্ধের" ওজস্বিনী ভাষা মনে পড়িল। যেখানে একদিন কামানের গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইত, যেখানে বন্দুকের ধূমে গগনমণ্ডল আবরিত ছিল, যে স্থানে উভয়পক্ষীয় সেনানীর পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইতেন, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দিবাভাগেও কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই, কালের কুটিলচক্রে আজ তাহা শান্তি নিকেতন হইয়াছে। আজ সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলে শাখাসীন পাখিগণের সুমধুর সঙ্গীতে প্রাণ শীতল হয়। প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন কি অভাবনীয় ব্যাপার! মাত্র দেড় শতাব্দীর কি ঘোর পরিবর্ত্তন! দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

কলেজের ছুটির সময় আমি একটী বন্ধু-সহকারে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ রামপাল গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই রামপাল একদা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কৌলিন্য-সংস্থাপক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন এই রামপালে বাস করিতেন। প্রাচীন ইষ্টকের স্তূপ, শুষ্ক সরোবর প্রভৃতি আজও ভগ্নহৃদয় তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। জনশ্রুতি এই বৃদ্ধা রাজমাতা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত এক সুবৃহৎ দীঘি খনন করা হইয়াছে। ইহাকে এখনও লোকে "বল্লাল-দীঘি" বলে। এই দীঘি খনন করিয়া কুলিরা প্রতিদিন কার্য্যশেষে একটী যায়গা হইতে প্রত্যেক এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইরূপে

যে দীঘির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে "কোদাল ধোয়ার দীঘি" বলিয়া থাকে। রাজা দুইটী প্রকাণ্ড মুদ্গর দ্বারা ব্যায়াম করিতেন; তাহা এখনও পড়িয়া আছে। কালক্রমে মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিলে সতী কন্যারা অনন্যোপায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন, এই অগ্নিকুণ্ড 'মিঠাপুকুর' নামে খ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এখনও সেইস্থান দেখাইয়া থাকে। বল্লালের পূর্ব্ব-পুরুষ অপুত্রক রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন অদ্ভুতশক্তিশালী বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য জলগণ্ডূষ হস্তে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে রাজার নিকট সংবাদ গেল। কিন্তু মহারাজ আদিশূর এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া সমীপস্থ শুষ্ক শালবৃক্ষে আশীর্ব্বাদ-বারি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। আশীর্ব্বাদের অমোঘ শক্তিবলে মৃতবৃক্ষ বাঁচিয়া উঠিল এবং নবপত্রে সুশোভিত হইল। ঐ শালবৃক্ষ অতীত ঘটনার সাক্ষ্য স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিম্বদন্তী এই—ঐ বৃক্ষে রাজহস্তী বন্ধন করিত। ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুরমণীগণ এখনও বৃক্ষমূলে তৈল ও সিন্দূর অনুলেপন করিয়া থাকে।

রামপালের কৃষকগণ ভূমিকর্ষণকালে অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ পাইয়াছে ও এখনও সময় সময় পাইয়া থাকে। যেখানে রাজ দরবার হইত, ঠিক সেই স্থান এখন ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং সেই ক্ষেত্রে জম্বুকও দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য! কালের কি অসাধারণ শক্তি! কি অমানুষিক ঘটনা! এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইল। যে দরবারে একটী মক্ষিকা প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইত, আজ সেই দরবারে জম্বুক দিবাভাগে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে—দরবার গৃহ ভেদ করিয়া ইক্ষুদণ্ডগুলি বিপক্ষ সেনানীর ন্যায় সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। উঃ! ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়! নিষ্ঠুর বিধাতঃ! এ তোমার কেমন লীলা?

৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৬টা ৩৭ মিনিটে লালগোলাঘাট গাড়ি থামিল। লাল-গোলাঘাট হইতে পদ্মা পার হইয়া গোদাগারি ঘাটে যাইতে হয়। পারা-

পারের জন্য "অস্প্রে" ষ্টীমার আছে। আমরা পদ্মায় স্নান করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। "অস্প্রে" লালগোলা ঘাট হইতে ৭টা ৩৬ মিনিটে ছাড়িয়া ৮টা ২৬ মিনিটে গোদাগারি ঘাটে গেল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া আমরা ষ্টেসনাভি-মুখে যাইতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক একটী বৃদ্ধা পরিচারিকাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "আপনি কাটিহার যাইবেন, এ বৃদ্ধাও কাটিহার হইয়া ইহার প্রভুর নিকট ভাগলপুর যাইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে কাটিহার পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়া যাইবেন।" আমি বৃদ্ধাকে অভয় দিয়া তাহাকে আমার গাড়িতে উঠাইলাম। বৃদ্ধা আমাকে পাইয়া বড় আনন্দিতা হইল। তাহার ব্যবহারে বোধ হইল যেন আমি তাহার চিরপরিচিত। বিদেশে এপ্রকারই ঘটিয়া থাকে। কাহারও দ্বারা সামান্য উপকার পাইলে তাহাকে পরমবন্ধু বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ বিদেশে বন্ধুর অভাব হয় না; ইহা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। সহস্র মাইল দূরের অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত এমন গাঢ় প্রণয় জন্মে যে, তাহা চিন্তা করিলে ভগবানের করুণায় হৃদয় আপ্লুত হয়। জলপথে ও স্থলপথে সর্ব্বদা এ রকম বান্ধব না মিলিলে কেহ একাকী ঘরের বাহির হইতে পারিত না। পাঠক! জগদীশ্বরের প্রতি আস্থা রাখিয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যেখানেই কেন পরিভ্রমণ না করুন, কখনও সুহৃদ্‌বিহীন হইবেন না। আমারও অনেক মিত্রলাভ হইয়াছে এবং অনেকের দ্বারা আমি এতদূর উপকৃত হইয়াছি যে, তাঁহাদের কথা প্রস্তরফলকে খোদিত লিপির ন্যায় চিরদিন হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে।

(41, up mixed daily) ট্রেণ ৮টা ৪৬ মিনিটে ছাড়িল। নূতন লাইন বলিয়া গাড়ি ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের কম চলে এবং প্রত্যেক ষ্টেসনে প্যাসেঞ্জার না থাকিলেও অনর্থক দশ বার মিনিটের অধিক অপেক্ষা করে। ইহাতে বড়ই উদ্বেগ বোধ হইল। বেলা ১টা ২১ মিনিটে মালদহ জেলার প্রধান নগর ইংরেজবাজার গাড়ি থামিল। মালদহ ইতঃপূর্ব্বে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল; বঙ্গবিচ্ছেদের পর রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানে আসিয়ে রাজা আদিশূরের রাজধানী প্রাচীন গৌড়নগরের কথা আমার স্মরণ হইল। মালদহ হইতে আট দশ মাইল দক্ষিণে গৌড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। মহারাজ আদিশূরের বংশধর রাজা

বল্লালসেন ও তৎপুত্র রাজা লক্ষ্মণ সেন ধরা হইতে কবে অপসৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে সকলেই এইরূপ চলিয়া যায় এবং সকলকেই এই স্বর্গোপম মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। তবে ভরসা এই—কেহ চলিয়া গেলে তাহার সহিত সমস্ত মুছিয়া যায় না। নদী শুষ্ক হয় বটে; কিন্তু রেখা থাকে। মানুষ মরিয়াও স্বীয় গুণানুসারে অল্পকাল বা দীর্ঘকালের নিমিত্ত ইহ সংসারে জীবিত থাকে এবং অমর ইতিহাস তাহা মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

মালদহের আম্রকানন একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, আম্রকানন ভিন্ন দ্বিতীয় বৃক্ষ দেখা যায় না। এমন আম্র কানন-সমাকীর্ণ জিলা ভারতে বিরল। আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস আম্র ফলের যৌবনাবস্থা; কিন্তু এখানে মাত্র অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যেখানে এত বৃক্ষ জন্মে, তাহার ফল বহুব্যাপী হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আম্র ফলের রাজা। সেই শ্রেষ্ঠ ফল ঈশ্বর আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে মানবকে ভগবৎপ্রেমে বিভোর করে!

রেলওয়ে আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রতি ১০০ মাইল পরে নামিয়া একদিন বিশ্রাম করিতে পারা যায়; কিন্তু এই নূতন লাইনে সে সুবিধা নাই বলিয়া এ পথে বাঙ্গালী খুব কম যাতায়াত করে। এ লাইনে ভাড়া খুব কম। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, কুলিদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের অধিকাংশ কুলি এই লাইনে যায়। "লালগোলা ঘাট" পর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালী ছিল, তাহার পর ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। মালদহ ছাড়াইলে বাঙ্গালী বড় দেখি নাই।

আমরা ৫টা ৫২ মিনিটে কাটিহার অবতরণ করিলাম। কাটিহার বড় জংসন। ইষ্টারন্ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের এক শাখা গৌহাটী হইতে ও অন্য শাখা গোদাগারি হইতে আসিয়া এখানে বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনের বিস্তার ১৪০০ মাইল। আমরা বৃদ্ধাকে একটী নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিলাম। সে ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিল। তাহাকে আর কোন সাহায্য করিবার আবশ্যক হইবে না এবং সে এখন আপনিই ভাগলপুর যাইতে পারিবে, ইহা বলিয়া

আমাদিগকে সুমিষ্ট বচনে বিদায় দিল। দুই দিবসের অনশনে আমরা অবসন্ন-হৃদয়ে ম্লানমুখে জঠরজ্বালা নিবৃত্তির চেষ্টায় খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইলাম।

উদরের চিন্তা বড় চিন্তা। ইহা অপেক্ষা অধিক ভাবনার বিষয় এ জগতে নাই। তাই বুঝি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥"

কাটিহার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত। এখানে যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা সকলেই আপিসের কর্ম্মচারী। এতদ্ভিন্ন এখানে কোন বাঙ্গালীর ভদ্রাসন নাই। এ স্থানের অধিবাসীরা হিন্দুস্থানী। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কাটিহার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এ লাইনে মিটার গেজের মাপও ইহার রেল ৩ ফুট ৩½ ইঞ্চি প্রশস্ত।

রাত্রে আহারান্তে টিকেট করিতে গেলাম। কার সাধ্য টিকেট-গৃহে প্রবেশ করে? ভীমপরাক্রম হিন্দুস্থানিগণ যমদণ্ড হস্তে টিকেটগৃহ বেষ্টন করিয়া আছে। প্রথমতঃ দুই একবার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে অতি কষ্টে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুইখানা লক্ষ্ণৌর টিকেট লইয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পাঠক! অকপটচিত্তে লিখিতেছি, দুর্ব্বল হীনবীর্য্য বাঙ্গালী-জীবনে শতবার ধিক্কার আসিল। প্রত্যুত বিদেশে শারীরিক শক্তি প্রধান অবলম্বন। যাহার সে শক্তি নাই, তাহার বিদেশ গমন বিড়ম্বনা মাত্র।

এ অঞ্চলে টিকেট করিতে এতটা বেগ পাইতে হইবে জানিয়া আমরা একেবারে লক্ষ্ণৌর টিকেট লইলাম এবং ভবিষ্যতে আর কখনও অনতিদূরবর্ত্তী স্থানের টিকেট লই নাই। কাটিহার হইতে লক্ষ্ণৌ ৪৮০ মাইল—ভাড়া ৩৸৶০ আনা।

কাটিহার হইতে বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ীতে উঠাও বড় কষ্ট—এক প্রকার মারামারি করিয়া সবলে উঠিতে হয়; কারণ মোরান জুতাপায়ে গাঁটরি কক্ষে তৈলপূর্ণ বংশদণ্ড হস্তে উষ্ণীষধারী ভোজপুরীগণ প্রত্যেক কামরা অধিকার করিয়া আছে। উঠিবার অসুবিধা হওয়ায় মধ্যশ্রেণীর টিকেট লইতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া প্রিয় কেরাণী বাবু পর্ণপত্র চিবাইতে চিবাইতে বাতায়ন কক্ষ ঝটিতি বন্ধ করিলেন, অমনি যুগপৎ ঘণ্টা বাজিল।

আমরা দৌড়িয়া আসিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক একটী গাড়ীতে উঠিলাম। ১০টা ৪০ মিনিটে (1, up, passenger) ট্রেণ চলিল।

এই ট্রেণে একটীও বাঙ্গালী নাই। এবং কাটিহার ত্যাগের পর শীঘ্র আর কোথাও বাঙ্গালী দেখি নাই। বাঙ্গালীর অভাব বোধে আমার হৃদয়ে একটু অশান্তির উদ্রেক হইল। বাঙ্গালীর অভাব আমি দৃঢ়রূপে অনুভব করিলাম। যেহেতু বাঙ্গালীর বিয়োগে বাঙ্গালীর মনোবেদনা অস্বাভাবিক নহে। তবে সুখ এই—এ যাতনা আমার অধিক দিন ছিল না। কারণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে সমস্ত সহ্য হয়। অদ্য যাহা কঠিন বোধ হইতেছে, অভ্যাসবলে কল্য তাহা সহজ হইয়া আসিবে, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। বাঙ্গালীর অদর্শন ও বঙ্গভাষায় কথা কহিতে না পারিয়া যে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, ক্রমে তাহা সহ্য হইয়াছিল।

আমি হিন্দিভাষা ভাল রকম কহিতে পারি না বটে; কিন্তু সাধারণ ভাবে কথোপকথন করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করি না; পরন্তু বুঝিতে ত কোন কষ্টই হয় না। কারণ সমস্ত ভাষাতেই অপরের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে যে সময় লাগে, নিজে বলিতে শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা অধিক সময়সাপেক্ষ। আমাকে একটী হিন্দুস্থানী ভৃত্য দ্বাদশ বর্ষ অপত্যস্নেহে লালনপালন করিয়াছে। সে আর ইহসংসারে নাই। তাহার অভাব আমার নিকট বন্ধু-বিয়োগ অপেক্ষা অধিক। সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। আমি তাহার ক্রোড়ে আবাল্যবর্দ্ধিত। আমার এই বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার ন্যায় মায়াবী, সরল, বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য আর দেখি নাই। তাহার নিকট সর্ব্বদা হিন্দিভাষা শ্রুত হওয়ায় সেই ছায়া হৃদয়ে পড়িয়াছে। অপিচ, তাহার মুখনিঃসৃত দুই চারিটী শব্দ এখনও বেশ স্মরণ আছে; কারণ শৈশবের কথা বড় স্মরণ থাকে। হিন্দুস্থানী লোকের সহিত এখন যে কিছু কথাবার্ত্তা কহিতে পারি, ইহা সেই অঙ্কুরিত বীজের ফল, এ কথা সর্ব্বদা স্বীকার্য্য।

আমাদের গাড়ীতে বিহারনিবাসী একজন আদালতের কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় হয়। ইনি সুশীল ও মিষ্টভাষী। কথা বলিবার শক্তি সকলের সমান নহে। বাক্যস্ফুরণ সকলের সমান হয় না। ইহা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির উপর নির্ভর করে না। ইহা ঐশ্বরিক শক্তি বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। ইহার কথায় লালিত্য আছে। ইঁহার শব্দচাতুর্য্যে ও বাক্যবিন্যাসে আমি মুগ্ধ

হইলাম। ইঁহার নিকট অনেক নূতন কথা শুনা গেল। এই মহাগ্রীষ্মে ছাপরা গোরকপুর প্রভৃতি জিলা অতিক্রম করিতে বড় কষ্ট হইবে বলিয়া ইনি আমাদিগকে প্রত্যহ দিবাভাগে বিশ্রাম করিয়া রাত্রিকালে যাতায়াত করিতে উপদেশ দিলেন এবং কাটিহার হইতে লক্ষ্ণৌর মধ্যে (এই লাইনে) ছাপরা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আহারাদি করার বিশেষ সুবিধা নাই বলিয়া ছাপরায় নামিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। নানা কারণে আমরা ইঁহার অনুরোধে রক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমরা রাত্রে ১।৩৪ মিনিটের সময় কাটীহার হইতে ৪৫ মাইল দূরে "থানা বিহিপুর" ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। কাটিহার এবং থানা বীজিপুরের মাঝখানে কোশী নদীর পুল পার হইলাম। থানা বিহিপুর হইতে গঙ্গাতীরে "ভাগলপুর কাছারী" একটি শাখা লাইন গিয়াছে। থানা বিহিপুর হইতে রওনা হইয়া ৪।৪৫ মিনিটে "সাহেবপুর কমল" পঁহুছিলাম। সাহেবপুর কমল হইতে "মুঙ্গের ঘাট" পর্য্যন্ত একটি ব্রাঞ্চ ট্রেণ আছে। সাহেবপুর কমল হইতে রওনা হইয়া ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৬৷৩০ মিনিটে "বাড়াউনি" জংসনে উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৩৩)

সোণায় যতক্ষণ খাদ থাকিবে ততক্ষণ হাতুড়ীর ঘা দিলে ফাটিবে কিন্তু পাকা সোণা কখনই চিড় খায় না জানিও। তাই বলি ভাই! মনোধাতু পাকাইয়া ফেল, তাহা হইলে আর তাহা সংসারের সহস্র আঘাতেও ফাটিবে না।

(৩৩৪)

ভাই! দিনমণির ভিতর দেখ, গলিত কাঞ্চনের ভিতর দেখ, উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ভিতর দেখ, যাহার ভিতর দেখিবে আমার জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর

সুচিকণ শ্যামরূপ দেখিতে পাইবেই পাইবে, যদি এ চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিতে না পাও, তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিও পাগলের কথা মিথ্যা নয়।

(৩৩৫)

দোষীকে দণ্ড পাইতে দেখিলে কাহার মনে না দুঃখের উদয় হয়? চোরকে বাঁধিয়া নির্দ্দয়ভাবে বেত মারিতে মারিতে চৌকিদার ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, দেখিলে কাহার না দয়া হয়? খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে দেখিলে কোন্ ব্যক্তি খুসী হয়? দয়াময়, তোমার চরণে ঘোরতর অপরাধী হইলেও এ মহাপাতকী কি তোমার করুণার প্রত্যাশী হইতে পারে না?

(৩৩৬)

সকল জ্যোতিরই ছায়া আছে, পূর্ণজ্যোতিঃ দেখিবার চক্ষু আমাদের নাই, তাই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াই তুষ্ট থাকি অথবা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী জননী পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হইলে পাছে আমাদের চক্ষু পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তাই তিনি দয়া করিয়া শীতল শ্যামলরূপে দেখা দেন। তাই বলিয়া ভাই তাঁহাকে যেন কালো মনে করিও না। তাঁহার কালো ধোলো দুইরূপ একাধারে বিরাজিত, শ্যামা শ্যাম, গৌরী গৌর চিরকালই আছে, ইহার একটীই দেখা যায়, আলো আঁধার দুই একাধারে থাকিলেও আমরা আলোর কাছে অন্ধকার দেখিতে পাই না, অন্ধকারে আলোক অনুভব করিতে পারি না। আলোর লয় অন্ধকারে, অন্ধকারের লয় আলোয়।

(৩৩৭)

দয়াময়ি! তোমার সোণার সংসার কি এম্‌নি করে জন্মের মত সয়তানকে ইজারা দিতে হয়? মা! আমরা তোমার খাস্ তালুকের প্রজা, উহার অত্যাচারে ত আর বাঁচি না। জগজ্জননি! রক্ষা কর।

(৩৩৮)

ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানর চেয়ে ফাঁসি দেওয়া ঢের ভাল, তবু কেন মা! জীবকে একজন্মের পাপে সাতজন্ম পুড়াইয়া মার?

(৩৩৯)

ভাই! ব্রহ্মাগ্নি নষ্ট করিয়া যাহা পাইয়াছ, তাহা যে আগুনের গাছ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বীজে আগুন থাকিলে ফলও অগ্নিময় হইবে।

(৩৪০)

দোষ করিলে দণ্ড লইতে কাহার আপত্তি থাকে? চোর জেলে যাইবার সময় চুপ করিয়া থাকে; হত্যাকারী মুখ বুজিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে, সে জানে অপরাধ করিলে তাহার সাজা আছে। তবে কেন ভাই! স্বকৃত দুষ্কৃতের ফলে কষ্ট পাইলে আমরা হাউ মাউ করি?

(৩৪১)

নব প্রণয়িণী কুলকামিনীগণও বেশভূষা করিয়া থাকেন, আর বারবনিতাগণও বসন-ভূষণে সর্ব্বদা সজ্জিতা থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ ঢের। কুলাঙ্গনার বেশ ভূষা তাঁহার প্রাণপতির সোহাগ প্রত্যাশায়, আর বেশ্যার বিভ্রম বিলাস পথের পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। যদি ভাই! বাস্তবিক হৃদয়নাথের প্রেমাভিলাষী হইয়া গৈরিক বসন পরিধান বা তিলক-কণ্ঠী ধারণ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমায় দোষ দিই না নতুবা তোমার সাজ-গোজ যদি শুধু রাস্তার লোকের মন ভুলাইবার জন্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করিব।

(৩৪২)

মাটীর পুতুল পাঁচ সাতটী লইয়া খেলা করিতে গেলে দুই একটী ভাঙ্গিয়া যাইবেই—যাইবে; তার জন্য কাঁদিয়া পৃথিবী মাথায় করিলে কি হইবে?

(৩৪৩)

ভাই! বেশী মধু খাইলে গাজ্বালা করে তাই বলি, বেশী মধুপ্রিয় হইও না, জ্বলিয়া মরিবে। যাহা হইতে যত সুখী হইবে, সে নিশ্চয়ই তোমাকে ততোধিক জ্বালা দিবে।

(৩৪৪)

ভাই! এই ভবের হাটে সকল সুখই মূল্য দিয়া কিনিতে হয়, বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, তবে অগ্রিম মূল্য দিলে তাহা সুলভ বোধ হইবে, ধারে কিনিলে সুদ শুদ্ধ দ্বিগুণ দাম দিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

ক্রমশঃ—

জনৈক পাগল।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। ফাল্গুন ১৩১৭। ১১শ সংখ্যা।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২২

ওহে ক্লান্ত তীর্থযাত্রী,
শেষ হবে দুঃখ রাত্রি,
যখন তুমিহে এই
তিনটি বৃহৎপুর অতিক্রম করিবে।
শুন ধীরে মোর কথা,
ওহে শিষ্য মারজেতা,
এই তিন পুর মাঝে
তিনটি বিভিন্ন ভাব তব কাছে ভাসিবে।

তাহাদের অতিক্রমি,
আবার তখনি তুমি,
চতুর্থ যে পুর তায় পদার্পণ করিবে।
তার পর সপ্তলোক,
যেখানে না থাকে শোক,
চির শান্তিময় স্থান, বিরাজিত দেখিবে ;
এই সপ্তলোকে যাঁর
হইয়াছে অধিকার
শোক, দুঃখ, অনুতাপ, স্পর্শে নাক তা'য় ;
দূরে যায় তার ভ্রান্তি,
অনন্ত তাহার শান্তি,
শান্তির সরিতে সে যে সদা ভেসে যায়।
প্রথম অবস্থা যাহা জাগ্রত তাহার নাম,
দ্বিতীয় যে স্বপ্নময়,
তৃতীয়ে সুষুপ্তি কয়,
পার হলে চৈতন্যের এই তিন মহাধাম,
চতুর্থ আসিবে যাহা, তুরীয় অবস্থা সেই,
অবিশেষ আধ্যাত্মিক তুলনার কিছু নাই,—
সনাতন শান্তিময়, চৈতন্যের খেলা ঘর,
চৈতন্য করিছে খেলা এইখানে নিরন্তর।
কোন কোন গুপ্ত-প্রাচ্য-মহাবিদ্যাবিদ্ যাঁরা,
প্রপঞ্চের উপশম সেই সপ্তলোক তাঁরা,
কলহংস দেহের যে বিরাজিত সপ্ত স্থান,
বলেন, তাহার মাঝে আছে তারা বিদ্যমান।
সেই কলহংস যিনি তিনি কালাতীত ;
কালের দ্বারায় পুনঃ হয়ে প্রতিহত,
অনন্ত অব্যয় শিব সর্ব্ব অধিকারী,
সেই পূর্ণব্রহ্ম, হন ব্রহ্মা রূপধারী।

২৩

ইহাদের নাম যদি জানিবারে
চাহে তব প্রাণ,
কহি শিষ্য, রেখ মনে ধীরভাবে
করি প্রণিধান।

২৪

প্রথম যে গৃহ সেই
অজ্ঞানের ধাম
অবিদ্যার এইখানে
হয় পূর্ণকাম

২৫

এই গৃহ মাঝে হয় আলোক দর্শন
প্রথম তোমার,—
জীবনের লীলা খেলা, পরে মৃত্যু তব,
হইবে আবার।
কাটাইয়া দাও দিন ধীরভাবে থাকি,
সেই এক লক্ষ্য স্থানে স্থির দৃষ্টি রাখি।
চৈতন্য করেন খেলা রূপ মোহ লয়ে
সদা এই খানে
জগতের বিশিষ্টতা জ্ঞান ইন্দ্রিয়েরা তাই
যাহা কিছু মনে।

২৬

দ্বিতীয় যে গেহ রহিয়াছে তাহে,
তৈজস চৈতন্য খেলেন হাসি ;
স্বপ্নভাবে থাকি জীবাত্মা দেখেন
জীবন তরুর কুসুম রাশি।
কিন্তু জেনে তার প্রতি পুষ্প মাঝে
রহিয়াছে এক অহিতে ঘেরি ;

।শষাস্তের এই শিক্ষাময় পথ
এর নাম ঘোর কামনাপুরী।
পৃথিবীর যাহা অনুভূতি কিছু
এইখানে সদা আসিছে সেজে,
সে সব জানিও ভ্রমের আকর,
প্রেততত্ত্বীদের জগৎ এ যে।
এইথান হতে যত পুষ্পরাশি
আসিতেছে এই পৃথিবীতলে
ঘিরে থাকে সদা ভুজঙ্গ মহান্
সেই মনোহর সকল ফুলে।
মায়াপুরী এই বলে কেহ কেহ
মায়ার এথানে খেলার ঘর।
ধীরভাবে শিষ্য করি প্রণিধান
এই বাক্য গুলি সাদরে ধর।

২৭

তৃতীয়ের নাম প্রজ্ঞেয় আলয়।
বুঝ শিষ্য ভাল করে ইহা হতে বহুদূরে,
বিস্তৃত দুকূল হীন মহা জলাশয় ;—
অক্ষর ইহার নাম এখানে নাহিক কাম
অবিনাশি সর্ব্বজ্ঞতা এর প্রস্রবণ।
শুন শিষ্য পুনর্ব্বার আছে এর নামান্তর
পূর্ণ আধ্যাত্মিকময় চৈতন্য মহান,—
অব্যয় অবাঙ্ম সেই, অনপর পূর্ব্ব নাই,
এ অবস্থা প্রাপ্ত শিষ্য হয়েছে যেজন,
পতনের ভয় তার করেছে গমন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধা।

প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রং।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আকাশমিব নির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্।
যস্তাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি তথাগতম্॥ ২

যেমন আকাশ নির্লেপ, সর্ব্বপ্রকার লেপ সত্ত্বসঙ্গরহিত, নিষ্প্রপঞ্চ, সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ বা আকৃতি-বিহীন, নিরক্ষর বিশিষ্ট অক্ষর বা প্রকাশ ভাবের অতীত কেবল আপনার স্বরূপেই স্থিত, সেইরূপ যে পুরুষ তোমাকে নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরক্ষর জানিয়া, প্রেমের দ্বারা তোমাকে জানে ও দেখে, সেই পুরুষ তথাগত পরব্রহ্মকে জানিতে ও দেখিতে সমর্থ।

নির্লেপাং,—লেপশূন্যাং, আসঙ্গরহিতাং।

"নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড—৭ম অধ্যায়।

(তোমার কোনও উপাধি নাই, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি বাসনাশূন্য; তোমাকে যে জানে সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়)।

আবার সেই কথাই কেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বিপ্রপত্নীদিগের স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ধাম নিরীহো নিরহংকৃতিঃ।

(হে দেব, তুমি ব্রহ্ম, তুমি জীবের চরম ধাম, তুমি বাসনারহিত, অহংকারশূন্য)।

সাক্ষিরূপশ্চ নির্লিপ্তঃ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্ত্বং চ কারণং চ তয়োঃ পরম্॥

(তুমি পরমাত্মা, তুমি সাক্ষিস্বরূপ, নির্লিপ্ত ও নিরাকার। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই তুমি, আবার তুমিই প্রকৃতি ও পুরুষের কারণ)।

তুমি পূর্ণ,—তোমাতে কোনও বাসনার সংস্পর্শ-দোষ থাকিতে পারে না,

তাই তুমি শুদ্ধ ও পাপশূন্য। নির্লেপ অর্থে পাপশূন্যও বুঝায়। যথা,—লোক-বেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ।—কুসুমাঞ্জলিঃ।

নিষ্প্রপঞ্চাং—সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ বা আকৃতিবিহীন। তত্ত্ব পঞ্চপ্রকার তাহা হইতেই আকারের সৃষ্টি হয়। অতএব "প্রপঞ্চ" অর্থে,—"বিপর্য্যাসো বৈপরীত্যং ভ্রমো বা মায়েতি স্বামী"।—ইতি ভরতঃ। তাই "প্রপঞ্চ" অর্থে সংসার। এই প্রপঞ্চ বা সৃষ্টি হয় কেন? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং। জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা।" —ভাগবত—১০ম স্কঃ, ১৪ অঃ ২৫ শ্লো।

(যেমন রজ্জুতে মহাসর্পের উৎপত্তিও অস্বীকার হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া না জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই অজ্ঞান হইতে এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, আবার জ্ঞান হইলেই লয় পায়)।

নিরক্ষরাং—অক্ষর—অক্ষর বা বর্ণ যেমন একেই শব্দের বিশেষ বিশেষ ভাব, তদ্রূপ জগতে বিশিষ্ট বস্তুভাব বা অবস্থায় যিনি অতীত, অর্থাৎ যিনি আপাত প্রতীয়মান বিশেষের অতীত, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যরূপিণী। এই কথার দ্বারা তাঁহাকে বিশেষের পশ্চাতে দেখিতে ইঙ্গিত করা হইতেছে।

ভাবেন—প্রেমের দ্বারা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভগবৎ ভাবের, এইরূপ লক্ষণ আছে :—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

এই শ্লোকের প্রথম পাদে যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সে সকল জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল জ্ঞান ব্রহ্ম অনুভব করাইয়া দিতে পারে না। তাই ভগবান বলিয়াছেন, প্রেম না থাকিলে তথাগতকে অনুভব করা যায় না। প্রেম বা ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞান বন্ধ্যানারীর তুল্য। সেই হেতু বশিষ্ঠদেব মুক্তিপিপাসু সাধককে পক্ষীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। পক্ষী যেরূপ তাহার দুই পক্ষের সাহায্যে তাহার উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ সাধক জ্ঞান ও ভক্তিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্ত হয়। উপনিষদ্‌ও সেই কথা বলিয়াছেন।

ভগবদ্গীতায় প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে ভগবান বলিতেছেন,—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূতায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

গীতা—১৮অঃ। ৫১-৫৫

(কপটতা, বঞ্চনা এবং ঈর্ষা অসূয়াদি যে কোন প্রকার চিত্তমালিন্য আছে, তৎসমুদয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ম্মলচেতা হইয়া, প্রগাঢ় ধৈর্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া, কায়িক ও ঐন্দ্রিয়িক সুখসাধক যে কোন প্রকার বিষয় আছে, তৎসমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র শরীরটির রক্ষা হইতে পারে, এরূপ আহারের পরিগ্রহ করিবে, এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষকে দূরে পরিত্যাগ করিবে, নির্জ্জনস্থানে একাকী বসতি করিবে, লঘু আহার করিবে, কায়, বাক্য ও মনকে সংযতভাবে রাখিবে, বশীকার বৈরাগ্যের অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সমাধি যোগের অনুষ্ঠান করিবে, এবং অহংকার, কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত মমতা শূন্য হইয়া অগাধ শান্তিসম্পন্নভাবে অবস্থিতি করাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলে। ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। যিনি ব্রহ্মানুভব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোন বিষয় বিলাসের নিমিত্ত কিছুমাত্র অনুতাপানুভব করেন না, আবার প্রাপ্তির জন্যও কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষাবান্ হয়েন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, এবং জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞান স্বরূপ, আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার সহিত অভিন্নদর্শনস্বরূপ ভক্তিদ্বারাই আমি কত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি, এবং কিরূপ পদার্থ, তাহা তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ আমার অপরিসংখ্যেয় উপাধি এবং নিত্য শুদ্ধ

বুদ্ধ যুক্ত স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন আমি আর সেই জীব যে একই পদার্থ, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তখন আর কোন প্রকার দুঃখ, শোক, সুখ, মোহাদি কিছুমাত্র থাকে না, ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ইহারই নাম মুক্তি।*

তথাগতম্—পরব্রহ্ম।

বৌদ্ধগ্রন্থে "আদিবুদ্ধ" নানা নামে অভিহিত আছেন; যথা,—সর্ব্বজ্ঞ, সুগতঃ, বুদ্ধঃ, ধর্ম্মরাজঃ, তথাগতঃ, ভগবান্, সমন্তভদ্রঃ, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন, অনাদিনিধান, আদিবুদ্ধ, নিরঙ্কক, জ্ঞানৈকচক্ষু, অমল, জ্ঞানমূর্ত্তি, বাবেশ্বর, মহাবাদী, বদিরত, বদিপুঙ্গব, বদিসিংহ এবং পরাজাত। হিন্দু যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, বৌদ্ধেরা আদি বুদ্ধ অর্থে তাঁহাকেই বুঝেন।

তথাগত অর্থে বুদ্ধও বুঝায়। সাধারণ বৌদ্ধেরা "তথাগত" অর্থে বুদ্ধকেই বুঝেন। বুদ্ধ অর্থে জ্ঞানী। "সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ"। তাঁহার আর আর নাম; যথা, "সর্ব্বজ্ঞঃ, সুগতঃ, ধর্ম্মরাজঃ, তথাগতঃ, সমন্তভদ্রঃ, ভগবান্, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিনঃ, ষড়ভিজ্ঞঃ, দশবলঃ, অদ্বয়বাদী, বিনায়কঃ, মুনীন্দ্রঃ, শ্রীঘনঃ, শাস্তা, মুনিঃ।" ইত্যমরঃ। অতএব আমরা দেখিতেছি, "আদিবুদ্ধের" অনেক নামই "বুদ্ধ" অর্থেও প্রয়োগ হয়। আদি বুদ্ধ হইতেই পঞ্চবুদ্ধ আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অপার্থিব। শাক্যমুনি এবং আর ছয়জন মনুষ্য বুদ্ধ, তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত এই সাতজন সাধনবলে নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধে মিশিয়াছেন। অতএব তাঁহারাও "তথাগত" প্রাপ্ত হইয়াছেন। তস্মিন্ গতঃ তথাগতঃ। তৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মধামে যিনি গিয়াছেন তাঁহার নাম তথাগত। যিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যে শান্তিধাম, যাহা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দধাম, তাহাকেই মহায়ান পন্থার শ্রদ্ধোদয় নামক গ্রন্থে "তথাগত গর্ভ" বলা হয়। তন্ত্রের ভাষায় তথাগত গর্ভকে মাতৃযোনি বলা হয়। ইহাই গায়ত্রী বা ব্রহ্মযোনি। অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, সমগ্র বিশ্বের একাধার স্বরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব আছে, যাহা জীবের শান্তিধাম। মানবের চিত্ত এই তত্ত্বে প্রবেশ করিলেই তিনি পরাশান্তি লাভ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান এই তত্ত্বকে মহৎব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ।

"মম যোনি র্মহৎব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।" এই ব্রহ্মযোনি হইতেই জীবের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাই জীবের লয়স্থান। আমরা পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহাকেই প্রজ্ঞা বলিয়াছি। বিশ্বের লয়স্থান এই ব্রহ্মযোনি তত্ত্ব জানিলে যে আনন্দ, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। মহাগুরুর কৃপায় তবে এই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। ইহাই গুরুতত্ত্ব। গুরুর কৃপাতেই সর্ব্বাত্মিকা অহংভাব একাত্মিকা অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়। গীতায় সেই ভাবের বেশ প্রকাশ আছে :—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

গীতায়ও সেই কথা উক্ত হইয়াছে।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥—৪—১০

(ব্রহ্মপরায়ণ বহু সাধক, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য হইয়া, জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন)।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫—২০

স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় লাভে উদ্বিগ্ন হন না ; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত)।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥" (আত্মজ্ঞব্যক্তি শোক তরণ করেন। যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন)।

জগদ্‌গুরু তথাগত বুদ্ধদেবে ও ব্রহ্মে পরম ভক্ত সাধক পৃথক দেখেন না। তাই তিনি তাঁহার এইভাবে স্তব করিয়া থাকেন ;—

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীঃ সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

অথবা মোক্ষগুণযুক্তা তোমাতে ও ভগবানে, সাধুপুরুষ প্রভেদ দেখেন না।

সদৈকত্বং ন ভেদোস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোসৌ সাহমহং যোসৌ ভেদোস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

দেবীভাগবৎ ৩—৬ (২)

গীতায় প্রসিদ্ধ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের "অনার্য্যজুষ্টম্ "ব্যাখ্যায় আর্য্যশব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—

"আর্য্যৈঃ (মুমুক্ষুভিঃ); আর্য্যশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আরও অপর স্থানে আছে।

প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী বৌদ্ধ উক্তি তুলা হইয়াছে, তাহার ষষ্ঠটী দ্রষ্টব্য।

জগদ্‌গুরোঃ—মুমুক্ষুর নিকট ভগবানের এই একটী নাম। আদি বুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত উক্তি আমি তুলিয়াছি, তাহার অষ্টমটীর ব্যাখ্যায় এইরূপ দৃষ্ট হয়।

"আদিবুদ্ধ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষক।"

মহাদেবরূপী ভগবানের দক্ষিণামূর্ত্তি এই জগৎগুরুর মূর্ত্তি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্তোত্রে লিখিয়াছেন;—

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তি দেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥

আমরা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধ অর্থে মানব বুদ্ধ বুঝাইলেও অসঙ্গত হয়না; কারণ মুমুক্ষু তাঁহার গুরুদেবকে গায়ত্রী হইতে প্রভেদ দেখেন না।

তব চার্য্যগুণাত্মায়া বুদ্ধস্য চ জগদ্‌গুরোঃ।
ন পশ্যন্ত্যন্তরং সন্তশ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥ ৩

(সকল উত্তম গুণসম্পন্ন পদার্থের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্ম ভগবান জগতের গুরু। যেমন চন্দ্রিকা ও চন্দ্রমার মধ্যে প্রভেদ নাই, সেইরূপ সাধুপুরুষ তোমাতে ও ভগবানে প্রভেদ দেখেন না)।

যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রকাশ নেত্রমধ্যে প্রবেশ না করিলে চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন উপলব্ধি হয়না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ব্রহ্মকে অনুভব করা যায় না। সেইজন্য ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যে কেহ ব্রহ্মযোনিঃ গায়ত্রী বা চণ্ডীদেবীকে প্রেমের সহিত দেখিতে পায়, সেই ব্রহ্মকে দেখিতে পায়। কারণ যেমন সূর্য্য হইতে সূর্য্যের প্রকাশ বা চন্দ্র হইতে চন্দ্রিকায় অভিন্ন; প্রকাশ হইবার পর সূর্য্যকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে চন্দ্র বলে; সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞান অভিন্ন এবং জ্ঞানলাভ করিলে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম যোনির কথারও অর্থ তাই। তাঁহা হইতে ব্রহ্ম কি উপলব্ধি হয় বলিয়াই তাহাকে ব্রহ্মযোনিঃ বলা হয়। অতএব "প্রজ্ঞাপারমিতার" অপর নাম ব্রহ্মগীতা বলা যাইতে পারে।

দেবীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাব এইরূপ ;—"যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বচৈতন্যরূপা আদ্যাবিদ্যাকে ধ্যান করি।" এই শ্লোকের "আদ্যা" কথার টীকাকারেরা দুইটী অর্থ করিয়াছেন। যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, মুমুক্ষুগণের উপাসনীয় সেই জগৎ-কারণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করি। অথবা জগৎকর্ত্তার তাদৃশ চৈতন্য-স্বরূপকে চিন্তা করি। গায়ত্রীরও এই দুই প্রকার অর্থ আছে। গায়ত্রী "সবিতুঃ" সম্বন্ধে ষষ্ঠীও হইতে পারে, বা অভেদবোধক ষষ্ঠীও হয়। সেখানে অর্থ হইবে—"জগৎকর্ত্তার তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপকে চিন্তা করি।

আদিকারণের নাম পরব্রহ্ম; বৌদ্ধ তাহাকে বলে, মহাশূন্যতা। এই প্রথম কারণ বা পরব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থার কথা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। তাহার বাহ্যিক বিকাশের কথা আমরা জানি। সকল দর্শনকারই স্বীকার করেন যে, এই আদিকারণ সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন; ইনি পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যশীল ও নিশ্চল বলিয়া মনে হয়। প্রলয়ে ইনি নিশ্চল, সৃষ্টির সময় ইনি কার্য্যকারী। ইনি চৈতন্যময়, একথা বলাও যায় না; কারণ নির্দ্দিষ্ট আধার ব্যতীত আমরা চৈতন্যের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিনা। উপাধিশূন্য চৈতন্য কিরূপ, তাহা অহংজ্ঞানশালী কোনও বুদ্ধিরই জানিবার শক্তি নাই। পরব্রহ্ম আত্মা নহে; কারণ আত্ম, শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম ও রূপ আত্মজ্ঞানযুক্ত নহেন। পরব্রহ্মজ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞান নহেন; কিন্তু তিনি এই তিনেরই কারণ।

এই পরব্রহ্মে একটী শক্তিকেন্দ্র ফুটিয়া উঠে, তাহাই ঈশ্বর প্রত্যগাত্মা বা শব্দব্রহ্ম। ইনিই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর Verbum (বাক্য) বা Christos (খৃষ্ট)। ইনি চিরকালই পিতার (father) বা পরব্রহ্মের হৃদয়ে স্থিত। সৃষ্টিকালে তাঁহার প্রকাশ, প্রলয়ে পিতৃঅঙ্কে তাঁহার নিমগ্নতা। খৃষ্টাবলম্বীরা বলেন "He is enternally in the bosom of his father হিন্দু বলিতেছেন "তিনি তাঁহার নিত্যধামে (পরব্রহ্মে) চির অবস্থিত।" বৌদ্ধেরা তাঁহাকে অবলোকিতেশ্বর বলেন। চিনদর্শনে অবলোকিতেশ্বরের অন্য অর্থ থাকিলেও ভগবান অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাঁহার আর নাম আদিবুদ্ধ। তাঁহার বর্ণনা বৌদ্ধগ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপে দৃষ্ট হয়।

১। প্রথমে যখন কেবল মহাশূন্যতা ছিল, যখন পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ পায় নাই, সেই সময়ে অপাপবিদ্ধ আদিবুদ্ধ আলোক শিখার ন্যায় প্রকাশ পাইলেন।

২। তিনিই মহামূর্ত্তি এবং বিশ্বরূপ; তিনি প্রকাশ পাইলেন। তিনি স্বয়ম্ভূ মহাবুদ্ধ আদিনাথ ও মহেশ্বর।

৩। সৃষ্টির তিনিই কারণ স্বরূপ; তিনিই সকলের রক্ষক। জগৎ তাঁহার ধ্যান হইতেই উদ্ভূত।

৪। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি ঈশ্বর, সমস্ত পূর্ণের সমষ্টিরূপ (আর্য্য গুণযুক্ত) তিনি অনন্ত, কায়াদিশূন্য; সমস্ত বস্তুই তাঁহারই বিগ্রহ, তিনি বিষ্ণুরই বিগ্রহ নন; তিনি সকলের আকারের কারণ, অথচ তিনি নিরাকার।

৫। তাঁহার অংশ নাই, আকার নাই, স্বস্থিত; তাঁহার যাতনা বা ভাবনা নাই। তিনি নিবৃত্তিরূপী, তাই তিনি শাশ্বত; তিনি প্রবৃত্তিরূপী অতএব তিনি শান্ত। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। কারণ্ডব্যূহ।

৬। আদিবুদ্ধের আদি নাই। তিনি পূর্ণ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সত্ত্বরূপী। সমস্ত অতীত তিনি জানেন, অথচ সমস্তই তাঁহার বর্ত্তমানের বিষয়।

৭। তাঁহার দ্বিতীয় নাই; তিনি সর্ব্বস্থ কুতির্থ হরিণের তিনি নবরত্ন সিংহস্বরূপ।

নবরত্ন—"সর্ব্বধর্ম্মানাং নিরভ্যাসলক্ষণম্"। কুতির্থ—তীর্থ (মোক্ষ), তাহাকে যাহা বাধা দেয়। স্বভাবিকেরা ইহার এই অর্থ করেন,—যাঁহারা মোক্ষ ধর্ম্মের অসত্য ব্যাখ্যা করেন, তাহাদিগের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষের মত

গর্জ্জন করেন। ঐশ্বরিকেরা বলেন,—তিনি ব্যতীত আর আত্মা নাই; যাহারা দুষ্ট, সিংহ দেখিলে যেমন মৃগ ভীত হয় তাহারা তাঁহাকে সেইরূপ ভয় খায়।

৮। সমস্ত বুদ্ধের তিনিই স্রষ্টা; বোধিসত্ত্বের প্রধানেরা তাঁহার অতি প্রিয়। তিনিই প্রজ্ঞার স্রষ্টা, তিনি জগতের স্রষ্টা; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সৃজন করে নাই। প্রজ্ঞার সাহায্যেই তাঁহার দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু তিনি অজ।

৯। সমস্ত সৎবস্তুর মধ্যে তিনি সত্ত্বস্বরূপ। তিনি বজ্র-আত্মা। অজ্ঞান রূপ শুষ্ক তৃণ ভস্মীভূত করিতে প্রজ্ঞারূপী জ্ঞান সাহায্যে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেন।

সকল ধর্ম্মেই অনন্তব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়। প্রলয়কালে অব্যক্তভাবে ইনি ব্রহ্মে লীন থাকেন। আবার সৃষ্টি সময়ে জ্ঞানময় শক্তি কেন্দ্ররূপে ব্যক্ত হন। ইনিই প্রথম জ্ঞাতা। জগতের জ্ঞানশালী অপর সমস্ত বস্তুই ইহারই প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ ইনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। তুরীয় অবস্থায় আত্মার অব্যক্তভাবের ন্যায় প্রলয়কালে ইনি পরব্রহ্মে অবাক্ত থাকেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমি কে ?

"আমি কে" এই কথাটী স্বতঃই সকলের মনে উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থির করা বড় সহজ নহে। যদিও বেদান্তাদি শাস্ত্র দ্বারা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায়, তথাপি তাহা এরূপে দুর্ব্বোধ্য যে, আমাদের মত সরলমতি লোক প্রায়শঃই তাহা বুঝিতে পারে না।

কারণ শাস্ত্রকারগণেরই এ সম্বন্ধে অনেক বিপ্রতিপত্তি আছে, কেহ স্থূল শরীরকেই আত্মা বলেন, কেহ বা মনকে আত্মা বলেন; কেহবা বুদ্ধিকে আত্মা বলেন, কেহবা কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞাতাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কাজেই মোহ-

তিমিরাচ্ছন্ন জীব কোনটাকে আত্মা বা "আমি" বলিবে তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে।

স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায়, সকল ইন্দ্রিয়ই নিশ্চল থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে। নয়ন নিশ্চল, কিন্তু দেখিতে পাই, পদ নিশ্চল কিন্তু চলিতে পারি, বদন নিশ্চল, বলিতে পারি। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হইতেছে, অথচ সকলই নিশ্চল, ইহা বোধ হয় কাহারও অনুভব বিরুদ্ধ নহে। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমান হয়, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল শরীরাতিরিক্ত অপর কোন একটী চেতন পদার্থ আছে।

এবং মরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা, স্থূল শরীর আত্মা নহে ইহা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

আমরা নিতান্ত অন্ধকারে পতিত, এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না।

হায়! একদিন যে আর্য্য জাতি আধ্যাত্মিক জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বেদান্তাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদিন যে আর্য্য জাতি সভ্যজগতে সর্ব্বত্র পূজনীয় ছিল, আজ তাহারা "আধ্যাত্মিক" কথাটি শুনিলেও চমকিত হয়। এমন কি কেহ কেহবা বাহ্যবস্তু ভিন্ন আধ্যাত্মিক কিছুই নহে, একথা বলিয়া ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে দাঁড়ায়। হায় রে কাল! তাহাই ঋষিগণ বলিয়াছেন।

"কালেচ বিলয়ং যাতি কালে সর্ব্বমুদেতি চ।"

এইরূপ উচ্চ জাতির এতদূর অধঃপতন ভাবিতেও দুঃখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথার অবতারণা করা যাউক।

এবিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন।

"প্রত্যক্ অস্থূলোঽপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ।"

"য এষ আত্মা অপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ

সে প্রত্যেক শরীরে বিদ্যমান, স্থূল নহে, মন নহে, প্রাণ সে কর্ত্তাও নহে, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ। সর্ব্ব পাপ বর্জ্জিত তাহাকে অন্বেষণ কর। স্থূলত্বাদি সকল দোষ নিষেধ করায় বুঝা যাইতেছে, স্থূল শরীরাদি ভিন্নই আত্মা। শ্রুতি আরও বলিতেছেন,

"অহং ব্রহ্মাস্মি"। "অয়ং আত্মা ব্রহ্ম"। এই শ্রুতিদ্বয় দ্বারা জানা যাইতেছে, যেই আত্মা সেই ব্রহ্ম। সেই অহংশব্দ প্রতিপাদ্য।

অর্থাৎ আমি বলিলে, স্ব-প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকেই বুঝায়। এখন দেখ স্থূল দেহাতিরিক্ত চিন্মাত্র সদ্বস্তুই যদি "আত্মা বা আমি" হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র আমার গৃহ এই কথাগুলি সঙ্গত হয় না।

অতএব ইহাই বলিতে হইবে, এই নির্গুণ স্বপ্রকাশ আত্মা যখন ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট হয়, তখন আমি বা জীব সংজ্ঞা হয়। তখনই আমার স্ত্রী, আমার পুত্র আমার গৃহ ইত্যাদি ব্যবহার হয়। ইহাই বেদের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

বস্তুতঃ আমার কিছুই নহে. ইহা শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন।

'য এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণস্তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।"

যিনি সুপ্ত প্রাণীর দেহে জাগ্রত থাকেন, এবং অবিদ্যা দ্বারা স্ত্রী প্রভৃতি উপভোগ্য বিষয় সকল নির্ম্মাণ করেন. সেই নির্ম্মল শুভ্র পদার্থই ব্রহ্ম। সে অবিনাশী।

অতএব "আমার" কথাটী অবিদ্যা কল্পিত বা ভ্রান্তিমূলক।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এই ভ্রমের কারণ কি, তাহার উত্তর আমি বলিব, অজ্ঞানই ইহার কারণ। এই অজ্ঞানই আমাদিগকে পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে দেয় না।

এই অজ্ঞানের দুইটী শক্তি, আবরণ শক্তি, ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি দ্বারা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব আবৃত করিয়া রাখে।

বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা এক পদার্থকে অন্য রূপে দেখায়।

তাহার দৃষ্টান্ত, রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হয়, এস্থলে রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানের আবরণ শক্তি, প্রকৃত রজ্জুকে আবৃত রাখিয়াছে। বিক্ষেপ শক্তি সর্পরূপে প্রকাশিত করিতেছে। এখন দেখ এই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অহং শব্দ প্রতিপাদ্য আত্মা আবৃত।

বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ঘট পটাদি প্রপঞ্চের প্রকাশ হইতেছে।

অতএব অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। ঘট পটাদি ব্যবহারিক বস্তুই যথার্থ রূপে অবগত হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র,

আমার গৃহ, এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকে, ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী ও তাহাদের সুখী সুখী হয়।

আধ্যাত্মিক চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান পায় না।

অতএবই "আমি" কে কোথা হইতে আসিলাম, কোথা বা যাইব, কিছুই তাহারা জানিতে পারে না। পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করে। তাহাই স্মৃতি বলিয়াছেন।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

শ্রুতিও বলিয়াছেন।

"তদ্ যদেহ কর্ম্ম চিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"

অজ্ঞানী সৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি সুখ ভোগে মত্ত থাকে, সৎকর্ম্ম ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া দুঃখ ভোগ করে। ইহাই শ্রুতির ও স্মৃতির তাৎপর্য্যার্থ।

হে জীবগণ! তোমরা যদি জন্ম মরণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি বিশ্ব-সংসারের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে চাও, তবে এই সকল বাহ্য মিথ্যা বস্তুতে অভিমান পরিত্যাগ কর।

সেই নিত্য সর্ব্বব্যাপক মুক্ত পরমাত্মাকে "আমি" বলিয়া জান। সেই পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই জগতে সৎ নাই। ইনিই সর্ব্ব কারণ, ইহাকে জানিলেই সকল জানা হয়। অলমতিবিস্তারেণ!

কালের স্রোত।

কি প্রকারে ইহা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হইতেছে।

অপার সংসার সমুদ্র মধ্যে
সমজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈত-
দ্বিশ্বেশ পাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা॥

কালের স্রোত ক্রমাগতই বহিতেছে—খরতর বেগে বহিতেছে—অনাদিকাল হইতে বহিয়া আসিয়া অনন্তে চলিয়া যাইতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবলই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কখন বা তমসাচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্ত-ভাবে, অপ্রকাশিত অবস্থায়, বহিতেছে; সেই সময়ে—সেই মহাপ্রলয়কালে—সুষুপ্তি অবস্থায় লীন হইয়া ঐ স্রোত পরমাত্মার অন্তর্হিত হইয়া থাকে, * কিন্তু তখনও বিরাম নাই, তখনও অনবরতই বহিতেছে। আবার কখন বা সেই তীব্র স্রোত প্রকাশমান হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে; সেই সময়ে—সেই সৃষ্টি-কালে—কালের স্রোত সেই মহাসত্তা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। + সেই পরমাত্মাই সত্ত্বরজস্তমসাত্মিকা তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়াকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশমান হন ও অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য জীব ও অসংখ্য পদার্থাদিরূপে ব্যক্ত হন ‡ এবং

---

* আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। মনুসংহিতা ১।৫।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে, কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় নহে, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল।

+ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

হে সৌম্য! অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।

‡ সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

তিনি বহু হইয়া সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। গীতা ১০।৪২।

এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশমাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

সেই সমস্ত ভাসমান হইয়া কালের স্রোতে বহিয়া যাইতে থাকে। তৎসমস্তই সেই মহাসত্তা পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাঁহা হইতেই চতুর্দ্দিকে অনন্তে বহিয়া যাইতেছে, আবার এক একটী করিয়া তাঁহাতে গিয়াই নিবৃত্ত হইতেছে। * অনাদিকাল হইতে কতবারই প্রলয়রূপ রাত্রিতে সমস্ত জীব আপন আপন সংস্কার অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত থাকিতেছে, আবার কতবার ঐ নিশার অবসান হইলে সমস্ত জীবজগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইতেছে এবং গতনিদ্র হইয়া অন্তঃকরণে নিহিত পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে † এত যে হইতেছে তিনি কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবে রহিয়াছেন—সৎস্বরূপ সেই পরমাত্মার সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সনাতন, ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন নাই ; ‡ সৃষ্টিকালে তিনিই তাঁহারই নিজ মায়াকে আশ্রয়

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ গীতা ৭।৭।

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ বা স্বতন্ত্র অন্য কিছুই নাই। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিতেছে, যাঁহা দ্বারা জাত বস্তু রক্ষিত হইতেছে এবং যাঁহাতে সমস্ত ফিরিয়া যাইতেছে ও প্রবেশ করিতেছে, তাঁহাকেই জানিবার জন্য ইচ্ছা কর ; তিনিই ব্রহ্ম।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।

অতএব ইহাই সত্য, যেমন সুদীপ্ত বহ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহস্র সহস্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, হে সোম্য! সেই প্রকার বিবিধ জীব অক্ষর পুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁহাতেই পুনরায় গমন করে।

† অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ গীতা ৮।১৮।১৯।

ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় ব্যক্ত (চরাচর প্রাণিগণ) প্রাদুর্ভূত হয়, এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে অর্থাৎ প্রলয়কালে সেই সমস্ত ব্যক্ত মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়।

‡ পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ গীতা ৮।২০।

চরাচরের কারণভূত সেই অব্যক্তেরও অতীত, স্বতন্ত্র, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর এবং অনাদি যে সত্তা, তাহা ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।

করিলেও ইহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকেন।* তুমি আমি মায়াময় জীব কি করিয়া সেই মায়াতীতকে অনুভব করিতে পারিব? তাঁহাকে বুঝিতে পারিব? তিনি যে বাক্যের অতীত, তর্কদ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে পারিব না বুঝাইতে পারিব না। যদি কখন এই ত্রিগুণময়ী মায়ার হাত এড়াইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। শুনিয়াছি তিনি বাঙ্মনোবুদ্ধির অগোচর।† জীব তত্ত্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাঁহাকে বুঝিতে পারে।

মহাপ্রলয়ের অবস্থাতে সত্ত্বরজস্তম এই তিনটি গুণের সমতা (Equlebrium) থাকে, অর্থাৎ অনুনাতিরিক্তভাবে পরস্পরের বিমিশ্রণের দ্বারা কোনটিরই বিকার অবস্থা থাকে না, তাহারা কেবল নিজ নিজ অবস্থাতেই থাকে। যখন সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখনই সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাতিরিক্তভাবে সংমিশ্রণই সৃষ্টি।‡ তিনটি গুণের পরস্পর

হে পার্থ! যে সমুদয় ভূত পূর্ব্বে ছিল, এই সেই চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় এবং পুনর্ব্বার দিবসাগমে স্ব স্ব কর্ম্মাদি-পরতন্ত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা ৯।৮,১০।

আমি স্বকীয়া মায়ারূপী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে কর্ম্মাদিপরবশভূত সকল পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করিয়া থাকি।

হে কৌন্তেয়; আমার অধিষ্ঠান বশতই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে এবং এই কারণেই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

† ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি ন মনো।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥ কেনোপনিষৎ।

দৃষ্টি বাক্য এবং মন তথায় যাইতে পারে না, আমরা তাঁহাকে জানি না এবং যে প্রকারে অপরকে জানাইতে হয় সে উপায়ও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমরা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট শুনিয়াছি, যাঁহারা আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

‡ সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্। সাংখ্যদর্শন ৬।৪২।

গুণত্রয়ের বৈষম্য সৃষ্টি এবং সাম্য লয়।

পদ্মপুরাণ, সর্গখণ্ড, ৩৯ অধ্যায়; কূর্ম্মপুরাণ ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠাংশের ৩ ও ৪ অধ্যায়।

জয়পরাজয়ই এই জগৎ—ঐ তিন গুণের নানা প্রকার মাত্রায় মিশ্রণ দ্বারাই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অসংখ্য অসংখ্য জীব ও অসংখ্য অসংখ্য পদার্থ নানা প্রকার নাম ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মুর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

কালস্রোতে ভাসমান জীব ও পদার্থ।

শত বৎসর নহে, সহস্র বৎসর নহে, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া—এক জন্ম নয়, শত জন্ম নয়, কত লক্ষ লক্ষ জন্ম জন্মান্তর হইতে— আমি অনন্ত অসীম কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। যতই যাইতেছি, ততই ক্রমাগত বহিরাবরণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, অবশেষে পুরাতন আবরণ একবারে ত্যাগ করিতেছি এবং ভাসমান অন্যান্য জীব হইতে অদৃশ্য হইতেছি। আবার নূতন আবরণে আবৃত হইয়া আমি দৃশ্য হইতেছি। † এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ কতই নূতন নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া আমি ভাসিয়া আসিতেছি। এইরূপ আমি একা নহি, কত অসংখ্য অসংখ্য জীব, কত অসংখ্য অসংখ্য বস্তু, আমার মত ভাসিয়া যাইতেছে। স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কতবার কত অসংখ্য জীব কত অসংখ্য বস্তু আমার নিকট আসিতেছে, আমিও তাহাদের নিকট যাইতেছি; তাহারা কেহ কেহ আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে, আমিও আবার কাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছি।

---

* এই পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় লিখিত হইল, সেগুলি অতিশয় জটিল ও দুর্ব্বোধ; সুতরাং ঐ সমস্ত বিশদরূপে লিখিতে হইলে অতীব বিস্তৃত হয়, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখা সম্ভব নহে। অতএব প্রত্যেক বিষয় এক একটি পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে বিশদরূপে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইহার পরে যাহা লিখিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশদ ও সহজভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না।

† তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যেমন তৃণজলৌকা (চীনে জোঁক) একটি তৃণের অন্তে গিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে টানিয়া লয়, সেইরূপ এই আত্মা এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া অবিদ্যাবশতঃ অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে টানিয়া লয়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা ২।২২।

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

ভাসিয়া যাইতে যাইতে ঐ প্রকার কতকগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে লইয়া চিরকালই চলিয়া যাইবার জন্য কতবার কত কামনা করিতেছি, কত উৎকট আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ; কিন্তু সেই প্রখর স্রোতের মুখে পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া রাখার কি সাধ্য আছে ? সেই স্রোত পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করতঃ তন্মধ্যে একটিকে নিমজ্জন করিয়া পুনরায় নূতন আবরণে আবৃত করতঃ উপরে উঠাইতেছে এবং ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অদৃশ্য হইবামাত্র কেহবা অনতিবিলম্বে কেহবা কিয়ৎ বিলম্বে কোন স্রোত কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া দৃষ্টিপথে আনীত হইতেছে। এই প্রকারে জীব পুনরায় নূতন আবরণে আবৃত হইয়া দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইলে কিয়ৎকাল অন্য জীবের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া বহিরাগমন করতঃ তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট অপর জীবগুলিরও ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার ঘটিতেছে। জীব যখন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে, তখন সেই স্রোতে পুনরায় তাহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত অথবা অপরিচিত কতকগুলি জীবকে নিকটে আনিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতেছে। এই প্রকারে সে ক্রমাগতই কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।*

জীব কেন ছুটাছুটি করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতেছে। জীব ঈপ্সিত বস্তু লাভ এবং অনীপ্সিত বস্তু ত্যাগের জন্য লালায়িত। সে যাহাকে তাহার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে—যাহার সহিত তাহার কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে—সুখ হইবে মনে করিতেছে, তাহাই পাইবার যে তৃষ্ণা, তদ্দ্বারা সে বেগে ধাবিত হইতেছে। ইহাকেই রাগ বা অনুরাগ (Attraction) কহে।† আবার যাহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার দুঃখ হইবে মনে করিতেছে, তজ্জন্য তাহাকে ত্যাগ করিবার যে ইচ্ছা হইতেছে, তদ্বশতঃ সে তাহাকে ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকেই বিরাগ বা দ্বেষ (Repul-

---

* যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহাদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্‌ভূতসমাগমঃ॥ মহাভারতম্।

যেমন মহাসাগরে (ভাসমান) এক কাষ্ঠ অপর কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া আবার পৃথক্ হইয়া যায়, (এই সংসারে) ভূতগণের পরস্পর সমাগমও তদ্রূপ।

† সুখাদ্রাগঃ। বৈশেষিক দর্শনম্ ৬।২।১০।

সুখ হইতেই অনুরাগ জন্মে।

sion) কহে। এই অনুরাগ ও বিরাগই যত অনর্থের মূল, ইহাতেই কেবল জীবকে ছুটাছুটি করাইতেছে—তাহাকে স্থির হইতে দিতেছে না—তাহাতেই সে পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতেছে—কেবলই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। * যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর, তাহাই মনের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনা হইতে ক্রোধাদি নানা প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। † তজ্জন্যই জীবের অন্তরে আবরণের উপর আবরণ পড়িতেছে এবং এক একটি অন্তরাবরণ ছাড়িয়া গেলেও তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন আবরণ আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। ঐ চিত্ত-বৃত্তিরূপ অন্তরাবরণবশতই জীবের ক্রমাগত বহিরাবরণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং সেই জন্যই সে নিত্য নিত্য নূতন নূতন মূর্ত্তিরূপ বহিরাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতেছে। কোন জীব যদি কামনা সমূলে উৎপাটন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়, আর তাহাকে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না, সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে, সে শান্তিলাভ করিতে পারে। ‡ জীব

---

* রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ। সাংখ্যদর্শনম্ ২।৯।

রাগ ও বিরাগের যোগই সৃষ্টি।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ গীতা ৩।৩৪।

সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও দ্বেষ হইয়া থাকে। এই উভয়ই জীবের পরম শত্রু; অতএব কদাচ উহাদের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে।

যৎকিঞ্চিদুদিতং লোকে যন্নভস্যথবা দিবি।
তৎসর্ব্বং প্রাপ্যতে রাম রাগদ্বেষপরিক্ষয়াৎ ॥ যোগবাশিষ্ঠম্।

হে রাম, সংসারে যাহা কিছু আছে, আকাশে ও দ্যুলোকে যাহা কিছু আছে, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারিলে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ২।৬২,৬৩।

মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়; আসক্তি হইতে কামনা, কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধের উদয় হয়।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

‡ বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ২।৭১।

যখন অদৃশ্য হইতেছে, তখন তাহার পুরাতন বহিরাবরণ ছাড়িয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু অন্তরাবরণ যেমনকার তেমনই থাকিতেছে। বহিরাবরণ ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইলেও পরিত্রাণ নাই, অন্তরাবরণ একবারে উন্মুক্ত না হইলে নিস্তার নাই। ঐ অন্তরাবরণবশতই সে আবার নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পুনরায় ছুটাছুটি করিতেছে।

জীব ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে ও তজ্জন্য যে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় তাহার অনুরাগদ্বেষাদি জন্মিতেছে, সেই সকল সুখদুঃখের, এবং প্রত্যেক সুখদুঃখ যাহা দ্বারা সাধিত হইতেছে, সেই সকল বিষয়ের প্রতিচ্ছবি (Image) তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়া যাইতেছে। ইহাকেই সংস্কার বলে। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীব কতকাল হইতে এই সংস্কার-রাশি সঞ্চয় ও ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। এই সংস্কারবলেই জীব পুনঃ পুনঃ অদৃশ্য ও দৃশ্য হইতেছে এবং কালের স্রোতে ভাসিতেছে ও ছুটাছুটি করিতেছে। জীব অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কাররাশিতে জড়িত থাকিয়া, পূর্ব্ব কামনা-সমষ্টি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করতঃ দৃশ্য হইতেছে; পুনরায় প্রবহমান কোন জীব বা পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য পূর্ব্ব-সংস্কারবশে ছুটিয়া যাইতেছে। এই প্রকারে জীব পুনরায় প্রবল স্রোতের মুখে গিয়া পড়ায়, ইহাতে তাহাকে কতদূর ভাসাইয়া লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, কূল হইতে কতদূরে লইয়া যাইতেছে, তীরে যাইলে স্থির হইতে পারে, কিন্তু তাহা সে যাইতে পারিতেছে না।

কালস্রোতের কূল ও ভাসমান জীব।

কালস্রোতের তীর বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইহার কূল কিনারা স্বতন্ত্র নহে। ইহা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া—অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে প্রকাশমান হইয়া—অসীম হইতে সীমাবদ্ধের ন্যায় প্রতীত হইয়া—পরমাত্মা-স্বরূপ চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক অনাদি হইতে আসিয়া চতুর্দ্দিকে অনন্তে বহিয়া যাইতেছে। সেই যে পরমাত্মস্বরূপ কেন্দ্রস্থান

যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করে, সেই স্থিরপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

তাহা পৃথক্ না হউক, সে স্থানে স্রোতের প্রখরতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া একবারে ধীর স্থির শান্ত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হয় যে ঐ শান্তিময় স্থান এই অস্থির অশান্তিময় স্থান হইতে স্বতন্ত্র। জীব যখন ভ্রান্ত হয় তখনই সে শান্তি পাইবার জন্য লালায়িত হয়, এবং সেই শান্তিময় স্থানে যাইবার জন্য—সেই চির শান্তিময় অবস্থা পাইবার জন্য—উদ্যোগ করে। সেই সময়ে প্রথমতঃ সে সেই স্থানকে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; কিন্তু সে যতই তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই সে যাহাকে পৃথগ্‌ভাবে দেখিতেছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত পার্থক্য অন্তর্হিত হওয়ায় সমস্তই এক দেখে, এমন কি, অবশেষে সে নিজেও এক হইয়া যায়। আমি বহুদূরে আছি, অস্বতন্ত্রভাবে দেখাত দূরের কথা, পৃথগ্‌ভাবে মনে করিয়াও যে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছি না, আমার চিন্তামণি যে ধরিতে পারিতেছিনা; ছুটাছুটি করিতেই ব্যস্ত, কেবলই অহরহঃ অসংখ্য অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ অন্তরে বাহিরে দেখিতেছি, আর যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

পরমাত্মা হইতে জীব পৃথক্ হইয়া আসিলেও পরমাত্মার আকর্ষণী শক্তি জীবাত্মার প্রতি সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইয়া আছে; ছোটটি বড়র দিকে আকর্ষিত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। সেই সর্ব্বব্যাপী অয়-স্কান্তমণি ত আমার প্রতি ক্রমাগতই আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তথাপি আমি আকর্ষিত হইতেছি না কেন? তাহা হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছি কেন? কেবলই বহুদূরে স্রোতের মুখে চলিয়া যাইতেছি—বেগে ভাসিয়া যাইতেছি কেন? আমাতে এমন কি আছে যাহাতে সেই মহতী আকর্ষণী শক্তিকেও বিফল করিতেছে? সেই মহতী আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা আর কোন্ অধিক তর বলবতী আকর্ষণী শক্তি আছে যে, আমাকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে? বুঝিয়াছি—চুম্বক যাহাকে আকর্ষণ করিবে তাহা যদি সমল হয়, যদি অন্য ধাতু বা পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তাহা হইলে কি উহা আকর্ষিত হইয়া থাকে? আমি যদি অমল অনাচ্ছাদিত লৌহসূচিবৎ হইতাম—যদি নির্ম্মল জীবাত্মা হইতাম—তাহা হইলে কি পরমাত্মকর্তৃক আকর্ষিত না হইয়া আমি দূরে গিয়া পড়িতাম? আমি ত্রিগুণাত্মক মায়ায় গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছিল, তজ্জনিত

কামক্রোধাদি দ্বারা সমল হইয়া, সংস্কাররাশির আবরণে আবৃত হইয়া আছি, সেই জন্যই সেই মহতী আকর্ষণী শক্তিকে বিফল করিতেছে, উহাতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না—অন্য আকর্ষণী শক্তি আমার বহিঃ ও অন্তরাচ্ছাদনকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমার জীবাত্মাকেও টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্রোতে যে সকল জীব ও পদার্থ ভাসিতেছে, তাহারাই আমাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাতে আমি প্রবলস্রোতের মুখে গিয়া পড়িতেছি, এবং শান্তিময় কেন্দ্রস্থান হইতে কতদূরে চলিয়া যাইতেছি। ভাসমান জীব ও পদার্থের মধ্যে কাহাকেও বা ধরিবার জন্য ছুটিতেছি, আবার কাহাকেও বা ত্যাগ করিবার জন্য দূরে পলাইতেছি। যাহাকে আমি ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই হয়ত আসিয়া আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইল, অথবা যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া বেগে ছুটিতেছি, তাহাকে হয়ত ধরিতে পারিতেছি না—উঃ কি কষ্ট!—কত দুঃখই অনুভব করিতেছি, মন একবারে বিক্ষোভিত হইতেছে। যদি প্রিয় জীব বা পদার্থ ধরিতে পারিতেছি, তাহাতে কত সুখই অনুভব করিতেছি, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেছি—অত্যুৎকট আকাঙ্খা করিতেছি—যে এই সুখ অনুভব করিতে করিতে ঐ জীব ও পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমি অনন্ত কাল চলিয়া যাইব। কিন্তু অহো! কি দুঃখ! যাহাকে এত কষ্ট করিয়া ধরিলাম, যাহার জন্য মনে মনে কত কল্পনাই করিলাম, তাহা হইতে হয়ত তখনই বিচ্ছিন্ন হইলাম, অথবা কিয়দ্দূর একত্র গিয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইলাম। এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমি শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কাহার সাধ্য যে সেই স্রোতের প্রবল বেগে একত্র তিষ্ঠিতে পারে। হয় সেই আমাকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া মগ্ন হইতেছে অথবা আমিই অদৃশ্য হইয়া স্রোতে নিমজ্জিত হইতেছি। যখন আমি ছাড়িয়া যাইতেছি, তখন যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া, তাহাদিগকে মনে করিয়া, একবারে কষ্টে অভিভূত হইয়া চলিয়া যাইতেছি। সুখ-দুঃখানুস্মৃতিরূপ যে সকল সংস্কাররাশি সঙ্গে লইয়া বহিরাচ্ছাদন ত্যাগ করতঃ অদৃশ্য হইতেছি, সেই সকল সংস্কারের তাড়নায়, সেই প্রকারের সুখ উপভোগ করিতেছি এবং দুঃখ ত্যাগ করিবার লালসায়, তত্তদুপযোগী জীব বা পদার্থরূপ বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ছুটিয়া ভাসমান হইয়া নূতন আচ্ছাদনে

আচ্ছাদিত হইয়া আবির্ভূত হইতেছি, এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছি। এই প্রকারে পূর্ব্বসংস্কার ক্ষয় করিয়া অবশিষ্টের উপরে আবার নূতন নূতন সংস্কার সঞ্চয় করিতেছি। এইরূপ সংস্কারের ভার বহিতে বহিতে কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। আমি একা নহি, আমার ন্যায় অসংখ্য অসংখ্য জীবেরই, এই প্রকার অবস্থা।

জীবগণের দেহাবরণের পরিবর্ত্তন এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ যতক্ষণ জীব দৃশ্য হইয়া ভাসিতে থাকে, সেই সময়ে, প্রতি নিয়তই অল্প পরিমাণে তাহার দেহরূপ বহিরাবণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কিন্তু তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কিছু কালের পরিবর্ত্তনের সমষ্টি লইয়া, দেহ ক্রমান্বয়ে প্রাণ, শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্দ্ধক্যরূপ কয়েকটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই অবস্থাতে পরিবর্ত্তন অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। জন্মকালে জীব সম্পূর্ণরূপ নূতন বহিরাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া দৃশ্য হয়, তৎপরে অনবরত পরিবর্ত্তন হইতে হইতে এই আবরণ ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন মৃত্যুকালে পরিবর্ত্তনের পরিণাম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন ইহা জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন আর জীবের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে না, জীব তখনই অদৃশ্য হয়; তৎপরে আবার সে নূতন আবরণ ধারণ করিয়া দৃশ্য হয় *। প্রতি জীবনেই যে সকল জীবের বহিরাবরণ ক্রমান্বয়ে ঐ কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুরূপ পরিণাম অবস্থায় উপনীত হইবে তাহা নহে। এই আবরণ উপরি উক্ত যে কোন অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে পারে, তখন সে অদৃশ্য হইয়া পুনরায় নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া দৃশ্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যরূপী জীবের বহিরাবরণ ভ্রূণাবস্থায় থাকিতে, জীব কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যথা সময়ে জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হয়, এবং তৎপরে যখন ইহা শৈশবা-

---

* দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ গীতা ২।১৩।

দেহীর এই দেহেতে কৌমার, যৌবন ও জরা যেমন অবস্থাবিশেষ মাত্র—দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র; ধীর পুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হন না।

বস্থায় থাকে, তখন তাহার চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণ সম্যগ্‌ভাবে পরিস্ফুট হয় না; কিন্তু তথাপি তাহার মানসিক ক্লেশের অবসান নাই, সে অহরহঃ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আবরণ শৈশবের সুকুমার অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাল্য বা কৈশোরাবস্থায় উপনীত হয়, তখন জীবের মানসিক বৃত্তিসকল অপেক্ষাকৃত পুষ্টিলাভ করে। তখনও তাহার সুখ নাই; তাহার মনে কামনার স্ফুরণ হইতে থাকে ও আশার কিরণ জ্বলিতে থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নৈরাশ্যের ছায়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কষ্ট দেয়। তাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে উদ্বেলিত করে, তাহার মনে কোন প্রকারেই শান্তি হয় না।

তৎপরে ঐ আবরণ উল্লাসময় যৌবনের অবস্থায় উপনীত হইয়া পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় ও সেই সঙ্গে চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণও সম্যক্‌ পরিস্ফুট হয় এবং অন্তঃকরণ পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া সেই সকল যথাসাধ্য পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সময়কে সুখের সময় মনে করিয়া জীব কত আশাই করিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইল না, দেখিল যে ইহাও ঘোরতর দুঃখময়। তাহার পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী উদ্দাম কামনা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা, উদিত হইয়া সর্ব্বদাই তাহাকে উদ্বেজিত করিতেছে; কামনার উপর কামনা আকাঙ্ক্ষার উপর আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহাকে সুস্থির হইতে দেয় না। কাম ক্রোধ লোভাদি বৃদ্ধি পাইয়া, হিংসাদ্বেষ অহঙ্কার অবির্ভূত হইয়া তাহাকে অস্থির করে। এই সময়ে সে সেই ক্ষণভঙ্গুর আবরণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, তাহাকে সেই অবস্থায় চিরদিনই রাখিবার জন্য কতই কামনা করিতেছে; অথবা এই অবস্থায় চিরদিনই থাকিবে ইহাই মনে করিয়া, এই আবরণের পরিণাম কি হইবে তাহা না ভাবিয়া এবং যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তাকে মনে একবারও উদিত করিতে না দিয়া, অন্ধ ও উন্মত্তের ন্যায় চলিতে থাকে। কেহ বা এই নশ্বর আবরণ দ্বারা অন্যান্য জীবের হৃদয় মন মুগ্ধ করিবার লালসায় তাহারই পারিপাট্যের জন্য, অথবা তাহা যে প্রকার ভাবে আছে, সেইরূপ চিরকাল রাখিবার জন্য, কতই বৃথা শ্রম করিতেছে; ইহা কর্ম্মফলবশে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কোন প্রকার বিকৃত ভাবযুক্ত হইলে, তাহা অপনোদনের জন্য কতই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কালস্রোত তাহা মানে কৈ? অত সাধের

আবরণেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বিকৃত ভাবগ্রস্ত করিতেছে, অথবা হয়ত তখনই পরিবর্ত্তনের পরিণাম অবস্থায় লইয়া গিয়া সেই জীব হইতে ইহাকে উন্মুক্ত করিতেছে এবং হতভাগাকে অদৃশ্যপথে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় নূতন আবরণ আচ্ছাদিত করতঃ দৃষ্টিপথে আনয়ন করিতেছে।

যৌবনের প্রখরতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আবরণ প্রৌঢ়াবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে ইহার শক্তি হ্রাস হইতে থাকে এবং মানসিক তেজেরও ক্রমে প্রবলতা কমিতে থাকে, ইহাতে জীব দারুণ কষ্ট অনুভব করে। দেহের প্রথমাবস্থায় জীব কেবলমাত্র জনকজননীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তৎপরে যতই চলিতে থাকে ততই ক্রমে ক্রমে ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদি নাম দিয়া তাহার অতি সন্নিকটস্থ জীবের সহিত এবং আরও কত নূতন নূতন দূরস্থিত জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রিয়বোধে সেই সকলে আসক্ত হয়। তাহাদের কাহারও কোন প্রকার কষ্ট হইলে সেও দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, এবং কেহ অদৃশ্য হইলে ত দুঃখে একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। যে সকল পদার্থে সে প্রিয়বোধে আসক্ত হইয়াছিল, তাহারও কোনটি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাতেও সে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। উদ্দাম যৌবনে সে যে সকল আশা করিয়াছিল, তাহাতে নিরাশ হইয়াও সে দুঃখ পাইয়া থাকে; এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইতে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হয় ও কখন কখন মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করতঃ তাহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়।

প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করতঃ ক্রমে ক্রমে বার্দ্ধক্যাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আবরণ জীর্ণ হইয়া আইসে। তখন পলিত-কেশ-গলিত-দন্ত-লোলিত চর্ম্ম বিশিষ্ট সর্ব্বাবয়বের শোভাহীনতা দর্শন পূর্ব্বক জীব ক্ষোভে একবারে অধীর হয়। ইন্দ্রিয়াদির বল ক্ষুণ্ণ, শরীর দুর্ব্বল, মন নিস্তেজ হইয়া তাহাকে তাহার কত কষ্টই দিতে থাকে এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারময়ী ছায়া আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রিয়বোধে যাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে কত কষ্টই সহ্য করিয়াছে, কত যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছে, সেই হয়ত অপ্রিয়-বোধে তাহার প্রতি বিরাগভাব দেখাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে, অথবা দুর্জ্জয় কালের স্রোত সেই প্রিয় জীবকে তাহা হইতে সবলে ছিন্ন করিয়া লইয়া

দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছে, ইহাতে বৃদ্ধ মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপরে আবার নিজ মৃত্যুর ভীষণ চিন্তা সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাহাকে বিত্রস্ত করিতেছে। প্রিয় জীব, প্রিয় পদার্থ, যাহাদের সহিত সে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এবং যে আবরণকে সকল অপেক্ষা প্রিয়বোধ করিয়া এত যত্নের সহিত সে রক্ষা করিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া সে শোকে অধীর হইয়া পড়িতেছে। কেহ বা আবরণের রোগরূপ সাম্যভাব বিহীনতা বশতঃ এবং সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে তাড়িত হইয়া অসহ্য মানসিক বৈক্লব্য-বশতঃ, মৃত্যুই আশ্রয়দাতা—সেই আবরণ ত্যাগই তাহার শ্রেয়ঃ—ইহাই বিবেচনা করিয়া, সেই মৃত্যুই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কিন্তু হায়! সে বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ আবরণ ত্যাগ করিলেও পুনর্ব্বার নূতন আবরণে অভিভূত হইয়া ইহা অপেক্ষাও হয়ত কত অধিক যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে চিরদিনের জন্য দুঃখের হাত এড়াইতে পারে, যাহাতে সে স্থায়ী সুখ পাইতে পারে, তাহারই যদি পূর্ব্বে আয়োজন করিতে পারিত, তাহা হইলেই চিরশান্তি লাভ করিতে পারিত, তাহার সে কিছুই করিল না।

ভাসমান জীব কি প্রকারে শান্তিময় আশ্রয়ে উপনীত হয়।

সকল জীবইত সুখের জন্য লালায়িত; সেই সুখ ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হওয়ারই জন্যও ত সকলে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু যে প্রকারে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থায়ী সুখ পাইতে পারে, যাহাতে সেই অনন্ত সুখ হইতে পারে, চিরশান্তিলাভ করিতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান সকলে করিতে পারিতেছে না, তাহার নিজ প্রকৃতির তাড়নায় তাহাকে অন্যদিকে লইয়া যাইতেছে। বৈষয়িক সুখ সম্মুখে দেখিয়া তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু শেষে দেখিতেছে, ইহা সুখ নহে, ইহা দুঃখ, যদিও সুখ অনুভব করিতেছে তাহাও আবার ক্ষণিক, কোন প্রকারেই সে স্থায়ী সুখ পাইতে পারিতেছে না। ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণ যে সময়ে তাহার প্রকৃতিতে আধিপত্য করিতেছে, সেই সময়ে সেই গুণের উপযোগী সুখের জন্য সে ধাবিত হইতেছে। যে জীবের জন্মান্তরীণ নিজ সংস্কার-বশে কোন সময়ে তমোগুণের প্রাধান্য হইতেছে, তখন সে তাহারই উত্তেজনায়

মোহেতে অভিভূত হওয়ায় তাহার ইন্দ্রিয়গণ তত্তৎ বিষয় হইতে উপরত হইতেছে এবং সে নিদ্রা আলস্য প্রভৃতিতে সুখ অনুভব করিতেছে, তাহারই জন্য লালায়িত হইতেছে। * সে সুখও আবার স্থায়ী নহে, কারণ তখনই হয় ত তাহার রজোগুণ অপর দুই গুণকে পরাজয় করিতেছে, সে তখন মনে করিতেছে যে, ভাসমান জীব বা পদার্থরূপ বিষয় সকলকে ধরিতে পারিলে—ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত করিলে সুখী হইবে, ইহাই মনে করিয়া সে ধাবিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইলে হয়ত সুখ অনুভব করিতেছে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহা হলাহলময় দুঃখরূপে পরিণত হইতেছে। † আবার যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইতেছে, বাহিরের বিষয় হইতে তাহার ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখীন হইতেছে, তখন সে আভ্যন্তরীণ প্রসন্নতা অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতেছে। ‡ এই সুখই স্থায়ী সুখ হইতে পারে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ আবার অন্য কোন গুণ প্রাধান্য লাভ করিয়া তাহাকে তদুপযোগী সুখের প্রলোভন দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তত্তদ্‌গুণের কার্য্য করাইতেছে। এই প্রকারে এক গুণ হইতে গুণান্তরে যাওয়াতেই তাহাকে স্থির হইতে দিতেছে না, সে স্থায়ী সুখ পাইতে পারিতেছে না। যদি তিনটি গুণ পরস্পর বিপরীত দিকে সমানভাবে আকর্ষণ করিতে থাকে, যদি তিনটি গুণ সমভাবে মিশ্রিত হয়—তাহা হইলে সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলেই সে শান্তি পাইতে পারে। এই প্রকার গুণের সাম্যাবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে আবার গুণাতীত হইয়া যে চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ছুটাছুটিরও নিবৃত্তি হইয়া যায়;

---

* যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌॥ গীতা ১৮।৩৯।

যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে ও নিদ্রা আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ।

† বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্‌॥ গীতা ১৮।৩৮।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষবৎ বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ।

‡ যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্‌।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌॥ গীতা ১৮।৩৭

যে সুখ প্রথমতঃ বিষ ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, এবং যাহা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ।

কিন্তু তাহা সে করিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া জীব যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে; * যখন সকলেরই নশ্বরত্ব ও ক্রমাগত নিরাশ হইয়া যখন সকল মিলনেরই অস্থায়িত্ব অনুভব করে; তখনই অন্যান্য ভাসমান জীব বা পদার্থের দিকে আকর্ষণী শক্তি কমিয়া যায় এবং জীব সেই মহতী আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখনই ক্ষণিক সুখ ত্যাগ করিয়া, স্থায়ী শান্তি পাইবার আশায়, সেই শান্তিময়ের দিকে যাইবার জন্য মন লালায়িত হয়, তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে জীব সেই দিকেই অগ্রসর হয় এবং উজান বাহিয়া চলিয়া যাইতে থাকে, পরে সেই অসীম ক্ষমতাশালিনী ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিকার ছাড়াইয়া, প্রবল বেগবান্ কালের স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পরমানন্দময় পরমাত্মস্বরূপ সেই মায়াতীত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে জীব সেই পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। সকল জীবই এই সাধারণ নিয়মে শান্তিময়ের শান্তিরাজ্যে উপনীত হইয়া তাঁহাকেই লাভ করিবে—চরম শান্তিময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ঐ সাধারণ নিয়মানুযায়ী এই ছুটাছুটির নিবৃত্তি হইতে এবং আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত হইতে ত অনেক বিলম্ব। ক্রমান্বয়ে এক একটি বিষয়ে স্থায়ী সুখ প্রাপ্তিতে নিরাশ হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়ের অস্থায়িত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া, তৎসমস্ত ত্যাগ করিতে এবং পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইতে ত মনুষ্যরূপী জীবের পক্ষেও আরও কত জন্মের প্রয়োজন। পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইয়াও যে কেহ অনায়াসে তথায় চলিয়া যাইতে পারিবে, তাহারও নিশ্চিত নাই; সে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও আবার ফিরিয়া

---

* তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তরে ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যেমন আকাশে শ্যেন পক্ষী অথবা সুন্দরপর্ণযুক্ত মহাপক্ষী বহুদূর ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রান্ত হইয়া উভয় পক্ষ সংহত করিয়া বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ অন্তের দিকে ধাবিত হয়, সেখানে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া কিছু কামনাও করে না, কোন স্বপ্নও দর্শন করে না।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

(সকাম) কর্ম্ম দ্বারা যে সকল লোক (স্বর্গাদি) লাভ করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কারণ কর্ম্ম দ্বারা অকর্ম্মরূপী নিত্য পদার্থ লাভ হয় না।

আসিতে পারে. তাহা হইলে ত আবার কত বিলম্ব হইয়া গেল। এতএব এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইবার কি কোন উপায় নাই ?

হিন্দুগণ! তোমাদিগকেও কি আবার বলিতে হইবে যে সে উপায় আছে? তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, তোমরা যে স্থানে ভাসিতেছ, সেই স্থান হইতেই, ভাসমান অন্যান্য জীব ও পদার্থকে তুচ্ছ করিয়া, সেই শান্তিময়ের উদ্দেশে স্রোতের প্রতিমুখে দ্রুতগতিতে গিয়াছেন, এবং নিজ ক্ষমতায়, নিজ সাধনা-বলে, এই দুস্তর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন, ও যাইতে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জীবকে ভিন্ন ভিন্ন সহজ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আর এতদ্ব্যতীত সাধারণ নিয়মানুসারেও যে তোমাদের মানবের ফিরিবার সময় হইয়াছে। তোমরা বহুবার বহুসুখ ভোগ করিয়াছ, উহা প্রাপ্তির আশায়ও কতবার কতবার নিরাশ হইয়াছে, তুচ্ছ ভাসমান জীব ও পদার্থ এতবার এতদিন হইতে ধরিয়াও বীতস্পৃহ হও নাই? তোমরা চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নিকৃষ্ট তামসী গতি উদ্ভিদ কৃমী কীটাদি জন্ম হইতে আরম্ভ করতঃ চৌরাশি লক্ষবার অদৃশ্য হইয়া প্রত্যেক বারে নূতন নূতন মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক, ক্রমোৎকর্ষবশে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ; * আবার মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, তাই তোমরা এই পবিত্র ভারতভূমিতে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এত নূতন নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, এত নূতন নূতন জীব ও পদার্থাদির সহিত সংযোগ বিয়োগরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও তোমাদের সাধ মিটে নাই? এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত ছুটাছুটি করিয়া, কি তোমাদের শ্রান্তি বোধ হয় নাই? আর কেন, চল ফিরিয়া চল। বহুকাল হইল প্রকৃত গৃহ ছাড়িয়া আসিয়া, প্রকৃত পিতা মাতা পুত্র কন্যাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়া, কতবার কত ক্ষণভঙ্গুর গৃহে "আমার আমার" বলিয়া প্রবেশ করিয়াছ, কতবার কত জীবকে পিতা মাতা পুত্র কন্যাদি নামে অভিহিত করিয়া "আমার আমার" বলিয়া তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছ, কতবার কত পদার্থকে তোমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর মনে করিয়া "আমার আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু কৈ কেহই ত তোমাদের হইল

---

* বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১৮শ অধ্যায়

না? তোমাদের যদি হইত তাহা হইলে সে সমস্ত তোমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কেন? এখনও কি ভ্রম ঘুচে নাই? প্রকৃতই যাহা তোমাদের তাহাই পাইবার উদ্দেশে অগ্রসর হও। এই বর্ত্তমান আবরণ ত্যাগের পূর্ব্বে যাহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ করিবার উপযোগী হও, যাহাতে সেই বস্তু সম্যকরূপে বুঝিতে ও চিনিতে পার, তাহারই আয়োজন কর। তাহা হইলে আর পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতে হইবে না, আর বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। * আহার বিহার নিদ্রাদির দ্বারা অনেকবার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছ, এক্ষণে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, পবিত্র ভারতভূমিতে হিন্দুকুলে জন্মিয়া, আর কেন কেবলমাত্র পশুরূপী জীবের বৃত্তির অনুসরণ করিতেছ? পশুগণ হইতে তোমরা যে অনেক শ্রেষ্ঠ জীব। পশুগণ অপেক্ষা এবং অন্য মনুষ্য অপেক্ষাও তোমরা যে সেই উৎকৃষ্টতম পদার্থের অনেক সন্নিকট তাহা দেখাও, সকলে দেখিয়া তোমাদেরই অনুসরণ করুক। ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

উত্তর ভারত ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়াউনি একটী বড় জংশন। এখান হইতে একশাখা "সমস্তিপুর" জংশন হইয়া দ্বারবঙ্গ ও মুজাফরপুর, এবং অন্য শাখা সিথারিয়া ঘাট গিয়াছে। ইহার অপর পার "মোকামাঘাট", এখানে গাড়ি প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করে। আমরা ইত্যবসরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। পানিওয়ালা দন্তকাষ্ঠ ও জল লইয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া ট্রেণের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতেছে এবং আরোহীদিগকে জলও দন্ত কাষ্ঠ দিয়া পুরস্কার স্বরূপ একটী পয়সা চাহিয়া নিতেছে।

আমরা বারাউনি জংসন হইতে ১০১৬ মিনিটে "হাজিপুর" আসিলাম। একটু শব্দের বা পদার্থের স্থানভেদে নামভেদ হইয়া থাকে। দুই বা ততোধিক

---

* ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ কঠোপনিষৎ।

যদি ইহ জগতে শরীর পতনের পূর্ব্বে (ব্রহ্মকে) অবগত হইতে না পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি জন্য, সংসারে ঘুরিবার জন্য, শরীর গ্রহণ করিতে হইবে।

থানার শাসনাধীন যে স্থান বঙ্গদেশে তাহা "মহকুমা", বিহার, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে তাহা "তহসিল" এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও মান্দ্রাজ প্রেসিডিন্সেতে তাহা "তালুক" নামে অভিহিত হয়। হাজিপুর মুজাফরপুর জিলার তহসিল।

আমরা হাজিপুর ছাড়াইয়া প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িতা প্রসিদ্ধা গণ্ডকী নদী পার হইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেসন "সোনপুর" আসিলাম। সোনপুর সারণ জেলার অন্তর্গত। এখানে গঙ্গা নদী পার হইয়া দিঘাঘাট যাওয়া যায়। সোনপুর হইতে মুজাফরপুর এক শাখা লাইন গিয়াছে। ইহার সন্নিকটে বিখ্যাত হরিহর ছত্র। প্রতিবৎসর রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে সাত আট মাইল ব্যাপিয়া হরিহর ছত্রে প্রকাণ্ড মেলা বসে। ইহাকে সোনপুরের মেলা কহে। এই মেলা প্রায় একমাস থাকে। মেলার স্থানটী রমণীয়। মেলার সময় ভারতের নানাস্থান হইতে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এত বড় বৃহৎ মেলা ভারতে আর নাই। আমরা মেলার স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। এবং ১১।৫৪ মিনিটে বিহারের অন্তর্গত "ছাপরা" ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এই জংসন হইতে বালিয়া ও গাজিপুর হইয়া বানারস পর্য্যন্ত একশাখা লাইন গিয়াছে। কাটিহার হইতে ছাপরা ১৯৯ মাইল। ইহা সারণ জিলার প্রধান নগর। হাজিপুর হইতে বেশ গরম বোধ হইতেছিল, ছাপরা আসিয়া আর দুদণ্ড স্থির থাকিতে পারিতেছি না। একি বিপদ! ট্রেণ যখন বেগে চলে তখন তীব্র উষ্ণবায়ু-প্রবাহ সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়, এবং যখন কোন ষ্টেসনে অপেক্ষা করে তখন মহাগ্রীষ্ম বোধ হয়। ভাবিলাম "দয়াময়, এই উত্তপ্ত বায়ু মণ্ডলের মধ্যদিয়া আমাদিগকে কোন্ দেশে কি উদ্দেশ্যে লইয়া চলিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমিই জান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, মানুষের ভাবনা বৃথা।" পরস্পর শ্রুত হইলাম, এদেশের ভদ্রসম্প্রদায় বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে দিনে রেলপথে যাতায়াত করেন না। বেলা বৃদ্ধির সহিত গরম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। স্থানীয় লোকেরই এগরম অসহ্য হয়, পরিমিত জলবায়ুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত বাঙ্গালীর পক্ষে অকস্মাৎ নূতন প্রদেশের ভীষণ গরম অসহনীয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? একমাত্র সান্ত্বনা এই, দুঃখের অবস্থা সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না। অতি দুঃখের সময় দয়াময় মাঝে মাঝে শান্তি-বারি সিঞ্চন করেন। তাহা না হইলে বিধাতার সৃজিত সোণার সংসার ছারখার হইত—পৃথিবী মহাশ্মশানে

পরিণত হইত। আমাদের কষ্ট দেখিয়া স্বভাবতঃ উদারচিত্ত হিন্দুস্থানীরা কেহ সহানুভূতি-সূচক আলাপনে আপ্যায়িত করিল, কেহ জল আনিয়া দিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, যেন আমরা তাহাদের পরমাত্মীয়। তাহাদের এরূপ সৌজন্যতায় আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রসংশা করিলাম। বস্তুতঃ তাহারা প্রশংসার্হ। তাহাদের পরিচর্য্যায় আমাদিগের সকল কষ্ট তিরোহিত হইল।

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালীকে সকলেই আদর করে, সকলেই ভালবাসে। বাঙ্গালীর সংসর্গে তাহারা নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে ও বাঙ্গালীর জন্য তাহারা ত্যাগ.স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পাঠক! মনে করিবেন না, বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানীদের অপেক্ষা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা বাঙ্গালীকে সম্মান করে। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে; ইহা লৌহের শক্তি নহে, চুম্বকের গুণ। বাঙ্গালীর দোষ ও গুণ বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। সুধী পাঠক! অন্তর্দৃষ্টি করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন কি, বাঙ্গালীর নৈতিক জীবন ভারতের কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এবিষয়ে হিন্দুস্থানিগণ আদর্শ। তাহারা সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু এবং চরিত্রবান্। সময় সময় তাহাদের ভিতর যে উষ্ণ মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার কারণ, তাহাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অভাব। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে।

আমরা ১।১৬ মিনিটে "দারোগুা" জংশনে উপনীত হইলাম। এখান হইতে একটী শাখা-লাইন "মহারাজগঞ্জ" গিয়াছে। দারোগুার এক ষ্টেসন পরে "সাভান" পঁহুছিলাম। সাভান হইতে "আগুই" এক ব্রাঞ্চ লাইন আছে। আমরা ৩।১ মিনিটে "ভাট্নী" গেলাম। ভাটনী হইতে একশাখা "বারহাজ-বাজার" ও অন্যশাখা "বানারস" গিয়াছে। আমরা ৫।৬ মিনিটে গোরক্ষপুর গেলাম। এখান হইতে "উক্কা বাজার" হইয়া "গণ্ডা" পর্য্যন্ত একটী লুপ লাইন ও গণ্ডকী তীরে "বাগাহা" পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন গিয়াছে। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের হেড্ আপিস গোরক্ষপুর। ইহা যুক্তরাজ্যের একটী বিভাগ।

বঙ্গদেশ ত্যাগ করায় অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। হায়! স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গমাতার সেই শস্যময় শ্যামল প্রান্তর আর নাই। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল

মরুভূমির মত দুর্ব্বাবিহীন ধবল প্রান্তর, কচিৎ দুই একটী মৃতপ্রায় পাদপ বক্ষে ধারণ করিয়া মরার মত পড়িয়া আছে। এবড় ভয়ানক দেশ। এপ্রদেশে বন জঙ্গল নাই, পশু পক্ষী নাই, বৃক্ষলতা নাই, পাখীর সুমধুর কলকণ্ঠ নাই, কিছুই নাই; আছে কেবল সজীবতাশূন্য সুদীর্ঘ প্রান্তর ও পাষাণবৎ মৃত্তিকা। বঙ্গবাসীরা যেমন কোন গ্রামে সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া পাতলা ভাবে বাস করে, এ অঞ্চলে সেরূপ নহে। তস্কর ও দস্যুভয় নিবারণার্থ এদেশে মাঠের কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে গ্রাম্য লোকেরা সমবেত হইয়া সহরের ন্যায় একবাড়ীর সহিত অন্য বাড়ী সংলগ্ন করিয়া—গাত্রে গাত্র ঠেকাইয়া বাস করে। এদেশে গৃহ এত ছোট যে, আমার ন্যায় খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিও অনায়াসে ছাদ স্পর্শ করিতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে একটীও বাতায়ন নাই। ইহার অভ্যন্তর এমন গাঢ় তমসাবৃত যে, সূর্য্যদেব সহসা প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াই যেন প্রত্যহ বহির্দেশ হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমাদের দেশে এ প্রকার গৃহে বাস করিলে ড্যাম্প লাগিয়া তাহাকে তিন দিবসের মধ্যেই শমন ভবনে যাইতে হয়; কিন্তু এপ্রদেশের শুষ্ক জলবায়ুদ্বারা পরিপুষ্ট ব্যক্তিদিগের এবংবিধ গৃহই উপযোগী। কারণ, দারুণ গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা এঘর বেশ ঠাণ্ডা এবং জানালা না থাকায় ভয়ানক শীতকালে কবাট বন্ধ করিলে শীত লাগিবার আশঙ্কা থাকেনা। বঙ্গদেশের মত বাঁশ, তালাই, চাটাই ইত্যাদির বেড়া এখানে নাই। হিন্দুস্থানিগণ শুধু মৃত্তিকার দ্বারা দেয়াল গাঁথিয়া ঘরের বেড়া দেয়। এ দেশের লোক এত গরীব যে যাহার মাত্র একশত টাকা আছে সে এদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ অঞ্চলে সাপের ভয় বড় বেশী। রাত্রিকালে কেহ সর্পভয়ে পথে ভ্রমণ করে না। গোরকপুরে একটী লালবর্ণের হস্তী দেখিতে পাইলাম। লালবর্ণের হস্তী আর কখনও দেখি নাই। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল যায়। ইহা ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের গাড়ি অপেক্ষা কিছু বড়। আমরা রাত্রি ৮.৩১ মিনিটে "বস্তি" পৌঁছিলাম। ইহা যুক্তরাজ্যের একটী জেলা। বস্তি হইতে কয়েক ষ্টেসন অগ্রসর হইয়া ১০.৩৩ মিনিটে "মান্‌কাপুর" জংশনে গেলাম। মানকাপুর হইতে অযোধ্যাঘাট" বা "লকার মণ্ডিঘাট" একশাখা লাইন গিয়াছে। মানকাপুরের এক ষ্টেসন পরে "গণ্ডা" পৌঁছিলাম। ইহা যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত

ফয়জাবাদ বিভাগের একটী জেলা। গণ্ডা হইতে "নান্‌পারা" জংশন হইয়া "নেপালগঞ্জ রোড" এত লাইন গিয়াছে এবং "গোরকপুর" পর্য্যন্ত এক লুপ লাইন বিস্তৃত আছে। আমরা গণ্ডা জেলা উত্তীর্ণ হইয়া ইতিহাসবিখ্যাতা সরযূনদী পার হইলাম। সরযূ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আবেগভরে মাতিয়া উঠিল। এখানে কত কথাই মনে উদয় হইল! হায়, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। যে সরযূ একদিন পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা মহানগরীর বিজয়-কীর্ত্তি দেশ দেশান্তরে সগৌরবে ঘোষণা করিত, যাহার উভয় তটপ্লাবিত স্থান একদা ঋষি জনাধ্যুসিত দেশ বলিয়া কথিত হইত, যাহার পুণ্যতোয়স্পর্শে এককালে কোশলরাজ্যের আপামর সাধারণ নিজকে ধন্য মনে করিত, সেই মহাতীর্থ, সেই ঐতিহাসিক পূতসলিলা সরযূ এখনও আছে, এখনও প্রাচীন কীর্ত্তি-গরিমা শুষ্কবক্ষে ধারণ করিয়া দুঃখে প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা ক্রমে সরযূ ও গঙ্গার প্রধান উপনদী "ঘর্ঘরা" পার হইয়া রাত্রি ২।১৮ মিনিটে "বরহোয়াল" ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী জংশন। এখান হইতে একটী ক্ষুদ্র শাখা "বারহাম ঘাট" ও একটী বৃহৎ শাখা "কানপুর" গিয়াছে। ইহার দুই ষ্টেসন পরে আমরা "বড় বাঙ্কি" পঁহুছিলাম। বড় বাঙ্কি ফয়জাবাদ বিভাগের একটী জেলা। এখান হইতে ফয়জাবাদ একটী ব্রাঞ্চ লাইন আছে। বড় বাঙ্কি হইতে রওনা হইয়া ৪।৩৫ মিনিটে "ডালিগঞ্জ" জংসনে আসিলাম। ডালিগঞ্জ হইতে রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে মিটার গেজ ট্রেণ কাণপুর গিয়াছে। আমরা কাটিহার হইতে "লক্ষ্ণৌ জংসনের" টিকিট না লইয়া ভ্রমবশতঃ "লক্ষ্ণৌ সিটির" টিকিট লইয়াছিলাম। এখানে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া লক্ষ্ণৌ জংসনের টিকিট লইয়া এই শাখা লাইনের (I, up, passenger) গাড়ীতে উঠিলাম।

পঞ্জাবের স্বনামধন্য চিকিৎসক মৃত লছমন দাসের বর্ত্তমান চেলা শ্রী ঘনইয়া দাসের চারিজন শীথ এজেণ্ট এই গাড়িতে উঠিল। ইহারা লক্ষ্ণৌ হইয়া অমৃতসর যাইবে। ইহারা বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর গ্রামে গ্রামে হাঁটিয়া ঔষধ বিক্রয় করে। ইহাদের ঔষধ সমস্ত জেলায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহাদের সহিত নানা বিষয় কথোপকথন হইল। ইহারা বেশ ভদ্র। ইহারা আমাদিগকে ভ্রমণ উপলক্ষে তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান অমৃতসর দর্শন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল।

আমরা লক্ষ্ণৌ সিটি ষ্টেশন হইয়া "আয়েসবাম" জংসনে আসিলাম। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ি এই জংসন হইয়া কাণপুর গিয়াছে।

আমরা ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৫।১৮ মিনিটে লক্ষ্ণৌ জংসনে নামিলাম। আমাদের সহিত শীখ চারিজন নামিল। লক্ষ্ণৌ আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ের জংসন। লক্ষ্ণৌ সিটি হইতে লক্ষ্ণৌ জংসন চারি মাইল ব্যবধান। গোমতী তীরে বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। গোমতী প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক নদী।

ষ্টেসনের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে আমরা সকলে আশ্রয় লইলাম। শীখেরা বৃক্ষের নীচে পরিষ্কার কম্বল বিস্তার করিয়া বসিল আমরা বুভুক্ষায় পীড্যমান হইয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানে আমাদের জিনিষাদি রাখিয়া রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাজারে বহির্গত হইলাম। বাজারের রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হিন্দুস্থানী রমণীগণ দোকানীর কার্য্য করে। আমরা তাহাদের নিকট হইতে চাউল, দাল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে ইন্দারার সুশীতল জলে স্নান করিয়া একটী পরিষ্কৃত স্থানে রন্ধনাদি সমাপনান্তে দুই দিন পর তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। এখানে প্রভাতেই বেশ গরম বোধ হইল।

লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার মুসলমান ভূপতিগণের রাজধানী। অযোধ্যায় প্রথম নবাব সাদত আলি খাঁ লক্ষ্ণৌর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ওয়াজ্জি আলি খাঁ অযোধ্যার শেষ নবাব ছিলেন। লক্ষ্ণৌর প্রধান দর্শনীয় মচ্ছিভবন দুর্গ, ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদ, হোসেনাবাদ, এমামবাড়া ও ওয়াজিদ আলির কীর্ত্তি "কৈশরবাগ"। কৈশরবাগের একটী ফটক তৈয়ার করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এজন্য ইহা 'লাখীগেট' বলিয়া বিখ্যাত। সহরের মধ্যে গোমতী তীরে ভগ্ন অট্টালিকাময় বিখ্যাত 'বেলিগার্ড।' বেলিগার্ড সিপাহী-বিদ্রোহের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইংরাজেরা এই স্থানে ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া আত্ম রক্ষা করেন।

লক্ষ্ণৌর পূর্ব্ব-গৌরব স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার বড় কষ্ট হইল, কেমন যেন একপ্রকার যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই নবাব বাড়ী, 'অন্দরমহল, সীসমহল, বিলাস-কক্ষ, বেগমের স্নানাগার, মনোহর বাগ, সুরম্য হর্ম্ম্য

প্রভৃতি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কেহই নাই, যেন একটা ভূতের বাড়ী। ইন্দ্রতুল্য প্রাসাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে, পাষণ্ডের হৃদয়েও শেল-বিদ্ধ হয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের কি দ্রুত পরিবর্ত্তন! মহাকালের কি অসাধারণ শক্তি! অতি অল্পকালমধ্যে মাত্র দেড় শত বৎসরে লক্ষ্ণৌর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—যুগান্তর ঘটিয়াছে। উঃ ইহা কি সহ্য হয়! আমি আন্‌মনে উদাসপ্রাণে এইক্ষণবিধ্বংসী জনপদের অসারতা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

লক্ষ্ণৌর খরমুজ প্রসিদ্ধ। ইহা স্বাদু ও সুমিষ্ট। ভারতে এ রকম খরমুজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে একটী খরমুজ ভক্ষণ করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয়, শরীর শীতল হয় এবং চিত্তস্ফূর্ত্তি জন্মে। বাজারে খরমুজ দর্শন করিয়া, আমরা ইহাকে আমাদের দেশী খরমুজের ন্যায় নীরস মনে করিয়া প্রথমতঃ ইহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু শীখেরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় ইহা ক্রয় করিলাম। তাহারা না বলিলে আমরা এই উপাদেয় ফলের আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইতাম। লক্ষ্ণৌয়েতে ডবল পয়সা চলে না। এ স্থানে সাগর জল হইতে অনেক উচ্চ। অন্ততঃ এক শত হাত খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না। দুগ্ধ এবং ঘৃত বেশ সুলভ। পাকা ওজনের উৎকৃষ্ট মহিষ ঘৃতের সের এক টাকা এবং জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের সের দশ পয়সা। এখানে যুক্তরাজ্যের ছোট লাট অবকাশ সময়ে অবস্থান করেন। আমরা হারদ্বার যাওয়া মনস্থ করিয়া শীখদের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। হরিদ্বারের টিকিট লইয়া প্লাটফর্ম্মের উপরের সেতু পার হইয়া অন্য প্ল্যাটফর্ম্মে যাইতেছি, এমন সময় একজন টিকিট কালেক্টার মন্দ-অভিপ্রায়ে আমার নাম কি, বাড়ী কোথায়,—ব্যবসা কি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি অনেক বিষয় উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ওয়াচ খুলিয়া দেখি, ট্রেণ ছাড়ার সময় হইয়াছে, অথচ তাঁহার প্রশ্ন ফুরাইতেছে না; ইহাতে একটু বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে বলিলাম "আপনার উদ্দেশ্য প্রশ্নের সূচনা হইতেই বুঝিয়াছি, আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য নহি। আপনার সন্দেহ দূরীকরণার্থ

বলিতেছি, আমি বিপ্লবকারী দলভুক্ত নহি, আমি একজন পর্য্যটক। ইহা বলিয়া আমি দ্রুতপাদ বিক্ষেপে আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা ১১।২৫ মিনিটে (7, mixed up) ট্রেণ ছাড়িল। আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই হইতে সাহারানপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা ব্রডগেষ অর্থাৎ ৫॥ ফুট ব্যবধানে ইহার রেলপাতা হইয়াছে। আউধ ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ে লাইন এক হাজার মাইল বিস্তৃত। ইহার হেড আপিস লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ হইতে হরিদ্বার ৩০১ মাইল, ভাড়া ৩৲১০ আনা।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১৪শ ভাগ। চৈত্র ১৩১৭। ১২শ সংখ্যা।

মধ্যশাখা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীভগবানের কান্তাসকল সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রিবিধা। এই ত্রিবিধা কান্তারই কান্তাভাব স্থায়ী। তন্মধ্যে সাধারণীর কান্তাভাব সম্ভোগেচ্ছা-নিদান, সমঞ্জসার কান্তাভাব কচিৎ ভেদিত সম্ভোগেচ্ছ এবং সমর্থার কান্তাভাব স্বরূপা ভিন্ন সম্ভোগেচ্ছ। সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবের নিদান অর্থাৎ মূল, তাহা-কেই সম্ভোগেচ্ছানিদান কান্তাভাব বলা যায়;—সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবে কখন কখন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম কচিৎ ভেদিত সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব, আর যে কান্তাভাবে সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্বরূপের সহিত অভেদে প্রকাশ পায়, তাহার নাম স্বরূপাভিন্ন সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব কুব্জাদি সাধারণী কান্তার কান্তাভাবই সম্ভোগেচ্ছা নিদান কান্তাভাব কারণ, তাঁহাদিগের প্রেম

সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সমঞ্জসা মহিষীগণের কান্তাভাবই কচিৎ ভেদিত সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব, কারণ তাঁহাদিগের কান্তাভাব কখন সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ পায় না, এবং কখন তদ্ভিন্নও প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সমৃদ্ধ ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবই স্বরূপাভিন্ন সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব, কারণ, তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্থায়ী ভাবের সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ স্থায়ীভাবের অন্তর্ভূত হইয়া কেবল শুদ্ধ-স্থায়ীভাব-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই স্থায়ীভাবের স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় না। সাধারণী কান্তাদিগের বলবতী সম্ভোগেচ্ছা সকল সময়েই কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে ভিন্নাকারে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য স্বসুখ বাসনা রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণী কান্তাসকল স্বরূপতঃ স্বসুখতাৎপর্য্য বর্জ্জিত হইলেও তাঁহাদিগের প্রেম কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য স্বসুখ বাসনার আকারে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে উহার কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময় স্বরূপের প্রকাশ থাকে না, স্বসুখ তাৎপর্য্যময় রূপান্তরই লক্ষিত হইয়া থাকে। সমঞ্জসা কান্তাদিগের ঐ সম্ভোগেচ্ছা কখন কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য স্বসুখ বাসনার আকারে উত্থিত হইয়া সাধারণীর ন্যায় স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে এবং কখন কেবল কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া উক্ত প্রেমের অন্তর্ভূত হইয়া সমর্থার ন্যায় স্বরূপাভিন্ন রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমর্থা ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছা সর্ব্বদাই কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময়ী। তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্য স্বসুখ বাসনা রূপে উত্থিত হয় না। ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণসুখ ভিন্ন অপর সুখের অনুসন্ধানই থাকে না। তাঁহাদিগের আত্মসুখের অনুসন্ধান না থাকাতেই তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধ কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়া কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। যদি-কেহ আপত্তি করেন সমর্থা ব্রজদেবীগণের আত্মসুখে তাৎপর্য্য না থাকুক; কিন্তু সঙ্গকালে আত্মসুখ অপরিহার্য্য— আমরা তাহা স্বীকার করিনা, কারণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সুখের অনুভব সম্ভব হয় না। অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগের সুখোৎপত্তির চেষ্টাতেও সঙ্গত হয়না—কারণ যাহার অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগে সুখ জন্মে, তিনি

যে সুখানুসন্ধান রহিত, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্ব্বথা সুখানুসন্ধান রহিত ব্যক্তির অন্নপানাদির উপভোগে সুখানুৎপত্তি বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়। জাগ্রদাবস্থায় বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ান্তরের অনুভবাভাব সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ, সুষুপ্তিরত কথাই নাই। ব্রজদেবীগণ সদাই তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদিগের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অভাব-থাকে না। তাঁহারা নিত্য তুরীয় অবস্থায় থাকিয়া স্থূল সূক্ষ্মাদির কোন সমাচারই রাখেন না। এক্ষণে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে তাঁহাদিগের স্থূল সূক্ষ্মাদির অনুভব না থাকিলেও, তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গজনিত সুখ বিশেষের অনুভব হউক? এরূপ আপত্তি আমরা ইষ্টাপত্তি মনে করি। তুরীয়স্থা ব্রজদেবীগণ তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ জনিত সুখ বিশেষের অনুভব করেন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে ঐ সুখ যে এই সুখ নহে, উহা যে প্রাকৃত সুখ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেরূপ স্থূলে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে সূক্ষ্মে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার ভিন্ন, যেরূপ সূক্ষ্মে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে কারণে পুঞ্জীভূত জ্ঞানও তৎপ্রকার ভিন্ন, তদ্রূপ তুরীয়ে বা সিদ্ধদেহে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুখ জ্ঞান বিশেষ। অতএব সিদ্ধদেহ সম্পন্না ব্রজদেবীগণের তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ জনিত সুখের অনুভব যে স্থূলাদি সংস্পর্শ জনিত সুখানুভব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা স্থির। উহা সমাধি সুখ হইতে বা ব্রহ্মানুভব জনিত সুখ হইতেও স্বতন্ত্র।

সাধারণ ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে আবার শ্রীরাধাপ্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ পাইয়া আর কোনদিকে চাহিলেন না, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা কিন্তু সেরূপ বিভোর হইলেন না। শ্রীরাধা দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক কৃষ্ণ, ঠিক সেইরূপ সাধারণ ভাবে তাহার পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। এই দেখিয়াই শ্রীরাধার মান হইল, তিনি মানিনী হইয়া রাস ছাড়িয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাস ছাড়িয়া গেলেন, চন্দ্রহারের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, চন্দ্র সকল ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা। শ্রীরাধিকা চলিয়া গেলেই শ্রীকৃষ্ণও চলিয়া গেলেন। মধ্যমণির অভাবে মণির

মালা শোভাচ্যুত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আর রস ভাল লাগিল না, তিনিও শ্রীরাধিকার অনুসরণ করিলেন।

রাম রায়ের কথা শুনিয়া প্রভুর মুখকমল উৎফুল্ল হইল। তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন—"ইহা শুনিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। এখন আমি সাধ্যসাধনের তত্ত্ব জানিলাম। কিন্তু আরও কিছু শুনিবার অভিলাষ হইতেছে। কৃপা করিয়া কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বল। এই সকল বিষয় তোমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট শুনিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি ভিন্ন অপর কেহই এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে।"

রাম রায় প্রভুর ঈদৃশ বিনয় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমিত কিছুই জানিনা; তুমি যাহা বলাইলে, তাহাই বলিলাম। লোকে যেমন শুকপক্ষীকে পাঠ পড়াইয়া তাহার মুখ হইতে ঐ পাঠ শ্রবণ করিয়া সুখ পায়, আপনিও তেমনই আমার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে বলাইয়া শুনিতেছেন এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতে-ছেন। বস্তুতঃ আমি ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহার কিছুই জানিনা।"

প্রভু বলিলেন,—"আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানিনা। মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সঙ্গগুণে ঐ মন কিছু নির্ম্মল হইলে, আমি তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ভক্তিতত্ত্ব আমিও জানিনা, এক রামানন্দ জানেন, তিনিও এখানে নাই। তাঁহার মুখে তোমার মহিমা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্তুতি করিতেছ, কিন্তু বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন বা শূদ্রই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু; আমি সন্ন্যাসী বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার তত্ত্ব বলিয়া আমাকে পূর্ণ-মনোরথ কর।"

রাম রায় বলিলেন,—"আমি নট, তুমি সূত্রধার; তুমি আমাকে যেমন নাচাইতেছ, আমিও তেমন নাচিতেছি; আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী, তোমার যাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমিও তাহাই উচ্চারণ করিতেছি।"

যদিও রামানন্দ রায় বুঝিতেছেন যে, আমি যাঁহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করিতেছি, ইনি স্বয়ং ভগবান্, তথাপি তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, তাহার আদি নাই। তিনি কারণ সকলেরও কারণ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব-রস পূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত অপ্রাকৃত নবীন মদন। তিনি অন্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মদন সকলের মূলাশ্রয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত হইয়া নিত্য নূতনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি কোটি কন্দর্প লাবণ্য এবং প্রকৃতা প্রাকৃত কন্দর্প সকলের মূলস্থানীয়। শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্তই কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা তাহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কামকেও মোহিত করিয়া থাকেন। নানা ভক্তের আস্বাদ্য রস নানাবিধ, তিনি ঐ সমস্ত রসের বিষয়ও আশ্রয়। তিনি শৃঙ্গার রস রাজমূর্ত্তি-ধারী। আত্ম পর্য্যন্ত সকলের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীনারায়ণাদিরও চিত্ত হরণ করেন। তিনি লক্ষ্মী প্রভৃতি নারীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার নিজের মাধুর্য্য নিজের চিত্তকেও হরণ করে। তিনি আপনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।

এই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিলাম। অতঃপর শ্রীরাধার স্বরূপ বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। ঐ অনন্ত শক্তি সকল সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত।* উক্ত ভাগত্রয় যথা,—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গাশক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি এবং জীব-শক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি। অন্তরঙ্গাশক্তিই স্বরূপশক্তি ও সর্ব্বশক্তির প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় অতএব তদীয় স্বরূপ শক্তি ও ত্রিরূপা-ত্মিকা।* ঐ সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপিণী এবং অধিষ্ঠাতৃ রূপতঃ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। তত্তৎ প্রাধান্যে

সন্ধিন্যাদিনাম জানিতে হইবে। সন্ধিনী প্রাধানা অধিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ সম্বিৎ প্রাধানা অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান সখিবর্গ, আর হ্লাদিনী প্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ভক্তি ও কান্তাবর্গ। শান্ত ও দাস সকল কেহ সন্ধিনী প্রধান ও কেহ সম্বিৎ প্রধানের মধ্যে নিবিষ্ট। হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী দ্বারাই সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইয়াও নিজানন্দাধিষ্ঠাত্রী হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজানন্দ অনুভব করেন। এই হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। হ্লাদিনীর সারাংশে সেই প্রেম। সারাংশ শব্দের অর্থ আনুকূল্যাভিলাষ। ঐ আনুকূল্যাভিলাষাত্মক প্রেমকে আনন্দ চিন্ময় রসও বলা যায়, ঐ রসাত্মক প্রেমের পরম সার মহাভাব। শ্রীরাধাই মহাভাব স্বরূপিণী। তিনিই কান্তাবর্গের অংশিনী অতএব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত। তিনিই চিন্তামণি সার সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণই তাহার কার্য্য। লক্ষ্মীগণ তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি মহিষীগণ তাঁহার প্রতিবিম্ব ললিতাদি গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না বলিয়া তিনিই সকল কান্তার আকারে বিরাজ করেন। তন্মধ্যে ব্রজে স্বপক্ষ বিপক্ষাদি নানা ভাব ভেদে ও রস ভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকান্তার শিরোমণি। তিনি দেবী অর্থাৎ দীপ্তিমতী অতএব পরম-সুন্দরী। অথবা তিনি কৃষ্ণারাধন-ক্রীড়ার নিবাস নগরী বলিয়াই তাঁহাকে দেবী বলা হয়। তিনি কৃষ্ণময়ী; কৃষ্ণ তাহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন। যেখানে যেখানে তাঁহার নেত্র পড়ে, সেইখানে সেইখানেই কৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

৺শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের গৌরসুন্দর হইতে উদ্ধৃত।

মানব ও দেবতা।

আমরা জানি যে দেবতা স্বর্গে থাকেন ও মানব মর্ত্তে থাকেন। এক্ষণে আমরা দেখিব স্বর্গ কিরূপ ও মর্ত্তই বা কি পদার্থ। স্বর্গে দেবতাগণ কিরূপে বিরাজ করেন, মানবের ও দেবতার কি কি বিভিন্ন প্রকৃতি? প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে; স্বত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় বিশিষ্টই প্রকৃতি, এই গুণত্রয় ব্যতীত প্রকৃতিকে আর কিছু বলা যায় না। প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বব্যাপী জীব মাত্রেই গুণত্রয় বিশিষ্ট। আমরা মানবের প্রকৃতির গুণত্রয় লইয়া তাহাই বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি, তাহাতেই বুঝিয়া থাকি যে কিরূপে এই তিন গুণের এক একটি আধিক্যতায় প্রকৃতির ভাব প্রকাশ পায়। যে মানবকে দেবতুল্য মনে করি, সে মানবের কি গুণভাব আধিক্যতা আছে; সে মানব সত্বভাবাপন্ন, তাঁহার রজঃ ও তমঃ গুণ অতি অল্পমাত্র। এই সত্বগুণভাব, যাঁহার মধ্যে আধিক্যতা প্রকাশ পায় তিনিই মানবরূপধারী হইলেও আমরা দেবতা বলিয়া গণ্য করি ও ভক্তি করিয়া থাকি। এবং যে স্থলে আমরা রজঃ-গুণভাবের আধিক্যতা দেখিতে পাই ও স্বত্ব ও তমঃ অতি অল্পমাত্র, তিনিই মানব বলিয়া গণ্য হন, আর যে স্থলে তমঃগুণের প্রাধান্যতা দেখি ও স্বত্ব ও রজঃ অতি ঈষৎভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাই পশু ভাব সে মানব দেহধারী হইলেও পশু বলিয়া গণ্য হয়।

এক্ষণে দেখিব যে গুণত্রয়ের লক্ষণ কি কি? স্বত্বগুণের লক্ষণ, মানব ও দেবতার সহিত যে সম্বন্ধ আনয়ন করে অর্থাৎ মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের শাস্ত্রানুশীলনে ও তাঁহাদের উপদেশগুলি পালন করতঃ যে ভাব বিশিষ্ট হইয়া সেই রস পানে, কেবলমাত্র সুখানুভব করিতেছেন, তিনি স্বর্গীয় সুখানুভবই করিয়া থাকেন; কারণ যে স্থলে দুঃখ আসে না এমন স্থলই স্বর্গ এবং স্বত্বগুণভাব। তাঁহাদের স্বাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে।

রজঃগুণভাবের লক্ষণ এই দেখি, যে কর্ম্মী, যিনি পার্থিব ও বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে অনুরক্ত এবং সেই সকল কর্ম্মগুলির ফলভোগ সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত অর্থাৎ মর্ত্তের ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক দুঃখ ভাবে সর্ব্বদাই নিমগ্ন; ইনি

ফলপ্রত্যাশী হইয়া সকাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন ও কর্ম্মফলের দায়ী হন, ইহাকে রাজসিক গুণ বলা যায়। মানবের প্রকৃতি এরূপেই দিন যাপন হইয়া থাকে। ইহারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

তমঃগুণের লক্ষণ, যাহা কর্ম্মে অলসতা, মোহ ভাব (অর্থাৎ কেবল মাত্রই দুঃখময় হইয়া থাকে) কারণ উহাদের কোন কর্ম্ম করিবার সুখ একেবারেই থাকে না; অতএব কোন কর্ম্ম না করিলে অত্যন্ত নারকীয় যন্ত্রণাবোধ হইতে থাকে ইহাকে, তামসিক ভাব কিংবা পশুভাব বলা হইয়া থাকে, এই পশুভাবই অনন্ত দুঃখের কারণ হয়।

কিন্তু জীব মাত্রেই গুণত্রয় বিশিষ্ট, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গুণের আধিক্যতা ও অন্যান্যগুলির অতি ঈষৎ পরিমাণ থাকিয়া যায়, তাহাতে আধিক্যতা গুণেরই আধিপত্য প্রকাশ হইয়া থাকে, অপর দুইটির বল প্রকাশ পায় না। অপর দুইটির শক্তি অতি ক্ষীণভাবে থাকে যাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না, কিন্তু গুণবিচারক পণ্ডিতগণ বিচার দ্বারা সেই অস্পষ্ট ক্ষীণভাবগুলিও বুঝিতে সক্ষম হয়েন, তাহাই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়েন। এবং সর্ব্বজীবকে সমভাবে দেখিতে সমর্থ হয়েন। এবং সকলকেই ভালবাসিতে শিখিতেছেন। কিন্তু মানব সাধারণতঃ মানবের প্রকৃতি অনুযায়ী গুণের তারতম্য দেখিয়া লোককে ভালবাসে ও দোষ দেখিয়া তাহাকে ঘৃণা করে। সাধু পুরুষ মহাত্মগণ তাহা করেন না। এই সকল দেব লক্ষণ, অর্থাৎ তাঁহারা দেবতা। আমরা যদি পরকে ভালবাসিতে যাই, তাহাতে আমাদের সেই লোকের যতটুকু স্বত্বভাব আছে (অর্থাৎ যতটুকু গুণভাবটি আছে) তাহাই যদি কেবলমাত্র আলোচনা করি, দোষের ভাগ প্রতি একেবারেই লক্ষ্য না রাখিতে চেষ্টা করি, তবেই আমরা ক্রমে ক্রমে লোকটিকে ভক্তি, ভালবাসা, বা প্রেমভাবে দেখিতে শিখিব, আমরা নিশ্চয়ই জানি যে মানব মাত্রেই দোষ গুণ উভয়ই আছে, তবে কোন স্থলে কাহারও গুণের ভাগ অধিক ও দোষের ভাগ কম, এবং কাহারও দোষের ভাগ অধিক ও গুণের ভাগ কম; কিন্তু আমরা নিজেদের পাপের ভাগ বৃদ্ধি না করিয়া লোকের গুণভাগটুকু দেখিব স্থির করিয়াছি; তজ্জন্য আমাদের চক্ষে কাহারও দোষের ভাগ নাই কেবলমাত্র গুণের ভাগেই লক্ষ্য, তজ্জন্য গুণীর গুণ, ও দোষীর গুণ সর্ব্বই সমভাব আসিয়া পড়ে অতএব এইরূপে আমাদের সমজ্ঞান

পথের পথিক হইতে হইবে, এইরূপে নিজের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিলে জ্ঞানীর জ্ঞান অপসারিত হয় না ; তখন বুঝা যাইবে যে পার্থক্য জ্ঞানই অজ্ঞতার পরিচয়, স্বার্থপরতা। জীবের মোহ জীবকে ভ্রমপথে লইয়া গিয়া বিভিন্নভাবে আড়িত করিয়া অতিশয় স্বার্থপর করিয়া দেয়। এই স্বার্থপরতাই অজ্ঞানী, বদ্ধজীব ; তাহারা ভালবাসা কাহাকে বলে জানে না, তাহারা কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ সুখান্বেষী। যেখানে স্বার্থ-সুখের জন্য ব্যস্ত জানিবে, সেখানে ভালবাসা ঠিক নয়, কেবলমাত্র মোহ। সে রিপুবশে বশবর্ত্তী রাগ, দ্বেষ অস্মিতার বদ্ধজীব।

কিন্তু ভালবাসা, ভক্তি বা প্রেম একই বস্তু, সেই বস্তু যিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। ভালবাসাই জগতের সার। ভালবাসাটি পরের সুখ বৃদ্ধি ; স্বার্থ সুখের জন্য নহে, যিনি প্রকৃত ভালবাসিতে জানেন, তিনি দেবতাকে জানেন ; তিনি স্বর্গীয় সুখ জানেন, সেখানে মোহ আসিতে পারে না ; কারণ ভালবাসাই আনন্দ।

এই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান হওয়া চাই, অর্থাৎ সর্ব্বজীবকেই সমভাবে ভালবাসিয়া থাকে, সেখানে আত্মপর ভেদ নাই— সমজ্ঞান, তিনি আত্মজ্ঞানী পুরুষ। তখন তিনি যথার্থই নিজেকে চিনিতে পারিবেন ও নিজেই সর্ব্বময় দেখিবেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ গীতা

মানব যখন সর্ব্বভূতস্থ হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, তখন নিজেকেই সেই স্বাত্বিক পুরুষ দেবতা বিশেষ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। নিজভোগ্য কিছু থাকে না, দেবতায় সর্ব্বস্ব তাঁহার সমর্পণ, দেবভোগ্য সর্ব্বস্বই দেবতায় সমর্পণ হয়। তখন তিনি সর্ব্বজীবেই স্বত্বভাবাপন্ন দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করেন, এই সমদর্শিভাবে যিনি অবস্থান করিতেছেন তিনিই দেবতা।

দেবতার আবাস স্থল স্বর্গে। কোথায় স্বর্গ ? তাহা দেখা যাউক। আমরা সপ্তলোক শুনিয়া আসিতেছি ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ; মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং এই সপ্তলোক। এক্ষণে উক্ত ত্রিলোক লইয়া দেবতার আবাস স্থল স্বর্গ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে শিখিব।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোক। ভূর্লোক মর্ত্তঃ, ভুবর্লোক (কামলোক) বা নরক এবং স্বর্লোক স্বর্গ। ভূলোক (physical plane) পার্থিব সুখ ও দুঃখ অনবরত অনুভব হইয়া থাকে, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির রজগুণপ্রাধান্যতা বিশিষ্ট বদ্ধজীব মানবরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাই বহির্মুখী মন ও জগৎসংসার, এই স্থলে সুখ ও দুঃখ ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ বিরাজ করিতেছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। গীতা।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সুখ ও দুঃখ মানব বুদ্ধির দ্বারা কোনটি সুখ ও কোনটি দুঃখ তাহাই অনুভব করিয়া বিচার করিতে সমর্থ হয়েন, এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিবার জন্য বহির্জগৎ বা অন্তর্নিহিত স্থলে ব্যাপৃত থাকিতে সচেষ্ট হয়েন ইঁহারা মনুষ্য। কিন্তু পশুগণ তাহা সক্ষম নয়। কারণ তাহাদের বিচার শক্তি নাই, অনুভব শক্তিও বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না, অতি ক্ষীণ ভাবে বিরাজমান। তাহারাই তমগুণের আধিক্যতা বিশিষ্ট। তাহাদের বিবেক জ্ঞান কিছুমাত্রই নাই। এ জগতে তাহারা পরের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে ; তাহাদের নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই জ্ঞান নাই ; এই তমগুণ-প্রধান জীবগণ কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা বদ্ধ, মোহ প্রাপ্ত। এই মোহ ভাবই দুঃখময়, যন্ত্রণাময়। নিজ কাম্য বস্তুতে লিপ্ত থাকিতে থাকিতে দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হয়েন, তাহাই সম্পূর্ণ নরক যন্ত্রণা ভোগে ভুগিতে থাকে, পরাধীন বন্দীভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, সেই স্থল তামসিক। এই তামসিক ভাব ভুবর্লোকে (Astral plane)। জীব যখন এই লোকে উপনীত হয়েন বন্দীভাবে অবস্থান করেন, নিজের দুষ্কৃতির বশে থাকিয়া নিজ শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরাধীন বন্দিভাবে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। এস্থলে সুখ একেবারেই নাই, অনন্ত দুঃখ ; নিজ ভোগ্যবস্তু সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও ভোগ করিবার ক্ষমতা একেবারেই না থাকাতে অনন্ত নরকের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। কারণ সে বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, সম্পূর্ণ মোহ ও বদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। এই অজ্ঞানী বদ্ধ জীবের বাসস্থল। ইহাই দুঃখময় নরক।

আমরা কোথায় স্বর্গ দেখিতে যাইতেছি, তা নয় নরক দৃশ্য দেখিতে আসি-

লাম কেন? নরক না দেখিয়া স্বর্গ দেখা যায় না বুঝি, কারণ আমাদের সাংসারিক কাম্য বস্তু আদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকি, তজ্জন্য নরক দৃশ্য একবার দর্শন করিয়া পরে স্বর্গভোগ করিবই করিব এ কথা ঠিক। প্রবাদ আছে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কামলোক বা নরক দৃশ্যটি দেখিয়া স্বশরীরে (স্বাধীন জ্ঞানে) স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গ, সেই স্থানে দেবতারা বাস করেন। ইহাকে স্বর্লোক বা (Mental plane) কহে। এই স্বর্লোক স্বত্বগুণাবিশিষ্ট স্বাত্বিক জীব। স্বাত্বিক জীবগণ এই স্বর্লোকে অবস্থান করেন, এ স্থলে দুঃখ একেবারে থাকে না, কারণ কোন অভাব এ স্থলে নাই; যেখানে অভাব নাই সেখানে দুঃখ নাই, এই স্বর্লোকে সকল ভোগ্য বস্তুও আছে, অপ্রাপ্য বস্তুও আছে এবং দেবতাগণ নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ ফল প্রত্যাশা না করিয়া পবিত্র সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সে দেবভোগ্য পদার্থ সকল কেবল দেবতারাই ভোগ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা সুখ ভোগই করিয়া থাকেন। এখানে দুঃখ একেবারেই নাই, রজঃ ও তমঃ এতই অল্প যে তাহাদের শক্তি সেখানে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে তজ্জন্য ইহা সাত্তিক স্বর্গ—দেব স্বর্গ। দেবযান (Dechan) বলা হইয়া থাকে। দেবযানের অধিষ্ঠাতা স্বত্বগুণবিশিষ্ট স্বাধীনচেতা পুরুষই দেবতা।

কিন্তু যে স্থলে সুখও নাই কেবলমাত্র আনন্দ, এই আনন্দের (ব্রহ্মের) বাসস্থল। এস্থলে কোন গুণই নাই, নির্গুণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় হইতে যিনি অতীত; অর্থাৎ যেখানে কোন গুণই নাই কিংবা এই গুণত্রয়ের সাম্য ভাব। ত্রিগুণাতীত পরমপুরুষ। অর্থাৎ যে পুরুষ এই পরম আনন্দে লীন হইয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ, সদানন্দ, আনন্দময় কথিত আছে। এই উক্ত পরম পুরুষই ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম।

কিন্তু* যাহা ত্রিগুণাতীত নহে তাহাই গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণ। যাহা কেবল মাত্র সুখময় তাহাই স্বত্বের আধিক্যতা পূর্ণ থাকাতে স্বাত্বিক জীবগণ দেবতারূপে স্বর্লোকে বা স্বর্গে বাস করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। তাহাকে দেবযান (Devachan) বলে। এ স্থল হইতে দেবতাগণ আবশ্যকমত (ভূর্লোকে) মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মগণ

* মল্লিখিত ব্রহ্মচিন্তা নামক প্রবন্ধ পন্থা পত্রিকায় প্রকাশিত। যাঃ মূঃ।

জীবহিতার্থে লোকশিক্ষার্থে কার্য্যক্ষেত্রে মহাত্মা (Master) রূপে আবির্ভাব হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ সুখ ভোগ জীবন অবস্থায় যোগিগণ যোগ দ্বারা ভোগ করিতে সক্ষম, এবং মৃতের পর সাত্ত্বিক পুরুষগণ এই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি যে মানবপ্রকৃতি লইয়াই আমরা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক ভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। অতএব আমরা সত্ত্বগুণাবিশিষ্ট হইয়া স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে সচেষ্ট হই। তাহাতে আমাদের দুঃখ থাকিবে না। কি প্রকারে আমাদের সত্ত্বগুণের আধিক্যতা হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবে। তবেই আমরা মানব হইতে—দেবতা হইতে সক্ষম হইব। তখন বুঝিব এই বর্ত্তমান মর্ত্ত হইতে স্বর্গ কত পৃথক। আরও বুঝিব জীব ও শিব প্রভেদ কত। শিব ইনি দেবাদিদেব মহাদেব। ইনি মহাযোগী ও সম্পূর্ণ ত্যাগী পুরুষ, ইঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী পুরুষ আর নাই। ইঁহার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী পুরুষ আর নাই; তজ্জন্য ইনি মহাযোগী।

মহাযোগী শিবের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই এই তেত্রিশ কোটি দেবতা অপেক্ষা মহান্, তজ্জন্য তিনি মহাদেব। ইঁহার আবাসস্থল মহাযোগে। ইনি মহাযোগে অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ। ইনি শ্মশানে, মশানে, কৈলাসপুরী, রাজ অট্টালিকা পথে, ঘাটে, স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইনি রাজাধিরাজ মহারাজ, দেবাদিদেব মহাদেব। ইনি দীন, হীন ভিক্ষুক। ইঁহার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় নাই, মান, অপমান, যশ, অপযশ কিছুই গ্রাহ্য নাই, তজ্জন্য তিনি অতি মহৎ। ইঁহার আহার বিহারে কিছুমাত্র বিকার নাই, তিনি সদ্গন্ধ, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ আঘ্রাণ করতঃ সম সুখানুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কোন ভোগাভোগের তারতম্য নাই, সর্ব্ব বিষয়েই নির্লিপ্ত ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন, কারণ তিনি সমদর্শী, সমজ্ঞানী, এই হলো সাম্যভাব, (অর্থাৎ তিনি কোন বিষয়েই বদ্ধ নহেন)। তিনি বম্‌ভোলা তাঁহার নাম ভোলানাথ; তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ ও পূর্ণজ্ঞানী। তিনি নির্ম্মাণ কায়া লইয়া এখনও কৈলাসে অবস্থান করিতেছেন, যিনি এই সাধকের ন্যায় মহাযোগে অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বর্গোপরি স্থল লাভ করিয়াছেন, কারণ তিনি যে স্থলে থাকিবেন, সেই স্থল

স্বর্গোপরি স্থল, দেবতাদিগের স্বর্গ হইতেও উন্নত স্থল, ইহার নাম কৈলাস। কৈলাস মহাযোগীর আবাসস্থল।

কৈলাস বলিলে যে জড়জগতের কৈলাস পর্ব্বত বলিয়া বুঝা যায় ঠিক তাহা নহে, কৈলাস অতি উন্নত স্থল যে স্থলের অপেক্ষা আর উন্নতম হয় না; যিনি সর্ব্ববিষয়েই উন্নত তিনিই কৈলাসে থাকেন। প্রাচীন ঋষিগণ যে কৈলাস শিখর শব্দ জড়জগতের কোন পর্ব্বত বলিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, কারণ ভূগোলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না; স্বর্লোক অপেক্ষা অতি উন্নত স্থল বিশেষ বুঝাইবার জন্য শিখর শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কে শব্দের উত্তর লস ধাতু ঘঞ্ কর্ত্তৃবাচ্যে = কৈলাস (কে অর্থ জলে* লস ধাতুর অর্থ উল্লাস বা আনন্দ) অর্থাৎ তিনিই আনন্দে বাস করিতেছেন সেই স্থল স্বর্গোপরি স্থল বিশেষ বুঝাইবার জন্য কৈলাস শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যে স্থল শান্ত (সুখময়), অতি শীতল অর্থাৎ (অনিত্য সুখ দুঃখের উত্তাপে উত্তাপিত হইতে হয় না), সেইরূপ অতি সুখস্থল উচ্চতার অর্থাৎ অনিত্য সুখ দুঃখের লেশ মাত্র নাই, ইহাই স্বর্গের অতি পবিত্র সত্ত্ব জ্ঞান সুখ উপভোগে সুশীতল স্থল। বরফের ন্যায় যেমন সুশীতল হইতে পারে না, ইহাই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট কেবলমাত্র সুখাতীত সুখ, স্বর্গাদপি স্বর্গ, এই স্থলই অতি সুখময় ইহার ন্যায় আর সুখস্থল হইতে পারে না। তাহাই শিববাসস্থল। শিবমুক্ত; শিব শান্ত; শিব বাসস্থল—শান্ত স্থল; তাহাই স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই মহাদেবের (শিবের) আবাসস্থল। এই শিবলোক। জীবভাব ও শিবভাব আমরা এইরূপে বুঝিয়া শিবোঽহং † এই মহামন্ত্র ধ্যান করতঃ জীবভাব দূর করিয়া শিবভাবে শিবলোকে বাস করিতে সচেষ্ট হইব।

ওঁ নমঃ শিবায়। ওঁ নমঃ শিবায়।

ওঁ নমঃ শিবায়। ‡

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* জলে কারণে, অর্থাৎ প্রলয়ে; আনন্দ।

† শিবোঽহং এই মহামন্ত্ররূপী অস্ত্র ধারণ না করিলে জীবের বন্ধন ছিন্ন হয় না।

‡ ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্র অভ্যাস না হইলে শিবোঽহং মহামন্ত্র অভ্যাসের অধিকারী হয় না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মায়া কি পরমাণুসৃষ্টির হেতু, বিচার পূর্ব্বক তাহার শেষ মীমাংসা।

মায়া পদার্থ বেদ মূলক কিনা, তাহার মূল কি শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ যথা ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি, ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি,' যস্মান্ মায়ী সৃজ্যতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞ চান্দ্রায়ণাদিব্রত এই সকল ক্রিয়া ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি বেদে কথিত আছে। পদার্থ সকল যাহা হইয়াছিল বা হইতেছে অথবা হইবে, তত্তাবৎ সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকারি ব্রহ্মের প্রপঞ্চোপাদান অসম্ভব হেতু মায়ী অর্থাৎ কূটস্থ ব্যাপী স্বশক্তি যোগে সৃষ্টিতে উপপন্ন হইয়াছিলেন, স্বীয় মায়াকল্পিত প্রপঞ্চময় ভূতাদি সৃষ্টি করিয়া অশেষ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। আত্মা মায়া সন্নিরুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ মায়াতে অভিভূত হইয়া জীব উপাধি গ্রহণ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন। মায়া বিহীন হইলেই জীব মুক্ত লাভ করে "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্, মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতন্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়া অভিভূত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগদ্ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই মায়াকেই প্রকৃতি বলা যায়, পরমেশ্বর যখন মায়া বিশিষ্ট হন, তখন তাঁহাকে মায়ী বলে। সেই মায়ী পরম পুরুষের কল্পিত অবয়ব দ্বারায় ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে। নির্ব্বিকার পুরুষের অবস্থান্তর ব্যতীত তাহা তদ্ভিন্ন নহে। মায়ার প্রস্তাব বৈদমূলক কিন্তু পরমাণুর কোন প্রসঙ্গ বেদমূলক দেখা যায় না; সুতরাং মায়া বা প্রকৃতি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরমাণু স্থাপন করার জন্য বাদি মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত মল বিহীন। "পরমাণু স্থাপনের জন্য যে প্রমাণ স্থির করিয়াছেন, তাহা যথা ছান্দগ্যে "সদেব সৌম্যেদমগ্র, আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহু, রস দেবদগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ং তস্মাদপপতঃ,

সজ্জায়েত। উক্তবাদি ব্যাখ্যা করিতেছেন, নৈনায়িক মতে ব্রহ্মের ত্রিবিধ অবস্থা প্রত্যক্ষ, আশ্রয়ত্ব, সৃষ্টিকর্তৃত্ব, প্রলয়কালে এক মাত্র শূন্য ও তন্মাত্র ব্যবচ্ছেদক হওয়ায় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সমুদয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল, মূলে এব শব্দ বলে দ্বিতীয় পদের কোন সার্থকতা হয়না ও উপনিষৎ বিরোধি তৈত্তরীয় উপনিষৎ যথা অসদ্বা, ইদমগ্র, আসীৎ ততোবৈ, সদোজায়ত, তদাত্মানং স্বয়, মকুরুত, সুতরাং এই অসৎ পদে পরমাণু ইহার তাৎপর্য্য এই সৎ পদ সৎপদ ভিন্ন সুতরাং সৎপদবাচ্য ব্রহ্ম ভিন্ন পরমাণু প্রভৃতি লাভ হইল। সহায় পরমাণু ভিন্ন অন্য বুদ্ধি হয় না। সিদ্ধান্তীপক্ষে দেখাইতেছেন উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষতে শ্বেতকেতুর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা মতে আরুণি ঐ শ্রুতির উল্লেখ করেন অসৎ হইতে সদ্বস্তু উৎপত্তি অসম্ভব জন্য শ্বেতকেতুর প্রশ্ন কুতস্ত, খলু, সৌমৈব দৃশ্যাদি, হোবাচ, কথমসতঃ, সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বে, সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, এক মেবাদ্বিতীয়ং॥ শ্বেতকেতু বলিতেছেন কোন প্রমাণে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইতে পারে? আরুণি বলিতেছেন এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিল তৎ ভিন্ন অসৎ হইতে সতের উৎপত্তির দৃষ্টান্তাভাব; সুতরাং হে সৌম্য এই নিমিত্ত বলিতেছি এক অদ্বিতীয় সৎই নিশ্চয় ছিল ঐ সৎ পদার্থ অন্য আকারে অবস্থান করাতে তাহাই প্রকৃতি বাচ্য হইয়া বহুত্বে পরিণত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছু নহে যেহেতু তাহা মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল। তথাহি মনু—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং, অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং, সুষুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। কল্লুক টীকায়াং ইদং জগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং, লীনমাসীৎ। প্রকৃতিরপি ব্রহ্মাত্মনা অব্যাকৃতাসীৎ "শ্রুতি" তমো আসীৎ, তমসা গূঢ়মগ্র।" মহাপ্রলয়ে এই জগৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল, অপ্রজ্ঞাত ও কোন লক্ষণ এই জগতের ছিল না সুষুপ্তির ন্যায় অজ্ঞেয় ছিল প্রকৃতি অব্যাকৃতভাবে ব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন, শ্রুতি প্রমাণেও তাহাই অনুশাসিত হইতেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দ বল্লি যথা তস্মাধা, এতস্মাদাত্মনঃ, আকাশ সম্ভূতঃ, আকাশা দ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নং, অন্নাৎ পুরুষ, সবা, এষ পুরুষো, অন্নরসময়ঃ, তস্যেদ মেব। তৎপদবাচি ব্রহ্ম এতৎ পদবাচি প্রকৃতি ঐ প্রকৃতি ভূত আত্মা হইতে শব্দ গুণ যুক্ত আকাশ সৃষ্টি হয়

আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে অগ্নি অগ্নি হইতে আপ জল জল হইতে পৃথিবী পৃথিবী হইতে ওষধি ওষধি হইতে অন্ন অন্ন হইতে পুরুষ সেই পূর্ব্বোক্ত পুরুষ অন্ন রস ময় তাহা হইতেই এ সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এ সমস্তই উপাধি যুক্ত আত্মা অর্থাৎ জীব সংসারে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিতেছে, তল্লক্ষে অসত্তঃ সজ্জায়েত শ্রুতির বিষয়, তদ্ভিন্ন প্রাগুক্ত কালের সৃষ্ট বস্তু প্রকৃতিও জগত আকাশাদি ভৌতিক জগৎ; সুতরাং জীবে ব্রহ্মে অভেদ প্রতিপন্ন করিতেছেন"তস্যেদ-মেব" পদে অভেদ পরিষ্কার দেখাইতেছেন কঠোপনিষৎ যথা অগ্নি যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ। বায়ু যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতি-রূপং বভূব একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্নলিপ্যতে চাক্ষসৈ বাহ্য দোষৈ, একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্ত-রাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ। অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া নানারূপ ধারণ করে, সেই প্রকার একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইয়াছেন আবার অবিকৃতরূপে পৃথক্‌ভাবে আছেন বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন নানারূপ ধারণ করেন সেই প্রকার একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে ভিন্ন হইয়াছেন এবং অবিকৃতভাবে পৃথক আছেন সর্ব্বলোকের চক্ষু স্বরূপ যে সূর্য্য চক্ষুর বাহ্যদোষে যেমন নির্লিপ্ত, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্ত-রাত্মা লোক দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না ও সর্ব্বথা পূর্ণই উপাধি বিশিষ্ট আত্মা অন্নগত হওয়া শ্রুতি সাব্যস্ত হইয়াছে। ঐ অন্নের উপাদান প্রকৃতি অন্ন অসৎ বাদির কথিত শ্রুতি ঐ অন্নাদি লক্ষিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রকৃতি উদ্ভবের প্রতি তাহা প্রযোজ্য নহে, উপনিষৎ প্রমাণে জগতের উৎপত্তির প্রতি মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা বাদি অস্বীকার করিতে পারেন না। শ্রুতি বলিতেছেন, প্রথমত শব্দ গুণ যুক্ত আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে, আকাশ কোন পরমাণুর অংশভূত নহে ঐ আকাশাদি ভৌতিক পদার্থ প্রকৃতি হইতে প্রকাশ পাইয়া অন্ন সৃষ্টি হইলে পূর্ব্বখণ্ড "তথৈবানু প্রাবিশৎ" আত্মা স্বীয় দেহ রচনা করার জন্য ঐ অন্নে প্রবিষ্ট হন সুতরাং আত্মার প্রাগুৎপত্তিকালে অসৎ বিদ্যমান থাকিতেছে ঐ শ্রুতিতে কথিত ব্রহ্ম সেই আত্মা ঐ শ্রুতিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে ভৌতিক আকাশ সৃষ্টি হয় ঐ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি অর্থাৎ

সগুণ হইয়া সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর আলোচনা করেন তৎকালের প্রমাণ। ঐতরেয় উপনিষৎ যথা—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ, স ঐক্ষত, লোকান্নসৃজা॥ পূর্ব্বে এক আত্মা ছিলেন তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন তদনুযায়ী বিশ্ব সৃষ্ট হইল। তৈত্তিরীয় উপনিষতের প্রমাণ—অসদ্বা ইদমগ্র অপিচ ততোহত্র সদো জায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" একীকালের ঐ দুই শ্রুতি বলিলে পরস্পর বিরোধ হয়। পূর্ব্ব শ্রুতিতে প্রাগুৎপত্তি-কালে কিছুই ছিলনা ও বাদীর দর্শিত শ্রুতিতে অগ্রে অসৎপদার্থ বিদ্যমান ছিল। ঐ উপনিষতের প্রমাণে আত্মা প্রকৃতি সংগত হইয়া সগুণ হইলে সৃষ্টির আলোচনা হয়, তৎকালে অসৎপদের বিদ্যমানতা কিছু দেখা যায় না। বরং তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এতস্মাদাত্মন আকাশসম্ভূতঃ প্রকৃতি অব্যাকৃতভাবে স্বরূপতার আশ্রয় করিয়া পরমব্রহ্মে লীন থাকাতেই সৃষ্টি আলোচনা হয়। বিশ্বসৃষ্টির প্রাগুৎপত্তিকালে সুতরাং ব্রহ্ম বই আর কিছুই থাকে না, ঐ আলোচনাও ঈশ্বর সগুণ হওয়ায় তাহাকেই পূর্ব্বকথিত ষোড়শ কলা প্রকৃতাশ্রিত পুরুষ বলা যায়। সেই পুরুষ ভুবনে প্রবেশের দ্বার অন্নকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় শরীর অসৎ পদার্থের যোগে রচনা করেন। দেহ সৃষ্টির প্রাগুৎপত্তিকাল ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টির প্রাগুৎপত্তিকালের উক্ত শ্রুতি নহে। বাদী মহাশয় ঐ সমস্ত শ্রুতির আলোচনা না করিয়া বিপরীত তাৎপর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রকৃত ঐ সিদ্ধান্ত শ্রুতি বিরোধী ও যুক্তি বিরুদ্ধ। দুইটী অবস্থা নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি দ্বারায় হওয়াতে শ্রুতি দ্বয় অবিরোধী হইল; সুতরাং বাদীর কথিত দ্বৈত মত মূল্য বিহীন।

অপর আপত্তি ঈশ্বরের স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই, এইরূপ বেদান্ত-বাদীরা বলেন প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার সহিত বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়; সুতরাং দ্বৈত মত নিরাস কিরূপে হয়। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন কঠোপনিষৎ প্রমাণে আত্মা পৃথক্ থাকিতেছেন ও পূর্ব্ব অধ্যায়ে ধর্ম্মপুরাণের প্রমাণে সাব্যস্ত হইতেছে, আত্মা দেহ ধারণ করায় প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করেন॥ পুরুষ প্রকৃতস্থো বৈ ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রাকৃতান্ গুণান্ তাহাতে নিজেকে নিজে সুখী বা দুঃখী মনে করেন প্রকৃত আত্মা সুখ দুঃখাদিতে আবৃত নহেন। যেহেতু মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রাকৃত সুখ দুঃখে অভিভূত হন না, বিশেষতঃ আত্মার স্বরূপ চৈতন্য প্রকৃতি সৃষ্ট অচেতন প্রাকৃত দেহে চৈতন্য প্রবেশ করিবার ঐ অচেতন পদার্থ সচেতন হইয়া প্রকাশ

পায়, যখন চৈতন্য দেহ ত্যাগ করেন তখন দেহ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা মৃত বলিয়া ব্যভিচার হয়; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা দেহের সহিত নির্লিপ্ত পৃথক্ অত্রাবস্থায় আত্মা সত্তাতে দেহের অসত্তা প্রত্যক্ষ হইতেছে মুক্ত পুরুষকে লোকে বিদেহ বলে দেখুন চৈতন্য জড় পদার্থের অবভাসক চৈতন্যের অনবস্থানে জড় পদার্থ নিষ্ক্রিয় হইয়া ক্রমে অদৃশ্য হয়। চৈতন্য বোধময় আত্মা তিনি মাত্র পূর্ব্বেও ছিলেন এখন বিদ্যমান ভবিষ্যতে তিনি থাকিবেন। কঠোপনিষতে প্রমাণ হইয়াছে আরো বিকার রহিতে প্রকৃতি-নিষ্ঠ হইয়া চৈতন্যে বিলয় হয় অত্রাবস্থায় নিত্যত্বে প্রকৃতি স্থান না পাওয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থলে আত্মার সহিত বিজাতীয় ভেদ হয় না যে হেতু প্রকৃতি নির্ব্বিকার অবস্থায় ব্রহ্মেতে লীনা হইলেও ব্রহ্মের সত্তার কোন বিরোধ হইতেছে না; সুতরাং প্রকৃতির সহিত বিজাতীয় ভেদ হইতেছে না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছেন যোগীন্দ্র বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন হে অনঘ! রাম আকাশ মাত্র ভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি জগৎ ব্রহ্মার মানসিক কল্পনা ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে ইন্দ্রজালিক ভ্রমময়। কেবল এক মাত্র আত্মাই সত্য বিজাতীয় হেতুতর্ক শস্ত্রার্থের বিপরীত।

অপর আপত্তি এই যে প্রকৃতি কল্পনা নিরর্থক কেননা পরমাণুর সমষ্টি এই জড় জগৎ তাহার সত্তাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্ব সম্পাদিত হয় নচেৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্ব বা আশ্রয়ত্ব বা প্রত্যক্ষতার জন্য আর কিছু থাকে না। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন শ্রুতি ও মনুসংহিতা প্রমাণানুযায়ী প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপত্তি হইতেছে সর্ব্বাদি আকাশ শব্দ গুণাশ্রয়ী সৃষ্টি হয়, এ আকাশের উপাদান পরমাণু নহে, তাহার উপাদান কি স্থির হইবে? এ কারণেও মায়াকে স্বীকার ব্যতীত অন্য উপায় নাই, পরমাণুর অসহায়ে স্বপ্ন কল্পিতরূপ স্বপ্নকালে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা ভ্রমায়ত্ব স্বীকার করিলে স্বপ্ন কল্পিত জগৎ ভ্রমায়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে এই ভ্রমের উপাদান মায়া ভিন্ন আর কি সাব্যস্ত করা যাইতে পারে? পরমাণু চক্ষুর অগোচর হইলেও দুইটী পরমাণু সৃষ্টি হইলে তাহাকে দ্বিশ রেণু বলে তিনটীতে ত্রিশরেণু নৈয়ায়িকগণ পরমাণুর প্রাদেশিক সংযোগ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এ পরমাণুর সমষ্টি এই জড়জগৎ সাব্যস্ত করিতেছেন প্রাদেশিক সংযোগ হেতু তাহার রূপ থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সে অবয়বের উপাদান মায়া

ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নৈয়ায়িকগণ পরমাণুকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন। অসৎপদে অর্থাৎ অনিত্য স্থলে ন্যায় মতে অসৎ বা অনিত্য স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং তাৎপর্য্যগত পরমাণু সাব্যস্ত করা এ দর্শন-বিরুদ্ধ ও শ্রুতি ও অভিধান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ স্কন্দপুরাণে বিশেষ অবধি মহৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতি সৃষ্ট, বাদী মহাশয় শ্রুতি কি মন্বাদি-প্রণীত সংহিতা দ্বারায় পরমাণুর কোন প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অত্রাবস্থায় তাৎপর্য্যগত সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমময় ও ধর্ম্ম-বিরোধী ব্রহ্ম সূত্রে এক পাদে ২য় অধ্যায়ে "এতেন শিষ্টাচার পরিগ্রহা, অপি ব্যাখ্যাতা॥ ভাষ্য শিষ্টৈর্ম্মনু যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতয়ঃ পরমাণু কারণবাদ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেপি বাদা ব্যাখ্যাতা নিরাকৃত ইতি বেদিতব্যাঃ মনুযাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি শিষ্টগণের অভিপ্রেত পরমাণু ও কারণ প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়াছে যে সমস্ত দ্বৈতবাদী দিগকে শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করতঃ বাদী মহাশয় স্ব মত দূর করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, দ্বৈতবাদ শ্রুতি সম্মত না থাকা শ্রুতি বিরোধী উক্তি শিষ্টতা স্থলে গৃহীত নহে। কঠোপনিষৎ ২য় বল্লি অবিদ্যায়া মন্তরে বিদ্যমানা; স্বয়ন্ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দ্রষ্টব্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধে নৈবনীয় মানা যথান্ধাঃ॥ অবিদ্যার অন্তরে থাকিয়া যাঁহারা জ্ঞানী মনে করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি দ্রষ্টব্যমান হইয়া ভ্রমণ করে যেমন অন্ধেরা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান হয়॥ ধর্ম্ম বিরোধি ও শ্রুতি-বিরোধী যে সমস্ত বিধি তাহা আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত নহে, অন্ধেরা যেমন অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান হইলে তাহা সৎপন্থা নির্দ্দিষ্ট হয়না, তাহাদের কৃত দর্শন তাহা কৃতিত্বের গৌরব ভিন্ন ধর্ম্মপথের পক্ষে তাহা নহে; সুতরাং ধর্ম্মকামী ব্যক্তিরা মন্বাদিকেই শিষ্টস্থলে গ্রহণ করিবেন; সুতরাং পরমাণু ও কারণবাদ শিষ্টগণের অভিপ্রেত নহে অতএব পরমাণুবাদ সকল প্রকারেই আর্য্যধর্ম্মের অনুপযোগী তাহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

পরমাণু রহিত হইলে ঈশ্বরে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বের আপত্তি চলে না। সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বের অর্থ সৃষ্ট বস্তু নিয়া তাহা দ্বারায় অভিলষিত ব্যবহার করার শক্তি সম্পন্ন যে সে কর্ত্তা, শক্তি পরিচালিত হইতে থাকিলেই তাহাতেই কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তে, ঈশ্বরের স্বরূপ "মাণ্ডুক্যে" আত্মার অবস্থা চারভাগে বিভক্ত, চতুর্থ ভাগ স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিলেও এ অধ্যায়ে পরিষ্কার ধারণার জন্য পুনরুল্লেখ করিতেছি "নান্তঃ প্রজ্ঞং, ন বহিঃ-প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনঃ

প্রজ্ঞং, না প্রজ্ঞং মব্যবহার্য্য, মগ্রাহ্য, মলক্ষণ, মচিন্ত্য, মব্যপদেশ্য, মেকাত্ম, প্রত্যয় সারং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তংশিব, মদ্বৈতং, চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ।" যে অবস্থায় আন্তরিক জ্ঞান নাই ও বাহ্য জ্ঞান নাই উভয় সঙ্গিজ্ঞান নাই, যে অবস্থা প্রজ্ঞানঘন নহে, প্রজ্ঞ নহে, অপ্রজ্ঞ নহে, যে অবস্থা অদৃষ্ট অব্যবহার্য্য অগ্রাহ্য ও অলক্ষণ, অচিন্ত. অব্যপদেশ্য একাত্ম প্রত্যয়গম্য প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গল স্বরূপ অদ্বিতীয় তাহাই চতুষ্পাদ অর্থাৎ অবিকার্য্যস্বরূপ অবস্থা জানিবে তাহাকেই আত্মা কঠোপনিষৎ ৩য় বল্লি যথা অশব্দ মস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং, তথা রস নিত্য মগন্ধ বচ্চ যৎ. অনাদ্যনন্তমহতঃ পরং ধ্রুবং নিচার্য্য তং মর্ত্তুমর্থাৎ প্রমুচ্যতে। অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় রস বিহীন গন্ধাদি বিহীন নিত্য অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে মহান ধ্রুব অর্থাৎ কুটস্থ অর্থাৎ ভূতাদির অনপেক্ষিক যে ব্রহ্ম তাহাকে নিচার্য্য অর্থাৎ—অবগত লইয়া মনুষ্য মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়॥ প্রপঞ্চো-পশম নির্ব্বিকার ভাব তাহা না শব্দে না স্পর্শে অনুভব হয় রূপ বিহীন গন্ধাদি পঞ্চ অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিহীন ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া ঈশ্বর হইতে অনিত্য বস্তুর সত্বা বিহীন সাব্যস্ত হইতেছে, কেননা ঈশ্বরের কার্য্য ভাব এই নশ্বর জগৎ। যখন কোন বস্তুরই সত্তা নাই তখন ঈশ্বর নিত্য বস্তু মাত্র অবশেষ থাকায় কর্ত্তৃত্বের অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং কোন বস্তুরই সত্তা নাই তখন কোন বস্তুর আধাররূপে গৃহীত হইবে, স্মৃতিতে প্রপঞ্চোশম হইলে প্রত্যক্ষ অসম্ভব কেবল প্রত্যয় গম্য ভিন্ন আর জানিবার উপায় নাই; সুতরাং কথিত লক্ষণ ঈশ্বরে স্মৃতি সম্মত ধার্য্য হয় না সগুণ ব্রহ্মেরও সৃষ্ট কর্ত্তৃত্ব নাই, যেহেতু সৃষ্ট বস্তুর উপাদান মায়া অর্থাৎ নাই যে বস্তু তাহাকে বস্তুত্বে পরিণত করিয়া আত্মাকে সঙ্গ করেন যে তাহার নাম মায়া বা প্রকৃতি, চৈতন্যের উপাদান আত্মা কর্তৃত্ব বলিলে নিমিত্ত কারণ ব্যতীত উপাদান কারণ হয় না, এজন্য লক্ষণ স্মৃতি বিরোধী বলিয়া স্থির আছে স্মৃতিমতে লক্ষণ সাব্যস্ত হয় না জন্য তাহা প্রমাণে গৃহীত নহে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিতে তাহা দেখিয়াছেন "তদৈবানু-প্রবিশৎ" ইত্যাদি।

ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভিদ্ধাতপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত॥ বাদি দেখাইতেছেন ঋতপদের পর চ ও সত্যপদের পর চকার দুইটী চকারের দ্বারায় ব্যবচ্ছেদক হওয়ায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মতর অন্য বস্তুবাচক হইতে হয়, নচেৎ একার্থ বাচক হইলে

দ্বিরুক্তি দোষে তাৎপর্য্য বিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বৈতবাদ খণ্ডন কি করিয়া হইবে? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ঋত শব্দের অর্থ শ্রুতি যথা ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম এবঞ্চ সত্যং জ্ঞান মানন্দং ব্রহ্মেতি॥ ঋতমেকাক্ষরং প্রণবার্থ প্রতিপাদ্য সগুণং ব্রহ্মেতি সত্যঞ্চ নির্ব্বিকারং প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মেতি ঋত শব্দে একাক্ষর প্রতিপাদ্য অর্থাৎ ওঁকার প্রতিপাদ্য সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রিত প্রকৃতি বোধক, নির্ব্বিকার সত্ত্বাবোধক ব্রহ্মকেই শ্রুতির লক্ষ্য যে নির্ব্বিকার মহাপ্রলয় অবস্থায় ছিলেন, সেই ব্রহ্মই সত্ত্বগুণত্বে সৃষ্টি বিষয়ক আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা পরতন্ত্র হওয়ায় সেই প্রলয়-সম যে অন্ধকার উৎপন্ন হয়, রাত্রিপদে অন্ধকার উপলব্ধ হইল, নিগু‍র্ণকে সগুণে পরিণত করাতে দুই ভাব উপস্থিত হয় অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ, ঐ লক্ষণকে একত্রে সমাবেশ করার জন্য শ্রুতিতে দুইটী চকার উল্লেখ করিয়াছে। টীকাকার বলিতেছেন, "মহাপ্রলয় সময়েও কেবলং ব্রহ্মৈবাসীৎ" সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে তপসোঽদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোজায়ত ইত্যাদি। "মনু অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ-মপাসৃজৎ" সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্মই ছিলেন, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সগুণ অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ উপনীত হইলে পর মহাপ্রলয় প্রভাতে সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সৃষ্টির আদি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ স্থাপন করেন। শ্রুতি তপঃ শব্দে তাহাই সূচনা করিয়াছেন; সুতরাং ঋতপদ দ্বিরুক্তিদোষে দূষিত হয় নাই, তন্মূলে দ্বৈতাভাস হইতেছে না, অন্যান্য আপও ফলোপধায়ক নহে।

বাদী মহাশয় প্রকৃতিকে ব্রহ্মের পত্নী সাব্যস্ত করিয়া একটী অশ্লীল কবিতা লিখিয়া অবিদ্যাকে নিন্দাচ্ছলে আর্য্যগুরু শঙ্করকে নিন্দা করিয়াছেন। বাদী এরূপ মহা মোহাচ্ছন্ন হইবেন, ইহা চিন্তারও অবিষয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্মে জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল, তখন অনেক কৃতী নৈয়ায়িক ছিলেন; কিন্তু কেহই ঐ বৌদ্ধমত খণ্ডনে সমর্থ হইয়াছিল না। শঙ্কররূপ শঙ্করের অভ্যুত্থানে ও বেদান্ত বিচারে সমস্ত দার্শনিক দিগকে পরাজিত করিয়া বেদান্ত মত পরিশুদ্ধ স্থির করিয়া লইয়া বৌদ্ধমত উৎ-সাদিতে ঐ বেদান্ত মতানুযায়ী উপাসনা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। আর্য্য সন্তান মাত্রেই তদনুযায়ী তদবধি চলিয়া আসিতেছেন। আত্মাকেই চিন্তা করা স্থির হওয়াতে সোঽহং পদ ধ্যানের পর নিবিষ্ট হইয়াছে শঙ্কর এইভাবে আর্য্য গুরু হইয়াছেন, এ গুরুনিন্দা বড়ই দুরদৃষ্টজনক।

জীব সমস্ত কর্ম্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীপুং নপুংসক আদি দেহের ব্যতীত আত্মার নহে। অত্রাবস্থায় মায়া বা অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীলিঙ্গ ধারণায় যে অশ্লীল উক্তি, তাহা আরো দুরদৃষ্ট জনক, প্রকৃতি নির্ব্বাচিত শ্রুতিতে তাহা ব্রহ্মবাচক, তাহা ব্রহ্মের অবস্থান্তর তটস্থ লক্ষণযুক্ত। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ সং-প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম। ওঁ প্রতিপাদ্যও ঐ প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম গুণ যুক্ত সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি তিনি মহান্ শব্দের বাচ্য। সেই শরীর মায়া-ময় আর সত্ত্বগুণের ক্রমশ লঘুতা হেতু যে শরীর, তাহা অবিদ্যা নামে কথিত হন,: ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের হীনতায় দেব মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি জন্মিতেছে। শরীর-স্রষ্টাকে স্ত্রীবোধ করা নিতান্ত ভ্রমময়। মায়া অবিদ্যা সমুদয় এক প্রকৃতি অবস্থার পার্থক্যে নাম পৃথক হইয়াছে। দ্বৈতবাদে যে স্থানে যে শ্রুতির গ্রহণ সঙ্গত, তাহা না হওয়ায় দ্বৈতবাদের শ্রুতির অনবস্থা প্রসঙ্গ ও অভিধান ও শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বিরোধী তত্তাবৎ পাঠকগণ দেখিতে পাইলেন।

ষড়দর্শনের মত পরস্পর বিরোধী ঐ ষড়দর্শনের তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আংশিকভাগ লইয়া আর্য্যধর্ম্ম সৃষ্টি হওয়াতে প্রচলিত আর্য্যধর্ম্ম ভিন্ন প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে, এজন্য ধর্ম্ম সংযম ছলে মনু বলিয়াছেন 'যেনাস্য পিতরো জাতা যেন জাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন বিষ্যতে। পিতৃ পিতামহাচরিত ধর্ম্ম যাযনা করাই সঙ্গত। ঈশ্বর নিরূপণ সম্বন্ধে ষড়্-দর্শনের মত শ্রোতৃবর্গের জানিতে ইচ্ছা হইলে তাহা পরে ব্যক্ত করার ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্মপিপাসুদিগের তৃপ্তি সাধনের জন্য উপনিষৎ ও স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রমাণ সামঞ্জস্য করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। দ্বৈতমত শ্রুত্যাদির বিপরীত; কিন্তু অদ্বৈত মত ও মায়াবাদ শ্রুতি-সম্মত, তাহা খণ্ডনে দ্বৈতমত প্রবল করিতে যে কেহ উৎসাহিত হন, তিনি সর্ব্বথা মনুর অনুশাসন ক্রমে নাস্তিক বলিয়া নিন্দিত যে হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। যথা—মনু শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনু তিষ্ঠন্ হি মানব। ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং। শ্রুতিস্তু বেদবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ। তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংসে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥ যোব-মন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদ-

নিন্দকঃ। শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে সৎকীর্ত্তি ও পর লোকে অনুপম সুখলাভ হয়। বেদকে শ্রুতি ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে। সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিচার বুদ্ধির অতীত। শ্রুতি স্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। যে দ্বিজ হেতু শাস্ত্রতর্ক বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমূল এই দুই শাস্ত্রকে মান্য না করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিকের সহিত যজন যাজন দান প্রতিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শিষ্টসমাজ কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। এরূপ অবস্থায় সাধুমাত্র সকলকেই সতর্ক হওয়া উচিত।

শ্রীবিনোদলাল পাকড়াশী বেদান্তরত্ন।

৭৯ নং গণেশমহল্লা উমাসুন্দরীর বাড়ী,—৺কাশীধাম।

কালের স্রোত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি কেহ বল যে, তুমি আহার নিদ্রা বা কামরিপু চরিতার্থ জন্য যে সুখ জন্মে, সেই তামসিক সুখে মোহিত নহ, তাহার জন্য লালায়িত নহ, তুমি ধন মান ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের জন্যই ব্যগ্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও যে ছুটাছুটি করিতেছ এবং যাহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতেছ, তাহা যে প্রকৃত সুখ নহে। যাহাকে ধরিলে সুখ হইবে মনে করিয়া ধাবিত হইতেছ, তাহা হয়ত তখনই বিষবৎ প্রতীত হইতেছে, অথবা প্রথমতঃ অমৃতময় বোধ হইয়া কিয়ৎকাল পরেই তাহা হলাহলরূপেই পরিণত হইতেছে। তোমার আপাতমধুর সেই রাজসিক সুখটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা পাইতেও যে কত দুঃখ অনুভব করিতেছ তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি বল যে তুমি আহার নিদ্রাদির সুখের জন্য ব্যগ্র নহ, ধনমান ঐশ্বর্য্যাদির জন্যও লালায়িত নহ, কেবল বিদ্যোপার্জ্জন, বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ অথবা পরোপকারাদি দ্বারা মনের প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্যই তোমার আগ্রহ, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আহারাদি করিবার যে আবশ্যক তাহাই করিয়া এবং ধনাদির যাহা প্রয়োজন তাহাই প্রাপ্ত হইয়া তুমি সন্তোষ লাভ কর। যদিও সেই মানসিক

প্রসন্নতারূপ সাত্ত্বিক সুখ অন্যান্য সুখ অপেক্ষা স্থায়ী বটে, কিন্তু ইহাও যে, চির-স্থায়ী নহে। যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয় তাহাই আকাঙ্ক্ষণীয়। একবারে চির-কালের জন্য যাহাতে দুঃখ কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট সুখ পাইতে পার, যাহাতে চিরশান্তি লাভ করিতে পার, যাহাতে আর বারংবার অদৃশ্য পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে ছুটাছুটি করিতে না হয়, সেই অবস্থাইত আকাঙ্ক্ষণীয়। * যাহাতে এই কালের স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আকাঙ্ক্ষ-ণীয় সেই সুখময় স্থানে উপস্থিত হইতে পার—সেই ঈপ্সিততম বস্তু লাভ করতঃ তুমি শান্তিময় হইতে পার। যাহাতে তুমি চরমসুখের অবস্থা পাইতে পার, তাহারই উপায় করিতে হইবে। তথায় যাইবার সেই অবস্থা পাইবার কোন পথ আছে কিনা, থাকিলে তোমার পক্ষে কোন্‌টি সহজ পথ তাহাই তোমাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাই তোমাকে জানিতে হইবে। যদি তোমার সৌভাগ্যক্রমে কেহ কৃপা করিয়া সেই পথ তোমাকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইবে।

শান্তিময় আশ্রয়ে উপনীত হইবার পথ কে বলিয়া ও দেখাইয়া দেয়।

জীবকে পথ বলিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিত্য, সত্য, অক্ষয়, অভ্রান্ত ও অনাদি বেদরূপ বাণী ক্রমাগত নিঃসৃত হইতেছে। সেই সুস্পষ্ট ও গভীর স্বর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া থাকিলেও আমরা সকলে তাহা শুনিতে পাই না। ঈশ্বর ও তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, অজ্ঞানরূপ মলরাশি আমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া থাকায়, তাঁহা হইতে যেন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছি; তাঁহাকে দেখিবার—তাঁহার বাক্য শুনিবার, আমাদের ক্ষমতা নাই। যতই অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে ততই দূরত্বও ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইবে। যে সৌভাগ্যশালী জীবের মায়ারূপ অজ্ঞানের আচ্ছাদন অপসারিত হওয়ায় দূরত্ব,

---

* যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যাহা ভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন তাহাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই। ভূমাই কেবল একমাত্র সুখ, এই ভূমাই জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য।

তিরোহিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শব্দ শুনিতে পাইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহা দ্বারা একবারে বিমোহিত হইয়া নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাতে লোপ করিয়াছে। তখন তাহার পক্ষে ঈশ্বর ও তাঁহার বাণী এবং তাহার নিজ অস্তিত্ব এক হইয়া গিয়াছে।

অতি পুরাতন আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ হইয়াছিলেন। যখন ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের অস্তিত্ব প্রায় একযোগ হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই ঈশ্বর বাণীর প্রতিশব্দ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই প্রতিশব্দের প্রতিশব্দ ক্রমান্বয়ে পর পরবর্ত্তী আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ে আঘাত করায়, তাঁহারাও ঐ প্রতিশব্দ শুনিয়া প্রকৃত শব্দ শুনিবার জন্য বেগে স্রোতের বিপরীত দিকে ছুটিয়া গিয়া সেই লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এখনও কত জীব প্রকৃত শব্দ শুনিতে পাইতেছে এবং আকাঙ্ক্ষণীয় স্থানে উপনীত হইতেছে। প্রতিস্রোতে যাইবার সময়ে কেহ কেহ গৃহীত প্রতিশব্দ পুনরায় প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ বা সেই প্রতিশব্দের সহিত নিজ শব্দ মিশাইয়া উহা বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আবার কেহ কেহ সেই প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আর প্রতিধ্বনিত হইতে না দিয়া, নিজের গুপ্ত আধারে রক্ষা করতঃ ইহা হইতে নির্গত হইতে না দিয়া তাহাতেই একবারে বিভোর হইয়া, প্রকৃত বাণী শুনিবার জন্য উজান বহিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া কি জানি কি শুনিয়াছেন, তাহাতেই যে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার অস্তিত্বও যে তাহাতে মিশাইয়া দিয়াছেন।

একেত নানাপ্রকার আধারে প্রতিশব্দ গৃহীত হওয়ায় উহার তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহার উপরে আবার কেহ কেহ নিজ শব্দ উহার সহিত মিশ্রিত করায় উহা অসংখ্য হইয়াছে; এই জন্যই অনন্ত শাস্ত্ররূপে অসংখ্য শব্দ আর্য্য সাধুগণের হৃদয়কন্দর হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। কোন কোন্ জীব তাহার উপযোগী শাস্ত্র শুনিতে শুনিতে বুঝিতে বুঝিতে নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে,—কাহাকেও কিছু বলা নাই, কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, আপন মনেই চলিয়াছে; অনেকে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারই গন্তব্য পথে গমন করিতেছে। কেহ কেহ

বা শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া, কিংবা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিকৃতভাবে তাহার মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃত কোন পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া, ভয়ানক কোলাহল পূর্ব্বক পরস্পর কলহ করিতেছে এবং তাহা হইতে কত বিকৃত শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাহাদের বিকট কোলাহলে বধির কর্ণ যেন আরও বধির করিয়া দিতেছে। তাহারা কলহ করিতে করিতে নিজের সামর্থ্য ক্ষয় করিয়া, কোন প্রকার অবলম্বন না থাকায় দৃঢ়রূপে কিছু ধরিতে না পারিয়া, একবারে অবশ হইয়া সকলে প্রবলবেগে দূরে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। আরও কত জীব কতপ্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃত শাস্ত্র, অথবা নিজ বিকৃত শব্দকে শাস্ত্রনামে অভিহিত করিয়া, তাহাই অপরকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। কেহ কেহ বা নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানাপ্রকার শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া সমস্তই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মনে করিয়া অমানুষ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতেছে। আবার কেহ কেহ শাস্ত্রের মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া, ইহার সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া, কি প্রকার সামর্থ্যযুক্ত হইলে কোন্ পথে যাইলে সুবিধা হয়, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, নিজ উপযোগী শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ আয়ত্তাধীন পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া অতি বেগে প্রতিস্রোতে চলিয়া যাইতে যাইতে, অন্যান্য জীবগণকেও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র শুনাইতেছেন ও বুঝাইয়া দিতেছেন ও তাহাদের প্রত্যেকের উপযোগী পথ বলিয়া দিতেছেন, এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকেও বা নিজে হাত ধরিয়া, তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া, চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তাহারা তাঁহারই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারই ক্ষমতার উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার পদবিক্ষেপাদি অনুকরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুসরণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে এবং নির্ব্বিঘ্নে সেই অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতেছে।

শাস্ত্ররূপ সত্যবাদী সদাই বিদ্যমান রহিয়াছে; মনুষ্যরূপী গুরুর উপদেশে সেই শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জীব অবলীলাক্রমে শান্তিময়ের শান্তিনিকেতনে উপনীত হইতে পারে। আবার ভক্তের ভগবদ্রূপী ঈশ্বর অথবা তাঁহার সন্নিকটস্থ কোন কোন দেবতা কখন কখন জীববিশেষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে তাহার প্রতি করুণা করিয়া গুরুরূপে তাহার দিকে তাঁহার কৃপারজ্জু

নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই জীব তখন সুমধুর দেববাণী শুনিতে পায়, তাহাই শুনিতে শুনিতে সেই রজ্জু অবলম্বন পূর্ব্বক সে এই দুস্তর স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়। কখন কখন আবার ভক্তের সেই লীলাময় ভগবান্ জীবকে পরিত্রাণ করিবার জন্য স্বয়ংই লীলা করিতে করিতে এই লীলাক্ষেত্রে—তাঁহারই স্রোতে—তাঁহারই মায়ার অধিকারে—আসিয়া প্রকাশমান হইয়া ভাসিতে থাকেন, * কিন্তু মায়াতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, কালস্রোতে তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। তিনি লীলা করিতে করিতে কতকগুলি জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া এবং পরবর্ত্তিগণের জন্য পথ নির্দ্দেশন করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হন। এই প্রকারে তিনি কতবার প্রকাশমান হইয়াছেন, কতবার নিজে জীবের ন্যায় আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং কতবার কত পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

শান্তিময় আশ্রমে যাইবার তিনটি প্রধান মার্গ।

প্রকৃত বাণী এক হইলেও তাহা যে আধারে প্রতিঘাত হওয়ায় প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়াছে, সেই আধারের তারতম্যানুসারে প্রতিশব্দেরও তারতম্য ঘটিয়াছে, এবং তাহার সহিত আবার নূতন নূতন ধ্বনি মিশ্রিত হওয়াতে অসংখ্য অসংখ্য শব্দ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুগণ! তোমরা যে স্থানে আছ, সেই স্থান হইতে যাঁহারা তোমাদের অগ্রে স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা নানাপ্রকার শাস্ত্ররূপ শব্দ বিকীর্ণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনটিই মূল পন্থা। ঐ পথত্রয় হইতে অসংখ্য অসংখ্য বর্ত্ম নির্গত হইয়াছে; তাহারই কোনটি বা কর্ম্মমার্গে যাইতে যাইতে ভক্তিমার্গে উপনীত হইয়া তখনই জ্ঞানমার্গে চলিয়া গিয়া পুনরায় ভক্তিমার্গে ফিরিয়া আসিয়াছে; কখন বা এমন বোধ হইতে থাকে যে, তিনটি মূলমার্গ বুঝি একটিতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই

* পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা ৪।৮।

সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

প্রকার কত অসংখ্য পন্থার নিদর্শন রহিয়াছে। ঈপ্সিততম বস্তুর অন্বেষণকারী জীব স্বীয় গুরুর উপদেশানুযায়ী নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়। একটি জীবের ন্যায় অনেকগুলি জীবের প্রকৃতি প্রায় একরূপ হইয়া থাকে, এই জন্য তাহারা প্রায় একই রকম পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যায়। অসংখ্য পথ হইলেও যেটির জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম এই তিনটি মূল মার্গের কোনটির সহিত অধিক সাদৃশ্য থাকে, সেইটি তত্তৎ মূলমার্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে কিংবা তাহারই শাখা বলিয়া কথিত হয়।

কর্ম্মমার্গ।

মনুষ্য কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যতদিন তাহার সংস্কাররাশি একবারে বিদূরিত না হয়, যতদিন তাহার সমস্ত কর্ম্মফল খণ্ডিত না হয়, ততদিন তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, ততদিন তাহাকে স্রোতে ভাসিতেই হইবে। পূর্ব্বসংস্কারবশেই সে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে,—ইহাই কর্ম্ম। কর্ম্মও করিবে অথচ তাহার ফলভোগ করিতে হইবে না, এই প্রকার হইলেই জীব ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। যদি নিরাসক্তভাবে কেবল পূর্ব্বসংস্কার-বশে সে কর্ম্ম করে, এবং তাহাতে সুখ বা দুঃখরূপ যে ফল হউক, তদ্দ্বারা যদি তাহার মন বিক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে আর সুখ দুঃখের প্রতিকৃতি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না, তাহা হইলে আর তাহার নূতন সংস্কার অঙ্কিত হয় না *। যদি ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে জীবের এই প্রকার উপলব্ধি হয় যে, যে কর্ম্ম সাধিত হইতেছে, তাহা ইন্দ্রিয়গণ করিতেছে, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণের সহিত তত্তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধমাত্র, তাহার সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, কিংবা সে যাহা করিতেছে তাহা ভগবান্ করাইতেছেন, তাঁহারই জন্য সে ঐ কার্য্য করিতেছে, তাহার যাহা ফল হইতেছে—তাহার সহিত তাহার

---

* তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

গীতা ৩।১৯।

অতএব তুমি ফলাসক্তি-শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোহ প্রাপ্ত হয়।

নিজের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা ঈশ্বরের, তাহা হইলে তাহাকে আর ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না, আর তাহার নূতন সংস্কারও সঞ্চিত হইতে পারে না। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহাই করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে জীব জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে উপনীত হয়, এবং তথায় উপনীত হইয়াও সে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকে। যতদিন তাহার পূর্ব্বসংস্কাররাশি একবারে বিলুপ্ত না হইয়া সে চিরশান্তি লাভ করিতে পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়—তাহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে হয়—তাহাকে স্রোতে ভাসিতে হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে মনে করিলেই কেহ করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে সে ঐ প্রকার করিতে পারে, অথবা এই জন্মে প্রথম ঐ প্রকার কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে গুরুর উপদেশানুযায়ী বৈধ কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। যাহার যে প্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাহাকে তেমনই ভাবে উপদেশ দিয়া, কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে, সদ্‌গুরু শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রধান অথবা ভক্তিপ্রধান পথে লইয়া যাইতে হইলে, তাহাকে তত্তদনুযায়ী নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে গুরু শিক্ষা প্রদান করেন; ক্রমে তাহাই সাধনা করিতে করিতে মনুষ্য ইচ্ছাদ্বেষবিরহিত হইয়া শুদ্ধচিত্ত হয়, কামক্রোধলোভাদি রূপ আবর্জ্জনা দূরীভূত হওয়ায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। তখনই সে প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারী হয়।

সহস্র সহস্র কামনারাশি তীক্ষ্ণাগ্র বক্রসূচির ন্যায় আমার মনকে গভীর-ভাবে বিদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। কি জানি বিষয়ে কি আকর্ষণী শক্তি আছে! ইচ্ছা না থাকিলেও আমার মন কেন সেই দিকে ধাবিত হয়? ভাসমান জীব ও পদার্থরূপ বিষয়ে তত্তদনুকূল কামনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে আমার মনও যাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাতে মন কতই কষ্ট পাইতেছে, কত অসহ্য বেদনায় সে অস্থির হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু কামনার কি মোহিনী শক্তি! এত যন্ত্রণাসত্ত্বেও মন পুরাতন কামনাগুলিকেও ছাড়িতে চাহে না, আবার তাহার উপর কত নূতন নূতন কামনাকে সযতনে আহ্বান করিয়া আনিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করাইতেছে। আমার সম্মুখে গুরুর কৃপারূপ রজ্জু নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, জানিতেছি যে তাহা দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিলে আমি অনায়াসে শান্তিময় স্থানে উপনীত হইতে পারিব। সেই রজ্জু ধরিব ধরিব

চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ধরিতে পারিতেছি না, যদি ভাবিতেছি যে ধরিয়াছি, কিন্তু দৃঢ়রূপে ধরিতে না পারায়, তখনই সেই সর্ব্বনাশিনী কুহকিনী কল্পনা আসিয়া কাণে কাণে কি বলিতেছে, গুরু উচ্চৈঃস্বরে নিষেধ করিতেছেন সাবধান হইতে বলিতেছেন, কিন্তু তাহা শোনে কে? কল্পনার মধুমাখা স্বর গুরুর স্বরকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, সেই সর্ব্ব বিঘ্নোৎপাদিনী কামনার প্রিয় বিষয় ধরিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া আমার মনের হস্ত প্রসারণ করিতেছি, অমনি রজ্জু স্খলিত হইয়া যাইতেছে, আমি অসহায় হইয়া পড়িতেছি; কামনা তখন সুবিধা পাইয়া আমাকে জোরে টানিয়া সেই বিষয়ের দিকে কতদূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। উঃ! তথায় কত অসহ্য যন্ত্রণাই আমাকে দিতেছে! যদি কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখিয়া থাক, যদি কেহ বিষয়বাসনা নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইয়া থাক, যদি কেহ নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাক, কর্ম্ম সিদ্ধ হউক বা অসিদ্ধ হউক, যদি তাহাতে তোমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়; প্রকৃত জ্ঞানী জনক রাজা যিনি লোকশিক্ষার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তিনি যেমন বলিয়াছিলেন যে, "সমস্ত মিথিলারাজ্য দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই বিনষ্ট হইবে না।", সেই প্রকার কেহ যদি অন্তরের সহিত বলিতে পার যে, সর্ব্বস্ব গেলেও তোমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না, তাহা হইলে তুমিই ধন্য হইয়াছ তুমিই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখিয়াছ। কি চুম্বক প্রস্তর তুমি লাভ করিয়াছ, সেই খানি একবার আমায় দাও, আমি এক একটি করিয়া আমার হৃদয়বিদ্ধ সূচিরূপ বিষয় কামনাগুলি সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর অন্য আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত না হইয়া আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত রজ্জুটি আমি দৃঢ়রূপে ধরিতে সক্ষম হই।

জ্ঞানমার্গ।

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে এক জন্মেই হউক বা জন্ম জন্মান্তরেই হউক জ্ঞানোৎপাদন হইয়া থাকে। জ্ঞানী সমস্ত কামনা উপেক্ষা করিয়া, সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য হইয়া, শত্রুমিত্রজ্ঞান লোপ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে কাল স্রোতের বিপরীত দিকে চলিয়াছেন। তিনি অনুরাগ ভয় ক্রোধাদি শূন্য হইয়া,

প্রতিস্রোতে হইলেও অবলীলা ক্রমে ভাসিয়া যাইতেছেন। দুঃখেতে তাঁহার মন বিক্ষোভিত হইতেছে না, বিষয় সুখের জন্য তিনি লালায়িত হইতেছেন না *, কেবলমাত্র চিরশান্তি পাইবার আশায় শান্তি উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছেন, যাহা কিছু দেখিতেছেন, সকলই ব্রহ্মার স্ফুরণমাত্র ইহাই অনুভব করিতেছেন। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না; সকলেতেই সমান দৃষ্টি করিতে করিতে সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিতে দেখিতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতেছে, অবশেষে নিজেও ব্রহ্ম ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন, এবং স্বকীয় পার্থক্য জ্ঞান—অহং মমেতি জ্ঞান—"আমি" 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞানরূপ নিজ অস্তিত্ব জ্ঞান—লোপ করিতেছেন; তখনই তাঁহার ক্ষুদ্রসত্তা সেই মহাসত্তা পরমাত্মা পরব্রহ্মে, অনন্ত সাগরে বুদ্বুদের ন্যায়, মিশাইয়া যাইতেছে। † জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শুকদেব অমৃতময় ফল আস্বাদন করিতে করিতে যে পথে গিয়াছেন; ব্যাস, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি জ্ঞানযোগিগণ যে মার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, কেহ কি সেই পথ অবলম্বনের অধিকারী হইয়াছ? তাহা হইলে তুমি যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছ, তুমি যে শান্তিময়ের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়া শান্তি যে কি, তাহা বুঝিয়াছ, প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাইতেছ। যে শান্তি উপভোগ করিতে করিতে তুমি চলিয়াছ, তাহা যদি বিতরণযোগ্য হয়, কিয়দংশ আমার উপর নিক্ষেপ কর, আমার বিক্ষেপণী শক্তি দূর হউক, আমি অনায়াসে আমার অভীপ্সিত, গুরুর সেই কৃপারজ্জু দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে সক্ষম হই।

* যাঁহার চিত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি সুখে স্পৃহাশূন্য, এবং যাঁহার অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতধী।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

গীতা ২।৫৬।

†

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

গীতা ১৩।৩০।

যখন ভূতগণের পৃথগ্‌ভাবকে একস্থ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিত এবং একমাত্র হইতেই ভূতগণের বিস্তার অবলোকন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মই হয়েন।

ভক্তিমার্গ।

বৈধ কর্ম্ম করিতে করিতে বৈরাগ্য জন্মে, বিষয়ের প্রতি ক্রমে বীতস্পৃহা হয়, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তাঁহার প্রতি যে আসক্তি জন্মে, তাহাই ভক্তি। ঈশ্বরে বিশ্বাস না জন্মিলে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইতে পারে না। বিশ্বাসই ভক্তির মূল। মুখে কেবল বিশ্বাস করি বলিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। বিশ্বাস জন্মিয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা নির্ভরতা দ্বারা করিতে পারা যায়। যাহার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহার উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। যতই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে, ততই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি হয় এবং আত্মনির্ভরতা হ্রাস হইয়া যায়। সেই অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক ঈশ্বরের ভজনা করে—তাঁহাকে ভক্তি করে—তাঁহার শরণাগত হয়। বিশ্বাস হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি ইত্যাদি মানসিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে জন্মিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি জন্মিলে তাঁহার প্রতি গাঢ় অনুরাগের উদয় হইলে—বহির্বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ক্রমে হ্রাস হইয়া সাধক আপনাকেও ভুলিতে থাকে। প্রথমতঃ স্বধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিতে করিতে এই পথে প্রবেশ করিয়া সাধক ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিক্ষা করে তৎপরে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিলে আত্মহারা হইয়া যায়, অবশেষে চরমসীমায় উপনীত হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইয়া যায়।

ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি যে পথের পথিক হইয়া নির্ভরতা কি, ভক্তি কি, ভক্ত কাহাকে বলে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন; যে রমণীয় প যাইতে যাইতে দেবর্ষি নারদ মধুময় বীণার হরিময় ধ্বনি ছড়াইয়া যাহাকে অধিকতর রমণীয় করিয়া গিয়াছেন; অজ্ঞান ও মোহবশতঃ অচেতন মানবকে চেতনা প্রদান করিতে চিন্ময় চৈতন্য স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, মধুরভাব ঢালিয়া দিয়া যে পথকে মাধুর্য্যময় করিয়া গিয়াছেন; সেই সকল ভক্তির পথে যদি [illegible] অগ্রসর [illegible] থাক, তাহা হইলে তুমি সুখগম্য পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হইয়াছ।

নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে যাইতে যাইতে জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে উপনীত হয়।

ভক্তিপ্রধান মার্গে যাওয়ার জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনা করিবার নিয়ম জ্ঞানপ্রধান মার্গের নিয়ম হইতে কিছু স্বতন্ত্র। যেমন অন্যান্য মূলমার্গের নানাপ্রকার শাখাপ্রশাখা আছে, ভক্তিমার্গেরও সেই প্রকার আছে। সেই সকল শাখা মার্গেতেও আচরণীয় বৈধ কর্ম্মেরও আবার পরস্পর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। কোন্ পথে কাহার চলিলে সহজ ও সুবিধা হইবে, তাহা তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দেখিয়া সদ্গুরু বুঝিতে পারেন—যিনি প্রতিস্রোতে বহুদূর অগ্রগামী হইয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু—তাঁহারই বিশেষরূপে ইহা বুঝিবার ক্ষমতা আছে। কেহ সহজে কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিতে পারে না, মুখের কথা বলিলে কেহ নিষ্কাম হইতে পারে না, আবার নিষ্কাম কর্ম্ম না করিলেও কেহ জ্ঞানী বা ভক্ত হইবার অধিকারী হয় না। মনুষ্য জন্মজন্মান্তর হইতে ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া যে কামনাতরুকে সম্যক্রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করা কি সহজ? কামনাবশতঃ সুখ দুঃখের সংস্কাররাশি কতই সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে, যেমন পুরাতনগুলি ক্রমাগতঃ ব্যয়িত হইতেছে, তেমনই আবার নূতন নূতন অর্জ্জিত হইতেছে, অবশিষ্টগুলির প্রতিচ্ছবি অন্তঃকরণে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, তাহা অপনয়ন করা কি সহজ? এ সমস্ত হৃদয়ে চিত্রিত হইতেছে বলিয়া তাহারই তাড়নায় জীব পুনঃ পুনঃ দৃশ্যমান হইয়া ভাসিতেছে এবং সেই সকলের উপযোগী বিষয় গ্রহণের জন্য কেবলই ছুটাছুটি করিতেছে ও পুনরায় নূতন নূতন সংস্কার সঞ্চয় করিতেছে। যে কামনা এত অনর্থ ঘটাইতেছে, তাহা যদি কেহ সমূলে উৎপাটন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলে ঐ ফল শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা আর ভুগিতে হয় না, ক্রমে ক্রমে কর্ম্মও ছাড়িয়া যায়, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়। সেই জন্য শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, এবং তাহাই আচরণ করিবার জন্য নানাপ্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকামী ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে যাইতে পারে না কিংবা সে একবারে বিশুদ্ধ ভক্তিপথে উপনীত হইতে পারে না।

কামনাজালে জড়িত না হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?

লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে সকলেরই চরম উদ্দেশ্য একই, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সকলে ধারণা করিতে পারে না অথবা সকলের তাহা ভাল লাগে না। পথ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও যে, যে পথেই যা'ক্ না কেন, তাহাতেই যাইতে যাইতে সে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবে—সকলেই সেই একই শান্তিময় অবস্থা ভোগ করিবে। যে ব্যক্তি কামনাপাশে বদ্ধ হইয়া আছে ও তাহাতেই আরও জড়িত হইতে আরও ভাল বাসে এবং তাহার সেই সেই কামনা সফল হইলেই সুখ অনুভব করে ও সেই সুখকেই চরম সুখ মনে করে, তাহাকে কামনাজাল ছিন্ন করিবার কথা বলিলে, সে যাহা জানে না, যাহা বোঝে না, তাহাকে তাহাই দিতে চাহিলে, তাহার ভাল লাগিবে কেন ? যে অর্থগৃধ্নু জীব অর্থকেই সমস্ত সুখের আদর্শ মনে করিয়া তাহারই জন্য লালায়িত হয়, যে শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তি শত্রুকে দমন করিতে পারিলে সকল সুখই পাইবে মনে করিয়া তাহাকে জয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, যে অপর কর্ত্তৃক প্রশংসিত হওয়াকেই চরম সুখ মনে করিয়া যশের জন্য দিশাহারা হয়, যে কামুক কামিনীর কুটিল কটাক্ষে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাহারই হাসিমাখা মুখ খানিকে সুখের সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহাই পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়, যে রমণী তাহার প্রাণপ্রিয়তমের প্রিয়সম্ভাষণ অমূল্য সুখের আকর মনে করিয়া তাহাকেই সমস্ত হৃদয় প্রাণ অর্পণ করে, যে স্নেহময় জনকজননী সন্তানের কমনীয় মুখ দর্শন করতঃ সংসারের সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গিয়া, তাহাই তাহাদের সুখের পরাকাষ্ঠা মনে করে, যদি কেহ তাহাদিগকে ঐ সমস্ত ত্যাগ করিতে, আসন্ন সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করিতে বলে ও তাহাদের বুদ্ধির অতীত মুক্তি যদি কেহ তাহাদিগকে দিতে চাহে, তাহা কি তাহাদের ভাল লাগে ? তাহারা কি তাহা প্রার্থনা করে ? যদি অর্থস্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত একবারে তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহারা কি তাহা প্রীতিপ্রদ মনে করিতে পারে ? কিংবা যদি কেহ তাহাদিগকে বলে যে "ঐ সকল কিছুই নহে, ঐ সুখ সুখই নহে, কামনাই যত অনর্থের মূল, অতএব সমস্ত কামনা ত্যাগ কর, ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব, তাঁহারই প্রীত্যর্থে তুমি কর্ম্ম কর," এই সকল কথা কি হঠাৎ তাহাদের রুচিকর হয় ? এই,

প্রকার কথা বলিলেই কি তাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে? তাহা পারে না। সেই জন্য সদ্গুরু শিষ্যকে তাহার উপযোগী উপদেশ দিয়া, তাহার কামনার অনুকূল ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী কর্ম্ম করাইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ করেন এবং ধীরে ধীরে তাহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া গিয়া অবশেষে তাহাকে চিরশান্তি প্রদান করেন। তিনি সেই বিশাল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে এমনি ভাবে লইয়া যান যে, সেই চরম অবস্থা শিষ্যের আকাঙ্ক্ষিত না হইলে, তাহাকে সেই উদ্দেশ্য জানিতে দেন না, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে সে যে শারীরিক, ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক কর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে এই প্রকার ভাবে তাহাকে নিযুক্ত করিতেছেন যে, সে ক্রমাগতই অলক্ষিতরূপে সেই চরম উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু সেই কর্ম্ম তাহার অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। যেমন, ক্ষুধার্ত্ত বালক যাহা সম্মুখে পায় তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হয়, কোন মিষ্ট সামগ্রী বিষাক্ত হইলেও তাহা হস্তে লইয়া খাইবার জন্য লালায়িত হয়, তাহাতে তাহার প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ইহা বলিলেও শোনে না এবং বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেও কাঁদিয়া বিহ্বল হয়; উহা প্রাণবিয়োগকারক না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই দ্রব্যের অনিষ্টকর অংশটুকু বাদ দিয়া তাহাই খাইতে দেয়, অথবা তাহার হস্তে অন্য একটি মিষ্টান্ন দিয়া সেই দ্রব্যটি কৌশলক্রমে কাড়িয়া লয়, ইহাতে বালকের কোন অনিষ্টও হয় না এবং ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয়। ইহার জন্য বালককে যদি শাসন বা ভয়প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাও সে করিয়া থাকে। আপাতমধুর বিষাক্ত বিষয়সুখ উপভোগ করিবার জন্য লালায়িত ব্যক্তিকে সদ্গুরুও ঠিক সেই প্রকার করিয়া থাকেন। তিনি বিষয়ের অত্যন্ত অনিষ্টকর অংশটুকু বাদ দিয়া তাহাই ভোগ করিতে দেন, কিংবা বিষয়সুখ হইতে অন্য কোন প্রীতিকর সামগ্রীর দিকে তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মন হইতে বিষয়টি কাড়িয়া লন। এজন্য কোন প্রকার শাসন বা ভয়প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাও করিয়া অনিষ্টোৎপত্তি হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করেন। প্রথমতঃ বিষয়ের অনিষ্টকর অংশ বাদ দিয়া বৈধকর্ম্ম করিতে গুরু উপদেশ দিয়া থাকেন; যদি ঈশ্বরে তাহার প্রীতি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করেন, তৎপরে তাহার প্রীতি জন্মিলে, এবং সেই

প্রীতিবশতঃ তাহার মন আকর্ষিত হইলে, ঈশ্বরকেই তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া দেন, সে তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহাকে সুখজনক অনুভব করিয়া, বিষয়সুখ ছাড়িতে চেষ্টা করে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট বোধ হয়, সে তখন সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই দৃঢ়রূপে অবলম্বন করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

Spirits—জীবাত্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীব আপনাকে নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট করিবার চেষ্টায় ক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর উপাদানের কোষ বা শরীর গ্রহণ করত তদ্দ্বারা পরে পরে আবৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু জীব তখন বীজবৎ অজ্ঞান বা সুপ্ত—সুতরাং অক্ষম। তাহাদের বিবিধস্তর দিয়া অবতরণকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মুক্তাত্মগণ তাহাদের সম্পূর্ণ সাহায্যদানে পথপ্রদর্শকরূপে তাহাদিগকে চালিত করেন। জীবাত্মাকে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য প্রথমে তাহার বিবিধ কোষ সম্পূর্ণ সহায় হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের আত্মোপলব্ধি কালে সেইগুলি প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া পড়ে।

যেরূপে উহা হইয়া থাকে সেই প্রণালীটী নিম্নে সংক্ষেপে কহিতেছি। জীব যে জড়াংশ অগ্রে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত তাদাত্ম্যভাব স্থাপন করেন, সেই জড়াংশ বা উপাধি জীবকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলে জীব উৎফুল্ল হইয়া কহিয়া থাকেন 'ইহাই আমি'। যেমন যেমন কঠিনতর কোষ অবলম্বন করেন, তেমনই তিনি আরও নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকেন, এবং আপনাকে অপর সকল হইতে অধিকতর পৃথক্ করিতে থাকেন। কোন একটী জীবাত্মার নূতন শরীর পরিগ্রহণকালে মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে তাহার অপরিমেয় অতীতের বিবিধ অবস্থা ও ক্রমোন্নতি অতি দ্রুতবেগে পুনঃ অভিনীত হইতে দেখা যায়। শিশু সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ধরিতে থাকে, বোধহয় যেন জড়প্রকৃতিকে পরীক্ষা করিয়া লইতেছে; শিশু স্বীয় পদ তাহার নিজের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া তাহা

কামড়াইতে থাকে ও বেদনা অনুভব করিয়া চীৎকার করে—ক্রমে তাহার জ্ঞান হয় যে উহা তাহার নিজেরই পদ। প্রথমে সকলে তাহাকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করায়, সে আপনাকে 'খোকা' বলিয়াই জানে, এবং ক্রমশঃ 'আমি', 'আমার' জ্ঞান হওয়ায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে তাহার চৈতন্য স্থূলশরীর সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে ; 'আমি' 'আমার' জ্ঞান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে 'অপর' গুলিকে পৃথক্ করিয়া ফেলে। যে পরিমাণে শিশু দেখিতে, শুনিতে, আঘ্রাণ লইতে বা আস্বাদন লইতে চেষ্টা করে, সেই পরিমাণে ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে—যদ্দারা যথাসময়ে জড়প্রকৃতি পৃথক্ এবং আপনিও তাহা হইতে স্বতন্ত্র এই নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট জ্ঞান উদ্ভব হইবে। যখন কালক্রমে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই জীব তাহার স্থূলদেহ হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া 'আমি এই দেহ নহি' বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। তখন সেই জীব সূক্ষ্মতর দেহ অবলম্বন করে, বিবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে একীভূত করিয়া একটী পঞ্চাত্মক সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করে। এইরূপে জীব যেমন উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই একে একে নিম্নস্থ দেহ গুলি 'নেতি' 'নেতি' করিয়া পরিত্যাগ করিতে থাকে। প্রথমে যেমন "অহং এতৎ অস্মি" এইবাক্য জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধীন করে, সেইরূপ পরিশেষে "অহং এতৎ ন" এই মহাবাক্য শরীরগুলিকে বশীভূত করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতে থাকে। যত অধিক পরিমাণে আমরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব যে আমরা এই স্থূল দেহ নহি, এই কামময় দেহ নহি, এই মনোময় দেহও নহি, ততই যথার্থ আত্মজ্ঞান—আমি চিৎস্বরূপ এই জ্ঞান—আমাদের সন্নিকট হইয়া পড়ে এবং মুক্তিও নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে। (জীব স্বভাবতই মুক্ত, কেবল অবিদ্যার সহিত সংযোগকালে বদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।) যে পরিমাণে জ্ঞানের প্রসার হইতে থাকে, সেই পরিমাণে নিম্ন স্তরসমূহ অনাত্মা বলিয়া প্রতীত হয়—এই পৃথক্করণ হইতে পুরুষ আপনার ধ্রুবত্ব ক্রমশঃ অধিকতর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমশঃ আমরা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কিছুই নহি, কিন্তু প্রাণ মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব, এবং যে কোষ বা শরীরসমূহ প্রথমে বিবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব

—কারণ তখন সেই শরীরগুলি আমাদের উন্নতি পথে বাধা দিতে থাকিবে। (আমাদের চৈতন্য যখন সে কোষে অবস্থিত, তখন তদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য সময়ে সময়ে জীবাত্মার পরিবর্ত্তে কোষগুলিকেও জীবাত্মার স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়—যেমনঃ 'কে যাতায়াত করে' প্রশ্ন হইলে, 'বিজ্ঞানময় কোষই যাতায়াত করে' অনেকে এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন।) নিম্ন কোষ হইতে তদুচ্চস্থ কোষে চৈতন্য গমন করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইলে জীবের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা হয়—এইরূপে উচ্চতর কোষে অবস্থিতি কালে জীবাত্মার উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে—কিন্তু তাহা চরম অবস্থা নহে, অনন্ত সন্ময় অবস্থা নহে। সেই অবস্থা পাইতে হইলে—ব্রহ্মকে পাইতে হইলে—আমাদের হৃদয় মধ্যে অতি গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হইবে। আবরণের পর আবরণ প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর স্থানে উপনীত হইয়াও অগ্রসর হইতে যখন ক্ষান্ত হইব না, তৎপরেই অতি গভীরতম স্থানে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" বিরাজিত নিষ্কল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম দেখিতে পাইব—যে আবরণগুলি পূর্ব্বে আমাদের পৃথক্ রাখিয়াছিল, তখন আর তাহারা সেই পরমাত্মাকে লুকাইতে পারিবে না, এবং তখনই আমরা জানিতে পারিব যে সেই বিশাল আত্মা আমাদের সকলেরই আত্মা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৪৫)

সূতা একটু বাঁকা হইলে. সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করিবে না, স্ক্রু একটু বাঁকা বসিলে কাষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিবে না ; তাই বলি ভাই ! প্রাণে তিলার্দ্ধ বক্রভাব থাকিতে সূক্ষ্ম সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৩৪৬)

দয়াময় ! স্মৃতিপটই মানবের সকল দুঃখের মূল। আজিকার কথা কাল ভুলিয়া গেলে আর ভবে কেহ যন্ত্রণা পাইত না।

(৩৪৭)

শুনিয়াছি, কোন কোন ধাতু-সংস্পর্শ বিষময়; যাহারা ছাপাখানায় কাজ করে, তাহাদের Lead Poisoning হয়, যাহারা রূপার কারখানায় কাজ করে, তাহাদের নাকি ধবল কুষ্ঠ হয়; কিন্তু ভাই! বিষয়ের বিষ বড় ভয়ানক, উহা যাহার মনে একবার প্রবেশ করে, শুধু তাহাকে জর্জ্জরিত করে এমন নহে, তাহার সংস্পর্শে যাহারা আইসে, তাহাদিগকেও সে বিষের জ্বালা ভুগিতে হয়।

(৩৪৮)

আমাদের মন যখন সেই অভয় পদ হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই আমাদের বিপদ জানিবে; বিপদ শব্দের আর কিছু অর্থ নাই, সে পদ হারাইলেই বিপদ, পাইলেই সম্পদ। মানবের সম্পদ বিপদ সকলই সেই পরমপদ লইয়া।

(৩৪৯)

আদার মূলে গন্ধ, চন্দনের গুঁড়ীতে, পানকর্পূরের পাতায়, গোলাপের ফুলে, আম কাঁঠালের ফলে সুমধুর গন্ধ। আবার দেখ, আদার গন্ধ—মনোরম স্বাদ কটু, চন্দন গন্ধে মনোহর—আস্বাদনে তিক্ত, গোলাপের ফুল সুরভি—গাছে কাঁটা। দয়াময়! তুমিই জান, কিসে কি দিলে ভাল হয়। এ সংসারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিছুই গড়িলে না!

(৩৫০)

এ অকূল ভবসমুদ্রে ভাই! হাঁকু-পাঁকু করিও না, যত হাত-পা ছুঁড়িবে, ততই তলাইয়া যাইবে, সাঁতার না জানিলে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া স্থির হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে কিনারা পাইলেও পাইতে পার।

(৩৫১)

ব্যভিচারী প্রেম জ্বলন্ত ইক্ষুরসের ন্যায় অতিশয় তীব্র, তাহার আস্বাদনে জ্বলিয়া মরিতে হয়। তাই প্রাণপতিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারে প্রেম স্থাপন করিয়া আমরা প্রেমের জ্বালায় দিবানিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। এ কলঙ্কিত প্রেম উগরাইবার যো নাই—ফুকরাইবারও যো নাই।

(৩৫২)

শোক সন্তাপ বিপদাপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ লোকে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া পড়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি চোখ কাণ বুঁজিয়া কোনপ্রকারে

তাহা সহ্য করেন, কিন্তু প্রেমিক ব্যক্তি অকাতরে তাহা বহন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি মনকে যে কোনপ্রকারে হউক, একরকম বুঝাইয়া সুঝাইয়া প্রাণে প্রাণে পুড়িতে থাকেন; কিন্তু প্রেমিকের প্রাণে এই সকলের আঁচ আদৌ পঁহুছাইতে পারে না। জ্ঞানী মুখ চোখ সিঁটকাইয়া কোনপ্রকারে তাহা গলাধঃকরণ করেন; কিন্তু প্রেমিক তাঁহার প্রিয়তমের প্রেরিত জ্ঞান করিয়া বিপদাপদ শোকসন্তাপ সকলই সহাস্যবদনে ও সঙ্কোচশূন্য প্রাণে বুক পাতিয়া গ্রহণ করেন। প্রেমিকের প্রাণের প্রাণকে স্মরণ হইলে আর সংজ্ঞা থাকে না; তখন তিনি আনন্দে ও আদরে গলিয়া যান, বিষকেও সুধাজ্ঞানে সাগ্রহে ও সুখে পান করেন।

(৩৫৩)

মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহার জন্য আর জেলে যাইতে হয় না। চুরী করিলে বা মূল্য না দিলেই দণ্ডভোগ করিতে হয়। দয়াময়! এ সংসারে মানবকে যদি সকল সুখই মূল্য দিয়া কিনিতে হয় তবে আর নরকসৃষ্টির সার্থকতা?

(৩৫৪)

তীর্থ স্থানে গিয়া কোন একটী ফল ত্যাগ করিবার প্রথা বহুদিন হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। কেহ বা কাশীধামে গিয়া বিশ্বনাথকে বিল্বফল বা দাড়িম্ব দিয়া আইসেন, কেহ বা গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে কমলা লেবু বা খেজুর দিয়া আইসেন, কেহ বা পুরুষোত্তমপুরে জগন্নাথকে আম বা আনারস দিয়া আইসেন, কিন্তু এই ফলদানের গূঢ়মর্ম্ম কি, তা জান? ইহা সেই গীতার "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অর্থাৎ ভাই! তীর্থধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম যাহা কিছু কর, সেই সকল কর্ম্মেই কেবল তোমার অধিকার, তাহার ফল তখনি সেই স্থানের অধিষ্ঠাত দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া আসিও, পুঁজী করিয়া বা পুঁটলী বাঁধিয়া ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া মরিও না। এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে আসিয়া শুভাশুভ সকল কর্ম্মের ফল সেই দেবাদিদেব জগৎপতির শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শূন্যপ্রাণে মরিতে পারিলেই জানিবে জীবনের যাবতীয় যাগযজ্ঞ, জপতপ, দানধ্যান, ব্রত নিয়ম তীর্থধর্ম্ম সার্থক হইবে।

জনৈক পাগল।